বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

সাধনা ও সংস্কৃতি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.৫০

আলোচ্যমান গ্রন্থখানি নানা বিষয়ে রচিত রচনা সংকলন। লেখক একাধারে কবি ও দর্শনশাস্ত্রী। তাই কবির অনুভূতি ও দার্শনিকের প্রতীতি, কবি-জনোচিত যুক্তি. দার্শনিক জনোচিত যুক্তি একাধারে আশ্রিত হয়ে প্রত্যেকটি রচনা জ্ঞান ও আনন্দের আকর হয়ে উঠেছে। আমরা এই গ্রন্থের যথোচিত প্রচার কামনা করি। —যুগান্তর

রবীন্দ্র নাট্য ধারা

আশুতোষ ভট্টাচার্য

১০.০০

এই গ্রন্থটি অনেক দিক থেকে মূল্যবান। লেখক ভূমিকাংশে রবীন্দ্রনাথের অবির্ভাবকাল ও বাংলা নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক ও রবীন্দ্রনাথ, জোড়াসাঁকোতে অভিনয়, শান্তিনিকেতন নাট্যাভিনয়, কলকাতায় রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়, প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ...এক কথায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।... —অমৃত

বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১২.০০

লেখক উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিদের কবিতা ও কাব্যভাবনায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।...শুধু গবেষকের নীরস মন নিয়ে এই জাতীয় আলোচনা সম্ভব নয়। লেখক একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যপাঠকের রসাপিপাসু মন নিয়ে সমগ্র বিষয়টির বিচার করেছেন।... —অমৃত

ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য

সঞ্জীবকুমার বসু

৮.০০

লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা গুপ্তকবি সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। দশটি প্রবন্ধ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।...বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য। —দেশ

স্মৃতিময় অতীত

সঞ্জীবকুমার বসু

৪.০০

এই গ্রন্থে অনেক পুরোনো দিনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগই প্রাচীন বাংলা দেশের। এবং তার বেশীর ভাগই আবার ইংরেজ আগমন-পরবর্তী যুগের। আলোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য কথার ফুলঝুরি নয়। এই ধরণের গ্রন্থ যত বেশী লেখা হয় ততই ভালো। —দেশ

আধুনিক বিশ্বনাট্য প্রতিভা

জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

১০.০০

আলোচ্য গ্রন্থখানি আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক নাট্য প্রয়াসের একখানি মনোজ্ঞ চালচিত্র। এ ধরণের বই বাংলা ভাষায় বোধ করি এই প্রথম। শুধু নাট্যরসিক পাঠকের কাছে নয়, আধুনিক বাংলা নাট্যান্দোলনের সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত আছেন, তাদের কাছেও গ্রন্থখানি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।... —দেশ

সংস্কৃতি প্রকাশন : ১০ হেস্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৯৯০০

সব মানুষের জন্য·সব কলমের জন্য

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট ঃ
ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু
ব্ল্যাক ★ ব্রাউন
ওয়াশেব্‌ল ঃ রয়েল ব্লু
রেড ★ গ্রীণ
Sulekha

সুলেখা
সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট ঃ
ব্লু-ব্ল্যাক ★ নেভি ব্লু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেব্‌ল ঃ রয়েল ব্লু ★ এমারেল্ড গ্রীণ
স্কারলেট রেড
Sulekha
EXECUTIVE INK
Sulekha
সুলেখা
জেনারেল্
পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক
ওয়াশেব্‌ল ঃ
রয়েল ব্লু ★ রেড ★ ব্ল্যাক
Sulekha

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ · ১৮৯২ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

আরশি — শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ · ১৮৯২ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

কল্যাণীয়েষু

রথী এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। আজ বিকেলে পিনাঙ তার পর ১৬ই তারিখে সুমাত্রা থেকে জাহাজ ধরে জাভায়। নানা বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে কাজ এগিয়েছে। এখানকার গবর্মেণ্ট আমাদের প্রতি বিমুখতা দেখায় নি বলে আমাদের সুবিধা হয়েচে। বিরুদ্ধতা উদ্রেক করবার জন্যে শত্রুপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করেচে। আরিয়াম আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়েচে— ও ছাড়া আর কেউ কিছুই করতে পারতনা— যদিও মনে একটু সন্দেহ গোড়ায় ছিল কিন্তু এখন দেখচি এখানে আসা সার্থক হয়েচে। অথচ রবরের বাজার নেমে যাচ্চে। দর যদি চড়া থাকত তাহলে এখান থেকে পাঁচ লাখ পাওয়া অসম্ভব হতনা। আমরা জাভায় গেলে আরিয়াম এখানে টাকা সংগ্রহে কিছুকাল কাটাবে তার পরে যাবে সায়ামে, সাইগনে। বোধ হচ্ছে সেখানেও নিতান্ত বিফল হতে হবেনা। জাভায় তাহলে সেপ্টেম্বরের বেশি আমাদের থাকা চল্‌বেনা। এদিককার কাজেও কিছুদিন সময় দিতে হবে।

মহম্মদ ঘাউস্ বলে এখানকার একজন মাতব্বর লোক— বিশ্বভারতী কাগজের গ্রাহক। তিনি অভিযোগ করছিলেন এ বৎসরের আরম্ভ থেকে তাঁর কাগজ বন্ধ হয়ে আছে। কে যে কাগজ পাচ্চে কে পাচ্চে না তা জানবার জো নেই— কিন্তু একটা রেজিস্টার বই রেখে এটা কি জানবার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনেকেই না পেলেও খোঁজ নেয় না— দৈবাৎ এর সঙ্গে দেখা হল বলেই জানতে পারলুম।

Hibbert Lecture-এর জন্যে যে নিমন্ত্রণ এসেচে সেটা গ্রহণ করেচি। আগামী বৎসরের অক্টোবর নবেম্বরের দিকে। তার আগে কানাডা ও য়ুনাইটেড স্টেট্স্ সেরে আসব।

এতদিনে অম্বালাল নিশ্চয় দেশে ফিরেচেন। কাগজে দেখা গেল আহমদাবাদে খুব বন্যা হয়ে গেচে। তাহলে আপাতত সেখান থেকে বোধ হয় আমাদের আশা নেই।

শান্তিনিকেতনের কাজকর্ম্ম আশা করি ভালোই চল্‌চে। অমিয় সাহিত্য-অধ্যাপনার কাজে লেগেচে তার চিঠিতে খবর পেলুম। তাকে মাঝে মাঝে উৎসাহ দিস্ আর দেখিস্ তার খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধে হচ্চে কি না। ইতি ১৩ অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

কল্যাণীয়েষু

রথী, জাভার পথে চলেচি। আর একটু পরেই আসব সিঙাপুর বন্দরে। সেখানে একদিন থেকে জাহাজ বাটাভিয়ার দিকে পাড়ি দেবে। বাকে সুমাত্রায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেচে— তার কাছে যা খবর শোনা গেল তাতে বোঝা যাচ্চে জাভায় সমস্ত বন্দোবস্ত বেশ ভালোই হয়েচে। সেখানে অভ্যর্থনা ও আয়োজনের কোনো ত্রুটি হবে না। আরিয়ামকে রেখে আসা গেল টাকা আদায়ের কাজে। তার পরে সায়ামে গিয়ে যদি সে সুবিধা দেখে তাহলে খবর দিলে আমরা প্রস্তুত হব। সেখানকার ব্রিটিশ কন্সলের কাছ থেকে একটা বেশ ভাল চিঠি পেয়েছি। সেখানে তিনি আমাদের সুব্যবস্থার চেষ্টা করবেন লিখেচেন। জাভায় কিছু বক্তৃতা করতে হবে, সে তেমন দুষ্কর হবে না। আমরা যে জাহাজে যাচ্চি আমাকে তার ভাড়া দিতেই হবেনা, আমার দলবল যাবে অর্দ্ধেক ভাড়ায়। জাভায় খুব সম্ভব রেলপথে আমরা বিনা মাশুলে ভ্রমণ করতে পারব, আর অধিকাংশ জায়গাতেই কারো না কারো বাড়িতে থাকা চল্‌বে। বাকে সেখানে আমাদের আগে যাওয়াতে অনেক সুবিধা হয়েচে। ওখানে কম্যুনিস্টদের উৎপাতে সেখানকার গবর্মেণ্ট উতলা হয়ে আছে, বাকে আমাদের সঙ্গে থাকাতে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সিঙাপুরে থাকতে সেখানকার জর্ম্মন কন্সল আমাকে বলেছিলেন যে বর্লিনে ডাক্তার বেকার আমাদের কাছ থেকে জর্ম্মন বইয়ের ফর্দ্দের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। ফর্দ্দ পাঠানো হয়েচে কিনা জানিনে।

বাকের সঙ্গে বসে হিসাব করে দেখা গেল জাভা ও বালীর কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়তে অক্টোবরের ২০শে নাগাদ হবে। তার পরে সায়াম বর্ম্মা সেরে দেশে পৌছতে লাগবে নবেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। এখানকার কাজ শেষ হলেই বাকে দম্পতি শান্তিনিকেতনে ফিরবে। আরিয়ামের বিশ্বাস, মালয়ে আমার কাজ হয়ে গেছে এখন এণ্ড্রুজ এসে একবার শেষঝাড়া যদি দিয়ে যেতে পারে তাহলে আরো কিছু হতে পারে। ইতি ১৯ অগস্ট ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

বাটেভিয়া থেকে চলেচি বালীতে। সেখানে দুই সপ্তাহ খানেক থাকব। এখানকার ভারতীয়দের বলেচি আমাদের বই এবং Museum-এ রাখবার জিনিষ দান করবার জন্যে। তারা দেবে প্রতিশ্রুত। গবর্মেণ্ট দেবে তার নিজের Publications। সেগুলোও খুব মূল্যবান। ইতি ২৩ অগস্ট ১৯২৭

৪

ওঁ

রথী, ম্যাঞ্চেষ্টর গার্জিয়ানে যে চিঠি পাঠিয়েছি তার ছাপানো কপি কতকগুলো তোর নামে এই সঙ্গে রওনা হবে। সেগুলো Copy from the letters sent to M. Guardian বলে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জেলার কাগজে পাঠাতে হবে। Andrews যদি ভারতবর্ষে থাকে তাকেও দিস তার জানা Editor প্রভৃতিকে পাঠাতে।

তোদের অনেকগুলো চিঠির সঙ্গে বালির বিবরণ দিয়ে রানীকে যে চিঠি দিয়েছি তার শেষ অংশে ··সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য আছে···র একান্ত অনুনয় সে অংশটা যেন ছাপানো না হয়, কেননা ওতে··প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমি নিজে তা ঠিক মনে করিনে— যেটা উচিত কথা সেটা বল্‌লে ভালো বই মন্দ হয় না। যাই হোক তোরা সকলে যা ভালো বোধ করিস সেই অনুসারেই ছাপতে দিস। এই চিঠিগুলো সব বিচিত্রায় যাবে। আজ বিকালে এখানকার আর্ট সোসাইটিতে আমার একটা বক্তৃতা আছে। কাল সকালে এখান থেকে সুরকর্তা যোগ্যকর্তা অভিমুখে রওনা হতে হবে। দীর্ঘ পথ। ইতি ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পিনাঙ

৫

কল্যাণীয়েষু

রথী আজ এখনি সকালে শ্যামের দিকে রওনা হতে হবে। দুই দিন এক রাত রেলপথে কাটবে। সুবিধে এই আমাদের জন্যে গাড়িতে যথাসম্ভব আরামের বন্দোবস্ত হয়েচে। শোনা যাচ্চে শ্যাম অঞ্চলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না— হয় ত রাজদরবার থেকে কিছু আশা করা যেতেও পারে। যাই হোক যাত্রাটা একেবারে ব্যর্থ হবে মনে করিনে। কয় দিন খুব ঝড়বৃষ্টির পরে আজ সকালে সূর্য্য উঠেচে, সমুদ্রের বুক চাপড়ানিও একটু ক্লান্ত হয়ে আসচে। আমরা চেষ্টা করচি পিনাঙে ১৭ই তারিখে পৌঁছিয়েই সেই দিনেই একটা জাপানী জাহাজ আশ্রয় করতে। Awa-Maru একটা বড়ো জাহাজ, কলকাতায় যায়। সিঙাপুর আপিসের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করচি, দেখা যাক্ কি হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ককে আমার প্রোগ্রামটা কি, না জেনে নিশ্চিত বলতে পারিনে। ওদিকে রেঙ্গুন আমাদের আগমন অপেক্ষা করে আছে। অন্তত তিনটে দিনও তারা ধরে রাখবার চেষ্টা করবে। মনে করতেও ভালো লাগ্‌চেনা— ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। কিন্তু যতটা জানা যাচ্চে এদিকের পালাটা জমবে। জমাবার মূলে আছে আরিয়াম। খুব কাজের লোক— কিছুতেই দমতে জানেনা। ধীরেনের কাছ থেকে কতক কতক খবর জানতে পারবি। ইতি অক্টোবর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

অমিয় ॥ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

অম্বালাল ॥ রবীন্দ্র-সুহৃৎ আমেদাবাদের অম্বালাল সরাভাই

আরিয়াম ॥ আরিয়াম উইলিয়মস (আর্যনায়কম)

এণ্ড্রুজ ॥ সি. এফ. এণ্ড্রুজ

ধীরেন ॥ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ

বাকে ॥ রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড বাকে

রানী ॥ শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ

কমলাকান্তের বঙ্কিম

ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত একটি অনন্যসাধারণ রসসৃষ্টিমূলক রচনা হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। স্থূল বক্তব্যের চেয়েও এর শিল্পরসটাই আমাদের সাহিত্যে অবিস্মরণীয়তা অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপ্রবন্ধ ছিন্নপত্র উপন্যাস ছোটোগল্পের মতোই আমরা কমলাকান্তের শিল্পরসই আস্বাদন করে থাকি। এ যেন আমাদের অনুভূতিলোকে সুকুমার কল্পনার ছায়াপটের সূত্রধার। কমলাকান্ত চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট চরিত্র। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে কাদম্বরীর পত্রলেখার মতো তার একটি মধুর সুহৃদ্‌সম্পর্ক। তার নিপুণ পরিহাস, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কখনও অশ্রুতে বিগলিত, কখনও বেদনায় আর্ত, কখনও আত্মমগ্নতায় প্রশান্ত, কখনও ভর্ৎসনায় অধীর। ধ্যানে জ্ঞানে স্বপ্নে ভাবনায় উপদেশে পরামর্শে কমলাকান্ত-চরিত্র বিচিত্র। তার নিরাসক্ত মানবপ্রেমে ভরা নিঃসঙ্গ স্পর্শকোমল হৃদয়ছবি আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে এই অপরূপ সৃষ্টির পশ্চাতে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবদ্ধ জীবনচিন্তা যা তাঁর প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে একটি কঠিন বাস্তবভিত্তি রচনা করেছে।

কমলাকান্তের এই চিন্তাবস্তুটির সুসম্বদ্ধ বিবরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। এতে অবশ্য তার শিল্পসৌন্দর্যকে কোনো দিক দিয়েই খর্ব করার দরকার নেই। সেদিক থেকে তার চূড়ান্ত সাফল্যকে মেনে নিয়েই অন্য দিক দিয়ে এর গভীরতার পরিমাপ করা যায়। বস্তুত বঙ্কিম-মনীষার এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর রসসৃষ্টি তাঁর যুক্তিবোধকে কোনো দিক দিয়ে প্রতিহত করে না বরং তাঁর কল্পনাকে একটি দৃঢ় বস্তুভিত্তি দেয়। এ রকম দৃষ্টান্ত যে বাংলা সাহিত্যে আর নেই তা নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবভক্তিভাবকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'তে তত্ত্ব এবং রস সম্মিলিত হয়ে গিয়েছে। গোরার উপন্যাস-রস আস্বাদন করতে আগ্রহী কোনো পাঠক রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাকেও এর থেকে আহরণ করতে চাইলে নিশ্চয়ই ঠকবেন না।

তবে এটাও হয়তো অস্বীকার করা যাবে না যে কমলাকান্তে বক্তব্যের দিকটা একটু বেশিই প্রাধান্য পেয়েছে। 'বিড়াল' 'আমার মন' 'একটি গীত' প্রভৃতি কয়েকটি রচনাতে লেখকের কয়েকটি সুস্পষ্ট বক্তব্য পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত সচেতন করে সন্দেহ নেই। এটা খুব স্বাভাবিক। উনিশ শতকের সাহিত্য-কর্মে প্রায় সর্বত্রই এই বক্তব্যপ্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই বিচিত্রপ্রবন্ধের ভূমিকায় লিখেছিলেন,

'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।'

এ যেন বঙ্কিমী যুগের বিষয়বস্তুগৌরবান্বিত রচনারীতির প্রতিক্রিয়াতেই বলা। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকেন্দ্রিক এবং বক্তব্যগৌণ সাহিত্যরূপের প্রবর্তন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রসসাহিত্য-সৃষ্টিতেও বক্তব্যবিষয় প্রাধান্য পেয়েছে কালধর্মে, যদিও তাতে রসসৃষ্টি কোনো দিক থেকে ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই জন্যই কমলাকান্তকে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার ফসল হিসাবে পাঠ করলেও ক্ষতি নেই।

'কমলাকান্ত' বইটি আমরা বর্তমানে যে রূপে পাই, প্রথম সংস্করণে এ বই সে রকম ছিল না। 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাতে ছিল এগারোটি রচনা। এই রচনাগুলি সবই বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৭৯ বাংলা সনের বৈশাখ মাস থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে ; ১২৮০র ভাদ্র থেকে ১২৮১র চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিমের নিজের লেখা রচনাগুলি ওই পত্রিকায় বেরোয়। অতঃপর ১২৮২তে (১৮৭৫ খ্রী) কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তখন এতে যেসব প্রবন্ধ ছিল বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালসহ তার তালিকা এই—

একা (ভাদ্র ১২৮০), মনুষ্যফল (আশ্বিন ১২৮০) ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয় (কার্তিক ১২৮০, পরে 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' নামে গ্রন্থভুক্ত), পতঙ্গ (অগ্রহায়ণ ১২৮০), আমার মন (মাঘ ১২৮০), বসন্তের কোকিল (চৈত্র ১২৮০), বিবাহ (আষাঢ় ১২৮১), বড়বাজার (আশ্বিন ১২৮১), আমার দুর্গোৎসব (কার্তিক ১২৮১), একটি গীত (ফাল্গুন ১২৮১), বিড়াল (চৈত্র ১২৮১)

বলা বাহুল্য এই তালিকায় বর্তমানে প্রচলিত 'চন্দ্রালোকে' (ফাল্গুন ১২৮০) এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) নেই। তার কারণ প্রথমটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং দ্বিতীয়টি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। যে দেড় বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেই সময়টি ছিল তাঁর বঙ্গদর্শনে চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-রচনার যুগ, সেগুলি 'বিবিধপ্রবন্ধ' নামে পরে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয়েছে। ১২৮২ সালেই বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়।

১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 'বুড়াবয়সের কথা'— তাতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী নাম ব্যবহার করেন নি। ১২৮৪র পৌষে লেখেন কমলাকান্তের পত্র— 'কি লিখিব' এবং 'কমলাকান্তের বিদায়' নামাঙ্কিত হয়ে গ্রন্থভুক্ত। ১২৮৪র ফাল্গুনে তিনি লিখলেন 'পলিটিকস', ১২৮৫র শ্রাবণ মাসে লিখলেন 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব'। তার পর ১২৮৮র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। তার পরেও ১২৮৯ সালের বৈশাখে 'ঢেঁকি' প্রকাশিত হয়।

১২৯২ সালে (১৮৮৫) কমলাকান্তের দপ্তরের রচনাগুলি সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি সহ 'কমলাকান্ত' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এতে তিনটি অংশ কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও মূল কমলাকান্তের দপ্তরের অনেক পরে লেখা, তবু 'ঢেঁকি' কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণে দপ্তর-অংশের অন্তর্গত হয়।

আমরা বর্তমানে সাধারণভাবে 'কমলাকান্ত' বইটি বোঝাতে 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামটি ব্যবহার করে থাকি, যদিও এ-প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়।

কমলাকান্তের বিভিন্ন রচনাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের দীর্ঘকাল জুড়ে আছে। বয়সের পরিণতির সঙ্গেসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও কল্পনারও পরিণতি এসেছে। তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় কমলাকান্তের লেখাগুলি চলে এসেছে। এর মধ্যে উভয়েরই ভাবপ্রতিফলন একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

কমলাকান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে হয় তা এই যে এর কোনো পূর্বাভাস কোথাও আছে কি-না। শিল্প হিসাবে কমলাকান্ত যে অভিনব সে কথা সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা

সাহিত্যে তখন অনেক কিছুই অভিনব, মহাকাব্য নাটক উপন্যাস। কমলাকান্তও তেমনি একটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি রূপেই পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পরে কমলাকান্তের অনুকরণ অনেক হয়েছে কিন্তু কমলাকান্ত বাংলা সাহিত্যে কারো অনুকরণ করে নি। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত আমাদের কিছু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন।[১]

আমাদের নবসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শ থেকে পেয়েছি। নতুন যুগের যাঁরা সার্থক সাহিত্যিক তাঁরা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত। বাংলায় মঙ্গলকাব্য কবিওয়ালার গান এবং পাঁচালীর সকল সম্ভাবনাই তখন নিঃশেষিত। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। সেকালের নব্যপন্থীরা 'স্পেকটেটর' নামের অনুকরণে করেছিলেন 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র তার থেকেই 'বঙ্গদর্শন' নামেরও ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন। বঙ্গদর্শনে মাসে মাসে 'লোকরহস্য' এবং কমলাকান্তে'র যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়ে বাঙালি সমাজজীবন এবং চরিত্রকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস-রসিকতায় অভিষিক্ত করেছে, তার পরিকল্পনা ট্যাটলার এবং স্পেকটেটরে অ্যাডিসন-স্টীলের বিচিত্র গদ্যরচনা থেকেই হয়তো এসে থাকবে। ইতিপূর্বে নানা বাংলা সাময়িক পত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ মন্তব্য বেরিয়েছে, কিন্তু সাময়িক উপলক্ষ-বর্জিত লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং রচনাভঙ্গি-সমন্বিত স্বতন্ত্র রচনা— যা পরবর্তী প্রবন্ধ-সাহিত্যের অগ্রদূত— প্রকাশিত হয় নি। এ ধরণের রচনা প্রকাশের পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্র যদি ইংরেজি সাহিত্য থেকে পেয়ে থাকেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, স্বীকার করতেও দ্বিধার কারণ নেই। সামাজিক বিষয়ের পর্যবেক্ষণের সূত্রেই অ্যাডিসনের রচনায় সার্ রোজার ডি কভার্লির মতো চরিত্র এসেছে; অন্য দিক দিয়ে তুলনা না করেও বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় এবং কমলাকান্তের দপ্তরে এই সূত্রেই বহু কাল্পনিক চরিত্র ভিড় করে এসেছে। মুচিরাম গুড়, কমলাকান্ত চক্রবর্তী, নসীরাম, ভীষ্মদেব খোশনবিশ প্রভৃতিকে নানা উদ্দেশ্য-সাধনে উদ্‌ভাবন করতে হয়েছে।

কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নানা মন্তব্য করানো ডি কুইন্সীর 'কনফেশনে'র অনুরূপ সন্দেহ নেই, যদিও ডি কুইন্সীর মন্তব্যগুলির সঙ্গে কমলাকান্তের গভীরচিন্তাদ্যোতক নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির তুলনা চলে না। ডি কুইন্সীর আফিমখোর তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাধারা মাত্র বর্ণনা করে গিয়েছে। কমলাকান্তের বস্তুত কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। সে নিরাসক্ত, আত্মীয়পরিজনহীন, সংসারবিমুখ। তার চিন্তা বস্তুতই নিজেকে নিয়ে নয়, সংসার ও জীবনের সাধারণ প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে।

কমলাকান্তর মনে যখন যা আসত ছেঁড়া কাগজে সে সেগুলি লিখে রাখত। একদিন সে তার এই কাগজগুলি ভীষ্মদেব খোসনবিশকে দিয়ে চলে যায়। ভীষ্মদেব লেখেন,

'এ অমূল্য-রত্ন লইয়া আমি কি করিব। প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে— যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা

১ 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য

আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম!'

পরিত্যক্ত কাগজপত্র অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা এবং তার পর সেই পত্রগুলিকেই প্রকাশ করবার এই কল্পনা স্কটের *Tales of My Landlord* থেকে নেওয়া হতে পারে বলে কেউ অনুমান করেন।[২] ডিকেন্সের পিকউইক ক্লাবেও এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে![৩] A Madman's Manuscript নামে সেই অংশটির সূচনাতে আছে,

If it failed to interest him, it might send him to sleep. He took it from his coat-pocket, and drawing a small table towards his bedside, trimmed the light, put on his spectacles and composed himself to read. It was a strange hard-writing and the paper was much soiled and blotted.

ডিকেন্সের থেকে কমলাকান্তের জোবানবন্দীর কল্পনাও এসেছিল[৪] সম্ভবত, কিন্তু তুলনা করলেই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে এবং নতুন সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। ডিকেন্সের পাগল উন্মাদরোগগ্রস্ত, তার উন্মত্ততা ব্যক্তিগত ঘটনার ফল. তার পাণ্ডুলিপিতেও নিজের সেই কাহিনী বর্ণনা করেছে। এদিক দিয়ে কমলাকান্তের সঙ্গে তার মিল নেই। জোবানবন্দীতেও কমলাকান্ত আপাতনির্বোধ উক্তি করেছে মাত্র, কিন্তু স্যাম অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং সরল। তার সরল উক্তিগুলি হাস্যরসের সৃষ্টি করে। ফলে স্যাম সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রে পরিণত। তার সরল উক্তিতেই পিকউইকের নির্দোষিতা প্রমাণিত। —তাই তার ভূমিকা তত্ত্বভাবনাবর্জিত সহজ ঔপন্যাসিক চরিত্রের ভূমিকা।

কমলাকান্তের শিল্পরূপে বিদেশী প্রভাব অস্বীকার্য নয়। এই শিল্পরূপের কোনো পূর্বাভাস আমাদের বাংলা সাহিত্যে ছিল না, সে কথাও বলা বাহুল্য। কিন্তু কমলাকান্ত যে ব্যঙ্গের এবং পরিহাসের ভঙ্গিতে সমাজ-সমালোচনা করেছে, তার কিছু পূর্বভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। নবজাগরণের সূত্রপাতে অভিনব পরিবর্তনগুলি অনেকের কাছে ছিল কৌতুকের বিষয়, অনেকের কাছে ছিল ক্ষোভের বিষয়, অনেকের কাছে ছিল সুদূর তাৎপর্যের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রক্ষণশীল সমাজের কাছে এই পরিবর্তন ছিল ক্ষোভের কারণ, নব্যবঙ্গের কাছে ছিল গভীর তাৎপর্যবহ। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক কবিতায় এটাই হয়ে দাঁড়াল কৌতুকের বিষয়। রঙ্গ ব্যঙ্গে পরিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সমকালীন সমাজকে দর্শনীয় করে তুললেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত রচনায় তাঁর বাল্যকালের সাহিত্যশিক্ষাগুরুর কাছ থেকে পাওয়া আদর্শ বিশেষ কিছুই রক্ষা করেন নি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত -সুলভ হাস্যপরিহাসময় সমাজ-সমালোচনার ভঙ্গি লোকরহস্যে এবং কমলাকান্তের দপ্তরে রক্ষা করেছিলেন।[৫] অবশ্য এইটুকুমাত্র বলে ক্ষান্ত থাকা ঈশ্বর গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের প্রতিই অবিচার। কারণ ঈশ্বর গুপ্ত স্বভাবধর্মবশত উদ্দেশ্যহীন এবং বিদ্বেষহীন রসিকতা করেছেন কিংবা মজাই শুধু করেছেন; বঙ্কিমচন্দ্র একটি সুদূর-গভীর জীবনমূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর

২ Priyaranjan Sen, *Western Influence in Bengali Literature* (1967) p. 223

৩ The Pickwick Club, chap. XI

৪ The Pickwick Club, chap. XXXIV

৫ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে' এর উল্লেখ করেছেন।

রসিকতার সঙ্গে ঘটেছিল মনীষার মিশ্রণ, তাঁর ব্যঙ্গে ছিল উদ্দেশ্য এবং কখনও কখনও বিদ্বেষ— অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। কমলাকান্তের কোনো কোনো রচনায় স্পষ্টতই রূপকের লক্ষণ আছে। আবার কোনো কোনো রচনা ঠিক রূপক না হলেও উক্তিতে এবং মন্তব্যে তাতে রূপকের আভাস আছে। 'পতঙ্গ' বা 'বড়বাজার' রূপকধর্মী রচনা, আবার 'মনুষ্যফল' ও 'বিড়াল' রূপকের আভাস সমন্বিত। 'পলিটিক্‌স'এ বৃষ ও কুকুরের অবতারণা পুরোপুরি না হলেও রূপকের আভাস নিয়ে এসেছে। এই বিশিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বনে বক্তব্যকে পরিবেশন করা ইংরেজি থেকে এসেছে কি না সন্দেহ, কিন্তু বাংলায় যে এই ভঙ্গি প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই বিশেষত রূপক-কবিতাতে। আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' পর্যন্ত রূপকের চর্চা হয়েছে। গদ্যের ক্ষেত্রে সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্তই এর প্রবর্তক। অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক রচনাগুলি এর উদাহরণ।

রসসৃষ্টি হিসাবে কমলাকান্ত একটি অনুপম সৃষ্টি হলেও এ কথা তো অস্বীকার করার নেই যে এই রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গভীর ও গুরু চিন্তাই পরিবেশন করেছেন। বস্তুত 'ফুলের বিবাহে'র মতো কল্পনামূলক লেখাটি ছাড়া অন্য সব গুলিতেই বঙ্কিমের এই উদ্দেশ্যটি বেশ স্পষ্ট। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হয় যে, বঙ্গদর্শনের পূর্বে কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করলেও বঙ্গদর্শনের যুগটাই (১৮৭২-১৮৭৫) চিন্তানায়ক বঙ্কিমের মনীষার দীপ্ত আত্মপ্রকাশের যুগ। 'বিবিধপ্রবন্ধে' সংকলিত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। 'বিবিদপ্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বিভিন্ন বিষয় দেখা দিল। ভারতবর্ষ ও বাঙলাদেশের ইতিহাস নিয়ে ভাবনা, আমাদের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ, আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব, লোকজীবনচিন্তা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনা, ফাইন আর্টস বা সূক্ষ্মশিল্প বিশ্লেষণ— এইসব নতুন ধরণের চিন্তাবস্তু বঙ্কিমচন্দ্র সুসংহত রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের আকারে বাঙালি পাঠকের চেতনাগোচর করলেন। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিকে দুই দিক দিয়ে দেখা যায়। প্রথমত জীবন ও সমাজের বিবরণ ও বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়ত নতুনতর মূল্যবোধ বা আদর্শচিন্তা। প্রথম রীতিটি ঐতিহাসিকের, দ্বিতীয় রীতিটি তত্ত্বদর্শী দার্শনিকের। অবশ্য এই রীতিভাগ নেহাতই স্থূল, বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দুইই মিশে থাকে, বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাবের অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত না হলে কোনো রচনাই গভীরতা অর্জন করে না। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-রচনার সাফল্য বস্তুতই এই দুয়ের মিশ্রণের ফল। এ কথা অনস্বীকার্য হলেও পরবর্তী বঙ্কিমকে মূলত আমরা দার্শনিক হিসাবেই পাই, বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমকে পাই বিশ্লেষণপরায়ণ মনীষী হিসাবে। তাঁর এই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে কমলাকান্তের দপ্তরে, কিন্তু এ কথা সহজেই অনুমেয় যে কমলাকান্তের দপ্তরের অভিনব রসসৃষ্টির মূলে কেবল বিচারই নেই, থাকতেও পারে না, বরং কমলাকান্ত চক্রবর্তীর অধীর উন্মাদনার প্রেরণামূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে ধ্রুববিশ্বাস প্রীতি আদর্শ ও মূল্যবোধ। কমলাকান্তকে কেউ কেউ যে কবি ও দার্শনিক বলে অভিহিত করেছেন তার কারণ এই। 'বিবিধপ্রবন্ধ' যেমন মূলত ঐতিহাসিক বোধ ও বিচারের সৃষ্টি, 'কমলাকান্তের দপ্তর' তেমনি তত্ত্ব ও আদর্শবোধের সৃষ্টি।

এই তত্ত্ব এবং নবমূল্যবোধ অবশ্য বিবিধপ্রবন্ধেও ছিল। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই 'ভারতকলঙ্ক' প্রকাশিত হয়েছে। ভারতকলঙ্ক শুধু ইতিহাস-বিশ্লেষণ নয়, গভীর জাতীয়তাবাদেরও অভিব্যক্তি। বঙ্কিমমানসে জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ আমরা দেখি 'মৃণালিনী'তে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তার পরে পাই ভারতকলঙ্ক। অতঃপর বিভিন্ন রচনার মধ্যেই জাতীয়তাবাদী প্রেরণা অন্তঃসঞ্চারী হয়ে আছে। তাঁর সমাজবিষয়ক লেখাগুলিতেও এই প্রেরণাই কাজ করেছে। এই প্রেরণার বশেই তিনি বাঙালি সমাজকে সমালোচনা করেছেন ধিক্‌কার দিয়েছেন নিন্দা করেছেন, লোকরহস্যের 'হনুমদ্বাবুসংবাদ' লিখেছেন, 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখেছেন। পরবর্তী কালেও 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' ও বাংলার ইতিহাস-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর মূলেও প্রেরণারূপে নিহিত ছিল গভীর দেশপ্রেম। আধুনিক বাংলার সমাজে ও চিন্তায় দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মহৎ দান। এই দেশানুরাগ ইতিহাসবোধজাত। ধর্মতত্ত্বে দেশপ্রেমের যে ব্যাখ্যা আছে, সে অবশ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা, সেখানে দেশপ্রেমকে যুক্তি দিয়ে তার অন্যনিরপেক্ষ মূল্যবত্তা সৃষ্টি করেছেন।

কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম উন্মত্ত আবেগের মধ্যে দিয়ে উদাত্ত ঝঙ্কারে গীতিময় হয়েছে। বিশেষ করে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'এ। 'একটি গীত' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে তাঁর অন্তঃনিরুদ্ধ আবেগকে দিগন্তব্যাপী হাহাকারে অবারিত করে দিয়েছেন—

'চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশানভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা, হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়?··· মনে মনে দেখিতে পাই মার্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিশ্মিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন।'

মুসলমানদের দ্বারা বাংলা বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাকে বঙ্কিম উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে বিভিন্ন উপলক্ষে স্মরণ করেছেন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না এই ঘটনার স্মৃতি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কাব্যোচ্ছ্বাসের সূত্রপাত হয়েছে। 'মৃণালিনী' এই বাংলা-জয়ের কাহিনী নিয়ে পরিকল্পিত। সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছে, এই কিংবদন্তীর লজ্জা বঙ্কিমকে দীর্ঘকাল পীড়া দিয়েছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' (১৮৭৪) পড়েই খুব সম্ভবত এই কাহিনীর অলীকত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ওই বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নাম দিয়ে (মাঘ ১২৮১)। তাতে তিনি বলেন,

'সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল।'

কমলাকান্তের 'একটি গীত' বঙ্গদর্শনের ঠিক পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় (ফাল্গুন ১২৮১)। প্রবন্ধে যেটা তথ্য রূপে মাত্র সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, 'একটি গীতে' সেটাই গভীর আবেগে ও বেদনায়

আর্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। ইতিহাস-আলোচনায় আবেগ ছিল নিরুদ্ধ, কমলাকান্তে সেই আবেগ হৃদয় বিদীর্ণ করে উৎসারিত। অতঃপর সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (অগ্রহায়ণ ১২৮৭) 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধটিতেও সেই একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন,

'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে?

'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?'

এই আবেগ এই বচনভঙ্গি এই মাতৃভাবনা কমলাকান্তের, এ কথা সহজেই অনুভব করা যায় 'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটির সঙ্গে তুলনা করলে। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ স্মরণীয়তা আছে, কেননা আনন্দমঠের মাতৃরূপের পূর্বাভাস ছিল এখানেই। 'একটি গীতে'র তিন মাস পূর্বে এই রচনাটি প্রকাশিত হয় (কার্তিক ১২৮১)। এতে কিন্তু ইতিহাস-অনুষঙ্গ নেই, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতির কোনো অবতারণা নেই। স্পষ্টতই বঙ্কিম এখানে দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে যুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন থেকে মুক্ত করে অন্যনিরপেক্ষ নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশজননীকে তিনি হিন্দু বাঙালির ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কমলাকান্তের আর কোনো দেবী নেই দেশলক্ষ্মী ছাড়া, আর কোনো পূজা নেই দেশপূজা ছাড়া। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের উত্তরার্ধে ধর্মতত্ত্বে মনুষ্যচরিত্রের নীতি স্থির করতে গিয়ে দেশভক্তিকেও তার চারিত্র্যনীতির অন্তর্গত করেছিলেন। তার সূচনা এখানে।

তা ছাড়া আনন্দমঠের কেন্দ্রীয় ভাবটির সূচনাও এখানে। সন্তানদের পূজ্যা দেশজননী দশভুজার পরিকল্পনাতেই পরিকল্পিত। আনন্দমঠের দেশজননী-মূর্তি বলিষ্ঠ ভাবের উদ্দীপক, ঐশ্বর্যময়ী। পতিত অবসন্ন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করে রজোগুণান্বিত করে তুলতে পারে এমনি ভাবেই সেই মূর্তি রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'আমার দুর্গোৎসবে'র মাতৃমূর্তি-বর্ণনাতেও সেই ঐশ্বর্যভাবের স্বপ্নেই কমলাকান্ত মগ্ন—

'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী-অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ-দশ দিক-দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত!'

আনন্দমঠের মূল ভাবটি 'বন্দেমাতরম্' গানটিতে সংহত হয়ে জাতীয়-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যে দেশরূপের কল্পনা বঙ্কিমমানসে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তারই যথার্থ মন্ত্ররূপ হচ্ছে এই সংগীত। বন্দেমাতরম্ আনন্দমঠে যথাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হলেও, মনে রাখতে হবে, গানটি লেখা হয়েছিল কমলাকান্তের দপ্তরের সমকালে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য সংকলিত আছে বঙ্কিমপ্রসঙ্গে।[৬] বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখনই গানটি রচিত হয়েছিল। এই ঘটনা অবশ্যই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের

৬ বঙ্কিমপ্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' এবং ললিতচন্দ্র মিত্রের 'বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।

মধ্যে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তার পর আর সম্পাদক ছিলেন না। ঠিক কোন্ সময়ে এই গানটি রচিত হয়েছিল সে তারিখ নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও 'আমার দুর্গোৎসব' লেখার সমসাময়িক কালেই যে গানটি রচিত তাতে সন্দেহ করা চলে না। দুর্গামূর্তির সঙ্গে দেশজননী কি করে অভিন্ন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিকে অধিকার করেছিল, সেই ইতিহাসও জানা যায়। একবার অষ্টমী পূজার দিন রাত্রিতে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে একজন কীর্তন-গায়ক বলরাম দাসের 'এসো এসো বঁধু' পদটি গান করেন। গানের মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে অনেকক্ষণ অভিভূত করে রাখে। কীর্তন-গায়ক আরও অন্য গান করেন কিন্তু এই গানটি বারবার শুনেই সেই রাত্রি ভোর হয়।[৭] এই ঘটনার স্মৃতিতেই বঙ্কিম কমলাকান্তের দপ্তরে লিখেছিলেন—

'যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী হইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে একা এই গীত গাই[৮] —এই গীত কখনও ভুলিতে পারিলাম না।'

সেই দুর্গাপূজার উপলক্ষের সঙ্গে বৈষ্ণব কবির এই গানটি মিশে গেল। গানের বঁধু হলেন দেবী দুর্গা, বঙ্কিমের তীব্র দেশাকাঙ্ক্ষার প্রতিমায় তিনিই হলেন রূপান্তরিত।

আধুনিক বাঙালির চিন্তার জগতে যেসব নতুন মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে দেশাত্মবোধ তার অন্যতম। দেশের সম্বন্ধে ভাবনা অবশ্য বঙ্কিমেই প্রথম নয়, তাঁর পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত, সকলেই নানা ভাবে জাতি দেশ এবং সমাজের চিন্তা করে গিয়েছেন। পূর্বে সমাজপতিরা নিজের সমাজের চিন্তাই করেছেন, সে-সমাজ আচারচিহ্নাঙ্কিত সাম্প্রদায়িক সমাজ। আধুনিক কালেই সেই সাম্প্রদায়িক সমাজের উর্ধ্বে দেশভাবনা নবশিক্ষিতদের মধ্যে স্থান করে নিল। এই নতুন ভাবের প্রেরণা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরই ফল, তারই সঙ্গে জড়িত আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। আমরা এই পরিবর্তনকে পরম আগ্রহেই বরণ করে নিয়েছিলাম। নবশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রসমাজ এই পরিবর্তনেরই সৃষ্টি। কিন্তু নতুন শিক্ষা দেশের চিত্তকে কতখানি আলোকিত করেছে, এই প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রই তুলেছিলেন। এই প্রশ্ন বস্তুত জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির কাম্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন নিঃসংশয় তেমনি অভ্রান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলরূপে এই শিক্ষার প্রসার ও প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, কলকারখানা, জীবিকা-অর্জনের নানা নতুন নতুন উপায়। বঙ্কিমচন্দ্র চোখের উপরেই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ সংবাদপত্র প্রভৃতির বিস্তার দেখেছেন। বাঙালি ধনশালী ব্যক্তিরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছেন, ফলে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই বাহ্য সম্পদের বিস্তার আমাদের চিত্তকেও সম্পদশালী করল কি? বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার প্রকৃতিতেই এই স্ববিরোধ। রক্তকরবীর রাজভাণ্ডারের মতো সমাজের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় কিন্তু রাজা যেমন হৃদয়ের ধনে রিক্ত, বর্তমান সভ্যতাও তেমনি হৃদয়ের সম্পদে রিক্ত। সমাজের নাগরিকশ্রেণীর মধ্যে সম্পদের বিস্তার ঘটছে কিন্তু সেজন্য বৃহত্তর লোকসমাজের জন্য কারো ভাবনা নেই।

---

৭ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ. 'এস এস বঁধু-এস', পৃ ৬১-৬৪

৮ তুলনীয় শেলির স্কাইলার্ক কবিতা — বর্তমান লেখক

আধুনিক সভ্যতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে মাত্র। কমলাকান্তের দপ্তরে 'আমার মন' রচনাটি বর্তমান সভ্যতার শূন্যতাকে আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে—

'ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটিই প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু। দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারানো মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে?'

এই সম্পদের বিস্তারের কথা দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। এই প্রবন্ধে তিনি উজ্জ্বল রঙে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র আরম্ভেই বঙ্কিম অধীর চিত্তে উপস্থাপিত করেছেন দেশের বৃহৎ জনসাধারণের বঞ্চনার দৃশ্য। সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে এই জনসাধারণকে বুভুক্ষু বঞ্চিত রেখেই। এ জন্য কারো কোনো বেদনা নেই। এই হৃদয়হীনতাই আধুনিক সভ্যতাকে করেছে শূন্যগর্ভ। এই বেদনা কমলাকান্তেরও। তবে কমলাকান্তের বেদনাবোধ আরও সর্বব্যাপী গভীর হয়ে উঠেছে। এ বেদনা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে সেই চিরন্তন প্রশ্নেই যেন পৌঁচেছে— যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন বুদ্ধদেব—

'সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোক শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটেরিয়াল প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।'

এই জীবনজিজ্ঞাসা কমলাকান্তকে করেছে দার্শনিক, ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র যার একটা সুসংহত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। সেই চিরন্তন প্রাচীন জিজ্ঞাসাই বঙ্কিমের চিন্তায় আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে দেখা ছিল। বাহ্যসম্পদের অনাবশ্যকতা কিংবা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, সে-রকমের সন্ন্যাসবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদের অনুকূল ছিল না। বাহ্যসম্পদের ভোগ সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছেন—[৯]

'গীতোক্ত এই ধর্ম Ascetic-Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।'

কর্মসাধন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন[১০]—

'ইংরেজরা যাহাকে Asceticism বলেন বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না। এই পরম পবিত্র ধর্মে

---

৯ বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ২য় অধ্যায়

১০ ধর্মতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়

সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। ইহাতে সর্বত্রই সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই।'

কমলাকান্ত বলেছে সংসার ও জীবনের প্রতি উদাসীন না হয়ে সম্পদকে লোককল্যাণে লাগানোই পূর্ণতা ও সার্থকতা; তা না হলে সভ্যতাবৃদ্ধির বস্তুতই কোনো সার্থকতা নেই। সংসার-উদাসীনতা যেমন অর্থহীন লোককল্যাণহীন স্বার্থসাধন তেমনি মনুষ্যস্বভাবের দীনতাকেই প্রকাশ করে। কমলাকান্ত পরিহাস করে যে কথা বলেছে, সেটা বস্তুত ধর্মতত্ত্ব-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রেরই কথা—

'সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ।'

আত্মপরায়ণতাকে বিশ্বপরায়ণতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব যে উপায়ে তার নাম প্রীতি-বৃত্তি। কমলাকান্তের উক্তিতে সেই কথাই প্রকাশিত। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই'।[১১] এ তত্ত্ব নিশ্চয়ই নতুন। সনাতন ঈশ্বরপ্রীতি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংপূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ বস্তু। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় মনে হয় মানুষকে যথার্থত ভালোবাসতে পারলে ঈশ্বরপ্রীতির জন্য ভিন্নতর সাধনার আর প্রয়োজন নেই। এই প্রীতিতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ধর্মতত্ত্বে যে জীবন-সমস্যার আলোচনা ছিল তার শেষ সমাধান ছিল প্রীতি-তত্ত্বে।

কমলাকান্তও এই প্রীতিতত্ত্বের সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণাতেই অনুপ্রেরিত। কমলাকান্তের ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস বস্তুতই গভীর মানবপ্রীতির রূপান্তরিত প্রকাশ। 'কমলাকান্তের বিদায়ে' কমলাকান্ত বলেছে—

'একার এত বন্ধন কেন? সে পাখিটি পুষিয়াছিলাম— কবে মরিয়া গিয়াছে— তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম— কবে শুকাইয়াছে— তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম— তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী— তাহার এত বন্ধন কেন?'

কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম রচনা 'একা'। এই রচনাটি কমলাকান্তের দপ্তর পর্যায়ে প্রথম লিখিত। এতে বস্তুত কমলাকান্তের স্বাভাবিক এবং সুপরিচিত ঢঙটি তেমন নেই। আফিং প্রসন্ন গোয়ালিনী প্রভৃতির প্রসঙ্গ এতে নেই; পরিহাসচতুর বচনভঙ্গিও নেই। নীচে 'শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী' এই নামটি মাত্র আছে; তা না হলে রচনাটি একটি নাতিদীর্ঘ আত্মভাবমূলক আবেগপূর্ণ রচনা। ভঙ্গিতে কোথাও লঘুতা নেই। এই চমৎকার রচনাটিতে কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রীতিতত্ত্বটিকেই বড়ো মধুর করেই উচ্চারিত করেছে।

'কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা।'

ধর্মতত্ত্বের উপরে উদ্ধৃত উক্তিটির প্রতিধ্বনি পাই এই রচনার শেষাংশে—

'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী— ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত।

---

১১ ধর্মতত্ত্ব, ২১ অধ্যায়

অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।'

কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের পরোপকারবৃত্তিতে এই মনুষ্যপ্রীতি-ভাবনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। চন্দ্রশেখরে রমানন্দ স্বামীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের কথোপকথনেও তার বিস্তার। প্রায় সমসাময়িক রচনা রজনী উপন্যাসেও ব্যর্থ উদাসীন অমরনাথের মধ্যেও 'একা' রচনাটির মূল ভাবটির ছায়া আছে মনে হয়। 'একা'র নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার ভাবটি রজনীর অমরনাথের আত্মকাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। কমলাকান্তের মতো অমরনাথও নিঃসঙ্গ সংসার-উদাসীন অথচ মহাপ্রাণ। অবশ্য অমরনাথের উদাসীনতার মূলে যে-ঘটনা আছে, সেটাই অমরনাথকে উপন্যাসের উপযোগী বিশিষ্ট নায়কে পরিণত করেছে। কমলাকান্তের সংসার-উদাসীনতার কোনো কারণ আমরা জানি না। কিন্তু 'একা'তে কমলাকান্তকে দেখি যৌবনধর্ম-বিষয়ে মোহমুক্ত কিন্তু প্রীতির ধর্মে দীক্ষিত, অমরনাথও 'ভবের হাটের দোকানপাট' তুলতে ব্যস্ত কিন্তু পরোপকার-সাধনে প্রীতির দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

কমলাকান্তের দপ্তরের এই রচনাটির আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মভাব-মূলক রচনা নেই; গদ্যের এই রীতি সেকালে প্রায় অপ্রবর্তিত ছিল বলা যায়। 'আত্মচরিতরচনা'র কথা বলছি না, নিজের মনের ভাব মিশিয়ে শিল্পরচনায় গদ্যের যে বিশিষ্ট রীতি তৈরি হয় যার সর্বোত্তম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা— উনিশ শতকে সেই রীতি সুলভ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়প্রধান রচনাতেও এই রীতির স্পর্শ সহজেই অনুভব করা যায়। বঙ্কিমের রচনাভঙ্গি যুক্তিমূলক, সেদিক থেকে 'একা' রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একক এবং অভিনব। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বইতে আত্মভাবমূলক রচনাধারার সূত্রপাত হয়। তার পর 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'ছিন্নপত্রে' এই রচনারীতি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী অনুপম শিল্পরূপ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই রচনাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সাধারণ ভাবেই আত্মভাবময় বলে বর্ণনা করলে অন্যায় হয় না। উপরন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতিতে যুক্তি তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি বহিরঙ্গ বক্তব্যবন্ধনই বড়ো। বোধ হয় একমাত্র কমলাকান্তের 'একা' রচনাটিতেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়—এখানে কমলাকান্ত শুধুই নিজের মনের পলাতক আলোছায়া নিয়েই মালা গেঁথেছে।

কমলাকান্তের দপ্তরে প্রথম প্রবন্ধ রূপে 'একা' সন্নিবিষ্ট। যদিও রচনারীতিতে এই প্রবন্ধটি বিশিষ্ট, তথাপি এই বইয়ের মুখবন্ধরূপে এর সন্নিবেশ বিশেষ অর্থপূর্ণ। যৌবনের স্বপ্নদ্রষ্টা সৌন্দর্যপ্রেমিক প্রাণচঞ্চল কমলাকান্ত জীবনের অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথপরিক্রমা করে এখন দেখছে এই জগৎটাকে আপাতদৃষ্টিতে যেমন দেখায় বস্তুত তা নয়। প্রথম-বয়সের মুগ্ধতা রূপান্তরিত হয় প্রৌঢ় বয়সের সংশয়-দ্বিধায়, সৌন্দর্যকে মনে হয় মোহিনী, বাস্তব হয়ে যায় স্বপ্ন। কমলাকান্তের যে লেখাগুলিকে ভীষ্মদেব খোশনবিশ প্রলাপোক্তি মনে করেছে, সেগুলি আসলে প্রৌঢ় কমলাকান্তের মোহভঙ্গের করুণ কাহিনী। কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কমলাকান্ত জেনেছে জীবনের সব-কিছুই ঠিক আছে ভেবে আত্মতৃপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই জন্যই কঠিন আঘাত দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে কমলাকান্ত বাঙালি জাতিকে সচেতন করতে চেয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালি জাতি নবশিক্ষার অভিমানে আত্মতৃপ্ত, অহংকৃত। কিন্তু মনুষ্যপ্রীতির শিক্ষাই সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা, এই শিক্ষাই মানুষকে আত্মস্থ করে যৌবনে ও বার্ধক্যে অচলপ্রতিষ্ঠ করে। সেই শিক্ষা সে পেয়েছে কি?

যে কাজ কমলাকান্ত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ দিয়ে করতে চেয়েছে, সেই কাজই বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিপরম্পরা এবং তথ্যসহযোগে তাঁর বিবিধপ্রবন্ধে এবং অন্যত্র করতে চেয়েছেন অর্থাৎ জীবনের সত্যমূল্য নির্ধারণ করতে। যেমন সুপরিচিত 'বিড়াল' প্রবন্ধটিতে ধনী-দরিদ্রের যে ধনবৈষম্যের তীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে, এক বৎসর আগে বঙ্গদর্শনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১২৮০) 'সাম্য' প্রবন্ধটিতে তার বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বঙ্কিম করেছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিম 'সাম্য' আর ফিরে ছাপেন নি, কিন্তু 'বিড়াল' আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাপ্রবৃত্তির অগ্রগামিতার প্রমাণ স্বরূপ বিরাজমান।

কমলাকান্ত যদি অভিনিবেশ-সহকারে পড়া যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্যে নিবদ্ধ বঙ্কিমী চিন্তার বহু ভাববীজ এতে পাওয়া যাবে, শুধু তা-ই নয়, বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাববস্তুর চিহ্নও এতে পাওয়া যাবে। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়ই ছিল নরনারীর প্রেম। এই প্রেমের যে পরিণাম তিনি এঁকেছেন অথবা তাকে যে রূপ দিয়েছেন সেটা উপন্যাসশিল্পের বিচার্য বিষয়। কিন্তু নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের অনিবার্যতাকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই অস্বীকার করেন নি। এর সত্য প্রকৃতিরই সত্য, দিনরাত্রি আলো-অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মতোই বাস্তব। এরই ভিতর দিয়ে বরং তিনি এমন একটি অন্ধ শক্তির লীলাকে দেখেছিলেন যার ভয়ংকরতা এবং সৌন্দর্য দুয়েই তিনি ছিলেন অভিভূত। বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই এই বিষয়টিকে নিয়েই আবর্তিত। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, আনন্দমঠ ও রাজসিংহ—প্রায় সবগুলি উপন্যাসই নারীরূপের বহ্নিশিখায় পুরুষের আত্মবিসর্জনই কাহিনী। অবশ্য বহ্নির নানা রূপ আছে। কমলাকান্ত বলেছে—

'রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত Paradise Lost। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ আণ্টনি ক্লিওপেট্রা। রূপবহ্নির রোমিও ও জুলিয়েত, ঈর্ষাবহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে পতঙ্গের কাহিনী বর্ণিত আছে যদিও বহ্নির বিভিন্ন বৈচিত্র্য তিনি দেখান নি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লেখক বঙ্কিমের মন্তব্যগুলি পতঙ্গ-কাহিনীর সূত্ররূপে কাজ করছে। দুর্গেশনন্দিনী থেকেই যদিও এই বিষয়ের সূত্রপাত, বিষবৃক্ষ উপন্যাসেই এই সূত্রের উল্লেখ স্পষ্ট হয়েছে। মৃণালিনীতে এর আভাস ছিল সত্য, বিষবৃক্ষেই লেখকের মন্তব্যরূপে এই অসংশয়িত মানব-স্বভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা দিয়েছে। বিষবৃক্ষ নামেই এর পরিচয়। হরদেব ঘোষালের পত্রেও এর ব্যাখ্যা। এই সূত্র আছে রজনীতে[১২] অমরনাথের নিজের উক্তিতে, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লেখকের

১২ 'আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ। অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধপুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।'— রজনী ৫ খণ্ড, ১ পরিচ্ছেদ।

বর্ণনায় এবং চন্দ্রশেখরের আত্মহারা প্রণয়পিপাসায়।[১৩] কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালের প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মন্তব্যটি পতঙ্গ রচনাটিরই প্রতিধ্বনি—

'রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ তো মোহের জন্যই হইয়াছিল।'

আনন্দমঠে রাজসিংহেও রূপমোহজনিত এই আকর্ষণকে বঙ্কিমচন্দ্র বড়ো তীব্র করেই দেখিয়েছেন। এটাই যেন জীবজগতের স্বাভাবিক প্রকৃতি, এটাই বাস্তব। সৃষ্টির মূলে আছে এই পতঙ্গবৃত্তি। একজন পণ্ডিত-সমালোচক বলেন—

'প্রেম হইতেই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়; জড়তার ক্ষেত্রে প্রকট হইলেই প্রেমের নাম হয় আকর্ষণ; উহাই শক্তিরূপে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিত্যযুগল ভাবে প্রকট হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি প্রকট করিতেছে।'[১৪]

পারস্পরিক আকর্ষণের এই বিশ্বলীলা মানুষের জগতে একটি অপূর্ব মূর্তি পরিগ্রহ করে। এখানে একদিকে যেমন আছে ইন্দ্রিয়বহ্নি তেমনি আছে প্রেমবহ্নি। কেউ অন্ধভাবে রূপের আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেয়, কেউ প্রেমাস্পদের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জন দেয়, কেউ বহ্নির আকর্ষণে ব্যক্তিসুখ উপভোগ করতে চায়, কেউ তারই আকর্ষণে নিজেকে তুচ্ছ করে দিয়ে প্রতিবেশীর জন্য জীবন উৎসর্গ করে। বঙ্কিমের উপন্যাসে গোবিন্দলাল আছে, চন্দ্রশেখর আছে, গঙ্গারাম আছে; আবার প্রতাপ আছে, সীতারাম আছে, অমরনাথও আছে। কেউ ভোগী, কেউ ত্যাগী, কেউ স্বার্থপর, কেউ অনুশোচনায় ম্রিয়মাণ। পুরুষ-চরিত্রের বিচিত্রতাকে বঙ্কিম দেখালেও নারী-চরিত্রের রহস্যেই বস্তুত তিনি ছিলেন মগ্ন। বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীচরিত্রের বিচিত্রতা ও শক্তিশালিতাও অসাধারণ। এখানেও নারীচরিত্রকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—একভাগে হীরা মতিবিবি জেবউন্নিসা রোহিণী শৈবলিনী—পুরুষচিত্তকে যারা আকর্ষণ করে, দিগ্‌ভ্রষ্ট করে আর একভাগে সূর্যমুখী কুন্দ ভ্রমর দলনী—যারা আত্মত্যাগের দ্বারাই পুরুষ-ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ করে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কোনো শ্রেণীর নায়িকাকেই বঙ্কিম নিছক কামনারূপিণী করে দেখেন নি। যারা পুরুষের চিত্তকে রূপের মায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তারাও নারীর স্বাভাবিক প্রেমের ক্ষুধাতেই আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি টেনে আনে। পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন গঙ্গারাম বা হীরালাল, নারীর ক্ষেত্রে তাদের তুল্য কেউ নেই। নারীজাতির প্রতি বঙ্কিমের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব অপূর্ব। বিবিধপ্রবন্ধের 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সীতা এবং দ্রৌপদী এই দুই নারীর প্রতিই অঞ্জলি দিয়েছেন। নারী-প্রকৃতির প্রতি এই বিস্ময়বোধ বঙ্কিমমানসকে আগাগোড়াই ভরে রেখেছে।

কমলাকান্তের একটি প্রবন্ধে নারীজাতির এই রহস্য-বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে কৌতুকের ভাষায়। প্রবন্ধটির নাম 'ঢেঁকি'।—

'আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল—কার্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্যকিরণে প্রভাসিত

১৩ চন্দ্রশেখরে 'শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া কিছু ইতস্তত করিয়া অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়।'—উপক্রমণিকা, ৩ পরিচ্ছেদ।

১৪ শশাঙ্কমোহন সেন, বাণীমন্দির, 'সাহিত্যের প্রকৃতি', পৃ ৪১৭।

শোপেনহাউয়ারের দার্শনিক মত আলোচনা প্রসঙ্গে উইল ডুরাণ্ট বলেছেন: **The force which draws the lover and the force which draws the planet are one.**

হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল।—ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!— ঐ রমণীরূপপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ— তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছে!'

'মনুষ্যফল' নামে লেখাটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কমলাকান্তের চিন্তা কৌতুকপূর্ণ শ্রদ্ধায় বিশেষ উপভোগ্য। বাইরের জগতে পুরুষের ভূমিকা বিচিত্র, নানা কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত। বঙ্কিম 'মনুষ্যফলে' পুরুষের বিচিত্র ভূমিকা নিয়ে নানা হাস্যকৌতুক করেছেন আলাদা আলাদা ভাবে। কিন্তু আমাদের সংসারে নারীর ভূমিকা তখনও পর্যন্ত অন্তঃপুরচারিণীর; সেইজন্য নারী-ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ বর্ণনাই এতে আছে। তাতে চিরকুমার নিঃসঙ্গ কমলাকান্তের গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা উচ্ছলিত—

'নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি, উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও— সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে— তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে?'

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটির মধ্যে পুরুষজাতির অকৃতার্থতার পাশে নারীজাতির সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র অন্তর্গত 'নরনারী' রচনাটি—

'আমরা অকর্মণ্য নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুইদিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন ঐক্যহীন সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা; এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।'

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমমানসের সমগ্র রূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বলেই ঔপন্যাসিক কল্পনা এবং প্রবন্ধচিন্তার একটি সমন্বয়রূপে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে অভিহিত বিশেষ এক শ্রেণীর সাহিত্যরূপের বিস্তার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ এবং বীরবলী রচনার সময় থেকেই এটি বাংলার সাহিত্যে স্থান পেয়ে এসেছে। কখনও কখনও আমরা তার জের টানি কমলাকান্ত থেকে। কিন্তু কমলাকান্তের সঙ্গে সাদৃশ্যের আভাস পাওয়া গেলেও কমলাকান্ত এদের থেকে আলাদাই। তার প্রধান কারণ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের মন চলে কল্পনার পথে, সেজন্য চিন্তার গ্রন্থিগুলি তেমন শক্ত নয়, এখানে ভাবগুলি চলে অনুষঙ্গ অবলম্বন করে। কমলাকান্তে লেখকের ব্যক্তিমন বিষয়বস্তুর উপরে উদ্ধত প্রাধান্য পায় নি। যুক্তির শৃঙ্খলা লেখকমননিরপেক্ষ

রূপেই ঋজু স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তা ছাড়া, এই বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বীজগুলি ছড়িয়ে গিয়ে একে দিয়েছে এক ভিন্ন ধরণের গুরুত্ব। আমরা পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকে কোনো গুরু যুক্তিবদ্ধ চিন্তার সন্ধান করি না। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' লঘুভঙ্গিতে লেখা না হলেও সমাজ ধর্ম রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার উপাদানও আমরা এতে খুঁজি না। 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' কল্পনাভাবমূলক রচনা। এতে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি ভাবময় উপলব্ধি অপূর্ব কাব্যময় ভাবনায় পরিলক্ষিত। তাঁর সেই ভাবনা একক মুহূর্তের প্রকাশ বলেই ধরা সংগত। কমলাকান্তের মতো বঙ্কিমের সমগ্র রচনার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা সব সময় যায় না।

হয়তো এ কথা সম্পূর্ণ সত্যও নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে যদি দেখা না'ও যায়, তাঁর কবিতার ভাবসত্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব। 'শ্রাবণসন্ধ্যা' 'রুদ্ধগৃহ' 'কেকাধ্বনি' 'আষাঢ়' প্রভৃতি লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন জীবনের কয়েকটি ভাবসত্য। বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবরূপ তুলে ধরাই বিচিত্রপ্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। 'কমলাকান্তে'র কল্পনার এই ভূমিকা নেই। কমলাকান্তের ভূমিকা যুক্তির। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সৌন্দর্যকে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মানবপ্রীতিকে।

সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসী কমলাকান্তেরও কম নয়। স্থূল জীবনটিকে অনেক সময়েই আদর্শের স্বর্গে পরিবর্তিত করতে তার বাসনার সীমা নেই। জীবনের স্থূলতা অনেক সময়েই পীড়া দেয়, তাই অন্যবিধ সৌন্দর্য আকর্ষণে তার আগ্রহ। কমলাকান্তের যেগুলি বিশুদ্ধ ব্যক্তিমূলক রচনা সেগুলিতেই তাঁর রসপিপাসু হৃদয়ের নিভৃত ব্যাকুলতা প্রকাশিত। কমলাকান্তের একাধিক রচনায় সংগীতের প্রসঙ্গ আছে। রসরূপে জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে সংগীতের সুর যেন আপনা থেকেই বেজে ওঠে। কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাই 'সংসারসংগীতে'র মাধুর্যের ভিখারী'।[১৫] তাই সে বলে 'গতিই সংসারের সুখ— চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য'।[১৬] সংসারের এই সংগীত কবি রবীন্দ্রনাথও শুনেছেন, তিনি বলেন 'পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়'।[১৭]

বৈষ্ণব পদাবলীর গানে কমলাকান্তের অন্তর পূর্ণ। নতুন অর্থে নতুন করে সেই সংগীত তার অন্তরকে বাজিয়ে তোলে। রঘুবংশের অজবিলাপে কুমারসম্ভবের রতির কান্নায় কমলাকান্ত মগ্ন হয়ে যায়। রসের সন্ধানে কমলাকান্ত ঘুরে বেড়ায়। এ জগৎ প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনায় বড়ো পীড়িত। প্রয়োজনের বন্ধনকে কি ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না বিশুদ্ধ রসের আলোক-উৎসবে? একদিন বসন্তের 'কোকিলে'র কাছে তিনি দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন— আত্মহারা আনন্দের দীক্ষা, 'বুড়া বয়সের কথা'য় কি সে পাথেয় ক্ষয় হয়ে গেল?

জুন-জুলাই ১৯৬৯

---

১৫ একা ১৬ একটি গীত

১৭ রুদ্ধগৃহ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকেরা জানেন এই ভাবটি রবীন্দ্রজীবনদর্শনের একটি মূল ভাব। তার পূর্বাভাস কমলাকান্তে।

ভারতচন্দ্রের 'বারমাস্যা'

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ('দেশ' ৪ মাঘ, ১৩৭৫) প্রমাণ করা গেছে যে, 'বারমাস্যা'র যে-পাঠ হ্যালহেড ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন সেই পাঠ-ই ভারতচন্দ্রের রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন। 'বারমাস্যা'র ছত্র কয়টি সমগ্র অন্নদামঙ্গলের অতি সামান্য অংশ। ছত্রগুলি থেকে সমগ্র কাব্যের পাঠ-সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বটে, তবে সংখ্যায় বেশি না হলেও প্রাচীনতম বলেই ছত্রগুলির মূল্য। এই ছত্রগুলি থেকে অন্নদামঙ্গলের পাঠ-রূপান্তরের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তার মূল্যও কম নয়। এই প্রবন্ধে 'বারমাস্যা'র প্রাচীনতম মূলকে আদর্শ-পাঠ ধরে অপর কয়েকখানি পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের পাঠের তুলনা করা হয়েছে। স্মরণ রাখতে বলি, আদর্শ-পাঠ মানে বিশুদ্ধ পাঠ নয়; বিশুদ্ধ পাঠের সন্ধান দেওয়া এই তুলনার উদ্দেশ্য নয়। তবে আদর্শ-পাঠ এবং নির্বাচিত পাঠান্তরগুলি পাশাপাশি রেখে দেখা যেতে পারে পাঠ-রূপান্তরের বিশেষ কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রই মুদ্রণ-যুগের সবচেয়ে নিকটবর্তী। অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ হওয়ার ২৬ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে বাঙ্গালা অক্ষর ছাপাবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ৬৪ বছরের মধ্যে সমগ্র অন্নদামঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তথাপি জনপ্রিয়তার জন্যই হক, বা মূলের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবের জন্যই হক, ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাঠ-বিকৃতি বোধ করি সবচেয়ে বেশি। শুধু পাঠ-বিকৃতি নয়, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে কত জনের কত টুকরো রচনা মিশে আছে তা নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য। কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণের পাঠের তুলনা করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যে-অবস্থায় অন্নদামঙ্গল আমাদের কাছে এসে পৌচেছে তাতে এর মধ্যে কোন্ ছত্রটি এবং কোন্ শব্দটি ভারতচন্দ্রের রচনা তা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কোনো চেষ্টাও আজ পর্যন্ত হয় নি। চেষ্টা করে বিফল হওয়াও লাভ, তাতে অন্তত এটুকু জানা যায় যে, অন্নদামঙ্গলের বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারের পথ বন্ধ। অনেককাল আগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদামঙ্গলের একখানি পুঁথির সঙ্গে বসুমতী সংস্করণের পাঠ মিলিয়েছিলেন (দ্র. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৮ ভাগ, ২ সংখ্যা, পৃ ৮৬-১০৪; ৩ সংখ্যা, পৃ ১২৬-১৩৬; ৪৯ ভাগ, ২ সংখ্যা, পৃ ৬৬-৮০)। তার পরে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সব গবেষণার মূল যে কাব্য সেই কাব্যের যথার্থ স্বরূপ সন্ধানে গবেষকেরা উদাসীন। মদনমোহন গোস্বামী 'রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র'এর একটি অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও গ্রন্থকার সমস্যার একেবারে সামনাসামনি গিয়েও ভিতরে প্রবেশ করেন নি। কাব্যের বিশুদ্ধ পাঠ ঠিক না হলে কাব্যের ভাষার আলোচনা পণ্ডশ্রম। কাব্যের কোন্ পাঠের ভাষার আলোচনা করা হবে? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের পাঠ, 'বিদ্যাসাগরী' সংস্করণের পাঠ, না, পুঁথির পাঠ? যদি পুঁথির পাঠ, তাহলে কোন্ পুঁথির? এর সহজ উত্তর হল, ভাষার আলোচনায় কাব্যের বিশুদ্ধ পাঠের সন্ধান একান্ত প্রয়োজনীয় নয়; কারণ,

ভাষার কাঠামো সব কটিতেই এক। সে কথা অবশ্যই ঠিক, কারণ সব পাঠই নিঃসন্দেহে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। কিন্তু ভাষার কাঠামো জানবার জন্য ভারতচন্দ্রের ভাষা আলোচনার প্রয়োজন কি? ভারতচন্দ্রের ভাষাকে আমরা জানতে চাই তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সঙ্গে তুলনায়। আমরা জানতে চাই তিনি 'মাগ্যা' লিখেছিলেন না 'মেগে' লিখেছিলেন, 'নৌতুন' লিখেছিলেন না 'নূতন' লিখেছিলেন। অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তনশীল স্তরপরম্পরার কোন্ স্তরটি ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি তাই আমরা জানতে চাই। তিনি অতীতকালে '-ইল' এবং ভবিষ্যৎকালে '-ইব' ব্যবহার করেছিলেন ভারতচন্দ্রের ভাষা বিশ্লেষণে এটাই বড় কথা নয়। ভারতচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা বাঙ্গালা ভাষার সংবাদ চাই না, বাঙ্গালা ভাষার একটি স্তরের সংবাদ চাই। কাব্যের পাঠ ঠিক না হলে সে-সংবাদ কোনো কালেও পাওয়া যাবে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'-র পাঠ বিশুদ্ধ এবং অভ্রান্ত বলে সকলে ব্যবহার করে থাকেন। পরিষদের এই সংস্করণটি নামে নূতন সংস্করণ, আসলে এটি তথাকথিত 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'এর পুনর্মুদ্রণ। সুতরাং পরিষদ সংস্করণের মূল 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'এর পাঠ-বিশুদ্ধি সম্পর্কে প্রথমে নিঃসংশয় হওয়া দরকার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্পাদনা করেছিলেন এটা জনশ্রুতি। অন্নদামঙ্গলের কোনো সংস্করণে বিদ্যাসাগরের নাম নেই। তিনি স্বনামে সংস্কৃত পুঁথি সম্পাদনা করেছিলেন, বাঙ্গালা পুঁথি বেনামীতে কেন করবেন, জানি না। অন্নদামঙ্গলের একটি সংস্করণ 'সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত' হয়েছিল, এতেই যদি ধরে নিই এই সংস্করণের সম্পাদক বিদ্যাসাগর তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি সংস্করণের নাম-পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ছিল "কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত।" বিজ্ঞাপনটি একটু তলিয়ে দেখা দরকার। "কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুস্তক" বললে বুঝি, ভারতচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি। এবং এও বুঝি, যে, এই পুঁথির সংবাদ ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের আগে কারও জানা ছিল না।

অন্নদামঙ্গল প্রথম ছাপিয়েছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে। সংস্করণটি "অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিত হইয়া শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা বর্ণ শুদ্ধ করিয়া" প্রকাশিত হইয়াছিল। এর পরে 'বিশ্বনাথ দেবের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত' (১৮১৭), 'রাধামোহন সেন সম্পাদিত' (১৮২৩), 'আড়পুলী বাঙ্গালী ছাপাখানায় ছাপা' (১৮২৩), 'শিয়ালদহে পীতাম্বর সেনের যন্ত্রে মুদ্রিত' (১৮২৯) অন্নদামঙ্গলের (সমগ্র বা বিদ্যাসুন্দর অংশটুকুর) বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। নকল পুঁথি অবলম্বনে পণ্ডিতদের সাহায্যে সম্পাদিত এই সংস্করণগুলি দিয়ে প্রকাশকেরা ব্যবসা যখন জমিয়ে ফেলেছেন তখন প্রকাশিত হল 'মূল পুস্তক'এর পাঠ সম্বলিত তথাকথিত 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'। সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা বলে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য-খ্যাতির ভার এর উপর পড়ল, আবার বেনামী বলে দায়িত্বের ঝক্কি কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর পড়ল না। কিন্তু 'মূল পুস্তক'এর বিজ্ঞাপন কি নিছক ব্যবসায়ের ফিকির, না, এতে সত্য কিছু আছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া শক্ত। কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, 'মূল পুস্তক'এর মত দুর্মূল্য এবং দুর্লভ সামগ্রীটি হাতে পেয়েও প্রকাশক সেখানি ছাপিয়ে দিলেন না। তিনি এই পুস্তক "দৃষ্টে" পাঠ সংশোধন করলেন। কোন্ পাঠ তিনি সংশোধন করলেন

তাও বললেন না। বিজ্ঞাপন থেকে এই বুঝি যে, মূল পুঁথির পাঠান্তর দিয়ে তিনি নকল পুঁথির বা ছাপা বইএর পাঠের সংশোধন করলেন। অর্থাৎ নকলকে দাঁড় করালেন আসলের সমর্থনে। ব্যাপারটা গোলমেলে। যে-সম্পাদক এরকম অদ্ভুত রীতিতে পুঁথি সম্পাদনা করেন তিনি বিদ্যাসাগরই হন আর বিদ্যাবাগীশই হন তাঁর সম্পাদনা-রীতির সার্থকতায় সংশয় থেকে যায়। এই অদ্ভুত-রীতির একটা অর্থ এই হতে পারে যে, 'মূল পুস্তক'এর অকৃত্রিমতায় সম্পাদকের মনে সংশয় ছিল, অথবা 'মূল পুস্তক'এর পাঠে এমন কিছু ছিল যা ছাপিয়ে দিতে সম্পাদকের মন সায় দেয় নি। 'মূল পুস্তক' কোথায় জানি না, পুস্তক যে মূল প্রকাশকের ঘোষণাই তার একমাত্র প্রমাণ। এই প্রমাণকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করতে পারছি না। কারণ, "মূল পুস্তক দৃষ্টে" পাঠ পরিশোধিত হওয়ার পরও প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে পাঠের পার্থক্য লক্ষ্য করছি। সাধারণভাবে চোখ বুলিয়েই এই পার্থক্যগুলি ধরা পড়ল, খুঁটিয়ে দেখলে আরও বহু পার্থক্য অবশ্যই ধরা পড়বে। পার্থক্য এমন কিছু গুরুতর নয়, কিন্তু পার্থক্য যে আছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এবং যখন দেখি পার্থক্যগুলি একটা বিশেষ রীতি অনুসারে ঘটেছে তখন যত ক্ষুদ্রই হক না কেন পার্থক্যগুলির পশ্চাতে একজন সংস্কর্তার হস্তাবলেপের চিহ্ন পাই, সে হস্ত ভারতচন্দ্রের নয়। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। প্রথমে প্রথম সংস্করণের পরে তৃতীয় সংস্করণের পাঠ।

'স্বামির'/'স্বামীর', 'ঝাপ'/'ঝাঁপ', 'লুটায়'/'লুঠায়', 'কোন'/'কোন্', 'পূর্ন্ন'/'পূর্ণ',
'রাত্রি পালা'/'নিশা পালা', 'প্রধানে থাকিবে'/'প্রধান থাকিবে', 'হৈলা'/'হৈল',
'যাহার'/'যাঁহার', 'বাড়ুয্যা'/'বাঁড়ুয্যা', 'তারে'/'তাঁরে'

পরিবর্তনগুলি কে করেছেন কেন করেছেন, জানা কর্তব্য। 'মূল পুস্তক'এ দ্বিবিধ প্রকার পাঠ অবশ্যই ছিল না। আর পরিবর্তনগুলিকে মুদ্রণ-ত্রুটি সংশোধন বলে অগ্রাহ্য করাও শক্ত। 'ঝম্প-'র আনুনাসিকের কথা চিন্তা করেই চন্দ্রবিন্দুটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সংস্কর্তা নিতান্তই গোঁড়া ও বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান-রহিত না হলে 'লুণ্ঠ'-র 'ঠ'-কে জবরদস্তি করিয়ে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন না। এই পরিবর্তনগুলি দেখার পর বলতে পারি না 'মূল পুস্তক'এর প্রতি সম্পাদক প্রকাশকের অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। মূল হক বা শাখা হক বা ছাপা বই হক, যে-পাঠ সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে পাচ্ছি তাতে অজ্ঞাতনামা গোঁড়া সংস্কৃত পণ্ডিতের হাতের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। এই গোঁড়া পণ্ডিতটি যে শুধু এইটুকু পরিবর্তন করে শান্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ কি। একমাত্র তৃতীয় সংস্করণেই যখন এরকম পরিবর্তন পাওয়া যাচ্ছে তখন যে মূলকে অবলম্বন করে প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছিল সে-মূলের উপর না জানি কি নির্দয় পীড়ন হয়েছিল। এই পীড়ন যে শুধু বানানের উপরই হয়েছে শব্দের উপর হয়নি তাই বা বিশ্বাস করি কি করে? 'রাত্রি'/'নিশা' সেদিকেও সন্দেহ জাগিয়ে দিচ্ছে। অন্নদামঙ্গল কাদার পিণ্ড হয়ে সংস্কৃত যন্ত্রে ঢুকেছিল প্রতিমা হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সে-প্রতিমা ভারতচন্দ্রের নয়। অথচ এই পাঠ-ই আমাদের বিচারে অন্নদামঙ্গলের শুদ্ধাতিশুদ্ধ পাঠ। পরিষদ্-সংস্করণের সম্পাদকেরা এই পাঠকেই আমাদের কাছে সুলভ করে দিয়েছেন? অথচ পরিষদ্-সংস্করণ প্রকাশের আগেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন ভারতচন্দ্রের প্রাচীনতম দুখানি পুঁথির সংবাদ দিয়েছিলেন। পরিষদ্-সংস্করণের সম্পাদকেরা 'সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত' পাঠ মেনে নিয়ে নিজেদের কাজের সুবিধে করেছেন।

যে-যুগে ভারতচন্দ্রের কাব্য ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সে-যুগটি বাঙ্গালা ভাষাকে

সংস্কৃতান্বিত করবার যুগ। এই চেষ্টার সূচনা হয়েছিল তখন থেকেই যখন কোম্পানীর কর্মচারীরা বাঙ্গালা শিখতে উদ্যোগী হলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ইংরেজ পণ্ডিতদের প্রেরণায় এবং বাঙালী সংস্কৃত পণ্ডিতদের পোষকতায় বাঙ্গালা ভাষা থেকে দেশী এবং তদ্ভব শব্দের জঞ্জাল পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ আমদানীর কাজ অব্যাহতভাবেই চলেছিল। ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে দীক্ষিত ইংরেজ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের গবাক্ষ দিয়েই বাঙ্গালা ভাষাকে দেখতেন। এঁদের চেষ্টায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঢালাই হয়েছিল সংস্কৃতের ছাঁচে। এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের (দেশী এবং তদ্ভব শব্দ বাদ দিয়ে) অসংখ্য অভিধান শিক্ষিত বাঙ্গালীর লিখিত ভাষাকে পরিপূর্ণভাবে সংস্কৃতমুখী করে তুলেছিল। এই উগ্র সংস্কৃতয়ানার যুগে অন্নদামঙ্গলের "পরিশোধিত" সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙ্গালা ভাষা তখন এমনই অশুদ্ধ যে পণ্ডিতকে দিয়ে সংশোধন না করিয়ে নিলে তা প্রকাশের যোগ্য হয় না। কাব্যের ভাষা এবং মুখের ভাষার ব্যবধান তখন দুস্তর। ভারতচন্দ্রের সময় এই ব্যবধান কি রকম দুস্তর ছিল জানি না। কিন্তু এ জানি যে, ভারতচন্দ্রের যুগ উগ্র সংস্কৃতয়ানার যুগ নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য-রচনার যুগ এবং কাব্য-প্রকাশের যুগ— এই দুই যুগের মধ্যে যে ভাষাগত ব্যবধান সে সম্পর্কে কি অন্নদামঙ্গলের সম্পাদক-প্রকাশকেরা অবহিত ছিলেন? পুঁথিতে প্রাপ্ত ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, না, নিজেদের বিচার-বিবেচনা অনুসারে সংস্কৃতের আদর্শে ভাষা সংশোধন করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। 'বাউ' 'মরুত' এবং 'গন্ধবহ' এই তিনটি পাঠান্তরের মধ্যেই এ কথার উত্তর আছে।

ভারতচন্দ্রের রচনাকে সংস্কৃতের সাজে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছিল এ কথা স্বীকার করা মানে এই নয় যে, তদ্ভব-দেশী শব্দের পাঠান্তরে তৎসম শব্দ থাকলেই সেটিকে প্রক্ষেপ বলে মনে করতে হবে। পাঠ-বিচারে কোনো সাধারণ সূত্রের নির্দেশ মেনে নেওয়া নিরাপদ নয়। প্রতেকটি পাঠ স্বতন্ত্র, তাদের সমস্যাও স্বতন্ত্র। সাধারণ নিয়মের আদেশে সে সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। কিন্তু যদি স্বীকার করি সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে লিপিকর বানান শুদ্ধ করে লিখতে পারেন নি, 'সরোবর'কে লিখেছেন 'সরবর', 'লুঠায়'কে লিখেছেন 'লুটায়' তাহলে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় যে, সেই লিপিকর সংস্কৃত জ্ঞানের অভাববশতই 'বাউ'কে 'মরুত' বা 'গন্ধবহ'তে রূপান্তরিত করতে অক্ষম। এমন লিপিকরই রূপান্তর করতে সক্ষম যিনি সংস্কৃতজ্ঞ এবং যিনি শুদ্ধ বানানে লেখেন। তাহলে 'বাউ' 'মরুত' এবং 'গন্ধবহ' এই তিনটির কোন্‌টি মূল আর কোন্‌গুলি প্রক্ষেপ বোঝা শক্ত নয়। তাহলে কি বুঝব অশিক্ষিত লিপিকর মূলকে বাঁচিয়েছেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকর মূলকে পরিবর্তন করেছেন? এ প্রশ্নের 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর নেই। তবে এ কথা মেনে নিলে অন্যায় হয় না যে, অশিক্ষিত লিপিকর শব্দের পরিবর্তন করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত। তিনি নিজের রচনা কিয়ে দিতে পারেন, ভুল লিখতে পারেন, অস্পষ্ট লিখতে পারেন, শব্দ-ছত্র ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু 'বাউ'র পরিবর্তে 'গন্ধবহ' অর্থাৎ তদ্ভব শব্দের পরিবর্তে তৎসম শব্দ লিখবেন না, কারণ সে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, 'গন্ধবহ'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তবে অশিক্ষিত লিপিকর অন্য উপায়ে পাঠের পরিবর্তন করতে পারেন। মূলের সংস্কৃত শব্দ না বুঝতে পেরে বা পাঠোদ্ধার করতে না পেরে তিনি নিজের পরিচিত শব্দ বসিয়ে দিতে পারেন।

আর-একটি কথা বললে এই গৌরচন্দ্রিকার অবসান হয়। বাঙ্গালা পুঁথি সম্পাদনায় বানানের

গোলোযোগ আমরা এড়িয়েই চলি। আমরা ধরে নিই লিপিকর অশিক্ষিত বলে শুদ্ধ বানানে লিখতে পারেননি। এখানে অশিক্ষিত মানে সংস্কৃতে অশিক্ষিত, যেমন এক সময় ইংরেজী না জানলে অশিক্ষিত বলে ধরা হত। কিন্তু সংস্কৃতে পারদর্শী না হয়ে কি শিক্ষিত হওয়া যায় না? যে লিপিকর শ্রদ্ধাভরে ধৈর্য ধরে মহাভারত বা রামায়ণের মত বিরাট পুঁথি লিখেছেন ঐ পুঁথিই তো তাঁর শিক্ষার প্রমাণ। লিপিকর যে বানান লিখেছেন সে বানান আমরা লিখি না তাই ভুল। আমরা মুদ্রণ-যুগের লোক, একরকম বানান দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তথাপি 'বল্ল' 'বল্লো' 'বোল্লো' 'বলল' 'বললো' 'বোললো' লিখলে যদি দোষ না হয় তাহলে 'দেস' লিখে লিপিকরেরা কি অশিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন? আমাদের দিক থেকে দেখলে যেটা ভুল বানান, লিপিকরদের দিক থেকে দেখলে সেটাই শুদ্ধ। আমাদের বানানে 'আমি', লিপিকরের বানানে 'য়ামি' 'য়ামী' 'আমী' 'আমি'। আমাদের বানানে নিয়ম, লিপিকরের বানানে বৈচিত্র্য। আমরা নিয়ম করেছি প্রয়োজনের তাগিদে, লিপিকরদের সে প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না, তাই নিয়মও নেই। বানানের বৈচিত্র্য তখন কাজের ব্যাঘাত ঘটায় নি, তাই নিয়মও গড়ে ওঠেনি, ব্যাঘাত ঘটলে নিয়ম সৃষ্টি হত। বানানের বৈচিত্র্য বানানের অশুদ্ধি নয়। 'ধৈর্য' যখন 'ধৈরজ' 'খ্যাতি' যখন 'খেয়াতি' বানানে লেখা হয়েছিল তখন সংস্কৃত পণ্ডিত যদি লিপিকরের টুটি টিপে ধরতেন তাহলে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হত? তাছাড়া 'অদ্য' যে একসময় 'অজ্জ' হয়েছিল সে কথাও বা জানছি কি করে? ঐ সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ বানান থেকে। তাহলে 'অহন্নিষ' ['অহর্নিশ']কেও বা ভুল বলি কোন্ যুক্তিতে? যে-বানানে বাঙ্গালা পুঁথি লেখা হয়েছে তা অনিয়মিত হতে পারে, কিন্তু সেই বানানই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বানান। আমরা যে-বানান জানি তা প্রথাগত বানান। সে-প্রথা লিপিকরদের জানা ছিল না, তাতে ক্ষতি কিছুই হয়নি। পুঁথির প্রচার বন্ধ হয় নি, একজনের লেখা পুঁথি অন্যের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এই বানান-রীতি লিপিকরদের সংস্কৃত-জ্ঞান পরিমাপের একটা উপায়। যিনি যত শুদ্ধ বানান লিখেছেন তিনি তত সংস্কৃতজ্ঞ এবং প্রথায় বিশ্বাসী। তাই 'বারমাস্যা'র পাঠে শ/ষ/স, য/জ, ণ/ন প্রভৃতির গোলোযোগ উপেক্ষা করি নি।

২

বর্তমান প্রবন্ধে 'বারমাস্যা'র প্রাচীনতম পাঠের পাশে পাঁচখানি পুঁথির এবং দুখানি মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ রেখে পাঠ-রূপান্তরের ধারা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। পাঠের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার এই আলোচনার বিষয় নয়। প্যারিসের পুঁথি (লিপিকাল ১৭৮৪) এবং প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণগুলি এই আলোচনায় ব্যবহার করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সবগুলি একত্র সংগ্রহ করা যায় নি বলে সাতটি পাঠের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। পরিষদ্-সংস্করণ মূলত 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'এর পুনর্মুদ্রণ বলে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি।

পাঠান্তরগুলি নিম্নলিখিত পুঁথি এবং মুদ্রিত সংস্করণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ক) হ্যালহেড সংগৃহীত বৃটিশ মিউজিয়ামের 'কালিকামঙ্গল'। লিপিকর আত্মারাম দাষ ঘোষ (কায়েস্থ), নিবাস কলিকাতা। আত্মারাম পেশাদার লিপিকর। তিনি কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল' এবং ১৭৭৩ সালে একখানি মহাভারতও নকল করেছিলেন (দ্র. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,

১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৫, পৃ. ৪৮৭, ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির ১ সংখ্যক বাংলা পুঁথি)। লিপিকরের বানান সংস্কৃত মতে শুদ্ধ নয়। তিনি 'খ্যাত' 'শিরোমণি' 'তেঁই' 'আপনি' 'মেগে' 'হয়ে' প্রভৃতির পরিবর্তে যথাক্রমে 'ক্ষাত' 'সিরমণি' 'তেঞ্রি' 'আপুনি' 'মাগ্যা' 'হয়্যা' প্রভৃতি লিখেছেন। এই বানান-রীতির ব্যতিক্রমও দুর্লক্ষ্য নয়। পুঁথির লিপিকাল সন ১১৮৩ (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। আজ পর্যন্ত জ্ঞাত ভারতচন্দ্রের প্রাচীনতম তারিখযুক্ত পুঁথি।

(খ) হ্যালহেড সংগৃহীত বৃটিশ মিউজিয়ামের 'কালিকামঙ্গল'এর খাতা। লিপিকর বা লিপিকালের উল্লেখ নেই। প্রথম পত্রে হ্যালহেডের স্বাক্ষর। সম্ভবত হ্যালহেডের নির্দেশক্রমে খাতাটি কোনো সংস্কৃত পণ্ডিত লিখেছিলেন। খাতার প্রত্যেক পাতার চারদিকে লাল কালির লাইন টানা এবং সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লেখা। বানান সংস্কৃত রীতি অনুসারী, তদ্ভব ও দেশী শব্দের বানানও বিশৃঙ্খল নয়, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। হ্যালহেড সংগৃহীত বলে খাতার লিপিকাল ১৭৮৩ সালের আগেই ধরতে হবে।

(গ) স্যার চার্লস উইলকিনস সংগৃহীত ইণ্ডিয়া আপিসের 'কালিকামঙ্গল' পুঁথি। লিপিকর বা লিপিকালের উল্লেখ নেই। উইলকিনসএর বাংলাদেশে অবস্থানকালেই (১৭৭৪-৮৬) পুঁথিখানি সংগৃহীত হয়েছিল মনে হয়, তাই লিপিকাল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই ধরতে হবে। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর ব্লমহার্ট-কৃত ক্যাটালাগে (১৯২৪) আনুমানিক লিপিকাল দেওয়া হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী, সেই অনুসারে মদনমোহন গোস্বামীও উনবিংশ শতাব্দী বলেই পুঁথির লিপিকালের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লিপিকাল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হতে বাধা নেই। পুঁথির বানানে সংস্কৃত রীতি, তবে ব্যতিক্রমও আছে।

(ঘ) জন লাইডেন সংগৃহীত ইণ্ডিয়া আপিসের 'কালিকামঙ্গল'। লাইডেন কলকাতায় ছিলেন ১৮০৬-১০ সালে। পুঁথির আনুমানিক লিপিকাল তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। বানান সংস্কৃত রীতির।

(ঙ) 'অন্নদামঙ্গল', বাঙ্গালী ছাপাখানায় ছাপা সন ১২৩০ (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

(চ) 'অন্নদামঙ্গল', সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, তৃতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯১৭ (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। তথাকথিত 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'।

৩

আদর্শ পাঠ

বারমাস্যা

১ বৈসাখে য়েদেশে বড় সুখের সময়
২ নানা ফুল ফুটে মন্দ মন্দ বাউ বয়
৩ বসাইয়া রাখিব হ্রিদয় সরবরে
৪ কোকিলের ডাকে নিদ্রা কে জাইতে পারে

পাঠান্তর

'বারমাস্যা' শিরোনামা (খ), (ঘ) পুঁথিতে নেই ; (ক), (গ) পুঁথিতে আছে। মুদ্রিত সংস্করণে 'বারমাস বর্ণন'। এই শিরোনামা পুঁথিতে নেই।

১ 'বৈসাখে এদেশে' (ক), (গ), (ঘ)। 'বৈশাখে এদেশে' (খ), (ঙ), (চ)। লক্ষ্য করতে পারছি বানান অনুসারে পাঠান্তরগুলি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাচ্ছে। (খ), (ঙ), (চ) পাঠে সংস্কৃত রীতির বানান, (ক), (গ), (ঘ) পাঠে সংস্কৃত মতে অশুদ্ধ বানান। আদর্শ পাঠে 'য়েদেসে' এবং 'এদেসে' দুই বানানই আছে (তু 'এদেসে' লাইন ২১, ২৫, ২৮)।

২ 'নানা ফুল গন্ধে মন্দ ২ বাউ বয়' (ক)
'নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়' (খ)
'নানা ফুলে গন্ধ মন্দ বহে সদা বায়' (গ)
'নানা ফুল গন্ধে মন্দ মরুত বহয়' (ঘ)
'নানা ফুল গন্ধ মন্দ গন্ধবহ বয়' (ঙ)
'নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়' (চ)
আগে লক্ষ্য করা গেছে (খ), (ঙ), (চ) পাঠে সংস্কৃতায়িত বানান, এখানে সেই তিনটি পাঠেই সংস্কৃতায়িত শব্দ 'গন্ধবহ'। এই তিনটি পাঠকে আপাতত এক মূল থেকে উৎপন্ন বলে ধরছি। তবে মনে রাখা দরকার যে 'গন্ধবহ' একখানি মাত্র পুঁথিতে পাচ্ছি এবং সে-পুঁথিখানির লিপিকর সংস্কৃত পণ্ডিত। আদর্শ-পাঠ এবং (ক) পাঠের পার্থক্য ('ফুটে'। 'গন্ধে') সম্ভবত লিপিকরকৃত। 'ফুটে' পাঠ অন্য পুঁথি দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে না, সুতরাং এটি আদর্শ পাঠের লিপিকরের পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়। এই পার্থক্যের কথা মনে রেখেও বলা চলে আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠের উৎপত্তি এক মূল থেকে। (গ), (ঘ) পাঠ আর একটি বা দুটি স্বতন্ত্র মূল থেকে উৎপন্ন কিনা সে-সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য (গ), (ঘ) পাঠকে আলাদা রাখা হচ্ছে। সুতরাং এখানে পাঠ-রূপান্তরের তিনটি স্বতন্ত্র ধারা অনুমান করতে পারি। আদর্শ এবং (ক) পাঠ প্রথম ধারা ; (খ), (ঙ), (চ) দ্বিতীয় ধারা ; (গ), (ঘ) তৃতীয় ধারা। তৃতীয় ধারাটি স্বতন্ত্র বা প্রথম-দ্বিতীয় ধারার সমন্বয়ে সৃষ্টি সে-সম্বন্ধে নির্দিষ্ট প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

৩ 'কোকিলের ডাকেতে নিদাগে কিবা করে' (ক)
'কোকিলের ডাক নিরাগ কি করে' (খ)
'কোকিলের ডাকে কামে নিদ্রায় কি করে' (গ)
'কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে' (ঘ), (চ)
'কোকিলের ডাকেতে বিকল মন করে' (ঙ)
এখানে পাঠের রূপান্তর কোনো নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে হয়নি। পাঠান্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক অমিল দেখেই বোঝা যায় লিপিকরেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পাঠের সংস্কার করেছেন। (খ), (ঙ) পাঠের বিকৃতি ধরা শক্ত নয়, (খ) পাঠে ছন্দ ঠিক থাকে না, (ঙ) পাঠে প্রসঙ্গ ঠিক থাকে না। (গ), (ঘ) পাঠ দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু 'নিদ্রায়' এবং 'নিদাঘে' ; সুতরাং একাধিক পাঠের মিশ্রণ বা লিপিকরের সংস্কার (গ), (ঘ) পাঠেই কম হয়েছে। এরকম অবস্থায় প্যারিসের পুঁথি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির সাক্ষ্য বিশেষ মূল্যবান। এখানে দেখতে পাচ্ছি আদর্শপাঠের 'নিদ্রা কে জাইতে পারে' কোনো লিপিকরই সমর্থন করেননি। প্যারিসের পুঁথি এবং এশিয়াটিক

সোসাইটির পুঁথিতেও যদি এই পাঠের সমর্থন না পাওয়া যায় তাহলে ধরতে হবে এটি লিপিকরের পরিবর্তন।

আদর্শ পাঠ

৫ জৈষ্ঠ মাসে পাকা আত্র য়েদেশে বিস্তর
৬ সুধা ছাড্যা খাইতে সাধ করে পুরন্দর
৭ মল্লিকা ফুলের মালা অগরু মাখিয়া
৮ নিদাগে বাতাস দিব কাম জাগাইয়া

পাঠান্তর

৫ 'জৈষ্ট মাষে পাকা আম্ব্র এদেসে বিস্তর' (ক)
'জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এদেশে বিস্তর' (খ), (গ) (ঘ), (ঙ), (চ)
'আত্র' এবং 'আম্ব্র' শব্দ দুটি 'আম্ব' শব্দের গোলোযোগে সৃষ্ট অর্ধতৎসম শব্দ। প্রাচীন বাংলায় 'আম্ব' এবং 'আম্র'-এর কোন্‌টির ব্যবহার বেশি ছিল অনুসন্ধান সাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহু জায়গায় 'আম্ব' আছে কিন্তু 'আম্র' নেই। কিন্তু প্রথম ধারায় পাচ্ছি 'আম্ব'/'আত্র', দ্বিতীয় ধারায় পাচ্ছি খাঁটি তৎসম 'আম্র'। এখানে পাঠ-রূপান্তরের প্রথম ধারা একদিকে, দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারা অন্য দিকে।

৬ 'সুধা ছাড়ি খাতে সাধ করে পুরন্দর' (ক)
'সুধা ছাড়ি খাইতে আসা করে পুরন্দর' (খ)
'সুধা ছাড়ি খাত্যে আসা করে পুরন্দর' (গ)
'সুধা ছাড্যা খাত্যে আসা করে পুরন্দর' (ঘ)
'সুধা ছাড়ি খাইতে আশা করে পুরন্দর' (ঙ)
'সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর' (চ)
এখানেও আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠে মিল। 'ছাড়ি' এবং 'খাতে' লিপিকরকৃত পরিবর্তন বলে ধরতে পারি। ছন্দের ত্রুটি দেখেই হয়তো 'খাইতে'কে 'খাতে' করা হয়েছে; কিম্বা 'খাতে' অস্বাভাবিক মনে করে আদর্শপাঠের লিপিকর 'খাইতে' করেছেন। 'খাতে' পাঠ অস্বাভাবিক মনে হলেও সম্ভব। 'যাইতে' অর্থে 'জাতে' প্রাচীন বাঙ্গলায় দুর্লভ নয়, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'এ আছে। 'ছাড়ি' / 'ছাড্যা' পার্থক্য গুরুতর নয়, 'ছাড়ি'-র পরিবর্তে 'ছেড়ে' হলেই পার্থক্য গুরুতর হত। সুতরাং প্রথম ধারার পাঠে মিল। দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারায় 'সাধ'-এর পরিবর্তে 'আসা' / 'আশা' (দ্বিতীয় রূপটি কেবলমাত্র (ঙ), (চ) অর্থাৎ মুদ্রিত সংস্করণের পাঠে।) 'ছাড়ি' / 'ছাড্যা' এবং 'খাইতে' / 'খাত্যে' পার্থক্যকে গুরুতর পরিবর্তন মনে না করলে (চ) ছাড়া দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারার সব কটি পাঠে মিল। (চ) পাঠের 'খেতে' কোনো পুঁথিতে পাওয়া যায়নি। সেই কারণে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে 'খেতে' সম্ভব ছিল কিনা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

৭ 'মল্লিকা ফুলের মালা অগৌর মাখিয়া' (ক)

'মল্লিকা ফুলের মালা আগর মাখিয়া' (খ)
'মল্লিকা ফুলের পাখা আগর মাখিয়া' (গ)
'মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া' (ঘ), (ঙ), (চ)

কোনো পুঁথির পাঠে যদি এমন একটি শব্দ পাই যেটি আর কোনো পুঁথিতে নেই তাহলে সে-শব্দটি লিপিকরকৃত পরিবর্তন বলে ধরতে পারি, যেমন আদর্শপাঠের দ্বিতীয় লাইনে 'ফুটে' লিপিকরকৃত পরিবর্তন বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই 'ফুটে' যদি অন্য কোনো পুঁথিতে পাওয়া যেত তাহলে শব্দটিকে লিপিকরের মনে না করে পাঠ-রূপান্তরের স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে গণ্য করতে হত। কারণ, দুজন লিপিকর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একইভাবে পাঠের পরিবর্তন করতে পারেন না। দুজন লিপিকর অভিন্ন মূল থেকে পাঠ সংগ্রহ করেছেন এ-অনুমান তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এখানে 'মালা' এবং 'পাখা' দুটি 'test word'। আদর্শপাঠে এবং (ক), (খ) পাঠে পাচ্ছি 'মালা', (গ), (ঘ), (ঙ), (চ) পাঠে পাচ্ছি 'পাখা'। এর মধ্যে (ঙ), (চ) মুদ্রিত পাঠ বলে আপাতত তাদের সাক্ষ্যের জোর কম। কারণ, মুদ্রিত পাঠে একাধিক পাঠের মিশ্রণ ঘটেছে, কোন্‌টি কোন্ পুঁথি থেকে এসেছে জানি না। কিন্তু এই প্রথম দেখছি (গ), (ঘ) পাঠে এমন একটি শব্দের মিল যেটি test word। প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার পুঁথির পাঠে 'মালা' আছে, 'পাখা' শব্দটি শুধু (গ), (ঘ) পুঁথিতে। এই দুই পুঁথির লিপিকর দুজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 'পাখা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, অনুমান করতে পারি না। তাহলে স্বীকার করতে হয় (গ), (ঘ) পাঠের লিপিকরেরা তৃতীয় একটি ধারার সংবাদ জানতেন। সুতরাং (গ), (ঘ) পাঠ বহু জায়গায় দ্বিতীয় ধারার সঙ্গে মিলে গেলেও 'পাখা' শব্দের সাক্ষ্যে এদের স্বতন্ত্র ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এবং সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে (ঙ) (চ) পাঠের মধ্যে এই তৃতীয় ধারার পাঠের মিশ্রণ আছে। আদর্শপাঠের 'আগরু'র সঙ্গে তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'আগরু'।

৮ 'নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া' (খ), (ঙ)
'নিরাগে বাতাস দিব কাম জাগাইয়া' (গ)
'নিদাঘে বাতাস দিব কাম জাগাইয়া' (চ)

এখানে আদর্শ পাঠ, (ক) এবং (ঘ) পাঠে আক্ষরিক মিল। 'নিরাগে' (গ) পুঁথির লিপিকরের সৃষ্টি বলে ধরতে হবে। সুতরাং দ্বিতীয় ধারার পাঠে পারস্পরিক মিল। তৃতীয় ধারার একটিতে প্রথম ধরার সমর্থন। অন্যটি লিপিকরের পরিবর্তনে বিকৃত।

আদর্শ পাঠ

৯ আসাড়ে নবিন মেঘ গভির গর্জ্জন
১০ বিযগির জম সম সঞ্জগির প্রাণ
১১ ক্রোধে নারী জদি কান্তে পাছ দিয়া থাকে
১২ জড়াইয়া ধরে তারে জলদের ডাকে

পাঠান্তর

১০ 'বিউগির জম সম সঙ্গগির প্রাণধন' (ক)
'বিরোগী রময়সি যোগীর প্রাণধন' (খ)
'বিয়োগ বয়ম সমজোগির প্রাণধন' (গ)
'বিয়োগির মরণ সংযোগির প্রধান' (ঘ)
'বিয়োগির যম সংযোগির প্রাণধন' (ঙ)
'বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন' (চ)

(খ), (গ), (ঘ), পাঠের লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও মূল পাঠ যথাযথ উদ্ধার করতে পারেন নি। আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠের মূল যে অভিন্ন তার আর একটা প্রমাণ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। 'সঙ্গগি' শব্দটির অসংখ্য প্রকার রূপান্তর সম্ভব ছিল, তা সত্ত্বেও শব্দটি দুখানি পুঁথিতে এক হওয়ায় মনে হয় পুঁথি দুখানির মূল এক। আদর্শ পাঠ, (ক) পাঠ এবং (ঙ), (চ) পাঠে পাঠ-রূপান্তরের একটা ক্রম পরম্পরার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে। আদর্শ পাঠে ছন্দ নির্দোষ ছিল, (ক) পুঁথির লিপিকর 'প্রাণ'এর সঙ্গে 'ধন' যুক্ত করে দিয়ে ছত্রটির মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। (ঙ), (চ) পাঠে 'সম' শব্দটি বর্জন করায় মাত্রা সংখ্যায় সমতা এসেছে। (খ), (গ), (ঘ) পাঠ নিঃসন্দেহে বিকৃত, তাই আদর্শ পাঠ, (ক), (ঙ) (চ) পাঠে অন্তত এই ছত্রটির পাঠ-রূপান্তরের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে মনে করা অযৌক্তিক নয়। 'জম' এবং 'প্রাণ' contrasting শব্দ : আদর্শ পাঠে সেইভাবেই শব্দদুটি প্রযুক্ত হয়েছে। (ক) পাঠের লিপিকর ছন্দের ত্রুটি ঘটিয়ে 'প্রাণধন' করেছেন, কিন্তু contrasting শব্দ হিসাবে 'প্রানধন'এর চেয়ে 'প্রাণ'ই প্রশস্ত। (ঙ), (চ) 'প্রাণধন'ই আছে, সম্ভবত 'সম' শব্দটি ছত্রটি থেকে তার আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেই কারণে ছন্দের খাতিরে 'প্রাণধন'-কে পূর্বরূপ 'প্রাণ'-এ রূপান্তরিত করা আর সম্ভব হয় নি। এই অনুমান ঠিক হলে আদর্শপাঠ, (ক) (ঙ) (চ) পাঠের কালপরম্পরারও আভাস পাওয়া যায়, অবশ্য (ঙ), (চ) পাঠের উৎপত্তি কোন্ পুঁথি থেকে সে সংবাদ আমাদের জানা নেই। আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠের 'জম' বানান লক্ষণীয় এবং তার সঙ্গে (ঙ), (চ) পাঠের 'যম' তুলনীয়। (ঙ), (চ) পাঠের পার্থক্য 'বিয়োগির' / 'বিয়োগীর', 'সংযোগির' / 'সংযোগীর'। এই পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ। তবে এই সঙ্গে (চ) পাঠের প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পার্থক্য— 'স্বামির' / 'স্বামীর'। তুলনা করলে এই পার্থক্যকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করা শক্ত।

১১ 'ক্রোধে নারি কান্তে জদি পাছে দিয়া থাকে' (ক)
'ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে' (খ), (ঙ)
'ক্রোধে কান্তা জদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে' (গ)
'ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে' (ঘ), (চ)

প্রথম ধারায় 'পাছে' / 'পাছ', 'নারী'('নারি') / কান্তে ; দ্বিতীয় ধারায় 'পিঠ' / 'পীঠ', 'কান্তা' / 'কান্তে'। (গ) পাঠ তৃতীয় ধারার অন্তর্গত হয়েও 'জদি' বানানে প্রথম ধারার সঙ্গে মিল। 'যদি' বানান আধুনিক, পুঁথিতে এই বানান প্রথম কবে পাওয়া যায় অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এখানে প্রথম ধারার পাঠে সাম্য এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারার পাঠে মিল।

১২ 'জড়াইয়া ধরে বলে জলদের ডাকে' (খ)
'জড়াইয়া ধরে ভয়ে জলদের ডাকে' (গ)
'জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে' (ঘ), (ঙ), (চ)
আদর্শপাঠে এবং (ক) পাঠে আক্ষরিক মিল। প্রথম ধারায় 'ভয়'। 'ডর' উহ্য রাখা হয়েছে, তাতে 'ধরে' এবং 'তারে'র ধ্বনিসাম্যও ক্ষুণ্ণ হয় নি। (গ) (ঘ) (ঙ) (চ) পাঠে গুপ্ত ভাবটি প্রকট হয়েছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারার পাঠ দেখে মনে হয় 'ভয়' এবং 'ডর'-এর মধ্যে কোন্‌টি বাঞ্ছনীয় সে-সম্বন্ধে লিপিকরেরা মনস্থির করতে পারেননি। আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠের লিপিকরেরা এরকম দোটানায় পড়েননি। প্রথম ধারায় দেখছি পাঠের কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারায় লিপিকরেরা নিজেদের পছন্দমত শব্দ বাছাই করেছেন।

আদর্শপাঠ

১৩ শ্রাবনে রজনি দিনে এক উপক্রম
১৪ কমল কুমুদ গন্ধে কে বুঝে মরম
১৫ ঝঞ্ঝনার ধনি য়ার বিদ্দ্যুত চকমকি
১৬ দেখিবে সুন্দর নাচ ভেক মকমকি

পাঠান্তর

১৪ 'কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম' (খ), (ঘ), (ঙ)
'কমল কুমুদ গন্ধ কেবল নিয়ম' (গ), (চ)
আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠে আক্ষরিক মিল। অর্থাৎ দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারা অভিন্ন, প্রথম ধারা স্বতন্ত্র।

১৫ 'ঝনঝনার ধ্বনি আর বিদ্যুৎ চকমকি' (ক)
'ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনি বিদ্যুত চকমকি' (খ)
'ব্যঞ্জত বক্রুত নিতে বিদ্যুৎ চমকিত' (গ)
'ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝঝণী বিদ্যুৎ চমকিত' (ঘ)
'ঝঙ্গনার ঝঞ্ঝণী বিদ্যুৎ চকমকি' (চ)
আদর্শপাঠ ও (ঙ) পাঠ অভিন্ন। এখানেও দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারায় মিল, প্রথম ধারা স্বতন্ত্র। (গ) পাঠের লিপিকর মূলকে বিকৃত করেছেন। প্রথম (ঙ) পাঠের সঙ্গে প্রথম ধারার মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১৬ 'দেখিবে শিখির নাচ ভেক মকমকি' (খ), (ঘ), (ঙ)
'দেখিবে ভেকির নাট ভেক চমকিত' (গ)
'দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি' (চ)
আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠে আক্ষরিক মিল, সুতরাং প্রথম ধারার পাঠে পরিবর্তন নেই। দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারার পাঠ মোটামুটি অভিন্ন, তবে (গ) পাঠের লিপিকর ছত্রটিকে বিকৃত করেছেন। (চ)

পাঠের 'নাদ' পুঁথিতে নেই। 'দেখিবে শিখির নাদ' অর্থহীন, অন্য কোনো পুরনো পুঁথিতে এই পাঠের সমর্থন আছে কিনা দেখা দরকার।

আদর্শপাঠ

১৭ ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটি
১৮ কোসা চড়্যা বেড়াবে উজান আর ভাটি
১৯ ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি
২০ দুইজন সুইয়া থাকিব গলা ধরি

পাঠান্তর

১৮ 'কোসা চড়ি বেড়াব উজান আর ভাটী' (ক)
'কোশা চড়্যা বেড়াবে উজান আর ভাটি' (খ)
'কোসা চড়ি বেড়াবা উজান আর ভাটি' (গ)
'কোসা চড়্যা বেড়াবে উজান আর ভাটি' (ঘ)
'কোশা চড়ি বেড়াব উজান আর ভাটি' (ঙ)
'কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি' (চ)

এখানে তিনটি ধারার মধ্যে গুরুতর কোনো পার্থক্য নেই। (খ) পাঠের 'চড়্যা'র সঙ্গে তুলনীয় 'ছাড়ি' (লা. ৬), (ঘ) পাঠের 'চড়্যা'র সঙ্গে 'ছাড়্যা' (লা. ৬)-র অসঙ্গতি নেই। সেইরকম (ক) পাঠের 'চড়ি'র সঙ্গে 'ছাড়ি' (লা. ৬)-রও অসঙ্গতি নেই। 'চড়্যা' / 'চড়ি', 'ছাড়্যা' / 'ছাড়ি' একই শব্দের দুই বানান। যে লিপিকর যেটিতে অভ্যস্ত তিনি সেটি লিখেছেন। যিনি দুটিতেই অভ্যস্ত তিনি দুটিই লিখেছেন। 'ছাড়ি' যখন 'ছেড়ে' হয়েছে তখনই ভাষার স্তরের পরিবর্তন হয়েছে।

২০ 'সুনিব দুজনে সুইয়া গলাগলি করি' (ক)
'শুনিব দুজনে শুয়্যা গলাগলি করি' (খ)
'শুনিব দুজনে সুয়্যা গলাগলি করি' (গ)
'শুনিব দুজনে শুয়্যা গলাগলী করি' (ঘ)
'দেখিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি' (ঙ)
'শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি' (চ)

'সুইয়া' / 'শুয়্যা' পার্থক্য বাদ দিলে পাঠান্তরগুলির মধ্যে গুরুতর কোনো পার্থক্য নেই। (ঙ) পাঠের 'দেখিব' অবশ্যই বিকৃতি। এই ছত্রটিতেই প্রথম দেখা যাচ্ছে যে আদর্শপাঠ একদিকে এবং সবকটি পাঠান্তর একসঙ্গে অন্য দিকে। আদর্শপাঠের সমর্থন পাঠান্তরে পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ছটি পাঠান্তরের সাক্ষ্যের জোর বেশি। সুতরাং বলতে হবে আদর্শপাঠের এই ছত্রের পরিবর্তন লিপিকরকৃত। (ঙ), (চ) পাঠের 'শুয়ে' অবশ্য পুঁথিতে নেই।

আদর্শপাঠ

২১ আশ্বিনে এদেসে দুর্গা প্রতিমা প্রচার
২২ কে জানে তোমার দেসে তাহার সঞ্চার
২৩ নদিয়া সান্তিপুর হইতে খেয়ুড়া আনাইব
২৪ নৌতুন নৌতুন জাতে খেয়ুড় সুনাইব

পাঠান্তর

২৩ 'নদিয়া সান্তিপুর হইতে খেড় আনাইব' (ক)
'নদ্যা শান্তিপুর হইতে খেড়ুয়া আনাইব' (খ)
'নদ্যা সান্তিপুর হত্যে খেড়ু আনাইব' (গ)
'নদ্যা শান্তিপুর হৈতে খেড়বা আনাইব' (ঘ)
'নদ্যে শান্তিপুর হইতে খেঁড়্যো আনাইব' (ঙ)
'নদে শান্তিপুর হইতে খেঁড়ু আনাইব' (চ)
'নদিয়া' পাঠে ছন্দের ত্রুটি থেকে যায়। (ক) পাঠে 'খেড়ুয়া'কে 'খেড়' করে বোধহয় ছন্দের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। (ঘ) পাঠে আগে 'চড়্যা' (লা. ১৮), 'ছাড়্যা' (লা. ৬), 'খাত্যে' (লা. ৬) প্রভৃতি পাওয়া গেছে। সুতরাং 'নদ্যা'র সঙ্গে সঙ্গতি আছে। (ঙ) পাঠের 'নদ্যে' সম্ভবত 'নদ্যা' এবং 'নদে'র মাঝামাঝি। 'নদ্যে' এবং 'নদে' পুঁথিতে নেই। 'খেয়ুড়া'র ছটি পাঠান্তর এবং কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নেই। স্বভাবতই শব্দটির যথার্থ রূপ সম্বন্ধে লিপিকরদের মনে সংশয় ছিল, কিম্বা শব্দটি এত পরিচিত যে, লিপিকরেরা তাঁদের নিজের নিজের জানা রূপটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি এবং বিভিন্ন লিপিকরেরা শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানতেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা ফস্টরের বাংলা অভিধানে আছে 'খড়ুয়া' অর্থ 'player, gamestar, a species of melon, also a kind of female dress.' জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'খড়ুয়া' নেই, তিনি ছাপা বই থেকে 'খেড়ু' পেয়েছেন। আবার ফস্টরের অভিধানে 'খেঁড়ু' নেই। (গ) পাঠে 'খেড়ু' পাওয়া যাচ্ছে বটে, তবে অভিধানের সাক্ষ্যে মানতে হলে 'খেঁড়ু' / 'খেড়ু'-র চেয়ে 'খেড়ুয়া'-র প্রচলন বেশি ছিল। আদর্শপাঠের 'খেয়ুড়া' এবং (খ) পাঠের 'খেড়ুয়া' শব্দদুটি পরবর্তী ছত্রের 'খেয়ুড়' / 'খেউড়' শব্দের সঙ্গে তুলনীয়। 'খেয়ুড়া' / 'খেড়ুয়া' আদর্শপাঠে এবং (ক) পাঠের ২৩ সংখ্যক ছত্রে খেউড়-গায়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফষ্টরের অভিধানে এই অর্থেই শব্দটি পাওয়া যায়। আদর্শপাঠে এবং (খ) (ঙ) পাঠে খেউড়-গায়ক এবং খেউড়-গানের জন্য দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য পাঠে এ-পার্থক্য নেই। 'খেয়ুড়া' এবং 'খেড়ুয়া' স্বাভাবিক বিপর্যয়। এ কথা স্বীকার করলে প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার পাঠে মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অন্যগুলিতে পারস্পরিক অমিল দেখা যাচ্ছে।

২৪ 'নৌতন ২ জাতে খেড় শুনাইব' (ক)
'নৌতুন নৌতুন ঠাটে খেউড় শুনাইবো' (খ)

'নৌতুন নৌতুন ঠাটে খেউড় স্থনাইব' (গ)
'নূতন নূতন ঠাট খেড় শুনাইব' (ঘ)
'নূতন নূতন জাতি খেঁউড় শুনাইব' (ঙ)
'নূতন নূতন ঠাটে খেড়ু শুনাইব' (চ)

এখানে 'নৌতুন' ('নৌতন') এবং 'নূতন', 'জাতে' ('জাতি') এবং 'ঠাটে' ('ঠাট') লক্ষণীয় শব্দ। দ্বিতীয় ধারার (খ) (গ) পাঠের 'নৌতুন' শব্দে প্রথম ধারার সঙ্গে মিল এবং (ঙ) পাঠে 'জাতি' শব্দে প্রথম ধারার সঙ্গে মিল। (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) পাঠে তিনটি ধারার পাঠ মিশে গেছে। একমাত্র (চ) পাঠ অবিমিশ্রিত। এই অবিমিশ্র পাঠ পুঁথিতে পাওয়া গেলে তার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে যতখানি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যেত মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া গেছে বলে ততখানি সংশয়।

আদর্শপাঠ

২৫ কাত্তিকে এদেসে হয় কালিকা প্রতিমা
২৬ দেখিবা আত্মার মুত্তি অনন্ত মহিমা
২৭ ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাষ
২৮ সে দেসে কি রস আছে এদেসে তাহার

পাঠান্তর

২৬ 'দেখিবে আত্মার মুর্ত্তি অনন্ত মহিমা' (ক)
'দেখিবা অম্বার মূত্তি অনন্ত মহিমা' (খ)
'দেখিবে সে ঘোর মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা' (গ)
'নিরখিব আত্মাশক্তি অনন্ত মহিমা' (ঙ)
'দেখিবে আত্মার মূর্ত্তি অমন্ত মহিমা' (চ)

আদর্শপাঠে এবং (ঘ) পাঠে আক্ষরিক মিল। (ঙ) পাঠের 'নিরখিব' লিপিকর-কৃত পরিবর্তন।

২৮ 'সে দেশে এবেশ আছে এদেশে কি রস' (খ)
'সে দেশে কি রস আছে এদেশেতে রাস' (গ) (ঙ) (চ)

(ক) (ঘ) পাঠের সঙ্গে আদর্শপাঠের মিল। আদর্শপাঠে 'প্রকাষ' এবং 'তাহার' মিল না হলেও এই অমিল আরও দুজন লিপিকর অগ্রাহ্য করেছেন। তিনজন লিপিকর একই ভুল পাঠ নকল করেছেন। সুতরাং ভুলের উৎপত্তি এই তিনখানি পুঁথির কোনো একখানিতে অথবা অজ্ঞাত কোনো এক পুঁথিতে। (খ) পাঠের লিপিকর স্পষ্টই পাঠ বিকৃত করেছেন। গুরুতর পাঠভেদ না থাকায় ৩৬-৩৯ ছত্রগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

আদর্শপাঠ

৩৭ মেঘের বিক্রম সম মাঘের হিমালি
৩৮ ঘরের বাহির নহে জেই জুবা বলি

৩৯ সিসিরে কমল বোনে বধয়ে পরানে
৪০ ঘন ঘন ফুল ধনু কামিজনে হানে

পাঠান্তর

৩৭ 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমালি' (ক) (খ)
'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমারি' (গ)
'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী' (ঘ), (ঙ) (চ)
'মেঘের' সম্ভবত আদর্শপাঠের লিপিকরের বিকৃতি। লক্ষণীয় (খ) পাঠের সঙ্গে প্রথম ধারার মিল।

৩৮ 'ঘরের বাহির নহে সেই জুবা বলি' (ক)
'দম্পতি থাকয়ে সুখে করি গলাগলি' (খ)
'ঘর হতো না বারায় জার জুবা নারি' (গ)
'ঘরের বাহির নহে যে যুবক জানি' (ঘ)
'ঘরের বাহির না হয় যুবজানি' (ঙ)
'ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি' (চ)
পরিষদ্-সংস্করণে 'যুবজানি'র অর্থ দেওয়া হয়েছে 'যার যুবতী স্ত্রী'। ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। 'যুবজানি'কে সমাজবদ্ধ পদ না ধরলেও অর্থের গোলমাল হয় না। লিপিকরেরা সেইভাবেই শব্দটিকে নিয়েছেন এবং সেইজন্যে 'জানি' (আমি জানি)-র পাঠান্তর 'বলি' পাওয়া যাচ্ছে। লিপিকরেরা 'যুবজানি' শব্দটির অর্থ ধরতে না পেরে বিকৃতি ঘটিয়েছেন এমন মনে করবার কারণ নেই। কারণ 'যুবজানি'র সম্পাদক প্রদত্ত অর্থ এবং লিপিকরদের পাঠের অর্থ এক। শব্দটি পুঁথিতে বা পুরনো বাঙ্গালা সাহিত্যের আর কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে কি না দেখা দরকার। এখানে দেখছি প্রথম ধারার পাঠে মিল, দ্বিতীয়-তৃতীয় ধারার মধ্যে পারস্পরিক অমিল।

৪০ 'ঘন ২ ফুল ধনু ফুল বান হানে' (ক)
'নারীর মরণ হয় ছাড়ি কান্তজনে' (খ)
'সোনা ফুলে ফুল ধন কামি জনে হানে' (গ)
'মুলা ফুলে ফুল ধনু কামি জনে হানে' (ঘ) (ঙ) (চ)
(খ) পাঠে ৩৯-৪০ ছত্রদুটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

আদর্শপাঠ

৪১ বার মাস মধ্যে মাস বিসম ফাল্গুন
৪২ মলয়া পবনে জলে মদন আগুন
৪৩ কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার
৪৪ সুক্ষ্ম তরু মুঞ্জুরিবে কি বলিব আর

পাঠান্তর

৪২ 'মলয় পবনে জলে বিষম আগুন' (খ) (ঘ)
'মলয় পরসে জলে বদন আগুন (গ)
'মলয় পবনে জ্বলে মদন আগুন (ঙ)
'মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন (চ)
(ক) এবং আদর্শপাঠে আক্ষরিক মিল। (খ) (ঘ) পাঠের 'বিষম' লিপিকর প্রমাদ মনে করতে বাধা নেই, যেমন (গ) পাঠের 'বদন'। এখানে প্রথম-দ্বিতীয় ধারায় মিল দেখতে পাচ্ছি। (ঙ) (চ) পাঠের সমর্থন পুঁথিতে নেই।

৪৪ 'সুস্ক তরু মঞ্জরির কি বলিব আর' (ক)
'শুষ্ক তরু মঞ্জরিবেক তরু লতা আর' (খ)
'শুষ্ক তরু মুঞ্জরে কত কব আর' (গ)
'শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কবো আর' (ঘ)
'শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কতেক প্রকার' (ঙ)
শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর' (চ)
এখানেও আদর্শপাঠ এবং (ক) পাঠে মিল। তৃতীয় ধারায় (গ) (ঘ) পাঠে মিল। কিন্তু দ্বিতীয় ধারার কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নেই।

গুরুতর পাঠভেদ না থাকায় ৪৫-৪৮ ছত্রগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪

পাঠ-রূপান্তরের তিনটি ধারা আগেই অনুমান করা হয়েছে। এখন এই তিনটি ধারা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আদর্শ পাঠ এবং (ক) পাঠের বহু জায়গায় আক্ষরিক মিল। কয়েকটি জায়গায় কিছু অমিল (সম্ভবত লিপিকরকৃত) আছে বটে, তবে অমিলের চেয়ে মিল এত বেশি যে এই দুটি পাঠ এক মূল থেকে উৎপন্ন মনে করতে বাধা নেই। তাই আদর্শপাঠ এবং (ক) পুথির পাঠকে পাঠ-রূপান্তরের প্রথম ধারা বলা হয়েছে। কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দে মিল এবং বানান সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী বলে (খ) (ঙ) (চ) এই তিনটি পাঠকে দ্বিতীয় ধারা বলা হয়েছে। অবশ্য এই তিনটি পাঠের পারস্পরিক অমিলও অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা গেছে। কোনো কোনো জায়গার (খ) পাঠ প্রথম ধারার খুব কাছাকাছি এসে গেছে, দ্র. 'মালা' (৭), 'চড়্যা' (১৮), 'নৌতুন' (২৪), 'হিমালি' (৩৭), 'জলে' (৪২)। তথাপি 'গন্ধবহ' (২), 'আম্র' (৫), 'কান্তা···কান্তে' (১১); 'পিঠ' (১১) 'ঝঙ্কনি' (১৫), 'কেবল নিয়ম' (১৪), 'নিদাঘে' (৮) 'শুনিব' (২০), 'শিখিব নাচ' (১৬), 'ঠাটে' (২৪), 'শুষ্ক' (৪৪) প্রভৃতির সাম্যে (খ) (ঙ) (চ) পাঠ একই ধারার অন্তর্গত মনে করা হয়েছে। তবে একই ধারার অন্তর্গত হলেও তিনটি পাঠ একই মূল থেকে যে উৎপন্ন নয় তার প্রমাণ অমিলগুলি। (গ), (ঘ) পাঠে পারস্পরিক মিল যতটা অমিলও প্রায় ততটা। এই দুটি পাঠের সঙ্গতি কখনও প্রথম ধারার সঙ্গে কখনও দ্বিতীয় ধারার সঙ্গে। কিন্তু একটি বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগে যেখানে আদর্শ পাঠ, (ক) এবং (খ) পাঠে মিল হয়েছে সেখানে

(গ) (ঘ) পাঠে অন্য শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে (দ্র. 'মালা' / 'পাখা')। সেই কারণে (গ) (ঘ) পাঠকে তৃতীয় ধারা বলা হয়েছে। তৃতীয় ধারার পাঠে নূতন পাঠান্তর অপেক্ষাকৃত কম।

(ঙ) এবং (চ) পাঠ সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য প্রয়োজন। এই দুটি পাঠ কোন্ যুক্তিতে দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত তা বলা হয়েছে। কিন্তু (ঙ) (চ) পাঠের, বিশেষ করে (চ) পাঠের, কয়েকটি ছত্র বা শব্দ পাঠ-রূপান্তরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই পাঠ হয় অজ্ঞাত চতুর্থ মূল থেকে উৎপন্ন অথবা মুদ্রণকালে সম্পাদকের সৃষ্টি। যেমন, 'থেকে', 'শিখির নাদ', 'শুয়ে', 'নদে', 'যুবজানি', 'জ্বলে' / 'জ্বালে' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি প্রাচীন পুথির পাঠে আছে কিনা সন্ধান করা দরকার। (ঙ), (চ) পাঠের যে-শব্দগুলির সমর্থন পুঁথিতে পাওয়া যাচ্ছে না সেগুলি অবশ্যই সন্দিগ্ধ পাঠ। এগুলি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এই আলোচনায় আর-একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। আদর্শপাঠের আনুমানিক লিপিকাল ১৭৭৪ যদি ঠিক হয় তাহলে আদর্শপাঠ এবং (ক) পুথির পাঠ'ই ভারতচন্দ্রের রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীনতম পুঁথি দুখানিতে পাঠের গুরুতর কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। অন্য দিকে (খ) (গ) (ঘ) পুঁথি তিনখানি হয়ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই তিনখানি পুঁথির পাঠে একটির সঙ্গে আর-একটির মিল কদাচিৎ লক্ষ্য করা গেছে। এ থেকে অনুমান করতে পারি, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুঁথিতে পাঠের রূপান্তর কম, আধুনিক পুঁথিতে বেশি। মূলপাঠ যত আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে তার বিশুদ্ধিও তত কমে গিয়েছে, একটি ছত্র দশটি পৃথক ছত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম যে ঘটেছে তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হলে প্রাচীন পুঁথির মূল্য বেড়ে যায় এবং সন্দিগ্ধ স্থলে প্রাচীন পুঁথির উপরই নির্ভর করা যায়। প্রাচীন পুঁথি সুলভ না হলেও দু-চারখানি আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামের, প্যারিসের এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি মোটামুটি প্রাচীন। এই পুঁথিগুলি আজ পর্যন্ত কোনো মুদ্রিত সংস্করণে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানি না। এই পুঁথির পাঠান্তরগুলির সাহায্যে যদি ভারতচন্দ্রের পুঁথির একটি বংশলতিকা গড়ে তোলা যায় তাহলে ভারতচন্দ্রের বিশুদ্ধ পাঠ না হক নির্ভরযোগ্য পাঠের খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু তার আগে ভুলতে হবে যে 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'এর পাঠটি স্বয়ং ভারতচন্দ্র লিখে দিয়েছিলেন এবং তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত-রীতির বানানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে, 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'এ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালী ছাপাখানায় মুদ্রিত সংস্করণের পাঠই বানান সংশোধিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ'এ এমন উল্লেখযোগ্য নূতন পাঠের সন্ধান পাওয়া যায় নি যা তথাকথিত 'মূল পুস্তক' থেকে আসতে পারত। যদি কেউ 'বিদ্যাসাগর সংস্করণ' এবং বাঙ্গালী ছাপাখানায় মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনামূলক আলোচনা করেন তাহলে তিনি কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুস্তকের রহস্য ভেদ করতে পারবেন। এই রহস্য ভেদ করা ভারতচন্দ্রের definitive সংস্করণ প্রস্তুত করার প্রাথমিক কাজ।

চিঠিপত্র মীরা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

মীরু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি। দেশে চিঠিপত্র লেখার কারবার তুলে দিতে হয়েচে। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে, এক সহর থেকে আর এক সহরে এই হচ্চে আমার জীবনযাত্রা। যতদিন না দেশে ফিরি ততদিনের জন্যে দেশ আমার কাছে একরকম লুপ্ত হয়ে গেছে। এদেশের ঝোড়ো হাওয়ায় আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এদের কাছে আমার বলবার কথা আছে নইলে এখানে আমার আসা হতই না। আজকের দিনে পৃথিবীকে যদি সত্যের পথে জাগাতে হয়, তবে সে আমাদের দেশে হবে না। এরা এখনো বেঁচে আছে। এরা আজ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করচে সেইজন্যে এরাই সত্যের সঙ্গে সন্ধি করবে। আর আমরা চাকরী করব, ভিক্ষে করব, কুইনাইনের বড়ি গিলব আর পিলে বড় করে মরতে থাকব। অতএব যতই কষ্ট হোক্ এখানকার ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাকে জোর করে টেনে আনলেন শেষ বয়সে আমার জীবনের ফসল এইখানেই বুনে যেতে হবে। দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে— সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্ব্বদিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে। নইলে জীবনের অর্দ্ধেকের বেশি সময় বাংলা গদ্য কাব্য লিখে আসছি— হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি লিখতে যাব কেন? খামকা একদিন আমার ঘরবাড়ি ইস্কুল ফেলে বিলেতে দৌড়তে যাবার জন্যে কেন এত বড় একটা তাগিদ এল। এর থেকেই বুঝচি আমার জীবনের পথ আমার ইচ্ছা এবং হিসাব অনুসারে তৈরি হবে না— আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্যে এতদিন ধরে নানা সুখে দুঃখে গড়ে তুলেচেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে খাটাবেন। আমার দেশের কাজ নয়— তাঁর জগতের কাজ। কাজেই কোণের মধ্যে বসে থাকা আমার কপালে লেখা নেই।

স্কুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্যে রথীকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েচি। ঐখানে তোদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরকন্না ফেঁদে বসবি, আমি গিয়ে দেখবো। পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের গরুর দুধ দিয়ে তোদের গৃহস্থ ঘরের দৈনিক প্রয়োজন বেশ আরামে চলে যাবে। আমার জন্যে তেতালার ঘরটা রেখে দিস, যখন দেশে ফিরে যাব ঐখানে তোদের সঙ্গে জমিয়ে বসে খোকা আর খুকিকে নিয়ে আমার দিন কাটবে। বেশ বুঝতে পারচি আমার এই শেষ বয়সে তোর খুকীর প্রেমে গীতিকাব্যের ডুবজলে আমাকে আবার একবার ঝাঁপ দিতে হবে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুল আছে। একটা কথা মনে রাখিস্ ভাদ্র মাস থেকে অঘ্রাণ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে আমার সেই দোতলা ঘরে আশ্রয় নিস্ নইলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াতে পারবিনে। আমারও মনে হয় স্কুলের বাড়িতে চাষবাস করে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যদি তোরা থাকিস তাহলে মোটের উপরে তোদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। আমি ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের বাড়ির আর দুই একটা ঘর বাড়িয়ে নিতে পারব— তোদের থাকবার কোনো

অসুবিধা হবে না। Mrs. Moodyর বাড়িতে এসে পৌঁছেছি— সেইখান থেকে তোদের চিঠি লিখচি। খোকা খুকিকে আমার হামু দিস্। ইতি ২২শে অক্টোবর [১৯১৬]।

বাবা

২

[শান্তিনিকেতন]

মীরু

তোর জন্যে আমার মন দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে আছে। রোজ ভাবি একখানা চিঠি আসবে, কোথায় আছিস্ কেমন আছিস্ জান্‌তে পাব। বৌমাদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো সন্ধান পাইনে। তোরা নিজের ইচ্ছেমত থাকিস আমি সাধারণত কখনো জিজ্ঞাসা করিনে। যদি জানতুম একটা কোনো ব্যবস্থার মধ্যে স্থির হয়েছিস্ তাহলে আমার [মন] চুপ করে থাক্‌ত। সংসারে স্নেহ করলেও সুখী করবার ক্ষমতা কারো নেই। দুঃখ ভোগ সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়। কেন না সে তো ছায়া, আজ আছে কাল নেই— তার সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে ফেনার মত কালের স্রোতে ভেসে যায়, কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা যায় না। নিজের গভীর অন্তরে ধ্রুব শান্তির জায়গা আছে সেইখানে আমাদের সত্তা আছে যা চিরকালের, যা সংসারের জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ, লাভ ক্ষতি সকলেরই অতীত। সেইখানে আসন নিতে পারলেই মানুষ বাঁচে, সংসারের বাঁচা বাঁচাই নয়।

ভরতপুরে যাব না স্থির করেছিলুম। কিন্তু যখন কথা দিয়েছি তখন কোনোমতে কথা রক্ষা করা চাই। তাই স্থির করেছি ১৫ই মার্চ্চে রওনা হয়ে আগ্রা দিয়ে যাব। কাছাকাছি তুই কোথাও আছিস জানতে পারলে তোকে দেখে যেতে চাই। ভরতপুরের কাজ সেরে অর্থ সংগ্রহের জন্যে আমেদাবাদ প্রভৃতি দুই এক জায়গায় যেতে হবে। এ কাজটা আমার শরীর মনের পক্ষে অনুকূল নয়— কিন্তু এই দুঃখটাকে এড়াবার জো নেই।

কিছুদিন আগে আমার ডান হাতের আঙুলটায় আঘাত লেগে কিছুকাল আমার লেখা বন্ধ ছিল। কাল থেকে আঙুলটা মুক্তি পেয়েছে— তাই চিঠি লিখতে পারছি।

ফাল্গুনের শেষাশেষি, কিন্তু মেঘ করে এমন প্রবল শীতের হাওয়া চলচে যে ঘোর শীতের সময়েও এমন হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গরম কাপড় জড়িয়ে ঘর বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। পশ্চিমে এখন কি রকম কে জানে, গরম কাপড় নিয়ে যেতে হবে কিনা ভেবে পাচ্চিনে।…

মেয়েরা আগামী দোল পূর্ণিমায় কিছু নাচ গান করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। দিনু[১] তাদের নিয়ে রিহার্সল চালাচ্চে। ঝুনু[২] এখনো আছে। মোটের উপরে ভালোই ছিল— এই দুর্যোগে ভিজে হাওয়ায় কেমন থাকে বলা যায় না। এপ্রিল মাসে পাহাড়ের দিকে যাবে কল্পনা করচে।

আন্দাজে দিল্লিতে তোকে চিঠি লিখে দিচ্চি। যদি নাও থাকিস্ আশা করি নিশিকান্ত[৩] তোর ঠিকানা জানে। ইতি ১১ মার্চ্চ ১৯২৭

বাবা

১. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. শ্রীমতী সাহানা দেবী। ৩. নিশিকান্ত সেন।

শান্তিনিকেতন

৩

মীরু

অন্ধকারে আমরা হাৎড়ে বেড়াই যাদের ভালোবাসি তাদের না জেনে ক্ষতি করি, না বুঝে কষ্ট পাই। কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়, সেই সমস্ত ভুল চুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে, আমরা ভালোবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতর দিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তা হলে সে অভাব গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে— এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চল্‌চে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের হাত কাজ করচে। তার সেই জগৎ জোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি— শোকদুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্।—নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্ব্বলোকের সাম্‌নে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্‌চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্‌ব। অনেকে বল্‌লে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্,— আমার শোকের খাতিরে— আমি বল্‌লুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব— বাইরের লোকে কি বুঝবে তার ঠিক মানেটা। অন্তত তাদের এইটুকু বোঝা উচিত, বাইরে থেকে কোনো রকম সান্ত্বনার চিহ্ন, কোনো রকম আনুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই তাতে আমার অমর্য্যাদা হয়। ভয় হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাই কিছুদিনের জন্যে বারণ করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আস্‌তে। কিন্তু আমার সকল কাজকর্ম্মই আমি সহজভাবে করে গেছি। লোক দেখিয়ে কোন কিছুই বাদ দিতে চাইনি। ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে আত্মাবমাননা। অনেকদিন ধরে একান্তমনে কামনা করেছিলুম যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি আমার বিশেষ বন্ধু কেউ থাকেন তিনি আমাকে দয়া করুন। কিছু জানিনে, হয়ত দয়াই করেছেন। হয়ত আরো বেশি দুঃখের হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছি। এমনতরো প্রার্থনা করাই দুর্ব্বলতা। আমার জন্যে বিশ্বনিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হবে এমনতরো আশা করি যখন মন অত্যন্ত মূঢ় হয়ে পড়ে। কষ্ট যখন সকলকেই পেতে হয় তখন আমিই যে প্রশ্রয় পাব এত বড়ো দাবী করবার মধ্যে লজ্জা আছে। যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা

পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়— নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়— যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে। এডেনে এ চিঠি পাঠালে তুই পাবি কিনা জানিনে, তাই বম্বাইয়েতেই পাঠাব মনে করচি। ইতি ২৮ আগষ্ট ১৯৩২

বাবা

মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে লিখিত ; এই পত্রে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুও উল্লিখিত।

[শান্তিনিকেতন]

৪

মীরু

…ছোট সংসারের মধ্যেই একান্ত আসক্ত হয়ে থাকলে প্রত্যেক ছোট ব্যথা কল্পনায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। জীবনে ত কম দুঃখ পাই নি কিন্তু জীবনের ভূমিকা যদি ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগার পরিধির মধ্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকত তাহলে কেবল যে আমার দুঃখ বাড়ত তা নয় আমার মন অবিচারপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ত। আমার সাহিত্যিক জীবনে এই দুর্গতি ঘটেছিল দেশের লোকের সম্বন্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছি— এই অত্যুক্তির মূল কারণ এই সম্বন্ধে আমার মনের অস্বাস্থ্য। এবার নববর্ষ থেকে চেষ্টা করছি মনকে প্রকৃতিস্থ করতে। বিরাট এই মানববিশ্ব, অতি বৃহৎ সুখে দুঃখে তার ইতিহাস বিক্ষুব্ধ; আমি যদি তার সঙ্গেই নিজের ইতিহাস মেলাতে না পারি তাহলে কোণে বসে কেবলি নিজেকে খোঁচা দেওয়া ও অন্যের বিরুদ্ধে কণ্টকিত হওয়ার মতো লজ্জা আর কিছুই নেই। ক দিনের জন্যেই বা জন্মেছি, এই কটা দিন যদি "sweetness and light" থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করে যাই তাহলে এ ক্ষতিপূরণ হবে কবে? প্রাণপণ সাধনায় চেষ্টা কোরব বাকি কটা দিন জীবনের পরে ক্ষমা ও ধৈর্য্য বিস্তীর্ণ করে যেতে। ইতিমধ্যে যখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলুম তখন সকলের প্রতি নিজের অকারণ অধৈর্য্যে ও অবিচারে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। আর যেন এমন না হয় এই আমার কামনা। ব্যক্তিগত সংসার থেকে বেরিয়ে চলতে চাই বিরাটের দিকে। ১লা বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

পত্রগুলি চিঠিপত্র চতুর্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত

মীরা দেবী ১৮৯৪-১৯৬৯

রবীন্দ্রনাথের মীরু

বরাবরই দেখেছি কোনো জিনিস নষ্ট হওয়া মীরা দেবী সইতে পারতেন না। ঠিক এইজন্যেই কাজ সারতে তাঁর দেরি হয়ে যেত, অনুযোগের সুরেও অনেকে এ কথা বলেছেন। যত্ন করে সকলকে খাওয়াতে তিনি ভালোবাসতেন। নানা রকমের রান্না-খাবার করায় তিনি ছিলেন সুনিপুণ। আবার আচার-চাট্‌নিও তিনি করতেন, লোকদের বিলি করতেন।

একটা বিশেষত্ব তাঁর ছিল, যে-কাজে তিনি হাত দিতেন সুন্দর করে তা সমাধা করতেন। কোনো কাজ বা কোনো জিনিস অসুন্দর হলে সইতে পারতেন না। সেলাই-ফোঁড়াই শিল্পকাজে কোনো খুঁত থাকতে পারত না। সূক্ষ্ম সূচীকাজ তোলা খুবই কঠিন তাতেও সামান্য খুঁত যদি ধরা পড়ত বারবার খুলে নতুন করে করতেন দেখেছি। লেখাতেও তাই। কাটাকুটি পড়লে তখনই বদলে আবার লিখতেন। এজন্য লেখা শেষ করতে সময় লাগত। তাঁর পিতার লেখাতেও খানিকটা এই জিনিস দেখা যায়। কিন্তু সে অন্যরকমের। কাটাকুটি পড়লে পরিশ্রম তাঁর বেড়েই যেত। কাটাকুটিই কলমের সাহায্যে সুন্দর করে তুলতেন। ছবিই হয়ে যেত। সময় তো নেবেই।

মীরা দেবী খুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী— শুনে মালঞ্চে তাঁর বাড়িতে তাঁকে দেখতে গেলাম। বেলা তখন ৯টা ১০টা হবে। দেখি তিনি শয্যায় নেই। বাড়ির পশ্চিম দিকে আমবাগানে ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখিয়ে দিচ্ছেন। সাঁওতাল মাঝি করাত দিয়ে আম গাছের শুকনো একটা ডাল কাটছে। পাছে বিশ্রীভাবে ডাল কাটা হয়, দেখতে যদি খারাপ হয় তাই দাঁড়িয়ে দেখছেন। দেখাচ্ছেন পালিশ করে কীভাবে ডাল কাটা সম্ভব।

মীরা দেবীরই উৎসাহে এবং ব্যবস্থায় তাঁরই গাড়িতে জয়দেবের মেলা দেখতে কেন্দুলী গিয়েছিলাম। মীরা দেবী, হৈমন্তী চক্রবর্তী,[১] আর আমি। রওনা হয়েছিলাম ভোর রাত্রে, ফিরতে রাত বারোটা বেজে গেল। প্রকাণ্ড মেলা। অজয়ের বাঁধের উপর গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে উনুন করে রান্না হল। কাঠও সহজে সংগ্রহ হল, দু-একজন সঙ্গীও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করে তুললেন মীরা দেবী। সুন্দর রান্না, সুন্দর পরিষ্কার ব্যবস্থা— সকলেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন।

ওঁর কথা এখানে একটু বলি। রাঁধতে গিয়ে বেশমের গোলা একটু বেশি হয়ে গেল। ফেলে দেবার স্বভাব তাঁর ছিল না। ব্যস্ত হয়ে গেলেন সেটুকু কাজে লাগাবার জন্য, কোনো দরকার নেই কিন্তু বসে গেলেন বড়া ভাজতে। ফেলা কেন যাবে? আমরাই বললাম খাওয়ার জন্য তো এখানে আসি নি। দেখতে এসেছি। শীগগির চলুন, মেলা সবটা দেখা হয় নি।

বিদ্যালয় তখন ছোট। প্রায়ই সমস্ত আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কর্মী একত্রিত হতেন সমস্ত

---

১. শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের স্ত্রী

মীরা দেবী

রবীন্দ্রনাথের কন্যাগণ ও কনিষ্ঠ পুত্র

মধ্যস্থলে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা, পশ্চাতে দণ্ডায়মান মধ্যমা কন্যা রেণুকা,
দক্ষিণে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা, বামে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সৌজন্যে

দিনব্যাপী চড়ুইভাতি নিয়ে। সব সময়ে আশ্রমের বয়স্ক মহিলারাই এই চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করতেন। মেয়েরা রান্না করতেন, ছেলেরা কাজ এগিয়ে দিতেন; ঘরের ছেলেদের নিয়ে কাজ করার মতো। অবশ্য ভারী ওজনের কাজের জন্য পাচকও থাকতেন। মীরা দেবীই সমস্ত ব্যবস্থার উপরে প্রধান ছিলেন। সব দিকে দৃষ্টি রেখে সহজভাবে কাজ করে যেতেন। রান্না হয়ে যাওয়ার পর সব গুছিয়ে রেখে বসবার জায়গা তৈরি হবার সময়ের ফুরসুতে তিনি মেয়েদের সবাইকে নিয়ে কোপাই বা অজয় নদীতে স্নান করতে যেতেন। ফিরে আসতে হত অল্প সময়ের মধ্যেই।

শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িতে থেকে মীরা দেবী কিছুদিন সংসার করেছেন। নগেন গাঙ্গুলী তখন সেখানে। ছেলেমেয়ে একেবারে শিশু। নন্দিতার তখন এক বছরও পূর্ণ হয় নি। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি। আমরা মাঝে মাঝেই শ্রীনিকেতনে হাটা পথে বেড়াতে যেতাম। মনে পড়ে, সন্ধ্যাবেলায় সেনশাস্ত্রীর[২] সঙ্গে সেখানে গিয়েছি। চওড়া বারান্দায় গিয়ে বসলাম। আরও দু-একজন এসে বসলেন, সবাই যাতে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন তাই অতি সাধারণ সব কথা হচ্ছিল। গাঙ্গুলী মশাই পূর্ববঙ্গের লোক। বরিশালে ভিন্ন প্রণালীতে কী ভাবে কুমড়ো ফুল ভাজা করে তাই বলছিলেন। মীরা দেবী কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। ছোট্ট মেয়েটি পাশের ঘরে, তার কত রকম কাজ, কত রকম বায়না— আমার ভারি ভালো লেগেছিল।

অভিনয় এবং রিহার্সেলে যেতেন, ত্রুটি কিছুমাত্র চোখে পড়লে চুপ করে থাকতেন না, সে কথা বলেছেন। কিন্তু পরে ওঁর সমালোচনার মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং তাতে অনুষ্ঠান সুন্দরই হয়েছে।

খুব কম লোকই ওঁর গান ওঁর সুরের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু গাইতে পারতেন খুবই সুন্দর। দিনুবাবু গুরুদেবের গানের ক্লাসে যেতেন। নতুন গান তৈরি হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে। সেখানে মীরা দেবী গিয়েছেন, কিন্তু চর্চা করেছেন ফিরে এসে। তাঁর গান এখনো কানে বাজে। মিষ্টি এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল গলা। কিন্তু কোনো আসরে কেউ তাকে গাইতে দেখে নি। বেলা দেবী[৩] সকলের মধ্যে গলা ছেড়ে গাইতেন, মীরা দেবীকে তা দেখি নি। কিন্তু ওঁর গানও ছিল একই রকম সুন্দর।

গুরুদেবের পরিচর্যায় শুশ্রূষায় তাঁর কাজ ছিল অন্তরালে; রোগীর রান্না পথ্যাদি করায় তিনি ছিলেন নিপুণ। নিষ্ঠার সঙ্গে সবই করে তুলতেন সুন্দরভাবে। ১৯৩৭ সালে যেবার গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন সে সময়ে এই দিকের কাজটার ভার নিলেন মীরা দেবী। উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় একটি কোণে একটা রান্নাঘরের মতো তৈরি করা হয়েছিল। রান্না পথ্য সবই এই অস্থায়ী ছোট ঘর থেকে যেত।

শেষের দিকে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছেন, অনেক সময়েই কোণার্কে প্রতিমা দেবীর কাছে উঠতেন। ননদ-ভাজের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল। এক-একবার গিয়ে দেখেছি সরঞ্জাম সব সাজিয়ে নিয়ে রাঁধতে বসেছেন। দরকার কিছু ছিল না। রান্নার লোক ওঁদের ছিল। প্রতিমা দেবীকে একটু রেঁধে খাওয়াবেন, এই উপলক্ষে আরও দু-একজনকে খাওয়াবেন। রান্নাঘরে বসে আছেন— সেই অন্নপূর্ণা কল্যাণ-মূর্তিটি আজও চোখে ভাসছে।

শিলাইদহে মীরা দেবীকে পেয়েছিলাম খুবই কাছাকছি। গুরুদেবের আনন্দপূর্ণ সংসারটি তখন

২. বর্তমান প্রবন্ধলেখিকার স্বামী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

৩. রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা

সেখানে। নূতন বধূ প্রতিমা দেবীর আগমনে আজ তাঁর গৃহিণীপনায় সকলেই মুগ্ধ। আমেরিকা থেকে নগেন গাঙ্গুলী মশাই ফিরেছেন, তিনি রথীবাবু, সবাই শিলাইদহে। ননদ-ভাজে মিলে সংসারের কাজ-কর্ম সব দেখছেন করছেন। কুটনো কুটছেন দুজনে, সযত্নে নিপুণভাবে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন।

তাঁকে শেষ দেখেছি উত্তরায়ণে প্রতিমা দেবীর তিরোধানের পর। শয্যার পাশে পাথরের মূর্তির মতো বসে।—কয়েক মাসের মধ্যে তিনি নিজেও চলে গেলেন।

১৯০৮ সালের শীতকালে আমি শান্তিনিকেতনে যাই। অল্পদিন পূর্বে মীরা দেবীর বিবাহ হয়েছিল, স্বামী নগেন গাঙ্গুলী শিক্ষালাভের জন্য তখন আমেরিকায়। মীরা দেবী পিতার কাছে দেহলী বাড়িতেই থাকতেন, পড়াশুনাও করতেন। এই পড়ানোর মধ্য দিয়ে ইংরাজী সোপান পুস্তিকা তৈরি হচ্ছে। বেলা দেবী যদি আসতেন তো তিনিও লেখাপড়ায় বসে যেতেন। দু-একটি শিশুছাত্র এবং তারও কিছুদিন পরে নবপ্রতিষ্ঠিত বোর্ডিংএর মেয়েদের নিয়ে পড়ানোটা ক্লাসের আকার নিয়েছিল।

এক-একটা তুচ্ছ ছবি যেমন মনে গেঁথে যায়, কিছুতেই বিবর্ণ হয় না তার একটা এখনো দেখছি। মীরা দেবী দেহলীর নীচে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। একটু পরেই পড়তে উপরে যাবেন। হাতে কার্লাইলের একটা বই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁরা বিস্মিত হবেন— ইংরাজী সোপান আর কার্লাইল!

দুই বোনে দেহলীর একতলায় বসে গল্প করতেন আমার বসে বসে শুনতে বেশ ভালো লাগত। বেলা একদিন মীরাকে বলছিলেন রাজর্ষি কীভাবে লেখা হয়েছিল। এত রক্ত কেন? এই স্বপ্ন বাবা নিজেই দেখেছিলেন। আরো কত রকমের কথা।

শান্তিনিকেতনের আশেপাশে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। পাড়ার মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। শীতের দুপুর, ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, বর্ষার সন্ধ্যা, বৃষ্টির মধ্যেও ভিজতে ভিজতে এলেন মালঞ্চ বা উত্তরায়ণ থেকে গুরুপল্লীতে বেড়াতে যাওয়ার দল তৈরি করতে।

প্রান্তর, খোয়াই। কখনো বা দু-একটি কেয়া ফুল পাড়া হয়েছে, কেয়াফুল পাড়া খুবই কঠিন কাজ। ফুল এনে শান্তিনিকেতনে কারো বাড়ির জানলায় টানিয়ে দিয়েছেন। জানলা দিয়ে এসে বাতাস সমস্ত ঘর আমোদিত করেছে। ক্ষণিক দু-একদিনের জন্য হলেও রেখেছে বেড়ানোর আনন্দস্মৃতি।

শীতের দিনে খেয়ে উঠেই হয়তো এসেছেন। বলেছেন চলুন, রোদে একটু বেড়াতে যাই। কনকনে হাওয়াতেই সারে সারে সব গিয়েছি কত ঝোপঝাপ আমবাগান আল ধরে পাকা ধানক্ষেত পেরিয়ে।

গোয়ালপাড়া গ্রামের মেয়েরা এসে খবর দিয়েছেন কোপাইতে বান এসেছে। গ্রাম অতিক্রম করে জল চলে এসেছে বহুদূর পর্যন্ত। শ্রীশ মজুমদার মহাশয়ের সহধর্মিণী আমাদের সবারই ছিলেন মাসীমা। তাঁকে সঙ্গে না পেলে যাওয়া হবে না। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই চলে এসেছেন।

তখনো ভোরের আলো পরিষ্কার হয় নি। জলের স্রোত দেখে তো আমাদের চক্ষুস্থির। বানের জল নেমে গিয়েছে, কিন্তু গিয়েও যা আছে তা ভয়ংকর। হাঁটুজলের কাছেও দাঁড়ানো যাচ্ছে না, স্নান তো দূরের কথা। মাসীমা বোধ হয় জানতেন, সঙ্গে করে তিনি একটা ঘটি এনেছিলেন। তাইতেই সকলের স্নান সারতে হল।

দেহলীর দক্ষিণে বোলপুরের লাল রাস্তার ধারে একটি একতলা বাড়িতে মীরা দেবী কিছুদিন ছিলেন। সে বাড়ি এখন আর নেই। বাড়ির আঙিনায় কয়েকটি লেবুর চারা লাগানো হয়েছিল, সেই থেকে বাড়ির নাম লেবুকুঞ্জ। মীরা দেবীর আকর্ষণে প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকাজ সেরে গৃহিণীরা লেবুকুঞ্জে একত্র হতেন। বড়মা হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী, এঁদেরই উৎসাহ প্রবল। পরে ক্রমশ মেয়ের দল খুব বেড়ে গেল। আশ্রমের এই মেয়েদের নিয়ে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিমা দেবীর অনুরোধে গুরুদেব এই সমিতির নাম দিলেন আলাপিনী। বড়মার উদ্যোগে সমিতিতে সাহিত্য-আলোচনার ব্যবস্থা হল। মেয়েদের রচনা, ছবি দিয়ে হাতের লেখা 'শ্রেয়সী' পত্রিকা দেখা দিল। নাম দিয়েছিলেন বড়বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ। এ পত্রিকা পরে ছাপাবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। মীরা দেবী প্রতি মাসেই লেখা দিতেন। ঘরকন্নার কথা, খুবই সরল। সে লেখা এখনো আছে।

লেবুকুঞ্জে মহিলারা 'বশীকরণ' নাটক করেছিলেন। মীরা দেবী আয়োজন করেছিলেন কিন্তু নাটকে ছিলেন না। যাঁরা মীরা দেবীকে জানতেন তাঁরা বুঝবেন এই না-নামাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ এবং উৎসাহেই এই অভিনয় সফল হয়েছে।

ঠাট্টা তামাসা কথাবার্তায় তিনি খুব সরস ছিলেন। এখানকার ঠাকুর্দার[৫] সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল মধুর। একবার একটা পাকা মিষ্টি কুমড়ো কেটে সুন্দর করে স্বর্ণচাঁপার গড়নে তৈরি করে, তাতে একটু সেণ্ট দিয়ে ঠাকুর্দাকে চাঁপা ফুল বলে উপহার দিয়েছিলেন। "অসময়ে চাঁপা কোথায় পেলে?" তিনি ঠকেছিলেন ঠিকই। উপহার দিয়েছিলেন আর-সব মেয়েদের উপস্থিতিতে। সকলেই হেসে উঠলেন। ঠকানোতে সকলেরই আনন্দ।

অল্পবয়স্ক, বয়স্ক সকলেরই জন্মদিন পালনের একটা স্বীকৃত ধারা আছে। মীরা দেবীর জন্মদিন উদ্‌যাপিত হত সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এ ধারার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মীরুর জন্মদিনে সকলের পিঠে-পায়েস খাবার নিমন্ত্রণ হত। জন্মদিন ছিল পৌষ সংক্রান্তির দিন। আশ্রমের রান্নাঘরে সেদিন সকাল থেকে পিঠে তৈরির উৎসব। বিদ্যালয় তখন ছোট। সমস্ত গৃহিণীরা, ছোট মেয়েরা সবাই জড়ো হতেন। জন্মপার্বণে কত রকমের যে পিঠে তৈরি হত। হাসি-গল্প-আনন্দে এই পিঠে তৈরির পালা শেষ হত। সমস্ত খরচ দিতেন রবীন্দ্রনাথ। নিজে এসেও বসতেন।

কিছুদিন আগে এই দিনটি স্মরণ করে ওঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। লিখেছিলাম, 'আজ পৌষের সংক্রান্তি। আজ আপনার জন্মদিন। কামনা করি এখনো কিছুকাল পৃথিবীর আলো-বাতাস আনন্দ উৎসব উপভোগ করে মনকে আনন্দদান করুন। জীবন আপনার সার্থক হোক। বয়স্কর কাছ থেকে এই শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।'

বিখ্যাত পরিবারে জন্ম, শৈশবে কেটেছে স্নেহ-মায়া-মমতায়। তিনি ছিলেন ভাগ্যবতী। কিন্তু পরের জীবনে অনেক দুঃখ, শোক তাপ পেয়েছেন। কী সুন্দর ছিল তাঁর নীতু। স্বাস্থ্যবান, লাবণ্যেভরা মুখখানি। আমাদের বাড়িতে এসে অনর্গল গল্প করে যেত। অল্প বয়সেও গুছিয়ে কথা বলত। সে ছেলে বিলেত গিয়ে আর ফিরল না। জার্মানীতেই তার মৃত্যু[৪]। মীরা দেবী ছেলেকে দেখতে বিলেত

৪. এই মৃত্যুর প্রসঙ্গে মীরা দেবীকে লিখিত এই সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য, পৃ ৩৮-৩৯।—স, বি. ভা. প

গেলেন। এখানে শুনেছেন লাউয়ের রস খেলে কিছু হয়তো উপকার হতে পারে। সঙ্গে করে জাহাজে নিয়ে গিয়েছিলেন লাউ, মায়ের মন। নীতুকে রাখতে পারলেন না। ফিরে এলেন অল্পদিন পরেই। দুঃখও কি কম পেয়েছেন জীবনে?

ছেলেমেয়েদের কথায় গুরুদেব একদিন বলেছিলেন— এরা আর পাঁচজন ছেলেমেয়ের মতো সাধারণভাবে মানুষ হয়েছে, এজন্য নিজের আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হতেন। তাঁরা বলতেন বাড়ির ট্র্যাডিশান তুমি রাখলে না, গুরুদেব বলতেন এর বেশি 'ভালভাবে' রাখবার শক্তি নাকি তাঁর নেই। "আমার মীরাকে নাটোরের মহারাজা খুব ভালবাসতেন। অনেক সময়ে তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখতেন। মেজো বোঠান জ্ঞানদানন্দিনী কতদিন যে আমাকে এজন্য অনুযোগ করেছেন—মীরার ভাল কাপড়চোপড় নেই কেন? কিন্তু আমি কি করব? শক্তি ছিল না।"

সুখে দুঃখে অনেককাল কেটেছে আমাদের একসঙ্গে। মনে পড়ে শেষ বয়সেও কত সময়ে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। অনেক সময় নিরিবিলি একটানা গল্প করার সুযোগ মিলত না। দ্বিধা না করে বলতেন, 'ঠানদি, আপনার নাতি দুটোকে একটু সামলান তো! একটু যে গল্প করব তার জো নেই।'

কিন্তু শিশুপ্রীতি তার ছিল গভীর। ওঁর বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের ছোট্ট একটি শিশুকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। সুন্দর করে সাজিয়ে, একটা কাঁথা পেতে এলেন আমাদের বাড়ির সামনের বারান্দায়। এসে ডাকাডাকি, 'দেখুন তো কী এনেছি।' আমি বললাম, 'এতটুকু শিশু নিয়ে বেরিয়েছেন?' বললেন, 'কী হবে?' গর্বিতভাবে বললেন, 'শিশুদের নিতে করতে আমি ভালোবাসি, জানি-ও। ওরাও আমাকে পছন্দ করে।'

১৯৬৭র আগস্টে মীরা দেবী শান্তিনিকেতনে একবার এসেছিলেন। পিতার মৃত্যুদিন পর্যন্ত থাকবেন মনে হল। ৬ই আগস্ট সন্ধ্যায় কোণার্কের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম, দেখি, তিনি একটু অসুস্থ, বাদলা হাওয়ায় জ্বর-ভাব হয়েছে। খাটে শুয়ে আছেন। পাশে একটি চেয়ার নিয়ে বসলাম। বহুক্ষণ ছিলাম, কিছুতেই আসতে দিচ্ছিলেন না।

'একটু বসুন-না' বারবার এই অনুরোধ।

নিবিড়ভাবে এইরকম গল্প এই শেষ।

পরদিন ৭ই আগস্ট মন্দিরে গিয়ে শুনি মীরা দেবী অজ্ঞান।

ধাক্কা সামলিয়ে একটু সুস্থ হয়ে কলকাতা চলে গেলেন। ধাক্কা সামলালেন কিন্তু অল্পদিনের জন্য। কলকাতা যাওয়ার আগের দিন দেখা করে এসেছিলাম, উনি চেয়ারে শুয়েছিলেন, শ্রান্ত।

তাঁর সঙ্গে সেই শেষ দেখা।

কিরণবালা সেন

মীরা দেবীকে যেমন দেখেছি

বাংলা ১৩০০ সালের ২৯ পৌষ (১২ জানুয়ারি ১৮৯৪) মকর সংক্রান্তির শুভদিনে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর আর একটি নাম ছিল অতসী। কেন যে এই নামটি লুপ্ত হল তা জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের চেহারার সামান্য আদল এই কন্যাটির মুখে ছিল— যদিও রঙ শ্যামবর্ণই বলা যায়।

অন্যান্য কন্যাদের মতোই রবীন্দ্রনাথ এঁর বিবাহ বাল্যকালেই দেন, তবে স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকায় তাঁকে বয়সের অনুপাতে অনেক বড়ই দেখাত। প্রথমা ও মধ্যমা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) ও রেণুকাকে (রানী) হারিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ এই কন্যাটির উপর যেন বেশি করেই পড়েছিল। আদর করে তিনি ডাকতেন 'মীরু'।

মা যখন মারা যান তখন মীরা দেবীর বয়স ছিল মাত্র আট বৎসর। রবীন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান— মীরা দেবীর ভ্রাতা শমীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। বাড়ির সকলেরই ধারণা ছিল যে শমীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে পিতার গুণরাশি ও চেহারার অধিকারী হতেন। পিতার সঙ্গে তাঁর চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। সর্বদাই তাঁর কণ্ঠে গান লেগে থাকত ও মীরা দেবীর কাছে শুনেছিলাম যে তাঁর মেজ জ্যাঠামশায় (সত্যেন্দ্রনাথ)— যিনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন— তাঁর কাছে 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি শমীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করতে শিখে অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁর মুখভঙ্গী ও হাত-পা নেড়ে আবৃত্তির কথা মীরা দেবীর শেষ পর্যন্ত খুব সুস্পষ্ট মনে ছিল।

ভাই-বোনদের মধ্যে রানীদির (রেণুকা) সঙ্গেই বেশি ভাব ছিল তাঁর। তাই রানীদির অকালমৃত্যু মীরা দেবীর মনে গভীর ছায়াপাত করেছিল। পরবর্তী জীবনে মীরা দেবীর শোকের অন্ত ছিল না। পিতার একান্ত স্নেহপাশও তাঁকে তাঁর মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতে পারে নি। সন্তানের দুঃখবেদনা নিজ দুঃখশোক অপেক্ষা আরো বেশি করেই বাজে পিতামাতার হৃদয়ে— রবীন্দ্রনাথকে সে বেদনাও বহন করতে হয়েছিল জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ দুঃখশোককে কী আশ্চর্যভাবে বহন করে গিয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি নিজেই লিখেছেন—'মৃত্যু আমার আঙিনায়।" মীরা দেবী তাঁর পিতার কাছ থেকেই এই অসাধারণ সহশক্তি পেয়েছিলেন। একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রনাথ জার্মানিতে মারা গেলেন মাত্র একুশ বৎসর বয়সে। খুব বাড়াবাড়ির মুখে রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিলেন পুত্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে। অনেক আশা করে নানারকম রুচিকর ও মুখরোচক পথ্য দেবার আশায় যা যতটা সম্ভব দেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানে পৌছবার অল্পদিন পরেই সে চলে গেল। আত্মীয়ের মধ্যে বিদেশে তখন ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। সেই দুর্দিনে তাঁকে কাছে পেয়ে মীরা দেবী অনেকখানি নির্ভরতা পেয়েছিলেন। তবু যখন কল্পনা করি যে একমাত্র পুত্রকে অকালে ঐভাবে হারিয়ে তিনি যেদিন পিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন সেদিন সেই উদ্বেলিত শোক কী করে তিনি নীরবে সংবরণ করেছিলেন— তখন বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না! রবীন্দ্রনাথ তো শুধু পিতাই ছিলেন না, তিনি যে মাতৃস্নেহেও সন্তানদের ঘিরে রেখেছিলেন।

কী আশ্চর্য শোক সহ্য করবার ক্ষমতা মীরা দেবীর ছিল দেখেছি। যাঁরাই তাঁর নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তা জানেন। শেষে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর একবৎসর পূর্বে তাঁর অবশিষ্ট একমাত্র সন্তান নন্দিতাও চলে

গেল। তাও কী আশ্চর্যভাবে সহ্য করলেন— শোকের বাহ্য প্রকাশ এতটুকুও সেদিন কেউ দেখে নি— শুধু কর্মতৎপরতা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। সমস্তক্ষণই কারণে অকারণে কাজ করতে লাগলেন।

মীরা দেবী মানুষ হয়েছিলেন খুব সাদাসিধাভাবে। শান্তিনিকেতনে অন্যান্য অধ্যাপক ও কর্মীদের স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও সাজসজ্জার কোথাও অমিল বা তারতম্য কখনও চোখে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের কন্যা ও ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলে তাঁর কোনো অহংকার ছিল না। সর্বদাই আড়ালে আড়ালে থাকা তাঁর অভিপ্রেত ছিল।

মীরা দেবী সর্বদাই হয় বাগানের নয় সংসারের কিছু-না-কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন অথচ তাঁর পিতার এতবড় কর্মপ্রতিষ্ঠানের কোনো কিছুর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। কোনো কিছুর ভার নেন না কেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন "দাদার [রথীন্দ্রনাথ] ক্ষমতা আছে— দাদা নানারকম কাজকর্ম জানেন— সব ভাল ভাবে চালাতে পারেন, আমি বাপু ও-সব কিছুই পারি না— জানিও না কিছুই।" চিঠিপত্র এবং তৎকালীন সাময়িক পত্রে তাঁর রচনা ও চিঠিপত্রের বর্ণনাগুলি এমন জীবন্ত ও সরস হয়ে উঠত যে যাঁরা তাঁর চিঠিপত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরাই এ কথা স্বীকার করবেন। মৃত্যুর অল্প আগে অসুস্থতার অবকাশগুলি ভরে তোলবার জন্য তিনি স্মৃতিকথা[১] লিখছিলেন। এই লেখা আরম্ভ করে তিনি যে কত আনন্দ ও রস পাচ্ছিলেন তা তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ জানেন।

নিজের ক্ষমতার প্রতি যদি তাঁর একটুও বিশ্বাস থাকত তা হলে আরো আগেই এটা শুরু করলে আরো অনেক কিছুই আমরা জানতে পারতাম। বয়সে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে— তা ছাড়া সবকিছুই আর তেমন সংলগ্ন থাকে না, তাই লিখতে গিয়ে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

আত্মপরভেদাভেদজ্ঞান মীরা দেবীর মধ্যে বড় একটা দেখি নি। আমি বাল্যকালে শান্তিনিকেতনে যাবার পর তাঁর কাছেই বেশ কিছুদিন ছিলাম। তখনই দেখেছি তিনি আমাকে তাঁর নিজ সন্তানদের থেকে একচুলও তফাত কখনো কোনো অবস্থাতেই করেন নি। এ ছাড়া তাঁদের সংসার দেখাশোনা করবার জন্য যিনি ছিলেন সাহায্যকারিণী হিসাবে তাঁর সঙ্গেও আহারে বিহারে বিন্দুমাত্র পার্থক্য রাখেন নি কখনো।

মীরা দেবী একেবারেই মিশুক ছিলেন না ও তাঁর পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেখানে কোনো আপস চলত না। আগেই বলেছি তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। এমন-কি, অপ্রিয় সত্য বলতেও কুণ্ঠিত হতেন না— ফলে অধিকাংশ সময় লোকে তাঁকে ভুল বুঝত। এ ক্ষেত্রে তিনি অসহিষ্ণুই ছিলেন। কোনো বিষয়ে তাঁর মতামত চাইলে তা তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করতেন— অন্যের তাতে কতটা ভালো লাগবে বা না-লাগবে সেদিকে দৃকপাত না করেই। এক কথায় চিন্তায় কাজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন।

প্রকৃতিকে তিনি বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। তা হয়তো তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। গাছপালার প্রতি তাঁর কী অপরিসীম অনুরাগ দেখেছি— মানুষের মতোই যেন তিনি তাদের দেখতেন। ছোট ছোট গাছপালার শুকনো পাতাগুলি তাঁর চোখে এত অসুন্দর লাগত যে নিজ হাতে সব ফেলে

---

১. "আমার ছোটবেলার স্মৃতি" নামে 'দেশ' পত্রিকার ২২ কার্তিক ১৩৭৬ থেকে ৫ পৌষ ১৩৭৬ পর্যন্ত সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত। বিশ্বভারতী থেকে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশের পরিকল্পনা আছে।—স, বি. ভা. প.

দিতেন। গাছের আলবাল যেমন-তেমন হলে চলত না, তা সুন্দর ও পরিপাটি করে নিকিয়ে রাখাতেন। সব জিনিসেই তাঁর অত্যন্ত যত্ন ছিল। জীবজন্তু যখন পুষতেন তখন তাদের প্রতি নিখুঁত যত্ন দেখেছি। তাঁর সুন্দর বাগানটি দেখে ও তাঁর বাগানের শখ দেখে রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হতেন। তাঁর বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'মালঞ্চ'।

রন্ধনেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। যে কাজই করতেন তা এত পরিপাটি করে করতে ভালোবাসতেন যে সব কাজে তাঁর অত্যন্ত সময় লাগত।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পীড়ার সময় অধিকাংশ দিন মীরা দেবীই তাঁর পথ্য তৈয়ারি করতেন। জোড়াসাঁকোয় থাকতে ভোর থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সেবার ভার নন্দিতা ও আমার উপর ছিল। মধ্যাহ্নে বারোটার মধ্যে কিছুতেই তাঁর আহার্য প্রস্তুত করে তুলতে পারতেন না বলে নন্দিতা তার মাকে সাহায্য করবার জন্য আমাকে ঠেলে দিত কারণ সে জানত যে সকলের সাহায্য তাঁর মনঃপূত হবে না। তরকারী-কাটা থেকে পান-সাজা পর্যন্ত সব নিখুঁত হওয়া চাই। কাজেই বাগান ও ঘর-সংসারের কাজের বাইরে কিছু করার তাঁর সময়ও থাকত না। নন্দিতা কিন্তু এ বিষয় তার মায়ের একেবারে বিপরীত ছিল। সেবা-শুশ্রূষা করবার ও পরিশ্রম করবার তার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তা ছাড়া সে সব কাজই অত্যন্ত দ্রুত করতে পারত। অম্লানবদনে রোগযন্ত্রণা সহ্য করবারও তার কী আশ্চর্য শক্তিই ছিল। মনে হত তার দাদামশায়ের এই বিশেষ গুণটির সে অধিকারিণী হয়েছিল। শেষ দিকে মীরাদেবী কলকাতাতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন তার একটা কারণ যে মেয়েটিকে তিনি কন্যার অধিক স্নেহে গ্রহণ করেছিলেন তার আশ্চর্য শুশ্রূষা ও সাহচর্য তাঁকে আনন্দ ও শান্তি দিতে পেরেছিল। ছোট্ট অসহায় শিশুর মতো করেই জ্যোৎস্না দেবী তাঁকে তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলার মুহূর্তটি পর্যন্ত অপরিসীম ধৈর্য ও ভালোবাসার সঙ্গে অক্লান্তভাবে সেবা করেছেন। তাঁর সেবা ও যত্নের গুণেই মনে হয় অত কঠিন অসুখ সত্ত্বেও আরো কিছুকাল তিনি জীবিত ছিলেন। নন্দিতার কঠিন পীড়ার জন্য দিল্লিতে তাঁর কাছে নিজের অসুস্থতা নিয়ে থাকা তাঁর সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর এই ফ্ল্যাটটি তাঁর ভারি মনোমত ও বড়ো আরামের ছিল সে কথা তিনি তাঁর বন্ধুদেরও লিখেছেন অনেক সময়। তাঁর শেষ অসুখের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপালনী কলকাতায় চলে এসেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে তাঁর কার্যোপলক্ষে তাঁর মৃত্যুর আগেই চলে যেতে হয়েছিল। মীরা দেবীর ভাসুরঝি শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ্‌আলি ও জামাতা কৃষ্ণকৃপালনী সর্বদাই তাঁর খোঁজখবর নিতেন। এঁরা দুজনেই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কন্যাবিয়োগের পর জামাতাই তাঁর পুত্রতুল্য হয়েছিলেন। ১৩৭৫ সালের ফাল্গুন সংক্রান্তিতে (১৫ মার্চ ১৯৬৯) ভোর ৫টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর আত্মীয়বন্ধুবান্ধবরা ছাড়াও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়।

মীরা দেবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রক্তের শেষ চিহ্নটুকু অবলুপ্ত হয়ে গেল।

অমিতা ঠাকুর

ধর্ম ও বিজ্ঞান

মীরা দেবী

হিবার্ট জার্নাল সংকলিত রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে মীরা দেবী (অতসী দেবী) তরুণবয়সে রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে সংকলন করে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন ; তাঁর রচনা-নিদর্শনরূপে এর একটি ১৩১৮ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব মীরা দেবীর এইসকল প্রবন্ধের কতকগুলির একটি তালিকা করে দিয়েছেন, সেটিও পরে মুদ্রিত হল।

যে-সকল আধ্যাত্মিকভাব আমাদের সমাজ ও জীবনের মূলগত সেগুলি যখন ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হইয়া আবার পূর্ণ তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে তখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের কারণ হয়। বর্তমানে আমাদের সেইরূপ সময় আসিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে যেরূপ ছিল আজ তদপেক্ষা ধর্মের জ্ঞানগত ভিত্তি অনেক বেশি দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সে সময়ে আমরা একটা মানসিক অশান্তিতে ছিলাম— ভয় হইতেছিল ধর্মের মূল যদি বা ভূমিসাৎ না হয় বুঝি বা টলে। বিজ্ঞানের নূতন মাদকতা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া অনেক পীড়া এবং প্রলাপের কারণ ঘটাইয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রতিদিন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হওয়াতে তাহাদের নব নব তাৎপর্য লাভের জন্য মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে-সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে আমাদের চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্তনের আবশ্যক ঘটিল। আমাদের মনোরাজ্যে একটা বিপর্যয় দশা উৎপন্ন হইয়া আমাদের কাছে সমস্তই যেন অনিশ্চিত করিয়া তুলিল।

এইরূপ সময়ে যে ধর্মবিশ্বাস সংকটাপন্ন হইয়া উঠিবে ইহা অনিবার্য। চিন্তাশক্তিহীন ব্যক্তিরাই যে-কোনো অপরিচিত সত্যের অভ্যুদয়ে বিপদের আশঙ্কা করেন। নূতন কোনো ভাবকে গ্রহণ করিতে হইলে চিন্তাপ্রণালীতে ও কর্মক্ষেত্রে উভয়ত্রই পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। সেইজন্য তাহা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে আমাদের বিরাগের কারণ হইয়া উঠে।

পৃথিবীতে সহসা যদি স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে নানা লোকের নানা স্বার্থে ও ব্যবসায়ে আঘাত লাগিত সুতরাং তাহারা প্রতিকূল হইয়া উঠিত। তেমনি যদি হঠাৎ চরম সত্যও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তবে নানাবিধ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে যাহাদের মন নানাপ্রকার আরাম ফাঁদিয়া বসিয়া আছে তাহারা পীড়া অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না।

শুধু যে পরিবর্তনের বিভীষিকাই অশান্তির কারণ তাহা নহে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও মানুষ এখনকার চেয়ে অনেক কাঁচা ছিল। তখন সমস্ত নূতন তথ্যকেই মানুষ ইন্দ্রিয়বোধ-প্রধান স্থূল জড়বাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করিত, সুতরাং সহজেই সেই ব্যাখ্যা নাস্তিকতার অভিমুখে অগ্রসর হইত। কিন্তু এখন আমাদের দর্শনশাস্ত্র অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে ; এইজন্যই এককালে যে-সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আমরা প্রলয়ঙ্কর বলিয়া ভয় করিতাম এখন সেই-সমস্ত সত্যকেই জ্ঞানোন্নতির সহায় বলিয়া স্বীকার

করিয়া শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি। ইহার ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধের কথা আর আমরা শুনিতে পাই না এবং অভিব্যক্তিবাদই সকল রহস্যের মীমাংসাস্থল ও সকল জ্ঞানের মূল আশ্রয় এই ভুল ধারণা ঘুচিয়াছে।

এইজন্যই আজকালকার দিনে ধর্মকে মানবসমাজের একটি মহৎ পদার্থ বলিয়া সকলে সমাদরের সহিত স্বীকার করে;—ইহা যে আমাদের পশুপ্রকৃতিরই একটা উচ্চতর পরিণাম মাত্র এ কথা এখন আর শ্রদ্ধা লাভ করে না। অভিজ্ঞেয়তাবাদী (empirical) পণ্ডিতগণ বলিতেন কোনো জিনিসকে বুঝিতে হইলে কি হইতে তাহার আদিম উৎপত্তি তাহা আলোচনা করা আবশ্যক, তাহার প্রথম উন্মেষের অবস্থায় তাহাকে বিচার করিয়া দেখিলে তবেই তাহার প্রকৃত পরিচয় সম্ভবপর। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে যেহেতু মানুষের জীবনে শারীরিক অনুভূতিই সর্বপ্রথমে প্রকাশ পায় অতএব আমাদের উচ্চতম বৃত্তিগুলিও এই মূল উপাদানে গঠিত। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে মূলত ধর্ম উন্নত পাশবিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং তাহার নীচ উৎপত্তির সংবাদ যে জানে সে তাহাকে লইয়া আর বড়াই করিতে পারে না। কিন্তু এই-সকল মহদাশয়েরা সমস্ত চিন্তাকে স্থূল রেখায় আঁকিয়া ও প্রাকৃতিক জগতের সহিত সকল বিষয়ের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া বিষম ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। যে-কোনো পদার্থের মধ্যে বৃদ্ধি-ধর্ম আছে অর্থাৎ যাহা ক্রমশ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাহার গোড়ার দিকে তাকাইলে চলে না, তাহার পরিণত অবস্থার মধ্যেই তাহার যথার্থ তাৎপর্যটি পাওয়া যায়। বীজে নহে কিন্তু পরিণত বৃক্ষটিতেই আমরা বৃক্ষের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি। এইরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে পাশব স্বার্থপরতা হইতেই ধর্মবোধের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত সত্য নহে। বস্তুত কালের মধ্য দিয়া বিশ্ব ক্রমশ পরিণতির দিকে চলিয়াছে, এই ক্রমবিকাশের কোনো একটি বিশেষ পর্বকেই মূল বলিয়া গণ্য করা কোনো মতেই চলিতে পারে না। মূলে নহে ফলেই, আরম্ভে নহে চরমেই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, ফলেন পরিচীয়তে। অতএব মানুষের মন পদার্থটা কি তাহা জানিতে হইলে মিলের উপদেশ অনুসারে আমরা ধাত্রী-ক্রোড়ের শিশুর অপরিস্ফুট মনের মধ্যে উঁকি মারিতে চেষ্টা করিব না; কিন্তু সাহিত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যেই আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেইরূপ ধর্মবোধের প্রকৃতি কি তাহারই খোঁজ করিতে গিয়া আদিম কালের মানুষের স্বপ্ন এবং কুসংস্কারে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাতে কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে—আর অধিক কিছু নয়। বস্তুত জগতে যে-সকল বড় বড় ধনতন্ত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাদেরই প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে তবেই ধর্ম জিনিসটা যথার্থ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে সম্প্রতি আমাদের অনুসন্ধানের প্রণালী পরিবর্তিত হইয়াছে; সেইজন্য এখন অমরা ধর্মকেই সমস্ত জীবনের চূড়া এবং মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ বলিয়া গণ্য করি।

আজকাল বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট অধিকারভেদ ঘটিয়াছে। আমরা যত কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করি এক্ষণে তাহাকে দুই পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করে, বর্ণনা করে, ঘটনাগুলিকে তাহাদের দেশকালগত নিয়মের সহিত মিলাইয়া দেখে। দর্শন-শাস্ত্র তাহার কারণ তত্ত্ব ও তাৎপর্য নির্ণয় করে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা আমরা এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যগুলির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাই। এই তথ্যগুলি আমাদের প্রিয় হউক আর নাই হউক, তাহাদিগকে আমরা

কোনো কাজে লাগাইতে পারি আর না পারি— তাহাদের অস্তিত্বকে ঘুচাইবার নহে, তাহারা থাকিবেই। কোনো শাস্ত্রবাক্যের সহিত সংগতি থাকা না থাকা, ভালো লাগা না লাগার সহিত ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, ইহারা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের অধিকারভুত। ধর্মসভার মন্ত্রণা বা কোনো সাধারণ সভার বিধানে ইহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। যদি কোনো শাস্ত্র ইহাদিগকে অস্বীকার করে তবে শাস্ত্রকেই অপমানিত হইয়া হার মানিতে হইবে, কিন্তু যেমনই হউক বিজ্ঞান কেবল বর্ণনাই করে, ব্যাখ্যা করে না। চরম তাৎপর্য ও ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগকে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। জ্ঞানের পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দুই দিকের প্রশ্নেরই উত্তর আবশ্যক হয়। অবশ্য পূর্ণরূপে এ-সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই নাই— কিন্তু এই দুই জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রকে পৃথক রাখাতে এবং উভয়েরই গৌরব স্বীকার করাতে উভয়েই বিনা-বিরোধে পাশাপাশি বাস করিতে পারে। এই কারণেই আজকাল ধর্মকে লইয়া বিজ্ঞান দর্শনের বিরোধ-সম্ভাবনা নাই।

আমরা যখন কোনো পরিবর্তন দেখি তখন কোনো-না-কোনো দ্রব্যকেই সেই পরিবর্তনের কারণ বলিয়া জানি। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েই এখন দৃশ্যমান স্পর্শগোচর পদার্থকেই চরম বলিয়া গণ্য করে না। এই-সকল দ্রব্যকে আমরা যতই কেন ব্যবহারে লাগাই ও মাপিয়া জুখিয়া দেখি, ইহাদের যথার্থ প্রকৃতিটি জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়বোধমূলক অভিজ্ঞতার ভাষায় ব্যাখ্যা করা সহজ এবং সেইরূপে ব্যাখ্যা করিলে তাহার রহস্যটুকু আর থাকে না। কিন্তু যখনি আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে বস্তু পদার্থ টা আসলে কি, অমনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকি। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ ও রাসায়নিকগণ বলেন যে অণুর সমষ্টিই বস্তু ও সেই অণুগুলি আবার পরমাণুতে বিভক্ত, এবং সম্প্রতি পরমাণুগুলিকেও আবার আরো সূক্ষ্ম পদার্থের সমবায় বলা হয়। আমাদের অনুসন্ধান আরো অগ্রসর হইতে থাকিলে আরো গভীরতর রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করি এবং তখন শুনা যায় বস্তু নাকি আকাশ পদার্থের আবর্ত মাত্র। এইরূপে ক্রমশ আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের চারি দিকে যে-সকল দ্রব্য দেখিতে পাইতেছি তাহাদের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহারা তাহাদের অতীত কোনো একটি শক্তির ক্রিয়া মাত্র। অবশেষে স্পেন্সরের সহিত একবাক্যে বলিতে হয় যে, মানুষ সর্বদাই একটি অসীম নিত্য শক্তির সম্মুখে রহিয়াছে এবং সেই শক্তি হইতেই সমস্ত পদার্থ নিঃসৃত হইতেছে। এই সিদ্ধান্তটি যেমনই সত্য হউক-না-কেন ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কারণ-তত্ত্বের সমস্যাটিকে আপাতদৃষ্টিতে যতই সহজ মনে হউক বস্তুত উহা রহস্যে পূর্ণ। যে কারণ-তত্ত্ব প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মূল তাহাকে এক্ষণে আমরা কোনো দৃশ্যমান পদার্থেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখি না— আমরা তাহাকে কোনো একটি আদি শক্তির মধ্যেই অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করি।

তারহীন টেলিগ্রাফের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে আমাদের চারি দিকে একটি অদৃশ্য শক্তির মহা রাজ্য আছে এবং বিজ্ঞান ও দর্শন এই দৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলীকে কেন যে সেই অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ বলিয়া থাকে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাইব। অতএব দেখা যাইতেছে দৃশ্যমান দ্রব্যগুলিকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া না মানিয়া তাহাদিগকে অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া বলিয়াই আজকাল গণ্য করা হয়।

এইরূপে মানুষের ধর্মজ্ঞান একটি মস্ত ফললাভ করিয়াছে। প্রচলিত নাস্তিকবাদ ও জড়বাদ একেবারে

লোপ পাইয়াছে। আমাদের চিন্তাবৃত্তি যে অবস্থায় প্রকৃতির মধ্য দিয়াই সকল ব্যাপারকে দেখিয়া থাকে সে অবস্থায় প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যে প্রকৃতিই অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করে এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই কেবল ঈশ্বর করিয়া থাকেন। প্রচলিত ধর্ম-সমাজ এতদিন এই প্রকারে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই প্রকৃতি মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে ঠেলিয়া নিজেই সমস্ত স্থান জুড়িবার উপক্রম করিয়াছে। সেইজন্যই বিজ্ঞানের কোনো নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইলেই এ পর্যন্ত ধর্ম-সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যত বিস্তার হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কর্তৃত্বরাজ্য আমাদের পক্ষে ততই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে ভগবানই সেই অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা সেণ্ট্‌পলের ভাষায় বলিতে হইলে— যাঁহার মধ্যে আমরা বাস করি, চলি ফিরি, ও যাহার মধ্যে আমরা অস্তিত্বলাভ করি— তখন আমাদের বিষাদের আর কোনো কারণ থাকে না। তখন আর প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে কিন্তু তাঁহারই প্রকাশমাত্র। প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁহার কার্যপ্রণালী মাত্র। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাঁহারই জ্ঞানের রূপ।

এই কথাটিই ধর্মের মর্মকথা। ঈশ্বরই যে সকলের মূলে রহিয়াছেন ধর্ম ইহাই বলিতে চাহিয়াছে। তবে তাঁহার সৃষ্টিকার্য কি প্রণালীতে চলে সে সম্বন্ধে ধর্ম কিছু বলিতে চাহে না; সে যে-প্রণালীই হউক-না-কেন তিনি মূলে আছেন এইটুকু হইলেই হইল। তিনি যদি তাঁহার এক আদেশেই জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন তো ভালো, আর যদি যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহার সৃষ্টির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে তো আরো ভালো। যতক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া স্বীকার করা যায় ততক্ষণ প্রণালী লইয়া ধর্মের কোনো আপত্তি থাকে না।

জাগতিক কারণ-তত্ত্বের কেবল আকার এবং প্রণালীই বিজ্ঞানের আলোচ্য। তাহার প্রকৃতি ও অভিপ্রায়ের আলোচনা দর্শন ও ধর্মের অধিকারভূত। এইরূপে অধিকারের শ্রেণীভেদ হওয়াতেই, অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তনাকালে ধর্মসমাজে যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে। এক সময়ে লোকে কল্পনা করিয়াছিল যে যাহা বিশেষ একটা কিছুই নহে বলিলেও হয় তাহাও কেবলমাত্র কালপ্রভাবেই সমস্ত উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এখন সে মোহ কাটিয়া গিয়া এ কথা বুঝিয়াছি যে অভিব্যক্তিবাদ একটি মূল কারণশক্তির বাহ্য কার্যপ্রণালী মাত্র, তাহার মধ্যে কর্তৃত্ব কিছুই নাই। অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমরা কেবল এই কথাই বুঝিয়াছি যে কোনো জিনিসই হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই বা প্রথম হইতেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই। ধর্মতত্ত্বের একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ শক্তি মূলে থাকিয়া সমস্ত ঘটাইতেছে এবং এই অভিব্যক্তির মধ্যে ক্রম-উন্নতির পরিচয় আছে কি না? যদি সেই পরিচয় থাকে তবেই ধর্মের পক্ষ হইতে চিন্তার কারণ দূর হয়। অভিব্যক্তিবাদকে যদি কেবল অন্ধ পরিবর্তন-পরম্পরা না বলি তা হইলেই স্বীকার করিতে হয় যে উহা একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জগতের অভিব্যক্তির মধ্যে এই যে সম্মুখের দিকে লক্ষ্য স্থাপনের ভাবটি আছে ইহাই জগৎবিকাশের মূলে জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে প্রধান যুক্তি। যে কারণ-তত্ত্ব যন্ত্রমূলক, তাহা কেবলমাত্র অতীত ঘটনার পরিণাম, যাহা জ্ঞানমূলক তাহাই ভবিষ্যতের অভিমুখে আপন অভিপ্রায়কে অগ্রসর করে।

ধর্মরাজ্যেও অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করে, এই ধারণায় ধর্ম পূর্বাপেক্ষা অনেক বললাভ করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা কোনো ইঙ্গিত বা অলৌকিক কোনো ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু তাঁহারই এই জগতের মধ্যে আমাদের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। তিনি সর্বত্রই রহিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রিয়া নির্ভরযোগ্য নিয়মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এমন-কি খৃষ্টানদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল যে যাহা-কিছু নিয়মবহির্ভূত ও সৃষ্টিছাড়া তাহারই মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব। কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেই বুঝিতে পারি যে আভ্যন্তর জগৎ ও বহির্জগৎ যে অমোঘ নিয়মের দ্বারা চালিত হইতেছে তাহার মধ্যেই ঈশ্বরের চিরন্তন পরিচয়। যাহা-কিছু প্রাকৃতিক তাহাকে এখন আমরা আর অনৈশ্বরিক মনে করি না, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেই দিব্যকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি।

মীরা দেবীর রচনা-সূচী

১৩১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'স্বতঃপ্রবৃত্ত' ভাবে প্রবাসীর সংকলন ও সমালোচন বিভাগের ভার লইয়া, দেশী বিদেশী ইংরেজি কাগজ হইতে সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধের সারসংকলন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা রচনা করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কন্যা অতসী বা মীরা দেবীও এই সংকলয়িতাদের অন্যতম ছিলেন। এই আয়োজন প্রবাসীর ঐ বিভাগ উঠিয়া যাইবার পরও কিছুকাল চলিয়াছিল। এবং ১৩১৮ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা স্বীকার করেন তখনো এইরূপ সংকলন প্রকাশিত হইতে থাকে। মীরা দেবী -কৃত এইরূপ একটি সংকলন এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইল। মীরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে[১] এই প্রবন্ধের সস্নেহ উল্লেখ—'প্রবাসীতে তোর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে—দেখেছিস্ ত ?'

মীরা দেবী -কৃত এইজাতীয় সংকলনের একটি তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল :

প্রবাসী। সংকলন ও সমালোচন

১৩১৭

আশ্বিন

ভারতের ভাগবত ধর্ম্ম

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম-ইতিহাসের সার্বজাতিক সভায় গ্রিয়র্‌সন্ কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম।

কার্তিক

হিন্দুধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি

ধর্ম্ম ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায় সার্ আলফ্রেড্ লায়াল কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

১. পত্রসংখ্যা ৫। চিঠিপত্র চতুর্থ খণ্ড (পৌষ ১৩৫০)

পৌষ

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ‘ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু’তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মুশীর হোসেন্ কিদ্‌বাই-লিখিত প্রবন্ধের সংকলন।

মাঘ

প্রাচীন ভারতে বিদেশী

‘ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু’ হইতে সংকলিত।

চৈত্র

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপ

এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-রচিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

১৩১৮

শ্রাবণ

ধর্ম ও বিজ্ঞান

হিবার্ট জর্নাল হইতে সংকলিত।

আশ্বিন

ডাউলিং

জনৈক পাদ্রী সাহেব-লিখিত *From the Bottom Up* গ্রন্থ হইতে গৃহীত একটি চরিত্রের বিবরণ।

১৩২০

মাঘ

দরিদ্র ডিউক / সত্যঘটনা

From the Bottom Up গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। নানা কথা

১৮৩৩ শক। ১৩১৮

আষাঢ়

জাতির স্বাতন্ত্র্য, রণক্ষেত্রের কুকুর, পাঞ্জাবের বিবাহপ্রথা

শ্রাবণ

শীলশিক্ষা

আশ্বিন-কার্তিক

হাতীর দন্ত চিকিৎসা, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

এই তালিকায় ধৃত *From The Bottom Up*: the life Story of Alexander Irvine গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এখানি একসময় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ ছিল— শান্তিনিকেতনের

তৎকালীন অধ্যাপকদের কাহাকেও কাহাকেও লিখিত পত্রে সে কথা জানিতে পারা যায়। এইরূপ একখানি পত্রের অংশ নিম্নে উদধৃত হইল—

"সেই From the Bottom Up নামক বইটি পড়ে ফেলেছি। ভারি উপকার পেয়েছি। আমাদের যেখানে দৈন্য সেই জায়গাটা খুব স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে গেছে। সেইদিকে এবার আমাদের বিশেষ করে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বিদ্যালয় খুল্‌লে এবার আমি আমাদের সেই শক্তির দিকটা গড়ে তোলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব।"[২]

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

২. শান্তিনিকেতন-আশ্রমের তৎকালীন অধ্যাপক কালিদাস বসুকে লিখিত পত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা আষাঢ় ১৩৫০

প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যকৃপাপ্রাপ্তির কাল ও ফলাফল বিচার

বিমানবিহারী মজুমদার

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত উৎকলখণ্ডে (৬।৬) আছে যে উৎকলদেশের অধিবাসীরা সকলেই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বলিতে যিনি একবার মাত্র বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করেন তাঁহাকে যেমন বুঝায় আবার তেমনি যাঁহাকে দর্শন করিলেই মুখে কৃষ্ণনাম আসে তাঁহাকেও বুঝায়। প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদেবের মুখ্য সেবক। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে, অর্থাৎ ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে, পুরীতে তিনি একটি অনুশাসন ওড়িয়া ভাষায় লেখান। তাহাতে তিনি তাঁহার পিতা পুরুষোত্তমদেবের মতন নিজেকে 'গৌড়েশ্বর, নবকোটীকর্ণাট কলবরশেখর' বলিয়া পরিচিত করেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশের গঙ্গাতীর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর কর্ণাটদেশ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁহার কুলগুরু জীবদেব 'ভক্তি-ভাগবত' নামক কাব্যের শেষে (শ্লোক ৩০) নিজেকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বীরভদ্র অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র ১৭ বছর বয়সে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর তিন পক্ষের (দেড় মাস) মধ্যে গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া গঙ্গানদীতে পিতার তর্পণ করেন (শ্লোক ২৭)। এই বীররাজা তাঁহার অনুশাসন-লিপিতে ১৯।২০ বছর বয়সে লিখিতেছেন যে পুরীর মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যা-আরতির পর হইতে আরম্ভ করিয়া বড়শৃঙ্গার অর্থাৎ শয়নকালের পূর্ব পর্যন্ত গীতগোবিন্দ নৃত্য হইবে। ঠাকুরের পুরাতন নটীসম্প্রদায় এবং তেলেঙ্গী সম্প্রদায় গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্য কোনো গান শিখিবে না ও গাহিবে না ও অন্য কোনো নৃত্য নাচিবে না। মন্দিরে আরও যে চারজন বৈষ্ণব গায়ক আছেন তাঁহারাও গীতগোবিন্দ গান গাহিবেন। যাঁহারা ঐ গান জানেন না তাঁহারা উহা তাঁহাদের নিকট শুনিয়া শিখিবেন। যদি কোনো পরীক্ষক (পরিদর্শক) অন্য কোনো গীত ও নৃত্য করিতে দিবেন তাঁহারা জগন্নাথের দ্রোহ করিতেছেন জানিতে হইবে (Journal of the Asiatic Society, Bengal, 1893 No. 2 : উড়িয়া লেখ বিষয়ে মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ)। এই লেখ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে পৌঁছিবার এগার বৎসর পূর্ব হইতেই প্রতাপরুদ্র রসিক-সম্প্রদায়ের আস্বাদ্য গীতগোবিন্দের পরম অনুরাগী ছিলেন।

ঐ প্রমাণ দৃঢ়তর হয় রায়রামানন্দ-কৃত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক হইতে। রামানন্দ রায় ঐ নাটকে নিজের পরিচয় দিয়াছেন 'পৃথ্বীশ্বর' অর্থাৎ রাজা ভবানন্দের পুত্র বলিয়া। 'জগন্নাথবল্লভ' শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলন ঘটিবার আগেই লেখা হইয়াছিল, কেননা উহাতে শ্রীচৈতন্যের কোনো উল্লেখ নাই এবং প্রত্যেক গীতের শেষে গজপতি রুদ্রের নাম কোনো-না-কোনোভাবে লওয়া হইয়াছে। কবি যে তখনও পুরাদস্তুর রাজসভাসদ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তথাপি ঐ নাটকে দেখা যায় যে জয়দেব যে রসিক সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন তাহা উৎকলে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণের মুখে একটি গান দিয়া তাহার শেষে লেখা হইয়াছে—

> গজপতিরুদ্র মুদে মধুসূদন বচনমিদং রসিকেষু।
> রামানন্দরায় কবি ভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥

অর্থাৎ গজপতি প্রতাপরুদ্রের হর্ষের জন্য রামানন্দ রায় কর্তৃক রচিত মধুসূদনের এই বচন রসিকদের আনন্দবর্ধন করুক। ঐ নাটকে রাধিকার সখীর নাম মদনিকা, ললিতা বা বিশাখা নহে; বিদূষকের নামও মধুমঙ্গল নহে। ইহার মানে এই যে রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' 'ললিত-মাধব' ও 'দানকেলি-কৌমুদী' তখনও লিখিত হয় নাই বা উৎকলে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলাকে অলৌকিক বলিয়া উৎকলের বিদগ্ধজন গ্রহণ করিয়াছেন। 'জগন্নাথবল্লভ' যে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল তাহার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় প্রস্তাবনার দশম শ্লোকে। উহাতে সেকন্দর শাহ (১৪৮৯-১৫১৭) কন্দরে লুকাইতেছেন; কলবর্গ বা গুলবর্গার বাহমনী বংশীয় নৃপতি ছলছল চোখে পরিবারবর্গের দিকে তাকাইতেছেন, গুজরাতের নৃপতি (মামুদ বেগারাহা ১৪৫৮-১৫১১) নিজের রাজ্যকে জীর্ণ অরণ্য বলিয়া ভাবিতেছেন এবং গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) প্রবল বায়ুর বেগে চালিত সমুদ্র-পোতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় নিজেকে মনে করিতেন। যদি বিজয়নগরের সিংহাসনে কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-১৫২৯) অধিরোহণের পরে ঐ নাটক রচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার নামের উল্লেখও উহাতে থাকিত। প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন যে বিপক্ষ রাজাদের কালাগ্নিস্বরূপ শ্রীহরিচরণাশ্রিত প্রতাপরুদ্র ঐ নাটক অভিনয় করিতে আদেশ দিয়াছেন।

প্রতাপরুদ্রের নামে 'সরস্বতীবিলাস' নামে একখানি স্মৃতি বা ব্যবহারশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ডঃ কাণে বলেন যে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুআইন বিষয়ে মিতাক্ষরার পরেই সরস্বতীবিলাসের প্রামাণিকতা। উহার প্রথম শ্লোকে শিবের বন্দনা আছে। তাহার পর হনুমান জগন্নাথ গোপালকৃষ্ণ ও দুর্গার বন্দনা আছে। লোল্ল লক্ষ্মীধর নামে এক পণ্ডিত 'সৌন্দর্যলহরী'-টীকার শেষে লিখিয়াছেন যে তিনিই প্রতাপরুদ্র নাম দিয়া 'সরস্বতীবিলাস' লিখিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে প্রতাপরুদ্রের পরাজয়ের পর পরাজিত প্রভুকে ছাড়িয়া বিজয়ীর অধীনে চাকুরি লইয়াছিলেন। এ ধরণের লোকের কথায় কতটা আস্থা স্থাপন করা যায় বলা কঠিন। শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভের পূর্বেও প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণবতার সহিত অপরিচিত ছিলেন না। তবে তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন বৈষ্ণব অচ্যুত যশোবন্ত বলরাম ও জগন্নাথদাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় ঐ সময়ে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। বলভদ্র রাজগুরু 'অদ্বৈত-চিন্তামণি' ও 'শারীরক-সার' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র গোদাবর মিশ্র 'অদ্বৈত-দর্পণ' লেখেন। তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের শীর্ষস্থানীয় বাসুদেব সার্বভৌম লক্ষ্মীধর কৃত 'অদ্বৈত-মকরন্দে'র এক সুবিস্তৃত টীকা তৈয়ারি করেন। ঐ টীকায় তিনি প্রতাপরুদ্রের নাম উল্লেখ করিয়া লেখেন যে তিনি কৃষ্ণদেব রায়কে পরাজিত করেন। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের চৈত্র মাসে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও বিভূতি দেখিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য অদ্বৈতবাদের জীবব্রহ্মের ঐক্য ছাড়িয়া উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ মানিয়া লন ও পরমভক্ত হন। এই ঘটনার পরে তিনি 'অদ্বৈত-মকরন্দে'র টীকা লিখিতে পারেন না। যদি তাহার পরেই লেখেন তাহা হইলে প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেব রায়কে কখন পরাজিত করিলেন? কৃষ্ণদেব রায় রাজক্ষমতা লাভ করিবার চৌদ্দ দিন পরে জন্মাষ্টমীর দিন ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট তারিখে অভিষিক্ত হন। তাহার কিছু পরেই প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে অভিযান করিয়াছিলেন, কেননা গুন্টুর জেলার পলনাড তালুকে ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের এবং নেলোর জেলায়
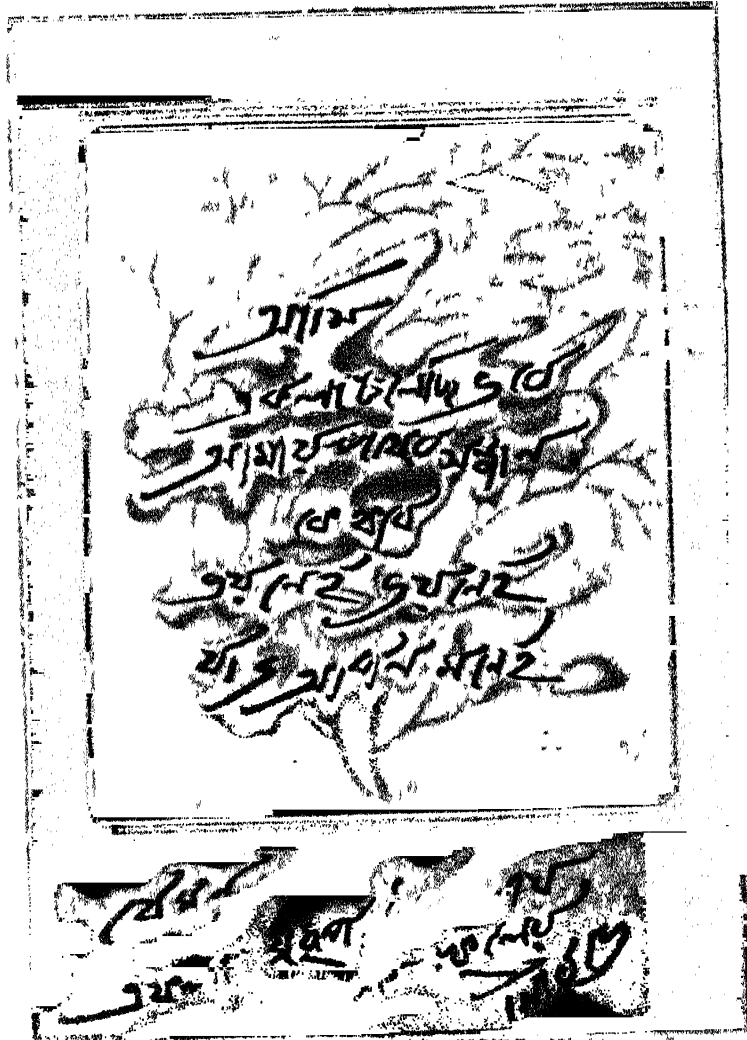
১৫১০এর ২৪ জানুয়ারির লেখ পাওয়া গিয়াছে। সার্বভৌম ঐ বিজয়ের কথা শুনিয়া টীকায় উহার উল্লেখ করেন।

জীবদেব 'ভক্তি-ভাগবত' কাব্যের উপসংহারে ২৮ সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—

অদ্বৈতবাদপরিশুদ্ধতরান্তরাত্মা
দ্বৈতং তনোতি বসুদেব সুতাবতারে॥

অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের অন্তরাত্মা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে পরিশুদ্ধতর হইয়াছিল বটে, কিন্তু বসুদেবসুতের অবতার হওয়ায় তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের কয়েক মাস পূর্বে অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ নিমাই পণ্ডিতকে কৃষ্ণের অবতাররূপে পুরুষসূক্ত স্তব পড়িয়া পূজা করিয়াছিলেন।

কাজেই এখানে বসুদেবসুতের অবতার বলিতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যই উপলক্ষিত হইতেছেন। জীবদেব লিখিয়াছেন যে তিনি ৩৫ বৎসর বয়সে প্রতাপরুদ্রের সপ্তদশ অঙ্কে মাঘ মাসে ঐ গ্রন্থ শেষ করেন। অঙ্ক ও রাজ্যাঙ্ক এক নহে। অঙ্ক গণনায় এক ছয় দশ ছাড়া অন্য শূন্য অশুভ বলিয়া বাদ দেওয়া হয়। কাজেই সপ্তদশ অঙ্ক অর্থে চতুর্দশ বৎসর। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে ঐ সময় ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু প্রতাপরুদ্র এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ করেন এবং অঙ্কের বৎসর শুরু হয় ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে; সুতরাং চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কের মাঘ মাস ১৫১১র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হইবে।

১৫১০এর চৈত্র মাসে শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দার্শনিক মতের পরিবর্তন সাধন করেন; তাহার ফলে রাজারও মত পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নহে। ঐ পরিবর্তনকে লক্ষ্য করিয়াই জীবদেব পূর্বোক্ত শ্লোক লিখিয়া থাকিবেন।

এখন প্রশ্ন এই যে ১৫১০এ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন কি? জয়ানন্দের মতে (পৃ. ১০০) শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের আদেশে নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ কটকে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিতে গিয়াছিলেন। অল্প কথায় জয়ানন্দ প্রতাপরুদ্রের একটি কথাচিত্র আঁকিয়াছেন—

গৌরবর্ণ প্রচণ্ড দোর্দণ্ড দীর্ঘতনু।
আরক্ত নয়ন যেন বড় ফুলধনু॥ পৃ. ১০৩

শ্রীচৈতন্য পথ দিয়া যাইতেছিলেন তাহা দেখিয়া রাজা যে হাতিতে চড়িয়া নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন তাহা সহসা মাথা নোয়াইল। রাজা ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে লাফ দিয়া নামিয়া শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন যে তিনি রাজমদে মত্ত; তাঁহাকে যদি প্রভু ত্রাণ করেন তবে তাঁহার প্রভূত মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। শ্রীচৈতন্য বলেন যে—

তোমার প্রসাদে মোর সুখময় প্রজা।
তোমা সম্ভাষিব আমি জগন্নাথের আজ্ঞা॥

ইহার পর জয়ানন্দ লেখেন নাই যে তখনই প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইলেন বা তাঁহাকে পূজা করিলেন। কিন্তু রাজার পাটরানী চন্দ্রকলা যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে ষড়ঙ্গে পূজা করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে হরিনাম দিলেন এ কথা লেখা আছে। ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসে যেমন দেখা যায় যে কেন্টের রাজকন্যা খৃস্টে ভক্তিমতী এথেলবার্গা নর্দাম্বিয়ার রাজা এডুফিন ও তাঁহার প্রজাবর্গকে

খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করান, অনুমান করা যায় যে চন্দ্রকলার প্রভাবে প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যচরণে ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ অন্যত্র লিখিয়াছেন যে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্য পুরীতে আসার পর, অর্থাৎ ১৫১২র স্নানযাত্রার পূর্বে, সার্বভৌমের মুখে সকল কথা শুনিয়া প্রতাপরুদ্র প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে আসিলেন। সেই সময়ে

জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রা পৌর্ণমাসী দিনে।
দেউল উত্তরদিগে দেখিল শ্রীচৈতন্যে॥ পৃ. ১২৬

জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে রাজা ও রানী শ্রীচৈতন্যের অষ্টভুজরূপ দর্শন করেন।

এই দর্শনের প্রভাব প্রতাপরুদ্রের উপর কি হইয়াছিল, তিনি যুদ্ধবিগ্রহ এবং অন্য রাজকর্ম ছাড়িয়া ভক্তবৈষ্ণব হইয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে জয়ানন্দ কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। জীবদেবের 'ভক্তি-ভাগবতে'র বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে রাজা ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদর্শন করার ফলেই নিজের রাজ্যে যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করাইয়াছিলেন, তাহাতে জগন্নাথের মূর্তি ছিল না, গোপাল-কৃষ্ণ মূর্তি অঙ্কিত ছিল, যথা—

গোপালমূর্তিরুচিরা নবহেমমুদ্রা
যন্নামবর্ণলিখনাঙ্কনভাসমানা॥২৯॥

এই ধরণের কোনো স্বর্ণমুদ্রা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আজও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রাজগুরু এমন একটা কথা বানাইয়া লিখিয়াছেন মনে হয় না।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিয়াছিলেন সে কথা কবি কর্ণপূর ও তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্' নামে সংস্কৃত গ্রন্থে (১৩।৭৮) স্বীকার করিয়াছেন। মুরারিগুপ্তের 'কড়চা' অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপূর মহাপ্রভুর তিরোধানের নয় বৎসর পরে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে এই মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার-কাহিনীটি মুরারিগুপ্তের 'কড়চা'র ছাপা বইয়ে যেমন ভাবে আছে তাহা কবি কর্ণপূর মানিয়া লন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলা-বর্ণনার অংশই তিনি মুরারির অনুসরণে লিখিয়াছেন; সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবনী হয় তিনি পান নাই বা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

মুরারি গুপ্ত (৪।১৬) বলেন যে শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ ও বৃন্দাবন ভ্রমণের পরে, অর্থাৎ ১৫১৬ বা তাহার পরে, প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন যে সার্বভৌম ও রামানন্দকে ডাকিয়া রাজা জানিতে চান যে শ্রীচৈতন্যের দর্শন তিনি কিরূপে পাইবেন। তাঁহারা বলেন যে সাধারণভাবে দর্শন পাওয়া দুর্ঘট; তবে যখন চৈতন্য-নিত্যানন্দ কীর্তনের আনন্দে মগ্ন থাকিবেন তখন যাইয়া যেন রাজা দর্শন করেন। রাজা সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া কীর্তনকালে যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। তিনি ষড়্‌ভুজমূর্তি দর্শন করিলেন এবং ভাগবতের রাসলীলা হইতে কতিপয় শ্লোক পাঠ করেন। নরহরি সরকারের শিষ্য লোচন তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' মুরারিকেই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন, তবে কালক্রমে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসে কিছু না কিছু অতিরঞ্জন ঘটে তাহা লোচনের বর্ণনাতেও বর্তমান আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ-শান্তিপুরাদি দর্শনের পর পুরীতে ফিরিয়া আসিলে একদিন রাজা জগন্নাথ-দর্শনের সময় বারংবার জগন্নাথের মূর্তির পরিবর্তে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি ব্যাকুল

হইয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে আসিলেন। তিনি বারংবার দ্বারপাল গোবিন্দকে অনুরোধ করিলেন যে-কোনো প্রকারে দর্শন করাইয়া দিন। কিন্তু গোবিন্দ রাজামহারাজাদের দ্বারীর মতন বলিলেন—

গোবিন্দ কহয়ে রাজা, না হও কাতর।
এখনে না পাবে দেখা, হৈল অনবসর।

—শেষখণ্ড পৃ. ১১১

রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। তিনি পুরীতেই থাকিয়া গেলেন। দুই-চারি দিন পরে একদিন কাশী মিশ্রের বাড়িতে যখন ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের নিকট বসিয়া আছেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী প্রভুকে রাজার দর্শন-ব্যগ্রতার কথা সসংকোচে জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে 'সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে রাজ-দরশন'। তখন পরমানন্দ পুরী বলিলেন যে এ কথা শুনিলে রাজা প্রাণত্যাগ করিবেন, তিনি আট-দশ দিন চরণদর্শনের প্রত্যাশায় অনাহারে আছেন—

আজি ত হইল রাজার দশ উপবাস।
সব ছাড়ি পড়ি আছে চরণপ্রত্যাশ॥

সকলে মিলিয়া শ্রীচৈতন্যকে এইভাবে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন—আচ্ছা, রাজাকে আনো, আমি প্রসন্ন হইলাম। প্রতাপরুদ্র আসিয়া শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিলেন; 'ষড়্‌ভুজশরীর প্রভু করে পরকাশ'। রাজা ভক্তিগদ্গদ চিত্তে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া হরি-হরি বলিয়া নাচিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ভালোভাবে প্রজাপালন করিতে উপদেশ দিলেন—

প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম।
প্রজা পুত্র রাজা পিতা কহিল এ মর্ম॥

তিনি আরও বলিলেন যে যিনি সকলকে নিজের মতন দেখেন তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণের দাস। লোচনের কিছু বৈষয়িক অভিজ্ঞতা ছিল; রামগোপালদাসের শাখানির্ণয়ে আছে যে লোচন 'গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন'। 'রসকল্পবল্লী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ. ২০৭। গুরুর অর্থ গুরুর জন্য এবং ফিরিঙ্গি বলিতে পর্তুগীজ বুঝাইত। তাঁহার মতে শ্রীচৈতন্য রাজাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সহিত জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যবাক্যের কিছু মিল আছে—

গোসাঞি বলেন প্রতাপরুদ্র সূর্যবংশে রাজা।
তোমার [চৈতন্য] প্রসাদে মোর সুখময় প্রজা॥

—জয়ানন্দ, পৃ. ১০৩

কিন্তু আকুমার বৈরাগী বৃন্দাবন দাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিবার পর উপদেশ দিলেন যে রাজা যেন সব কাজ ছাড়িয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন ও কৃষ্ণের কার্য করেন—

প্রভু বোলে 'কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য বিনে তুমি না করিহ আর॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণুচক্র-সুদর্শন॥

তুমি, সার্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলু এথায়॥'

—চৈতন্য-ভাগবত ৩।৫

শেষের দুই পংক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃন্দাবন দাসের মতে শ্রীচৈতন্য যে পুরীতে আসিয়াছিলেন তাহা প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ও রামানন্দরায়ের সহিত মিলন উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার জন্য। বৃন্দাবন দাস এমন কিছু লেখেন নাই যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে দেখা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশ্য তাঁহার ভক্তদের ইচ্ছা থাকিলেও 'তথাপি না পারে কেহো দেখা করাইতে'। তাই রাজা সরাসরি একদিন ফুলবাগানে, যেখানে পারিষদগণসহ শ্রীচৈতন্য বসিয়াছিলেন— সেইখানে, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও স্তুতিপাঠ করিলেন। প্রভুও রাজার কাকুর্বাদ শুনিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। মুরারি ও লোচনের মতন বৃন্দাবন দাসও বলেন যে শ্রীচৈতন্য গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে 'শেষখণ্ডে সেতুবন্ধ গেলা গৌর রায়' এবং 'শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার' বর্ণনা করিবেন বলিলেও গ্রন্থমধ্যে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণ ও বৃন্দাবন-গমনের কথা একটুকুও লেখেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কালনির্ণয় বিষয়ে কবি কর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ সবচেয়ে বেশি প্রামাণিক। কবি কর্ণপূর বলেন যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পর পুরীতে ১৫১০এর দোলযাত্রার পূর্বে পৌছিয়া মাত্র আঠার দিন পুরীতে ছিলেন (মহাকাব্য, ১২।৯৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য বৈশাখ মাসে দক্ষিণ-ভ্রমণে যাত্রা করেন এবং প্রায় দুই বৎসর পরে পুরীতে ফিরিয়া আসেন (চৈতন্য-চরিতাবলী ২।১৬।৮৩)। কবি কর্ণপূর বলেন যে প্রভু সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া ১৫১১র বর্ষার অন্তে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হন (মহাকাব্য, ১৩।৩৫)। তথায় কয়েক মাস থাকিয়া ১৫১২র স্নানযাত্রার পূর্বে পুরীতে ফেরেন। কিন্তু স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ-বিগ্রহের দর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি পুনরায় গোদাবরীতীরে রামানন্দের নিকটে যান। তথায় তিনি বর্ষার চারি মাস যাপন করেন এবং রামানন্দসহ ১৫১২র শরৎকালে পুরীতে ফেরেন (মহাকাব্য, ১৩।৬০-৬১)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন (২।১৬।৮৩-৮৫) যে দক্ষিণ হইতে ফিরিবার বৎসরেই শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে যাইতে চান; কিন্তু সার্বভৌম ও রামানন্দ তাঁহাকে নানারূপ বাহানা তুলিয়া পরবর্তী দুই বৎসরও যাইতে দিলেন না। সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে তিনি গৌড় হইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া বাহির হন। ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের হিসাব অনুসারে শ্রীচৈতন্য ১৪৩১ শকের মাঘ-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকের রথযাত্রার সময়ে তিনি দক্ষিণদেশে ছিলেন; ১৪৩৪ ও ১৪৩৫ শকে তাঁহাকে ভক্তগণ গৌড়দেশ ও বৃন্দাবন-ভ্রমণে যাইতে দেন নাই; ১৪৩৬ শক/১৫১৪ খ্রীস্টাব্দ হইতেছে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসর। তিনি সেবারে বৃন্দাবনে যান নাই; গৌড়ভ্রমণ করিয়া ১৫১৫এর বর্ষার পূর্বে পুরীতে ফিরিয়া আসেন। তার পর ঐ বৎসরের শরৎকালে ঝাড়খণ্ড দিয়া বৃন্দাবনে যান। ব্রজমণ্ডলের তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া প্রয়াগ ও কাশীতে কয়েকদিন থাকিয়া তিনি ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের পূর্বে পুরীতে ফিরিয়া আসেন। বৃন্দাবন দাসের মতে গৌড় ভ্রমণান্তে শ্রীচৈতন্য সম্ভবতঃ ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেন। এখন দেখা যাউক প্রতাপরুদ্রের পক্ষে তখন কটক বা পুরীতে থাকা ও অধ্যাত্ম বিষয়ে

মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল কি না। বিজয়নগরের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায় ১৫১২ পর্যন্ত বাহমনী স্থলতান মামুদ শাহের ও বিজাপুরের যুস্থফ আদিল শাহের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঐ সালে রায়চূড় অধিকার করেন। তার পর উম্মত্তুরের হিন্দু শাসককে দমন করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তম ও শিবনসমুদ্রমের দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বয় অধিকার করিয়া ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। নেলোর জেলার উদয়গিরি দুর্গ উৎকল সাম্রাজ্যের একটি বড় ঘাঁটি ছিল। কৃষ্ণদেব উহা অবরোধ করিলেন। প্রতাপরুদ্র স্বয়ং ঐ অবরোধ মুক্ত করিবার জন্য চার বার দক্ষিণে অভিযান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে বিজয়নগরাধিপতি উহা অধিকার করিয়া লইলেন। এই যুদ্ধের উভয় প্রতিপক্ষই বিষ্ণুর উপাসক। কৃষ্ণদেব মাধ্ব সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ নেতা ব্যাসরায়কে গুরুর মতন শ্রদ্ধা করিতেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উদয়গিরি হইতে বালকৃষ্ণের বিগ্রহ তিনি নিজের রাজধানীতে লইয়া যাইয়া কৃষ্ণস্বামী-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেব রায়ের আক্রমণ হইতে কোণ্ডবিডু প্রদেশ রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তত্রত্য দুর্গও ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার এক রানী ও জ্যেষ্ঠপুত্র বীরভদ্র শত্রুর হাতে বন্দী হইলেন। রাজ্যাধিরোহণকালে (১৪৯৭) প্রতাপরুদ্রের বয়স যদি ১৭ হয়, তাহা হইলে ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্রের বয়স ১৭-১৮'র চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় ঔদার্য ও রাজনীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ঐ অল্পবয়স্ক রাজপুত্রকে মহীশূরের একটি প্রদেশের নায়ক বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বীরভদ্র গজপতি ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের ১ অক্টোবর তারিখের এক শাসনপত্রে কৃষ্ণদেব রায় ও প্রতাপরুদ্রের পুণ্যার্থে বিবাহ-কর রদ করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় তাঁহাকে একবার রাজধানীতে ডাকাইয়া তাঁহার এক কর্মচারীর সহিত তরোয়ালের খেলা দেখাইতে আদেশ করিলে তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে আত্মহত্যা করেন। এই সংবাদে মর্মাহত হইয়া প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-রাজার মন্ত্রীর নিকট জানিতে চাহিলেন কী শর্তে তাঁহার রানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। মন্ত্রী বলিলেন প্রতাপরুদ্রের কন্যার সহিত কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাহ দিতে হইবে। উৎকলরাজ ইহাতে প্রথমে রাজি হন নাই, বোধ হয় বরবধূর মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশি বলিয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন ও দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধি হইল। কৃষ্ণদেব রায় যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল। বিজয়নগরের ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্র নাকি অচ্যুত রায়কে আক্রমণ করিতে যান, কিন্তু একজন তেলেগু কবি তাঁহাকে প্রভুহীন গৃহে আগত কুকুরের সহিত তুলনা করায় তিনি লজ্জায় ফিরিয়া আসেন। এই কাহিনী এমনই অবাস্তব যে ইহার উপর কোনো আস্থা স্থাপন করা যায় না।

কবি কর্ণপূর ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে পরিণতবয়সে 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক লেখেন। নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবার জন্য কবি সপ্তম অঙ্কে রাজার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—'শুনিয়াছি যে সম্প্রতি গৌড় দেশ হইতে কোনো মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরম কারুণিক যতীন্দ্র আসিয়াছেন।' সার্বভৌম বলিলেন, 'তা ঠিক।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি ভাবে তিনি তাঁহার চরণবন্দনা করিবেন? গ্রীক নাটকের স্থানকালের ঐক্যনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া কবি কর্ণপূর রাজার সহিত সার্বভৌমের কথোপকথনের মধ্যেই দূত-মুখে সংবাদ শুনাইলেন কি ভাবে শ্রীচৈতন্য আলালনাথ হইতে কূর্মক্ষেত্র, তথা হইতে নৃসিংহক্ষেত্র, গোদাবরী-তীর,

ক্রমে ক্রমে সেতুবন্ধ এবং তথা হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করিয়াছেন। অষ্টম অঙ্কে দেখি সার্বভৌম অত্যন্ত সংকোচের সহিত শ্রীচৈতন্যকে বলিতেছেন যে ভূপাল শ্রীচরণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত, প্রভু যদি অনুমতি দেন তবে তাঁহাকে লইয়া আসেন। এই কথা শুনিয়াই শ্রীচৈতন্য কানে আঙুল দিয়া বলিলেন যে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তজনের পক্ষে বিষয়ী ব্যক্তি ও নারীকে দর্শন বিষভক্ষণের চেয়েও গর্হিত। তাহাতে সার্বভৌম বলিলেন যে এ কথা সত্য বটে, তবে রাজা জগন্নাথদেবের সেবক। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বলিলেন যদি এরূপ প্রস্তাব পুনরায় উঠানো হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এখানে দেখা যাইবে না, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। এদিকে রাজা ঠিক করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যদি তাঁহাকে না দেখা দেন তবে তিনি আর জীবনধারণ করিবেন না। সার্বভৌমের মুখ দেখিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি বলিলেন যে সেই দেব, যিনি অদর্শনীয় ও নীচকুলোৎপন্নদিগকে দেখা দিতেছেন; তিনি কি এই প্রতিজ্ঞা লইয়া অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যে একমাত্র আমাকে বর্জন করিয়া আর সকলকে কৃপা করিবেন। রাজার দুঃখ দেখিয়া এবং জীবনপরিত্যাগের সংকল্প শুনিয়া সার্বভৌম এক উপায় বাহির করিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন রথোৎসবে নৃত্যবিনোদজাত পরিশ্রম দূর করিবার জন্য নির্জন উপবনে বসিবেন, তখন যেন প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে সহসা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাজা তাহাতে রাজি হইলেন। তিনি তপস্বীর বেশে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক শ্রীচৈতন্যের পদযুগল আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্য তখনও আনন্দে নিমীলিত নেত্রে ছিলেন। তিনি ভাগবতের ১১।২।২ শ্লোক বারংবার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—'হে রাজন! ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলেও সর্বপ্রকারে মরণশীল কোন্ ব্যক্তি অমর-শ্রেষ্ঠদেবেও উপাস্য গোবিন্দের পাদপদ্ম ভজনা না করিবে?'

'প্রতাপরুদ্র-অনুগ্রহ' নামক এই অষ্টম অঙ্ককে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। তিনি কবি কর্ণপূর -লিখিত শ্রীচৈতন্যের উক্তি নামক নিষ্কিঞ্চনের বিষয়ীদর্শন এবং সাপের আকার দেখিলেও যেমন ভয় হয়, স্ত্রীলোক ও বিষয়ী দেখিলে সেইরূপ ভয় হওয়া উচিত— শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন। রাজার আক্ষেপমূলক শ্লোকটিও তুলিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী নূতন কয়েকটি কথাও সংযোজন করিয়াছেন; যেমন সার্বভৌম রাজাকে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করিতে বলিলেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে যে রাজা সার্বভৌমকে পত্র লিখিলেন যে তিনি যেন সকল ভক্তকে প্রভুর নিকট তাঁহার জন্য নিবেদন করিতে বলেন, কেননা প্রভুর কৃপা না পাইলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিবেন, ভিখারি হইয়া মৃত্যুবরণ করিবেন। সার্বভৌম সকলকে সেই পত্র দেখাইলেন। সকলে একত্র হইয়া প্রভুর নিকট 'ডেপুটেশনে' গেলেন। শ্রীচৈতন্য তাহাতেও বলিলেন যে তাঁহারা কি চান যে তিনি কটকে যাইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করেন? এরূপ করিলে পরমার্থ তো নষ্ট হইবেই, লোকেও নিন্দা করিবে এবং স্বরূপ দামোদর ভর্ৎসনা করিবেন। নিত্যানন্দও বলিলেন যে রাজার যেরূপ অনুরাগ তাহাতে তিনি দর্শন না পাইলে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যকে রাজার প্রাণরক্ষার জন্য এক বহির্বাস দিবার অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য তাহাতে রাজী হইলেন। প্রতাপরুদ্র 'প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন।' ইহার কিছু দিন পরে যখন রামানন্দ রায় দক্ষিণ হইতে আসিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যসন্দর্শনের

উপায় করিতে বলিলেন। রামানন্দও শ্রীচৈতন্যকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে রাজী করাইতে পারিলেন না। তিনি বহির্বাস প্রদানের অপেক্ষা আর-এক ধাপ আগাইয়া বলিলেন যে তিনি রাজার পুত্রকে দর্শন দিতে সম্মত আছেন। কিশোর বয়স্ক রাজপুত্র আসিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কৃষ্ণবোধে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আছে যে রথযাত্রার সময়ে রাজা নিজে সুবর্ণমার্জনী লইয়া পথ ঝাড়ু দিতেছেন দেখিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন। রাজাও হরিচন্দনের কাঁধে হাত দিয়া শ্রীচৈতন্যের নৃত্য দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। নাচিতে নাচিতে প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে ধরিলেন। তাঁহার স্পর্শে শ্রীচৈতন্যের মনে ধিক্কার জন্মিল। তাহা দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন, কিন্তু সার্বভৌম তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে পথ ঝাড়ু দেওয়া -রূপ হাড়ির কাজ করিতে দেখিয়া শ্রীচৈতন্য রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; তবে যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন তাহা লোককে বিষয়ী-সংসর্গ ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র। সার্বভৌম তাঁহাকে আরও বলিলেন যে তিনি সময়মত তাঁহাকে যখন জানাইবেন তখন যেন তিনি যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৌলিক রচনা। কবি কর্ণপূরে বা অন্য কোনো গ্রন্থে এসব কথা নাই। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তখনও পুরীতে যান নাই; সুতরাং তাঁহার কাছেও এত বিশদ বর্ণনা শুনিবার সম্ভাবনা অল্প। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আছে যে রাজা সার্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণববেশে প্রভুর পদ সংবাহন করিতে করিতে রাসলীলার (ভা° ১০৷৩১৷৯) 'তব কথামৃতং' শ্লোকটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও ঐ শ্লোকে কথিত 'ভূরিদা'— অর্থাৎ যাঁহারা কৃষ্ণকথা শোনান তাঁহারাই যথার্থই ভূরিদ বা প্রচুর দানকারী— শব্দ আবিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সম্বিত লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি, আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া উপকার করিলে?' রাজা বলিলেন তিনি তাঁহার দাসের দাস। 'তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল', এই ঐশ্বর্য বলিতে মুরারির নামে প্রচলিত গ্রন্থের ৪৷১৬৷২০ শ্লোকের ষড়্ভুজ কিম্বা জয়ানন্দ-বর্ণিত (পৃ. ১০০) অষ্টভুজ বা অন্য কিছু তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন নাই। তিনি মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের লিখিত প্রথম চৈতন্যাষ্টকের সপ্তম শ্লোকটি ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের রথাগ্রে নর্তনের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু উহারই তৃতীয় শ্লোকে যে আছে 'হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি— কৃপোৎসেক-তরলঃ' তাহার কোনো উল্লেখ করেন নাই। বলদেব বিদ্যাভূষণ উহার টীকায় লিখিয়াছেন— গজপতি উৎকলাধীশে যে 'কৃপোৎসেকঃ কারুণ্যধারায়াভিষেচনং তত্র তরলঃ সত্বরঃ।' 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও 'শব্দকল্পদ্রুম' মতে তরল মানে চল এবং চল মানে চঞ্চল (অমরকোষ)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তরল শব্দের অর্থে অধীর বিহ্বল আত্মহারা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা পড়িলে কিন্তু মনে হয় শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিতে বিন্দুমাত্র ত্বরান্বিত বা অধীর হন নাই। বরং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে যে আছে জগন্নাথের আদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্য পুরীতে প্রথম পৌঁছিবার পরপরই কটকে গিয়াছিলেন, তাহা রূপগোস্বামীর বর্ণনার সমর্থক।

বিভিন্ন চরিতকারদের বর্ণনা হইতে ১৫১০, ১৫১২ এবং ১৫১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্রকে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছিলেন পাওয়া গেলেও উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব নহে। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপরুদ্র জয়ানন্দের বর্ণনা অনুসারে দেখাই পাইয়াছিলেন, ভক্ত হন নাই। জীবদেব বলেন যে রাজার দার্শনিক

মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, কিন্তু আচরণে বৈষ্ণবতা আসে নাই বলিয়াই বোধ হয়। কবি কর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য রাজাকে দেখা দিয়াছিলেন বা ঐশ্বর্য দেখাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বৃন্দাবন দাসের মতন এমন কথা শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া রাজাকে বলান নাই যে তুমি নিরন্তর কৃষ্ণসংকীর্তন কর এবং 'কৃষ্ণকার্য বিনে তুমি না করিহ আর' (চৈঃ ভা° ৩।৫)। মুরারি ও লোচনের মতে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পরে—কত পরে তাহা তাঁহারা লেখেন নাই, হয়তো ১৫১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দে—শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে সংসারজ্বালা হইতে উদ্ধার করেন। ঐ সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণের রাজ্য হারাইয়াছেন, তাঁহার প্রিয়পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রিয়কন্যাকে চিরবৈরীর হস্তে সম্প্রদান করিতে হইয়াছে। এমন বিপদের সময়ে তাঁহার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের পূর্ণতম কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করা স্বাভাবিক। আর ঐ সময়ে যদি শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনদাসোক্ত উপদেশ তাঁহাকে দিয়া থাকেন তাহা হইলেও কিছু অবাস্তবতা দোষ স্পর্শে না। প্রতাপরুদ্র তাহার পর আর কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। কিন্তু অশোক যেমন কলিঙ্গজয়ের পরে আর কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হয়তো প্রতাপরুদ্রও প্রকৃত বৈষ্ণবতা গ্রহণ করিবার পর আর যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও যেমন অশোকের জীবনকালে সাম্রাজ্য অটুট ছিল, প্রতাপরুদ্রের অবশিষ্ট রাজ্যও তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে তেমনই অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীচৈতন্যের কৃপা প্রাপ্তির ফলে উৎকলের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল বলা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। যদি ধরা যায় যে ১৫১২ খ্রীস্টাব্দেই তিনি কৃপা পাইয়াছিলেন তাহা হইলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তিনি ১৫১৩ হইতে ১৫১৫ পর্যন্ত যুদ্ধকার্যে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখান নাই। কৃষ্ণদেব রায়ের মতন অপূর্ব প্রতিভাশালী বীরের বিরুদ্ধে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। দক্ষিণে বাহমনীরাজের ভগ্নাংশগুলি ও পূর্বের হুসেন শাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছিল। যদি বলা যায় যে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব না হইলে উৎকলের সাম্রাজ্য হীনবল হইত না, তাহার উত্তরে বলা যায় যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজারা শ্রীচৈতন্যের ধর্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা কেহই কি মুসলমান-অধিকার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন? সেইজন্য হিন্দুদের রাজনৈতিক অধঃপতনের জন্য বৈষ্ণবধর্মকে দায়ী করা সংগত নহে।

রাজগুরু জীবদেব নয়টি অঙ্কে বিভক্ত 'ভক্তি-বৈভব' নামে একখানি নাটকে লিখিয়াছেন যে পুরুষোত্তমদেবের দোল-উৎসব উপলক্ষে নানাদিগন্ত হইতে আগত ভক্তবৃন্দের সামনে অভিনয় করিবার জন্য তিনি ঐ নাটক রচনা করিয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন যে উৎকলে শৈব পাশুপত তথাগত মত বা বৌদ্ধধর্ম এবং কৌলিক বা তান্ত্রিক মত নিরস্ত হইয়াছে ও কৃষ্ণের শুদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সরোজপুষ্পতুলসীমালাসমা লালিতাঃ পুণ্যানামিব রাশয়ঃ সমুদিতা দৃষ্টা ময়া বৈষ্ণবাঃ'। অন্য একটি শ্লোকে তিনি তাঁহাদিগকে 'সর্বে ভক্তিমতাবতার পুরুষা বিদ্যাকলা সন্ততাঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, pp. 275-277)। কিন্তু শ্যামানন্দ ও রসিকমুরারির জীবনী পড়িলে মনে হয় যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব উৎকলের গ্রামাঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিস্তৃত হয় নাই। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকলের জনসাধারণ শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য রসিকমুরারির প্রচারের ফলে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

কোম্পানি-যুগে বাংলা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোম্পানি-যুগের বাংলা নামেই প্রদেশ, আসলে একটা গোটা দেশের সামিল ছিল। তার আয়তন সংকুচিত করে চেহারা পালটানো হল প্রথম অঙ্গচ্ছেদের সময়, ১৯০৫ সালে। সেই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন এবং দেশব্যাপী উন্মাদনার কালে যাঁরা কিশোর বা তরুণ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা আজও জীবিত, তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন 'সোনার বাংলা'র জন্মকথা। দ্বিখণ্ডিত বাংলার হৃদয়ে যে গভীর দুঃখ ও অপমান বেজেছিল সেদিন, তা রবীন্দ্রনাথের কলমে ও কণ্ঠে উৎসারিত হয়েছিল এবং স্বদেশী গানের ভাণ্ডার এক বিশেষ সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিল। শুধু দুটি গানের উল্লেখ করি। 'রাখীবন্ধন' দিনটিকে উপলক্ষ্য করে যে গানের প্রয়োজন ও রচনা, তা হল 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। আর টাউন হল'এ বিরাট জনসভায় গাওয়ার জন্য তৈরী হল— 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

ইতিহাসের যে বিশিষ্ট পটভূমিকায় সোনার বাংলা কথাটির সৃষ্টি এবং ঐ শব্দ-বিধৃত ধারণার উৎপত্তি, তা এখন রাষ্ট্র-ইতিহাসে বড় হরফে ছাপা কিন্তু মনের মধ্যে প্রায় ধূসর স্মৃতি। শুধু নামটুকু টিঁকে ছিল বহুদিন পরেও পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত একটি সাময়িক পত্রিকার নামকরণে। যদিও এ নামের তাৎপর্য বর্তমানে বিশেষ কিছু নেই। তার মধ্যে সোনাই বা কতটুকু আর বাংলাই বা কোথায়— তা নিয়ে গবেষণা করা চলে, তবু কবির আঁকা সেই বাক্‌প্রতিমা আর কল্পিত মূর্তি অনেক বয়স্ক মানুষের মনেই অতৃপ্তির বেদনা জাগিয়ে তোলে। দুই বাংলাকে জোড় দেওয়া হল ১৯১১ সালে, কিন্তু তার পর? রাজনৈতিক গণ্ডগোলে ভূগোল গেল তলিয়ে। আবার বাংলা দুভাগ হল ছত্রিশ বছর পরে, রাষ্ট্র-দাবি আর সাম্প্রদায়িক অশান্তির অবসান -কল্পে। সংঘর্ষের মুখ্য কারণ অপসৃত হয়েছে নিশ্চয়ই। রাজনৈতিক প্রচার বা অপপ্রচারের কথা ছেড়ে দিই। কিন্তু যে সাংস্কৃতিক তথা মানবিক বিচ্ছেদের দুঃখ জাগল, সেটি গেল না, থেকে গেল। যেহেতু রাজনৈতিক ভূগোল আর সীমান্ত-রেখার চেয়ে আরও বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র।

কিন্তু ওসব কথা থাক্। কোম্পানি-আমলের বাংলার কথা বলতে গেলে গোটা বাংলার পুরো ছবিটাই মনে আসে এবং তার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতির কিছু বর্ণনা করতে হয়। কেননা, বাংলাতেই কুঠিয়াল থেকে শাসকগোষ্ঠীরূপে ইংরেজের প্রথম প্রবেশ। বাংলাকেই কেন্দ্র করে ক্রমশ পশ্চিমে কাশী ও উত্তর-পশ্চিমে অযোধ্যা রোহিলা মারাঠা রাজ্য, তার পর দিল্লী ও পঞ্জাব পর্যন্ত কোম্পানির এক এক পর্বে শক্তি বিস্তার ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। আর, বাংলাদেশ তখন অবিভক্তই ছিল না, আয়তনে ও মর্যাদায় ছিল কোম্পানির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিহার ও উড়িষ্যা শাসন এবং রাজস্ব -ব্যবস্থায় বাংলার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। বিষয়টির পরিধি এবং কাল-পরিমাণের গুরুত্ব কম নয়। প্রায় এক শো বছর। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করলে সিপাহী-বিদ্রোহে এসে থামতে হয়। কোম্পানি-যুগের অবসান ঘটল ১৮৫৮ সালে লিখিত-পড়িত ভাবে। তার পর, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ভারতশাসনের দায়িত্বভার সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অর্থাৎ ইংরেজ রাজ-সরকারের হাতে ন্যস্ত হল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের

ক্রমোন্নতি স্বীকার করেও বলতে হয় যে রাজ-প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ এলাকা ও নজর-ভুক্ত বাংলার গৌরব তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি ; বরং ভারত-স্বাধীনতা সংস্কৃতি-সাধনার মর্মস্থল বলে বাংলার তথা কলকাতার মর্যাদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

পলাশী থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস'এর শাসনকালের আরম্ভ, মাঝের এই পনেরো বছর হল অন্তবর্তীকাল। এটিকে ঠিক পুরোপুরি কোম্পানি-আমল বলা চলে না। কারণ, রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থার দিক থেকে এটা হল দোটানার মধ্যে এক রকম অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার যুগ। এই সময়ে কোম্পানির স্বার্থবৃদ্ধি ও শক্তিবিস্তারে ক্লাইভের কূটনৈতিক ভূমিকা সুপরিচিত। সিরাজের পরাজয় এবং নিধনের পর এল প্রথম পর্ব— মীর জাফরের মসনদ প্রাপ্তি। তার পর দ্বিতীয় পর্ব— মীর কাশিমের উত্থান। কোম্পানির সঙ্গে তাঁর শক্তিপরীক্ষার পালা শুরু। অবশেষে বক্সারের যুদ্ধে মেজর মনরোর কাছে হল শোচনীয় পরাজয়। এর পর তৃতীয় পর্বের সূচনা— মীর জাফরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সে পর্বের সমাপ্তি ঘটল নাজিমুদ্দৌলা-কর্তৃক সন্ধিপত্র মারফত কোম্পানির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল— এই আট বছরে তিন-তিনটি রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেল, যার ফলাফল প্রায় বৈপ্লবিক বলা যায়।

ঐ বছরই সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে যে পাকাকাকি বন্দোবস্ত হল, তার ফলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পেলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। নবাবের কাছ থেকে নিজামত বা দেশ-শাসন আর মুঘলরাজের নিকট থেকে দেওয়ানী বা রাজস্ব-আদায়ের অধিকার হস্তগত হলে কোম্পানির স্বার্থ ও শক্তি কায়েম হল। নবাব অতঃপর হয়ে দাঁড়ালেন বৃত্তিধারী। আর, নায়েব-নাজিম দু জন প্রকৃত-প্রস্তাবে হয়ে উঠলেন কোম্পানি-বাহাদুরের বশংবদ। অইনতঃ ও আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশ গভর্নরের অধীনে এল। তবে ক্লাইভের এই দায়িত্বহীন দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় যে গলদ ছিল তা অ-শাসন বা কু-শাসনের নামান্তর। এতে কোনও পক্ষেরই গরজ ছিল না। প্রকৃত কর্তৃপক্ষ হলেন কোম্পানি-রাজ। কিন্তু ইংরেজ টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। রাজস্ব-সংগ্রহই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, দেশ-শাসনের কাজ গৌণ। আর পরাশ্রিত নবাব নামতঃ দেশের সরকার, কার্যতঃ অলস ও অকর্মণ্য বৃত্তিভোগী।

১৭৭২ পর্যন্ত এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা চলতে থাকে। ক্লাইভ চলে যাওয়ার পর মাঝের এই পাঁচ বছর ছিল পরম দুর্যোগের কাল। বাংলার অবস্থা তখন সত্যিই শোচনীয়। দায়িত্বহীন চালনায় দ্বৈত-শাসন ক্রমেই অকেজো হয়ে উঠল, অনাচার ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে লাগল। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহু লোকের প্রাণনাশ হল, বাংলায় হাহাকার উঠল। কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের ঔদাসীন্য, অত্যাচারী ইজারাদারের অর্থলোভ ও নির্মম শোষণ, আর শাসনযন্ত্রের বিকলতার জন্য এই দুর্ভিক্ষ যে আকার ধারণ করল, তা ভয়াবহ। ঐ অরাজকতা ও মন্বন্তরের কিছু ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' পাওয়া যাবে।

হেস্টিংস যখন সরকারী কার্যভার হাতে নিলেন, তখন কোম্পানির ঘোর দুরবস্থা। ক্লাইভের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি ও অসংগতিগুলো দূর করতে তাঁকে যথেষ্ট সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী নিয়ে আসা, রাজস্ব বোর্ড স্থাপন, কালেক্টরি প্রচলন, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা, আইন সংস্কার এবং পাঁচশালা বন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রণয়ন করার ফলে কোম্পানি-শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব স্বীকৃত হল। তবে বেশি খাজনা পাওয়ার আশায় পাঁচ বছরের জন্য যে ভূমি-

ব্যবস্থার প্রচলন হয়, তাতে পুরাতন জমিদারদের অধঃপতন, সুবিধা ও মুনাফা -লোভী নতুন ইজারাদার-দলের আবির্ভাব আর ইংরেজ কর্মচারীদের অনভিজ্ঞ তত্ত্বাবধান শুরু হয়। অবশ্য, এতে যে কোম্পানির তরফে লাভের অংশের চেয়ে লোকসানই বেশি, হেস্টিংস সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ও তাঁর কার্যাবলীর যে সমালোচনা হয়েছিল, তা ইতিহাসেই পাওয়া যাবে। তাঁর দীর্ঘ বিচার এই কথাই প্রমাণ করে যে ভারতে কোম্পানি-সরকারের পরিচালনায় নানা গলদ ও দুর্নীতি ছিল। বাংলায় বসে তিনি কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেন এবং কোম্পানি-আমলের শাসনভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে যান। ১৭৮৫ সালে হেস্টিংস ফিরে গেলেন দেশে। তার পর এলেন কর্নওয়ালিস, যাঁর শাসন-সংস্কার এবং ভূমি-সম্পর্কিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন এই কারণে যে, বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা অনেক দিন ধরে কর্নওয়ালিসী প্রথার সঙ্গে আবদ্ধ ছিল। তারই ফলে আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রায় দেড় শো বছর কাল বাংলার সমাজ ও শ্রেণী -বিন্যাস প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে এসেছে এবং একটা বিশেষ ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র গঠন করে রেখেছে। তার মূল শিকড় মাটির বেশ গভীরে, তাই এখনও একেবারে উৎপাটিত হয় নি। মুখ্যতঃ কোম্পানির স্বার্থচিন্তা, স্থায়ী ও নিশ্চিত আয়ের ভাবনা, আর গৌণতঃ জমিদারকুলের নিরাপত্তা-চিন্তা— এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি। এই নীতির বহু সমালোচনা হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু বললে চলবে যে এই বন্দোবস্তের ফলে এক দিকে কোম্পানির অনুগ্রহ-পুষ্ট এবং ইংরেজ শাসনের সমর্থক জমিদারবর্গের অভ্যুদয়, অপর দিকে জমিরক্ষায় আগ্রহশীল এক স্বতন্ত্র পরিশ্রমী কৃষকশ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রজাস্বার্থ রক্ষিত হল না। তাদের কথা চিন্তার মধ্যে আসে নি। ভূম্যধিকারী আর রায়তদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল না। যা সৃষ্টি হল বাংলায় তা পুরনো অভিজাত শ্রেণীর বদলে একটি নকল সামন্ত সমাজ। এঁরা গ্রামাঞ্চলের জমিদারী ছেড়ে, তাঁদের আয় ও জীবিকার মূল সেই ভূমিসম্পর্ক ত্যাগ করে হলেন শহরবাসী। ফলে, কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও, ক্রমশঃ ইংরেজগোষ্ঠীর আনুকূল্যে এক ধরণের পরাশ্রয়ী অলস সমাজের উৎপত্তি হল। মধ্যস্বত্ব চাষী গৃহস্থের কিছু উন্নতি হল বটে কিন্তু সাধারণ কৃষকশ্রেণীর কোনও অবস্থান্তর ঘটে নি। তাদের দৈন্যদশার লাঘবও হয় নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা বাড়তে থাকে। এবং চাষীদের উপর উৎপীড়ন বেড়েছিল বলেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইণ্ডিগো কমিশন, বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্টের প্রয়োজন হয়।

কোম্পানি-আমলে গ্রাম-বাংলার কথা আগে বলি। মফস্বল বা পল্লী -অঞ্চলের চেহারা বিশেষ বদলায় নি ঐ এক শো বছরের মধ্যে। শহর-অঞ্চলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ, যতদিন না রেল স্টীমার ও ডাকঘরের প্রবর্তন হয়। কলকাতার জন-সংখ্যা বাড়ি-ঘর ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে কলকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে কিছু কিছু নাগরিক -জীবন ও -সভ্যতার আভাস এসে যায়। পৌর জীবনের চালচলন সেখানকার জীবন-মানে কিছু পরিবর্তন আনতে থাকে, এ কথা ঠিক। কিন্তু মোটা-মুটিভাবে বলা যায়, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির, আচার-ব্যবহার জীবনধারা সমাজ-বন্ধন কিংবা আর্থিক ব্যবস্থার, তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য রূপান্তর লক্ষিত হয় না। বাঙালীর পূজা-পার্বণ ব্রত-সংস্কার নিত্যকর্মপদ্ধতি লৌকিকতা মেলামেশা খাওয়া-নেওয়া বেশভূষার ধরন-ধারন মোটামুটি আগের মতই

চলতে থাকে। এগুলো ছিল একই রকমের, যদিও স্থান-বিশেষে প্রকার-ভেদ ছিল। নাগরিক জীবনে যতই নতুনত্ব বা রদ-বদল হোক, গ্রাম-সমাজ ও আঞ্চলিক জীবনযাত্রায় তেমন কোনও তারতম্য চোখে পড়ে না। কারণ বাঙালী সমাজ ও জীবনের মর্মস্থলে গ্রামীণ সংস্কৃতির চিহ্ন ও প্রভাব আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও যে বিলুপ্ত হয় নি, তা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

বাংলার রাজনৈতিক চেহারা বদলেছে ঠিকই, কিন্তু জলস্থলের ভূগোল কি পালটানো গেছে? কোম্পানির আমলে যা ছিল, এখন পর্যন্ত তাই তো রয়েছে দেখা যায়। এক দিকে গঙ্গার পশ্চিম অববাহিকা ভাগীরথী, অপর দিকে পূর্ব-পাকিস্তানে পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, আর মাঝখানে আত্রাই মহানন্দা তিস্তা ও করতোয়া বাংলার মাটিকে যেমন একদা গড়ে তুলেছিল, কোম্পানির আমলেও সেই গঠন ও লালনের ধারা অব্যাহত ছিল। অবশ্য নদ-নদীর পুরানো খাত মাঝে-মাঝে বদলেছে। কেউ বা পাশ ফিরে শুয়েছে, কেউ বা নতুন বাঁক নিয়ে স্রোতের ধারা পালটেছে। কোনও নদী মজে গিয়েছে, কোথাও জনপূর্ণ স্থলাঞ্চল জলের নীচে তলিয়েছে, কোথাও বা নতুন চর ও ডাঙা জেগে উঠেছে। কিন্তু এসব প্রাকৃতিক পরিবর্তন তো অনিবার্য।

সামাজিক জীবনে বাংলাভাষী সবাই বাঙালী বলেই পরিচিত ছিল। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য আর হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যগামী রক্ষণশীলতা — এ দুটি বৈশিষ্ট্য ছিলই, যদিও সে পার্থক্যটা ছিল ধর্মবিশ্বাসে এবং আপন-আপন আচারে-সংস্কারে। এতৎসত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করে এসেছে বরাবর সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, একই বিদেশী শাসনের অধীনে। লেখাপড়ায় ইংরেজি শিক্ষায়, বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনেকটাই এগিয়ে যায় এবং মুসলমান সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়ে। তার একটা কারণ অন্ততঃ এই যে, মুসলিমদের দাবিয়ে রেখে হিন্দু ভদ্রলোক -শ্রেণীকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দিলে— প্রভুনিষ্ঠ, অসির বদলে মসীজীবী— একটি সহায়-গোষ্ঠী তৈরী হয়ে উঠবে, যাদের উপর খানিকটা নির্ভর করা চলবে শাসন-নীতির সমর্থক হিসেবে। অবশ্য সে আশা সফল হয় নি এবং ১৮৫৮ সালের দশ-পনেরো বছর আগেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদল এবং নব্য শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী নীতিগুলির সমালোচনা করতে পশ্চাৎপদ হন নি। সে যাই হোক, বিলেত থেকে তখনও 'কম্যুনাল হার্মনি' কথাটার আমদানি হয় নি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের পথও ছিল কম। তাই বোধ হয় কোম্পানি-আমলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটুকু দুর্লভ হয় নি।

ধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামি ছিল নিশ্চয়ই; ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতাও ছিল। কিন্তু মনে হয়, দ্বন্দ্বটা ছিল দলগত, শ্রেণীগত। ভূস্বামী ও অনুচরবর্গের সঙ্গে রায়তের, পাওনাদারের সঙ্গে দেনাদারের। উচ্চশ্রেণী বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতা থাকলেও নিম্নস্তরের মানুষ, চাষী গৃহস্থ ও শ্রমজীবীদের ভিতর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তখনও জন্মায় নি। মীর জাফর নাকি কিরীটেশ্বরীর পূতবারি পান করেন, মুসলমান ওমরাহরা হিন্দু জ্যোতিষীদের উপর আস্থাবান ছিলেন, অভিজাতবর্গের কেউ কেউ হিন্দুদের দোল-পার্বণে আবীর-কুঙ্কুম নিয়ে খেলতেন। আবার কোনও কোনও হিন্দু জমিদার মহরম পরবে যোগদান করতেন, তাজিয়া বার করতেন। এসব নিছক গল্প-কথা নয়। তুর্ক-আফগান ও মুঘল-যুগে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের যে প্রথম ধারা লক্ষ্য করা যায়, তার সম্পূর্ণ অবলোপ ঘটে নি কোম্পানির-আমলেও। অবশ্য, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের চাপে বাংলার সাধারণ সমাজ ধর্মনির্বিশেষে উন্নত বা শিক্ষিত ছিল

না। বোল্‌টস, স্ক্রাফটন প্রভৃতি বিদেশী আগন্তুক হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আঠারো শতকে সারা ভারতেই তো ঐ এক অবস্থা। বাল্যবিবাহ কৌলীন্যপ্রথা বহুবিবাহ সতীদাহ—এসব হিন্দু কুপ্রথার দূরীকরণ হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, রাজা রামমোহন-বেণ্টিঙ্কের আমলে।

কিন্তু পুরনো কাগজপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে যে এ সময়েও সতীদাহ নরবলি চড়কপূজার কিছু-কিছু বীভৎস ঘটনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৮২৮ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে হাওড়া থেকে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা গেজেটে। 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদককে লেখা যে চিঠিখানা গেজেটে ছাপা হয় তা থেকে জানা যায়, ৫ই এপ্রিল তারিখে বালেশ্বর জেলার এক যুবতী বিধবা সালকিয়াতে সহমৃতা হচ্ছেন। বর্ণনাটি দীর্ঘ, তথ্যবহুল! পড়ে মনে হয়, এ নির্মম প্রথার নিন্দাবাদ করেও দর্শক ঐ রমণীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অবিচলিত স্থৈর্যের নমুনা দেখে অভিভূত না হয়ে পারেন নি। ১৮২৯ সালের ২রা জুলাই তারিখে আর-একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা গেজেটে। খবরটি নরবলি সম্পর্কে। কলকাতার অনতিদূরে হুগলী জেলার এক গ্রামাঞ্চলে, সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরের দরজা খুলে একদিন দেখা গেল, মহিষ ও ছাগলের সঙ্গে একটি ছিন্নমুণ্ড নরদেহ। এ ছাড়া, জাল-জুয়াচুরি ভণ্ডামি নানা রকমের প্রতারণার নমুনা সে কালের দেশী সংবাদপত্রে, যথা—সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-তিমিরনাশক, মার্তণ্ড প্রভৃতি কাগজ থেকে উদ্ধার করা যায়। চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার মশাই নাচগান-খানাপিনায় বেহিসাবী খরচপত্র করে শেষকালে নোট জাল আরম্ভ করেন এবং ১৮২৯ সালে মার্চ মাসে তাঁর বিচার হয়। জুরি ও অনেক গণ্যমান্যদের শাস্তি লাঘবের প্রার্থনা সত্ত্বেও, প্রধানবিচারপতি ন্যায়ের খাতিরে তাঁকে সাত বছরের জন্য প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ দ্বীপে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন। এ তো গেল বড়ঘরের কথা। জন-সধারণের মধ্যেও দুর্নীতি ও কদভ্যাসের কিছু-কিছু পরিচয় দেশী ও ইংরেজি খবরের কাগজে প্রকাশিত হত। যেমন পগেয়াপটিতে জনৈক শেঠজীর সঙ্গে এক পাণ্ডেজীর তুমুল-ঝগড়া পাঁঠা-কাটা নিয়ে, শেষকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং শেঠজীর অপঘাত মৃত্যু।

১৮২৮ থেকে ১৮৩২, এই কয় বছরের ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত সংবাদগুলির সংকলন-গ্রন্থ থেকে এ যুগের মোটামুটি নাগরিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। এক দিকে টিরেটা কলিঙ্গা মলঙ্গা চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি ঘটনা, বৌবাজার শিয়ালদা বৈঠকখানা জানবাজারে লোকের ভিড় এবং চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় ঐসব জায়গায় হার ছিনিয়ে নেওয়া, মাকড়িসুদ্ধ কান কাটা, কম ওজন আর চড়া দরে জিনিস বিক্রী করার খবর যেমন পাই, তেমনি শিক্ষিত সমাজের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা, সভা-অনুষ্ঠান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রচনার নমুনা, বিতর্ক আবৃত্তি, বড়লাটের উপস্থিতিতে নাটক-অভিনয় ও পুরস্কার-বিতরণ, ডিরোজিও সাহেবের সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা, রামদুলাল দে'র ছেলের বিয়েতে চার-পাঁচ দিনব্যাপী ভোজসভার বিপুল আয়োজন, শোভাবাজার রাজবাটিতে বিবিধ অনুষ্ঠান, মুসলমান ধনী আগা মহম্মদ সাহেবের নতুন স্ট্র্যাণ্ড রোড নির্মাণে বিশ হাজার টাকা দান, কলকাতা মাছের বাজার সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে মুনাফাখোর হালদারদের শোষণে গরীব জেলে-শিকারীদের দুরবস্থা—ইত্যাদি নানা টুকরো খবর থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে কোম্পানি-আমলের এই পর্বে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক শো চল্লিশ বছর আগে, মনুষ্য-চরিত্র

একই প্রকার ছিল। শুভ এবং অশুভ বুদ্ধি দুয়েরই প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙালী সমাজে। পৌর জীবন আর পল্লীজীবন -ধারা মোটের উপর স্বনির্দিষ্ট পথেই প্রবাহিত হত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাব কোম্পানি-আমলেই ধরা পড়ে, বিশেষ করে কলকাতায়— যেখানে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রচলন। রাজা রামমোহন রায় এই নতুন যুগের পুরোধা। কিন্তু ১৮১৫ সালে তিনি কলকাতায় এসে বসবাস করবার কিছু আগে থেকেই নবচেতনার সূত্রপাত। আঠারো শতকের শেষ দশ-পনেরো বছরে আগামী পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সে যাই হোক, ধর্ম ও সমাজ, এ দুটি বিভাগে যেসব অনাচার ও কদভ্যাস পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল তার সংস্কার সাধনের চেষ্টা উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই শুরু। এর পরে এল শিক্ষার প্রসার ও বাংলা ভাষার চর্চা, মূলতঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপর ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ।

এতে প্রথম দিকে বাংলা ব্যাকরণ, তার পর ভাষার ক্রমোন্নতি, এবং শেষ দিকে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত নতুন ভাবনার বাহন হয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা মান নির্ণয় সম্ভব হল। এই প্রসঙ্গে বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজি-শিক্ষিত নতুন দলের উদ্যম ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন নিয়ে দ্বন্দ্ব, প্রতীচ্যের প্রতি ডিরোজিয়ানদের আগ্রহ, ইয়ংবেঙ্গল'এর উগ্র ইংরেজিপনা, মধ্যপন্থী সংস্কারকদের স্বতন্ত্র কর্মনীতি, শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া, আর বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি থেকে শুরু করে হিন্দু ভদ্রসমাজে কোম্পানির আমলে নতুন চাকুরিজীবীর উদ্ভব এবং ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মর্যাদা-বৃদ্ধি— এসব তথ্য বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস যাঁরা পড়েন, তাঁরা জানেন। কোম্পানির শাসনকালে পাশ্চাত্য প্রভাবের সংঘাতে যে নতুন যুগের সূচনা ও ভারত-চেতনার উদ্বোধন, স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠা, নানামুখী জ্ঞান-অন্বেষণের চেষ্টা— এ সবই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, অর্থাৎ ১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের সময় থেকে শেষ সনদের পরমায়ু পর্যন্ত। এই সূত্রে বলা দরকার যে এ যুগে জনমত-গঠনের চেষ্টায় দেশী সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিগ্‌দর্শন সমাচার-দর্পণ ও বেঙ্গল গেজেট থেকে সোমপ্রকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার তালিকা করলে দেখা যাবে, ঐ চল্লিশ বছরে প্রায় চল্লিশখানি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যাদের মাধ্যমে সমাজ-চেতনা এবং সাহিত্য-অনুশীলন স্ফুরিত হতে পেরেছিল।

অবশ্য, এসব কর্ম-তৎপরতাই পৌর সভ্যতা বা নাগরিক সংস্কৃতির এলাকায় পড়ে। কিন্তু ঐ ইংরেজি কেতার পাশাপাশি ছিল দিশী বাবুয়ানি, কবিয়ালের দল, যাত্রা হাফ-আখড়াই, ঘুড়ি ও পায়রা ওড়ানো এবং বুলবুলির লড়াই। এগুলির অধিকাংশই সমাজের অপরিচ্ছন্ন দিক। গ্রাম অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব যেহেতু পৌঁছয় নি, সেই হেতু পল্লীগ্রামের সব মানুষ সভ্যতা-বর্জিত ও নিরক্ষর ছিল— এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে। সেকালে মক্তব চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। হিন্দুরা যেমন ফার্সী পড়ত, কোনও কোনও মুসলমান ছাত্র তেমনি সংস্কৃতচর্চাও করত, সরকারী রিপোর্টে সে কথার উল্লেখ আছে। তবে এটা সত্য যে ইংরেজি শিক্ষার উপর বেশি ঝোঁক পড়ায় দেশী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই কারণেই উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও পোষণের চেষ্টা দেখা দেয়। বাংলার লোকশিল্প লোকসাহিত্যের পুনরুদ্ধারে চিন্তাশীল বাঙালী সমাজ যত্নবান্ হয়। কলকাতা-কালচারের সূত্রপাত হলে নদীয়া মুর্শিদাবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি নবাবী আমলের শহরগুলি যেমন

হৃতগৌরব হয়ে যায়, কোম্পানি-আমলে তেমনি আবার ঐসব জায়গায় আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নগুলি বজায় রাখার জন্য চেষ্টাও চলতে থাকে। পুববাংলায়, বিশেষ করে ফরিদপুর-ঢাকায় কোটালপাড়া-বিক্রমপুর পরগনায় এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্পকলা সংগীত ও স্থানীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

আর-একটি কথা। কলকাতা শহর এ যুগে যতই শিক্ষিত মার্জিত হয়ে উঠুক, কোম্পানি-আমলে বাংলার মস্তিষ্ক না হোক, হৃৎপিণ্ড ছিল ঐ 'হিনটারল্যাণ্ড' অর্থাৎ মফস্বল ও পল্লী অঞ্চল। এবং সেখানে সবাই কিছু সরল মূর্খ বাস করত না। জাঁহাবাজ জমিদার, ধড়িবাজ নায়েব তো ছিলেনই, শাস্ত্র-আওড়ানো কূট-কৌশলী 'ভিলেজ বিসমার্ক' এবং মিথ্যে মামলার নিপুণ তদ্‌বির-কার 'কাগজ সরকারে'রও দেখা পাওয়া যেত।

শান্তিনিকেতনস্থিত রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্ররচনার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই-সকল পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থাতিরিক্ত অনেক অংশ, মুদ্রিত রচনার সহিত বহু পাঠভেদ, লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো শব্দ বা ছত্র বারংবার পরিবর্তন করিয়া কবি কিভাবে শেষ পাঠে উপনীত হইয়াছেন তাহার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে এই-সকল পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রবর্তিত রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্প হইতে বর্তমানে এই-সকল পাণ্ডুলিপির বিবরণ প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে 'পুষ্পাঞ্জলি' 'নলিনী' ও 'পূরবী' ইতঃপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ (১৩৭৫) ও কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। অন্য একটি বিবরণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

শিশু

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-১১৫

'শিশু' রচনার খসড়া-খাতা॥ উল্টা দিকে বাংলা শব্দদ্বৈত-সংগ্রহ

রচনাকাল (তারিখ আনুমানিক): ৪।৫ শ্রাবণ - ৫।৬ ভাদ্র ১৩১০/২০।২১ জুলাই - ২২।২৩ অগস্ট্ ১৯০৩।
স্থান: আলমোড়া।
বিবরণ: লাল মলাটের রুল-টানা খাতা (২০·৫ × ১৬·২ সে.মি.)[১]। শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী -নামাঙ্কিত। '৩১শে ভাদ্র ১৩১৬' তারিখে কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উপহৃত। অতঃপর প্রত্যেক পাতা সত্যেন্দ্রনাথের নাম-ঠিকানার রবার-স্ট্যাম্পে চিহ্নিত।
বর্তমান আকার-প্রকার: ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্ -কর্তৃক সংরক্ষণোপযোগী বাঁধাই। প্রত্যেক আলগা পাতা 'কাচ'-কাগজে আবৃত।[১] বোর্ড্ ও নীল চামড়ার মলাট। মোটের উপর মাপ: ২২ × ১৯ × ২ সেন্টিমিটার।
লেখা: রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে / পেন্সিলে।
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৮৪। গোড়ার ১ খানি পাতা (২ পৃষ্ঠা) খোওয়া গিয়াছে মনে হয়।
শিশুর কবিতা: পৃ ১-৭৫।
শব্দদ্বৈত-সংগ্রহ: পৃ ৮৪-৭৮ (খাতা উল্টাইয়া লেখা / কদাচিৎ কালীতে সংযোজন-সংশোধন)।
পৃ ৭৭ রচনারিক্ত। পৃ ৭৬ রবীন্দ্ররচনারিক্ত, পেন্সিলে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা: "শিশু" নামক কাব্য-গ্রন্থের এই পাণ্ডুলিপিখানি পূজনীয় শ্রীযুক্ত / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে আজ দান করিলেন। / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / ॥ ৩১শে ভাদ্র ১৩১৬ সাল ॥ /

---

১ নূতন ভাবে বাঁধাইয়ের পূর্বে প্রত্যেক পাতা কাটিয়া আলাদা করা হইয়াছে (জানুয়ারি ১৯৫৫); উহারই মাপ দেওয়া গেল।

দু'ধারে দুই পাড়ে ঘাসের কোলে
যত মানিক আনব ভারে ভারে!

দাদার জন্যে আনব মেঘে ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা বাছুর ঘোড়া!
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনকলতার চারা অনেকগুলি —
তোর তরে মা দেব কৌটো খুলি
সাত রাজার ধন মানিক একটি জোড়া

'শিশু' গ্রন্থের অন্তর্গত "দুঃখহারী" কবিতার পাণ্ডুলিপি চিত্র

রচনাপঞ্জী

প্রথমেই অধুনা পাণ্ডুলিপিতে-আরোপিত পৃষ্ঠাঙ্ক, পরে কবিতার ক্রমিক সংখ্যা—খাতায় (রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায়) যে সংখ্যা দেওয়া আছে সেটি নয় (শেষের দিকে এই সংখ্যা বসাইতেও ভুল করা হইয়াছে)— পরন্তু শিশু পর্যায়ের প্রথম যে কবিতাটি এ খাতায় পাওয়া যাইতেছে না সেটি হইতে গণনা করিলে পর পর যে সংখ্যা হয় তাহাই। কয়েকটি কবিতার শিরোনাম খাতায় আছে, সেরূপ একটি নামও পরে বদল করা হয়। রচনার স্থানকালের উল্লেখ পাণ্ডুলিপিতে নাই, অথচ সব কবিতাই আলমোড়ায় রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র সেনের মধ্যে এ সময়ে যে পত্রবিনিময় হয় তাহাতে অনেকগুলি কবিতার আনুমানিক রচনাকাল জানা যায়। (আলমোড়া ও কলিকাতা, ২ দিনের ব্যবধানে এক স্থানের চিঠি আর-এক স্থানে পৌঁছিত, ইহাই সচরাচর ঘটনা। অর্থাৎ ১লা শ্রাবণের চিঠি আলমোড়ায় ৪ঠা পৌঁছিয়াছে, ৫ই শ্রাবণে প্রেরিত কবিতা— খেলা, খোকা— মোহিতচন্দ্র ৮ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতায় পাইয়াছেন।) রবীন্দ্রনাথ কাগজের এক পিঠে চিঠি আর-এক পিঠে কোনো কবিতার শেষাংশ লিখিয়াছেন, এ ঘটনাও বিরল নয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ও মোহিতচন্দ্রের অনেকগুলি চিঠিতে রচনা-সম্পর্কিত অনেক ইঙ্গিত বা তথ্য আছে। পরবর্তী সংকলনে বর্তমান পাণ্ডুলিপি -বহির্ভূত সকল তথ্যই [ ] বন্ধনীমধ্যে দেখানো হইল। 'দ্র বা দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-পত্র' লেখায় বুঝিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের পত্রে কোনো-একটি কবিতা বা তাহার শেষাংশ পাওয়া যায়; পত্রের রবীন্দ্রনাথ-নির্দিষ্ট বা আমাদের অনুমিত তারিখটি নিয়ে যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। তাং—তারিখ। পৃ—পৃষ্ঠা। সং—সংখ্যা।

[সম্ভবতঃ খাতার প্রথম পাতায় ছিল :

১ খেলা / তোমার কটি-তটের ধটি রচনা : ৫ শ্রাবণ প্রকাশ : বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১০। পৃ ২৪৬]

পৃ ॥ সং	আলমোড়ায় রচনা : ১৩১০ শ্রাবণ / দ্র রবীন্দ্র-পত্র	রবীন্দ্র-পত্র তাং	মোহিত-পত্র তাং
১॥২	[খোকা] / খোকার চোখে যে ঘুম আসে / [৫ শ্রাবণ]		৮
৩॥৩	পরস্পর। [নির্লিপ্ত] / বাছারে মোর বাছা		[১০]
৪॥৪	[কেন মধুর] / রঙীন খেলেনা দিলে		[১০]
৫॥৫	[চাতুরী] / আমার খোকা করেগো যদি / [৭ শ্রাবণ]		[১০]
৭॥৬	[ঘুম-চোরা] / আমার খোকার ঘুম নিল কে[২]		
১০॥৭	[অপযশ] / বাছারে তোর চক্ষে কেন জল ?		
১১॥৮	[বিচার] / আমার খোকার কত যে দোষ		
১৩॥৯	[ছুটির দিনে] / ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে / [১৩ শ্রাবণ]	[১৩]	২১
১৬॥১০	[রাজার বাড়ি] / আমার রাজার বাড়ি কোথায়		২১
১৭॥১১	[মাঝি] / আমার যেতে ইচ্ছে করে / [১৫ শ্রাবণ]	১৫	২১
১৯॥১২	[সমব্যথী] / যদি তোমার খোকা না হয়ে		২১

২ পরপৃষ্ঠায় লেখা হয় এ কবিতার প্রথম স্তবক : কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া /

পৃ ॥ সং	আলমোড়ায় রচনা : ১৩১০ শ্রাবণ / দ্র রবীন্দ্র-পত্র	রবীন্দ্র-পত্র তাং	মোহিত-পত্র তাং
২১॥১৩	[প্রশ্ন] / মাগো আমায় ছুটি দিতে বল		২১
২২॥১৪	[মাস্টার-বাবু] / জানো আমি মাষ্টার মশায় / [১৬ শ্রাবণ]		১৯ ও ২১
২৪॥১৫	[বিচিত্র সাধ] / আমি যখন পাঠশালাতে যাই		২১
২৬॥১৬	[মাতৃবৎসল] / মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে		২১
২৮॥১৭	[লুকোচুরি] / আমি যদি দুষ্টুমি করে		২১
৩০॥১৮	[নৌকাযাত্রা] / মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা		২১
৩২॥১৯	[বিজ্ঞ] / খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা / [১৮ শ্রাবণ]	[১৮ ?]	২১
৩৩॥২০	[খোকার রাজ্য] / খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে		
৩৫॥২১	[ভিতরে ও বাহিরে] / খোকা থাকে জগৎমায়ের		
৩৯॥২২	[ব্যাকুল] / অমন করে কেন আছিস্ মাগো / [২৩ শ্রাবণ]	২৩	[২৭ ?] ২৬
৪১॥২৩	[বৈজ্ঞানিক] / যেম্নি মাগো গুরু ২ মেঘের পেলে সাড়া		[২৭ ? ২৬]
৪৩॥২৪	জ্যোতিষশাস্ত্র । / আমি শুধু বলেছিলেম		[২৭ ? ২৬]
৪৪॥২৫	[সমালোচক] / বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে		[২৭ ? ২৬]
৪৭॥২৬	[ছোটোবড়ো] / এখনো ত বড় হইনি আমি / [২৮ শ্রাবণ]	২৮	৩২
৫০॥২৭	[বনবাস] / বাবা যদি রামের মত পাঠায় আমায় বনে		
৫৩॥২৮	[বীরপুরুষ] / মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে		
৫৭॥২৯	[দুঃখহারী] / মনে কর তুমি থাকবে ঘরে / [৩০ শ্রাবণ ?]	[৩০]	
৫৯॥৩০	[বিদায়] / তবে আমি যাই তবে গো যাই / [৩১ শ্রাবণ]	৩১	
৬১॥৩১	[জন্মকথা] / খোকা মাকে শুধায় ডেকে / [৩২ শ্রাবণ ?]	[৩২]	
	রচনা : ১৩১০ ভাদ্র / দ্র রবীন্দ্র-পত্র		
৬৩॥৩২	অস্তসখী / রজনী একাদশী পোহায় ধীরে ধীরে / [১ ভাদ্র ?]	[১]	
৬৫॥৩৩	[বিচ্ছেদ] / বাগানে ঐ দুটো গাছে		
৬৬॥৩৪	[উপহার] / স্নেহউপহার এনে দিতে চাই		
৭০॥৩৫	পরিচয় । / একটি মেয়ে আছে জানি	[৬]	
৭৩॥৩৬	/ জগৎ পারাবারের তীরে / [৬ ভাদ্র]	[৬]	

তথ্যপঞ্জী

শিশু '২ আশ্বিন ১৩১০' তারিখ লইয়া মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তমভাগরূপে প্রথম প্রচারিত। কবিতাগুলি রচনার সমকালে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র উভয়ের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়, তাহাতেই রচনাসম্পর্কিত বহু তথ্য পাওয়া যায়, কবিতার তালিকা-ধৃত ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অতঃপর উহারই সারাংশ সংকলন করা যাইতেছে। মূল পত্রগুলি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত (রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত)— তাহারই সাহায্যে এই সংকলন প্রস্তুত করা হইয়াছে। শিশুর কবিতাগুলি লিখিবার পূর্বের ঘটনাও কিছু বলা দরকার— ১৩০৯ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী দেহত্যাগ করেন; '৫ই ফাল্গুন ১৩০৯' তারিখের চিঠিতে জানা যায় কবির 'মেজমেয়ে পীড়িত'; রেণুকা মীরা শমীন্দ্রনাথকে লইয়া চৈত্রের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগে উপনীত হন; হাজারিবাগে অভীপ্সিত ফললাভ না হওয়ায়, মীরা ও শমীন্দ্রকে কলিকাতায় মেজবৌঠানের কাছে রাখিয়া, রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আসেন সম্ভবতঃ ২৫ বৈশাখ ১৩১০ তারিখে; কাব্যগ্রন্থ- সম্পাদন ও মুদ্রণের কাজ পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে মোহিতচন্দ্র কিছুকাল (সম্ভবতঃ ৬-২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) আলমোড়ায় কাটাইয়া যান; ইহারও অনেক পরে এক শুক্রবারে [১লা শ্রাবণ ১৩১০ তারিখে] মোহিতচন্দ্র লেখেন রবীন্দ্রনাথকে : 'একটা suggestion করবার আছে। কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করবার সময় কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় সেগুলি এই সংস্করণেই সন্নিবিষ্ট করা ভাল, নইলে গ্রন্থাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর পর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী থেকে বালক বালিকাদের উপযুক্ত কবিতাগুলি সঙ্কলিত করিলে চলে।... আমার বইয়ে [১৩০৩ আশ্বিনের কাব্যগ্রন্থাবলীতে] "children" বলে যে কটা কবিতা নির্দ্দিষ্ট ছিল তা আজ দেখ্‌লাম— আমার মনে হয় "শিশু" বা "শৈশব" নাম দিয়ে একটা শ্রেণী করলে হয়— তার একটী ভূমিকা আপনাকে লিখে দিতে হবে।' ইত্যাদি। অতঃপর মোহিতচন্দ্র, ফুলের ইতিহাস, শীত, ঘুম, স্নেহময়ী, মধ্যাহ্ন, পোড়োবাড়ী, অভিমানিনী, উপকথা, সাতভাইচম্পা, হাসিরাশি, আকুল আহ্বান, মঙ্গল-গীতি, পাখীর পালক, আশীর্ব্বাদ, আত্মঅপমান, ক্ষুদ্র আমি, প্রার্থনা, নিষ্ফল উপহার, বিম্ববতী, বর্ষশেষ, অভয় —এই কবিতাগুলি (প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাব্যগ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠার উল্লেখে) তালিকাবদ্ধ করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলমোড়ায় '৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে লেখেন :

'গ্রন্থাবলীর যে অংশে ছেলেদের কবিতা বেরবে তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে "কিশোর" বা "কুমার" নাম দেবেন।[৩] কারণ শিশু অতি ছোট— সব কবিতা ও নামে খাপ খাবে না। যে ক'টা কবিতা লোকালয়ে [১৩১০ কাব্যগ্রন্থে ১ম ভাগের ২য় খণ্ডে] বের হয়ে গেছে তা "কিশোরে" আবার দিলে ক্ষতি হবে না... গানের মধ্যেও এরকম পুনরাবৃত্তি হবে। বরং এজন্য ভূমিকায় মার্জ্জনা চেয়ে রাখলেই হবে। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটা "কিশোর" অংশে না দিলে সমস্তই অসম্পূর্ণ হবে। আমার তালিকা :—

ফুলের ইতিহাস	বিষ্টিপড়ে	বিসর্জ্জন (অনুবাদ) ৪৭১ পৃঃ
সাধ (প্রভাতসঙ্গীত)	সাতভাইচম্পা	সূর্য্য ও ফুল ঐ
ঘুম	হাসিরাশি	কাগজের নৌকা (মুকুল)

৩ পরে 'শিশু' নাম দেওয়াই ভালো মনে করেন। 'রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' অংশে দ্বিতীয় সংকলন দ্রষ্টব্য।

শীত	আকুল আহ্বান	শীতের বিদায় (বালক)[৪]
স্নেহময়ী	মঙ্গল-গীতি	পুরাতন বট
মধ্যাহ্ন	পাখীর পালক	নদী (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)
পোড়োবাড়ি	আশীর্ব্বাদ	খেলা (ক্ষণিকা)
অভিমানিনী	বিম্ববতী	সুখ দুঃখ (ঐ)
উপকথা	শৈশবসন্ধ্যা	ওগো নবীন অতিথি (গান)[৫]
কাঙালিনী	স্নেহস্মৃতি (প্রথম চার stanza চিত্রা)	

"কিশোর" খণ্ডের গোড়ার কবিতাটা [প্রবেশক / মোহিতচন্দ্র বলিয়াছেন 'ভূমিকা'] লিখে পাঠাব। "কিশোর" কোন্ জায়গায় বসবে ?··· ইতি ৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০

আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পুঃ সূর্য্য ও ফুলে একটা ভুল আছে, ওর প্রথম লাইনেই আছে "মহীয়সী মহিমা"। মহিমা ক্লীবলিঙ্গ। অতএব··· সুমহৎ করে' দেবেন।'[৬]

রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' প্রসঙ্গে একটির বেশি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন এ চিঠিতে তাহার কোনো আভাসই নাই। এক দিকে সাংঘাতিক ক্ষয়রোগে পীড়িতা কন্যার সেবা যত্ন, বহু দুশ্চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, অন্য দিকে আশ্রমবিদ্যালয়ের ভাবনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব[৭], অন্যান্য পুত্রকন্যাদের সম্পর্কেও উদ্‌বেগ —এরূপ অবস্থায় নূতন কবিতাগুচ্ছ-রচনার কোনোরূপ প্রস্তাব করা হয় নাই আর হয়তো রবীন্দ্রনাথও আদৌ ভাবেন নাই। অথচ গোড়ার একটি কবিতা লিখিতে গিয়াই অনেকগুলি নূতন কবিতার সূত্রপাত হইল, কবির ভাবনা কল্পনা সম্পূর্ণ নূতন পথে ধাবিত হইল, তাহার ইতিহাস যেমন আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ-মোহিতচন্দ্রের এই সময়ের পত্রাবলীতে বিধৃত রহিয়াছে। একটি কথা মনে রাখা দরকার —আলোচ্য পাণ্ডুলিপি শিশুর সবগুলি নূতন কবিতার (যাহা পাওয়া গিয়াছে, ভ্রষ্ট প্রথম কবিতা বাদে) অনন্য খসড়া খাতা, সুতরাং যে পারম্পর্যে কবিতাগুলি খাতায় দেখা যায়, রচনার পারম্পর্যও তাহাই হইবে। অর্থাৎ, চিঠিপত্রের প্রমাণে যদি দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অথবা নবম ও একাদশ কবিতার রচনাকাল জানা যায় তবে অন্তর্বর্তী তৃতীয়-চতুর্থ অথবা দশম কবিতার কালনির্ণয় একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব হয় না। অন্তর্বর্তী কবিতার রচনা যে অন্তর্বর্তীকালে তাহা নিশ্চিত।

---

৪ বালক মাসিক পত্রের ১২৯২ বৈশাখে, পৃ ৫৬, 'ফুলের ঘা' শিরোনামে মুদ্রিত।

৫ শেষ ৩টি ব্যতীত অন্য কবিতাগুলি (শিরোনাম) এক সারিতে অর্থাৎ প্রথম সারিতে লেখা। তালিকা-সংকলনে সন্নিবেশের পারম্পর্য নির্দেশ করা হইয়াছে এরূপ মনে হয় না।

৬ সম্পাদকের পরামর্শে 'পরিপূর্ণ মহিমা' করা হয়।

৭ এ বিষয়ে সব সময় অবহিত ছিলেন, নিয়মিত রচনাও জোগাইয়াছেন। বিশেষতঃ ১৩১০ বৈশাখে নৌকাডুবি উপন্যাস শুরু হয়, উহার ধারাবাহিকতা যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে সে চিন্তাও ছিল ; মোহিতচন্দ্রকে ৪ বৈশাখের চিঠিতেই লিখিতেছেন : 'যখনই একটু সুবিধা বোধ করি "নৌকাডুবি" লিখ্‌তে হয়— ভয় হয় পাছে কখন্ অক্ষম হয়ে পড়ি তখন "নৌকাডুবি" নামটাই সার্থক হবে। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত লেখা সারা হয়েছে। আজ যদি সময় পাই পৌষ আরম্ভ করব। চৈত্র পর্য্যন্ত লিখে রাখ্‌লে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।'

অতঃপর বিশেষ বিশেষ কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্রের পত্রাবলীতে কোন্ কোন্ তথ্য পাওয়া যায় তাহা খতাইয়া দেখা যাক্। (মোহিতচন্দ্রের মোট ১২খানি চিঠি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ; ইহার মধ্যে চতুর্থ হইতে একাদশ সংখ্যায়, ১লা শ্রাবণ হইতে ৩২শে শ্রাবণের মধ্যে, 'শিশু'-সংকলনের নানা প্রসঙ্গ আছে।)—

কবিতা-সং

১,২ ৪ঠা শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'গোড়ার কবিতাটা লিখে পাঠাব।' ৫ই শ্রাবণে ছুটি কবিতা পাঠাইয়া থাকিবেন ইহা মোহিতচন্দ্রের পঞ্চম পত্রে (৮ শ্রাবণ ১৩১০) জানা যায় : 'পুঃ এইমাত্র আপনার কবিতা ছুটি পেলাম। গোড়ার কবিতাটি [খেলা] ভারি সুন্দর লাগ্‌ল।'

৩-৫ রবিবার দিনে [আমাদের অনুমান ১০ই শ্রাবণে] মোহিতচন্দ্র লিখিতেছেন ষষ্ঠ পত্রে : 'শিশু বিষয়ক ৫টি কবিতাই পাইয়াছি।··· একটির ত নাম দেবার দরকার নেই—যেটি গোড়ার কবিতা— আর একটির নাম "খোকা" আপনিই দিয়েছেন— সুতরাং আমি যে তিনটি রইল তার নাম "নির্লিপ্ত", "শৈশব চাতুরী", "কেন মধুর?" রাখিলাম!' তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রথম কবিতাটি প্রবেশক না হওয়ায় পরে কোনো সময় উহারও নামকরণ হয়, সহজেই বুঝা যাইতেছে। ১০ই শ্রাবণ তৃতীয়-পঞ্চমের প্রাপ্তি-স্বীকার হইতেছে, অতএব আলমোড়া হইতে ৭ই শ্রাবণের পরে প্রেরিত হয় নাই, রচনা ৫ই হইতে ৭ই শ্রাবণের মধ্যে। পরবর্তী পত্রে (রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিতে তারিখ নাই। প্রসঙ্গসূত্রেই এখানি মোহিতচন্দ্রের ১০ই শ্রাবণের চিঠির জবাব বলিয়া বুঝা যায়, অতএব ১৩ তারিখে লেখা ধরা যাইতে পারে) কবি লেখেন : '"শৈশব-চাতুরী" নামের "শৈশব"টা বাদ দিলেও চলে। বাকি নামগুলি স্বীকার করে নিলুম।'

৯ রবীন্দ্রনাথের যে চিঠির একটি বাক্য এইমাত্র উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহারই অপর পিঠে লেখা আছে 'ছুটির দিনে' কবিতার শেষাংশ। এ চিঠি ও কবিতার নকল ১৩ই শ্রাবণ লিখিত মনে করার কী কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে।

১১ '১৫ই শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'নামকরণের ভার আপনার উপর। কতগুলো নতুন কবিতা পেলেন? বোধহয় সবসুদ্ধ গোটাদশেক হবে। আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়চে।' এই চিঠির অপর পিঠেই 'মাঝি' কবিতার শেষাংশ লেখা, এটিকে ধরিলে সবসুদ্ধ 'গোটাদশেক' নয়— এগারোটি কবিতা হইতেছে।

দেখা যাইতেছে— রবীন্দ্রনাথ এক অথবা একাধিক কবিতা (লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) নকল করিয়া পাঠাইতেছেন বারে বারে। নকলের শেষে সাদা পৃষ্ঠা থাকিলে তাহাতেই চিঠিও লিখিয়াছেন। এইভাবে যেমন নবম ও একাদশ সংখ্যার শেষ ছত্রগুলি পাওয়া গেল, তেমনি ঊনবিংশ দ্বাবিংশ ষড়্‌বিংশ ও ত্রিংশ কবিতারও শেষাংশ বিভিন্ন চিঠির পিঠোপিঠি পাওয়া যায়।

১৪ রবীন্দ্রসদন-সংরক্ষিত সপ্তম পত্রে (১৯শে শ্রাবণ ১৩১০) মোহিতচন্দ্র বলিয়াছেন : 'শিশুখণ্ডে সবে মাত্র ১৪টি নূতন কবিতা পেয়েছি। আরো অনেকগুলি চাই। যে ভূতে আপনাকে শিশু রাজ্যে

টেনে নিয়ে গিয়েছে তাকে ধন্যবাদ দিই।' মোহিতচন্দ্র '৪ঠা অগষ্ট' বা ১৯শে শ্রাবণ তারিখে চতুর্দশ কবিতা যদি পাইয়া থাকেন, কবি উহা নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন ১৬ই শ্রাবণ তারিখে।

৯-১৯ মোহিতচন্দ্র অষ্টম পত্রে '২১এ শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে লেখেন: 'শিশু খণ্ডে সবশুদ্ধ ১৯টি নূতন কবিতা পেলাম। প্রথমটি ভাদ্রমাসের বঙ্গদর্শনে বেরিয়ে গেছে— আমার তত ইচ্ছা ছিল না, শৈলেশের পেড়াপীড়ি।[৮]… ইদানিং যে কবিতাগুলি পেয়েছি সবগুলির নামকরণ হয় নি।' অতঃপর 'রাজার বাড়ি' 'মাষ্টারবাবু' 'প্রশ্ন' 'অনুযোগ' [সমব্যথী] 'মাঝি' 'মাতৃবৎসল' 'লুকোচুরি' ও 'বিজ্ঞ' এই আট নাম দেন আটটি কবিতার, অপিচ লেখেন: ' "মধু মাঝির ঐ যে নৌকাখানা" আর "ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে"— এ দুটির নাম ['নৌকাযাত্রা' ও 'ছুটির দিনে'] এখনও দেওয়া হয় নাই।' সুতরাং ২১শে শ্রাবণের এই চিঠিতে তালিকা-ধৃত নবম - উনবিংশ সবগুলি কবিতার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এ চিঠি হইতে ইহাও অনুমান করা যায় উনবিংশতি সংখ্যার কবিতাটি ১৮ই শ্রাবণে পাঠানো হইয়া থাকিবে, নহিলে ২১শে শ্রাবণ কলিকাতায় পৌঁছিত না।

১৯ যে এক-পৃষ্ঠা চিঠির অপর পিঠে, এই কবিতার শেষাংশ লেখা তাহার তারিখ— '৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০' লেখার ভুল সন্দেহ নাই। (৪ঠা তারিখে বোধ করি নব পর্যায়ের প্রথম কবিতাও লেখা হয় নাই। ৪ঠা শ্রাবণের চিঠি পূর্বেই পর্যালোচিত হইয়াছে।) ৪ঠা অগস্ট্ হওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু চিঠির ভিতরে আছে 'আজ সোমবার'— সোমবার ছিল ৩রা অগস্ট্ / ১৮ই শ্রাবণ। এ তারিখই যথার্থ মনে হয়; রবীন্দ্রনাথ ১৮ই শ্রাবণ চিঠি ও কবিতা পাঠাইয়াছেন আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মোহিতচন্দ্র সবিস্তারে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ২১শে শ্রাবণ তারিখে।

২২ 'ব্যাকুল' কবিতার শেষাংশ কাগজের যে পিঠে লেখা তাহার অপর পিঠে '২৩শে শ্রাবণ ১৩১০' তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'এই ত ২২টা হল। কিন্তু শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তাহলে শুকিয়ে মারা যাবে— এরা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিষ— হাটবাটের জিনিষ নয়।… বঙ্গদর্শনকে ভুলবেন না। বিদ্যালয়কে স্মরণে রাখ্‌বেন। গ্রন্থাবলীকেও অবহেলা করবেন না। আমাকেও চিঠিপত্র লিখ্‌বেন। এ সমস্ত করে যদি সময় পান তবে ঘরের কাজে এবং বাইরের কাজে মন দেবেন।'

মোহিতচন্দ্রের '২৬এ' (২৭?) শ্রাবণ তারিখে লেখা পত্র (সংখ্যা ১০) ঐ চিঠির জবাব মনে হয়: 'আপনি আমার কর্ত্তব্য যে পর্য্যায়ে লিখে দিয়েছেন তার শেষের কোটা থেকেই কাজ

---

৮ রবীন্দ্রনাথ '১৭ই শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে লেখেন: 'নামকরণ করে দেবেন। স্থানকরণও আপনার কর্ত্তব্য। আমার কাজ আমি করেছি। এ কবিতাগুলি কোনো মাসিক পত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে— শৈলেশকে এই কথাগুলি আপনি বুঝিয়ে বলবেন। বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে, অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়। ছেলেদের হাতে যে পুতুল দেব আগে থাকতেই যদি তার রং উঠে কাপড় ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায় তবে সে কি সঙ্গত হবে?'

আরম্ভ করে দিলাম।... শিশু খণ্ডের কবিতাগুলিকে গোপন করবার জন্যে শৈলেশকে লিখে দিয়েছি' ইত্যাদি। মোহিতচন্দ্রের এই চিঠিতেই আছে: 'আপনার চিঠিগুলো আমি একটু দেরিতে পাচ্ছি।'

২৩-২৫ মোহিতচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিরই শেষাংশে আছে: 'আজ যে তিনটি কবিতা এল তারা বড় ছোট, তাদের নামকরণ দুদিন পরে করব।' 'চিঠিগুলো... দেরিতে পাচ্ছি' বলায় সন্দেহ হয়, রবীন্দ্রনাথের ২৩শে শ্রাবণের চিঠি ('ব্যাকুল' কবিতা-সহ) হয়তো ২৭শে শ্রাবণ তারিখেই পাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ২৪শে শ্রাবণে (?) অনুলিপিকৃত ও প্রেরিত 'তিনটি কবিতা'ও পাইয়াছেন অ-বিলম্বে— সে কবিতা হইল তালিকা-ধৃত ২৩-২৫ সংখ্যা। এই সময়ে লিখিত/প্রেরিত অন্য এমন 'তিনটি' কবিতা নাই যাহাদের ছোটো বা 'বড় ছোট' বলা যায়। চতুর্বিংশ সংখ্যার 'জ্যোতিষশাস্ত্র' শিরোনাম খসড়া পাণ্ডুলিপিতে/গ্রন্থে থাকিলেও প্রেরিত নকলে ছিল কিনা বলা যায় না।

২৬ রবীন্দ্রনাথের এক পৃষ্ঠার যে চিঠিতে '২৮শে শ্রাবণ ১৩১০' তারিখ, তাহারই অপর পিঠে 'ছোটোবড়ো' কবিতার শেষ দুইটি স্তবক। পত্র-ধৃত সর্বশেষ স্তবক কাব্যগ্রন্থে বর্জিত; কেননা, মোহিতচন্দ্র '৩২এ শ্রাবণ'[৯] তারিখের চিঠিতে (সংখ্যা ১১) 'শিশু খণ্ডে নূতন কবিতা ত এখন ২৬টি হল' এই প্রাপ্তিস্বীকারের পরে এবং 'খোকার রাজ্য' 'ভিতরে ও বাহিরে' 'ব্যাকুল' 'ফুল ফোটার ইতিহাস বা শিশুর বিজ্ঞান'[১০] ও 'ছোট বড়' (যথাক্রমে তালিকা-ধৃত সংখ্যা ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৬) এই কয়টি নামকরণেরও পরে লিখিয়াছেন: 'এই শেষের কবিতাটিতে গুরু মহাশয় ও দিদিমা সম্বন্ধে যে উক্তি দুটি আছে— সে দুটি মনে হচ্ছে না থাকলেও চলে— খোকার "বাবার মত বড়" হওয়াই সাজে, "জ্যাঠার মত বড়" হলে কি তেমন হয়?' এই চিঠির জবাবেই বৃহস্পতিবার [৩রা ভাদ্র ১৩১০ তারিখে] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া পাঠান: '"ছোট বড়" কবিতায় গুরুমহাশয় ও দিদিমা সংক্রান্ত দুটো শ্লোক [স্তবক] পরিত্যাগ করবেন।' গুরুমহাশয় সংক্রান্ত 'শ্লোক' (কবিতার দ্বিতীয় স্তবক) দেখা যায় শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করা হয় নাই।

২৯ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহই একটি-দুটি কবিতা লিখিতেছেন/নকল করিয়া পাঠাইতেছেন, চিঠিও লিখিতেছেন (ধরিয়া লওয়া যায় এক দিনে একখানির বেশি নয়), পাণ্ডুলিপি ও পত্রাবলীর পর্যালোচনায় ইহাই মনের চোখে প্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। তাহা যদি হয়, ২৮শে ২৯শে ও ৩১শে শ্রাবণের তারিখযুক্ত চিঠির অবকাশে দুই পৃষ্ঠার যে চিঠির সূচনা হইল 'ও পাতায় কবিতাটা কপি করতে করতে ঘুমে ঢুলছিলেম', তারিখ না থাকিলেও ধরিয়া লওয়া যায় তাহার তারিখ ৩০শে শ্রাবণ এবং এ চিঠির সঙ্গে ছিল একটিই কবিতা: দুঃখহারী (সংখ্যা ২৯)। মোহিতচন্দ্রের '২৬এ [২৭?] শ্রাবণ' তারিখের যে চিঠির বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে (২২-সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে), তাহাতে আছে: 'আমার বালক কালের পড়াশুনা অতীতকে নিয়েই ছিল... বৃদ্ধ যেমন অতীতের কাহিনী নিয়েই পড়ে থাকে'।

---

৯ মোহিতচন্দ্র ২৮শে শ্রাবণের চিঠি ও কবিতা ৩১শে শ্রাবণ তারিখে পান নাই? অথবা পাইলেও নানাভাবে বিব্রত থাকায় (মোহিতচন্দ্রের চিঠিতে যে কথা আছে) একদিন পরে উত্তর দিতেছেন?

১০ রবীন্দ্রনাথ ৩রা ভাদ্রের চিঠিতে লেখেন: 'শুধু "বিজ্ঞান" নাম দিলেই হয়।' পরে কোনো সময় 'বৈজ্ঞানিক' হইয়া থাকিবে।

ঐ চিঠি ২৬।২৭ যে তারিখেরই হউক, রবীন্দ্রনাথের বর্তমান চিঠিতে সেই প্রসঙ্গেই আছে : 'আপনি ছেলেবেলায় অতীতের মধ্যে ছিলেন' ইত্যাদি।

৩০ একখানি কাগজের যে পিঠে এই কবিতার শেষাংশ, তাহারই অপর পিঠে '৩১শে শ্রাবণ ১৩১০' তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'বাস্ আর নয়!··· ঠিক যেন একটা গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার মত— একটা তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই। বিদায় কবিতায় সেই তলা পাওয়া গেল— এখন আমি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারব। এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়! শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্ব্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম কিন্তু এমন বরাবর চলে না'। ইত্যাদি।

৩১ রবীন্দ্রনাথের বেতারিখ চিঠিতে পাই : 'এই কবিতাটিকেই শিশু খণ্ডের ভূমিকায় কবিতা করলে কি রকম হয়?' এটিকে ৩২শে শ্রাবণের চিঠি মনে হয় এবং উল্লিখিত কবিতাও মনে হয় 'জন্মকথা' (সংখ্যা ৩১)।

৩২ রবীন্দ্রনাথের বেতারিখ একখানি চিঠি মনে হয় ১লা ভাদ্রে লেখা, কেননা ইহাতে 'অস্তসখী' (সংখ্যা ৩২) কবিতার প্রসঙ্গ আছে আর ইহার পরে একখানি কার্ড্ও পাওয়া গিয়াছে যাহা ২রা ভাদ্র[১১] তারিখে লেখা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী ৩রা ভাদ্রে[১২] যে চিঠি লেখেন তাহাতে 'ছোটো বড়ো' (সংখ্যা ২৬) কবিতা সংশোধনের প্রসঙ্গ আছে তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে।

৩৫, ৩৬ রবীন্দ্রনাথ রবিবার [৬ ভাদ্র ১৩১০ তারিখে] আলমোড়া হইতে লিখিতেছেন : 'কাল কলিকাতায় যাত্রা করব— আজ আলমোড়া প্রবাসের শেষ দিনে শিশু খণ্ডের কবিতা শেষ করলেম— এইবার বোধ হচ্চে পজিটিভ্লি দি লাষ্ট্! এই কাগজটায় যে নামহীন কবিতাটা লিখে দিলেম সেইটেই বোধহয় শিশুখণ্ডের সূচনাস্বরূপে ব্যবহার হতে পারে। "তোমার কটি তটের ঘটি" [তালিকা-ধৃত সংখ্যা ২] ঠিক সূচনার মত নয়।···/ "পরিচয়" কবিতাটা কড়ি ও কোমল থেকে মেজে ঘষে বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া গেল। ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা শোধরাবার জন্যে অনেক লড়াই করা গেছে— বোধ হয় জয়লাভ করেছি। / সবসুদ্ধ ৩৭টা হল··· ইতি রবিবার'

তালিকা-ধৃত ৩৬ সংখ্যাই শিরোনামহীন প্রবেশক ও শিশু পর্যায়ের শেষ রচনা সন্দেহ নাই।

'পরিচয়' (সংখ্যা ৩৫) পূর্বদিনের রচনা হওয়াই সম্ভব। ৩৩-৩৫ সংখ্যায় উল্লিখিত কবিতাগুলি কড়ি ও কোমলের তিনটি কবিতা হইতে এভাবে সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া লেখা হয়, যে, এগুলিকে নূতন রচনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

উদ্ধৃত পত্রের শেষে, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কবিতার সংখ্যা-গণনায় ভুল করিয়াছেন। ভুল করিবার কারণও হয়তো আছে। পাণ্ডুলিপি-ধৃত কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে সংখ্যা বসাইয়াছেন পেন্সিলে। পাণ্ডুলিপিতে আমাদের তালিকা-ধৃত প্রথম কবিতাটি নাই ইহা পূর্বে বলা

১১ রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাই শুধু 'বুধবার' এবং 'আগামী সোমবারে এখান [আলমোড়া] হইতে বাহির হইব'। চিঠি শনিবারে কলিকাতায় পৌঁছিলে ছাপ পড়িয়াছে (এটি পড়া যায়) ২২শে আগস্টের, ঐ দিন ৫ই ভাদ্র— সবই হিসাবমত বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে লইয়া ৭ই ভাদ্র ১৩১০ তারিখে আলমোড়া ত্যাগ করেন।

১২ তারিখ নাই, 'বৃহস্পতিবার' লেখা আছে, 'যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত' এবং বিব্রত— তাহারও সরস বর্ণনা আছে।

হইয়াছে ; যেগুলি আছে তাহাতে অবিচ্ছেদ ১-২৯ সংখ্যা বসাইবার পরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমেই তাহার অনুবৃত্তি করা হয় ৩১-৩৬ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৫ই শ্রাবণে 'মাঝি' কবিতার নকল পাঠাইয়া চিঠিতে লিখিয়াছেন 'সবসুদ্ধ গোটা দশেক হবে'— উক্ত কবিতায় (পাণ্ডুলিপিতে) ঐ সংখ্যাই আছে সত্য। অথচ ২৩শে শ্রাবণে 'ব্যাকুল' কবিতার নকলের পিঠোপিঠি লিখিতেছেন 'এই ত ২২টা হল'— এক্ষেত্রে ঐ কবিতার শীর্ষে (পাণ্ডুলিপিতে) '২১' সংখ্যা লেখা থাকিলেও, প্রথম যে কবিতা পাণ্ডুলিপি হইতে স্খলিত তাহার সংখ্যা যোগ করিয়াই '২২' করিয়াছেন মনে হয়। মনে হয় অনুরূপ ভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত শেষ কবিতায় '৩৬' সংখ্যা থাকায় ('৩৫' থাকাই উচিত ছিল) এক যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন নূতন কবিতায় সংখ্যা হইল ৩৭।

অন্যান্য তথ্য

শিশু পাণ্ডুলিপির আধার-স্বরূপ যে খাতাখানি তাহার সম্পর্কে বাস্তব তথ্য কতকগুলি (সব তথ্য এই আলোচনার মুখপত্রে দেওয়া হয় নাই বা বিস্তারিত ভাবে দেওয়া যায় নাই) এ স্থলে সংকলনযোগ্য। খাতাখানি এ. সি. পাল এণ্ড্ কোম্পানির লাল (ভিতরে সবুজ) মলাটের রুল-টানা খাতা ছিল। সামনে ভিতরের মলাটে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী ; অপর দিকের ভিতরের মলাটে ছাপা আছে : 120 Pages। এই খাতার মলাটে (উপরে ও ভিতরে) 'শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী' 'নলিনী রায়' 'নলিনী' নামটি বারংবার থাকায় মনে হয়, এ খাতাখানি তাঁহারই ছিল। (নলিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথের পত্নী / নগেন্দ্রনাথ সপত্নীক ১৩০৯ চৈত্রে কবির সঙ্গে হাজারিবাগে ও পরে তথা হইতে আলমোড়ায় গিয়াছিলেন।) সামনে ভিতরের মলাটটিতে ক্লাস-রুটিনের যে ছক ছাপা আছে তাহাতে পাই রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের নাম, তাহা ছাড়া : 'নলিনী' [লেখিকা স্বয়ং] / 'রাজলক্ষ্মী' [সম্পর্কে মৃণালিনী দেবীর 'পিসিমা'] / 'নগেন্দ্র' / 'সব্বার নাম।' হাতের লেখা কাঁচা।

খাতায় মূলতঃ ১২০ পৃষ্ঠা ছিল, এখন মাত্র ৮৪ পৃষ্ঠা থাকায়, মূল খাতার ৩৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্ট / বর্জিত সন্দেহ নাই। এখনকার প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই কিছুদূর পর্যন্ত কালীতে কাঁচা হাতের লেখায় 13 14 প্রভৃতি ইংরাজি অঙ্ক (লেখার ভুলও আছে), ঐ লেখাতেই '39'-অঙ্কিত পৃষ্ঠার পরে 51-অঙ্কিত পৃষ্ঠাটি (বর্তমানে সপ্তবিংশ পৃষ্ঠা) পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুই স্থলে, বর্তমান প্রথম পৃষ্ঠার পূর্বে / ষড়্‌বিংশ সপ্তবিংশ পৃষ্ঠার মধ্যে, মূল খাতার বারো-বারো মোট চব্বিশ পৃষ্ঠা ছিল অনুমান করা যায়। সে যাহা হউক, এখনকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই শিয়রের দিকে কাঁচা হাতে যেমন কালীতে 13 সংখ্যাটি আছে, আর-একটি সংখ্যা আছে লাল পেন্সিলে পাকা হাতে : ৩/ এ লেখা রবীন্দ্রনাথেরই হইতে পারে। এমনও হইতে পারে— ইহার অব্যবহিত পূর্বে একখানি পাতা এইভাবেই দুই পিঠে ১ ও ২ অঙ্কে চিহ্নিত ছিল এবং সেই পাতায় (দুই পৃষ্ঠায়) শিশু পর্যায়ের প্রথম কবিতাটি লেখা হইয়াছিল : তোমার কটিতটের ধটি ইত্যাদি। লক্ষ্য করিতে হইবে 'খেলা' ও 'খোকা' (প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা / সংকলিত তালিকায় সংখ্যা ১ ও ২) কবিতা দুইটি যেমন ছন্দে তেমনি স্তবক ও ছত্র-সংখ্যায় অভিন্ন ; দ্বিতীয় কবিতা সমুদয় কাটাকুটি-সমেত এক পাতা / দুই পৃষ্ঠা -পরিমিত— মনে হয় প্রথম কবিতাও তাহাই ছিল।

পৃ ৫৩। এ পৃষ্ঠায় 'বীর পুরুষ' (মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে ইত্যাদি) কবিতার সূচনা। দক্ষিণোর্ধ্ব কোণে পেন্সিলে একটি পাশ-ফিরানো মুখের (পুরুষ) রেখাচিত্র আছে।

পৃ ৬৩। The Nabob by Daudet / Miss Jewet's Tales / Ideas of Good & Evil / by W. B. Yeats / এই তিনখানি বইয়ের নাম পৃষ্ঠার শিয়রে।

পৃ ৬৮। কপাল-টুকনি: ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী।

পৃ ৮৪-৭৮। (রবীন্দ্রনাথ খাতার উল্টো দিক হইতে লিখিয়াছেন বলিয়াই, আরোপিত পৃষ্ঠাঙ্কগুলির উল্টো চাল) বাংলা শব্দদ্বৈতের সংকলন। শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী-১২) বাংলা শব্দদ্বৈত (১৩০৭), ধ্বন্যাত্মক শব্দ (১৩০৭), ভাষার ইঙ্গিত (১৩১১) তিনটি প্রবন্ধে যে-জাতীয় শব্দ লইয়া নানা দিক হইতে আলোচনা, তাহারই বহুশত উদাহরণ মাত্র এই কয় পৃষ্ঠায় সংকলিত। এই সংকলনে তৎসম তদ্ভব এবং খাঁটি বাংলা শব্দ সবই আছে। বর্ণনানুক্রমে বা কোনোরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজানো হয় নাই।

পাঠপঞ্জী

পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ (কতকগুলি কবিতার রবীন্দ্রপত্র-ধৃত শেষাংশের পাঠ), সপ্তমভাগ কাব্যগ্রন্থের পাঠ (১৩১০) এবং পরবর্তী বা প্রচলিত পাঠ[১৩], এগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে দ্বিতীয় (কাব্যগ্রন্থ) বা তৃতীয় (প্রচলিত) হইতে প্রথম (পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রপত্র-ধৃত) পাঠের বিশেষ পার্থক্য যেগুলি, পরে সংকলন করা যাইতেছে। কাব্যগ্রন্থের পাঠ প্রচলিত পাঠ হইতে পৃথক হইলে তাহারও দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেওয়া যায়। সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠ উদ্ধৃত না করিলেও চলিবে। রচনার পারম্পর্যে, তালিকা-ধৃত ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে, পাণ্ডুলিপি-ধৃত বা অপ্রচলিত পাঠ সংকলন করা যাইতেছে। স্তবক বা ছত্র-সংখ্যার উল্লেখ প্রচলিত গ্রন্থানুসারে।[১৪] ছত্র ৩ (ছ৩), ইহাতে শেষ হইতে গণনায় তৃতীয় ছত্র বুঝিতে হইবে।

৪ কেন মধুর / স্তবক ৩: যখন লোলুপ মুখে নবনী লাগি
মায়ের আঁচল ধরি বেড়াও মাগি
… … … …
… … কিসের লাগি,
মধুর নবীন যবে বেড়াও মাগি'। / পাণ্ডুলিপি। পৃ ৪

৫ চাতুরী / স্ত ১। ছ ৬-৭: ভালবাসে সে… / …না যদি দেখে / পাণ্ডু। পৃ ৫
স্ত ৪। ছ ২-৩: যেখানে ওঠে তরুণ শশি / বিকাশে শুকতারা / পাণ্ডু। পৃ ৬
ছ ৬: হারাতে চাহে… / পাণ্ডু। পৃ ৬

৬ ঘুমচোরা / 'আমার খোকার ঘুম নিল কে' (মুদ্রিত দ্বিতীয় স্তবক) প্রথমে লেখা হয়, পরে 'কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া' (মুদ্রিত প্রথম)— অতঃপর স্তবকে ২।১।৩ সংখ্যা বসাইয়া বিন্যাসের পরিবর্তন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

---

১৩ কাব্যগ্রন্থ (১৯১৬), অষ্টম খণ্ড, শিশুকাব্যের পরবর্তী নানা পরিবর্তনের মুখ্য ক্ষেত্র। ইহার পরেও পরিবর্তন করা হয়।

১৪ সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপির বর্জনচিহ্নিত পাঠ সংকলন করা হইবে না।

স্ত ৩। ছ ৫-৭ : চোরা ধন কোথা রাখে ছাপিয়ে!
তার পরে মুঠি ২ সব তার নিয়ে লুটি'
পদ্মপাতায় আনি চাপিয়ে! / পাণ্ডু। পৃ ৯

৭ অপযশ / শেষ হইতে চতুর্থ ছত্রে 'তোমার নিন্দে করে!' লিখিয়া পরে : তোমায় নিন্দে করে! / পাণ্ডু। পৃ ১০

৮ বিচার / স্ত ১। ছ ৮-১১ : বাহির হতে তোমরা সবাই / কর তারে দুষি— / তোমাদের যা খুসি। ভালয় মন্দে আমার কিবা হয়! / পাণ্ডু। পৃ ১১
স্ত ২। ছ ৩ 'গুণ' স্থলে : গুণ(ই) / পাণ্ডু। পৃ ১১

৯ ছুটির দিনে / স্ত ৩। ছ ১১ 'একটি' স্থলে : একটা / পাণ্ডু। পৃ ১৪
ছ ১৩ 'কাঠকুড়ুনি' স্থলে : কাঠ কুড়নি / পাণ্ডু। পৃ ১৪ / কাব্য (১৩১০) / কাব্য (১৯১৬)
স্ত ৪। ছ ১ : এমনি যেদিন মেঘ করত / পাণ্ডু। পৃ ১৪
ছ ৩ 'যাচ্ছে' স্থলে : যেত / পাণ্ডু। পৃ ১৪
ছ ৬ : দুল্‌ত গলার পরে। / পাণ্ডু। পৃ ১৫
ছ ৮ : জান্‌ত কেমন করে? / পাণ্ডু। পৃ ১৫
ছ ৯ : ঝিলিক্ দিত / পাণ্ডু। পৃ ১৫
ছ ১২ 'পড়ে' স্থলে : পড়ত / পাণ্ডু। পৃ ১৫
ছ ৩ 'এখন' স্থলে : তখন / পাণ্ডু। পৃ ১৫
ছ ২ : 'চলে যে' স্থলে : চলে সে / পাণ্ডু। পৃ ১৫
স্ত ৫। ছ ৫ : রাত্রি হল / পাণ্ডু। পৃ ১৫ / রবীন্দ্র-পত্র
রাত্তির্ হল / কাব্য (১৩১০) / কাব্য (১৯১৬)
ছ ১০ 'পুঁথিপত্তর' স্থলে : পুঁথিপত্র / পাণ্ডু। পৃ ১৫

১০ রাজার বাড়ি / স্ত ২। ছ ২ 'আর কেহ তো' স্থলে : আর ত কেহ / পাণ্ডু। পৃ ১৬
স্ত ৩। ছ ৩ 'যেই' স্থলে : সেই / পাণ্ডু। পৃ ১৬

১২ সমব্যথী / মুদ্রিত গ্রন্থে স্তবকের পাঠভেদে / রূপভেদে ধ্বনি ও ছন্দো -গত কী প্রভেদ হইয়াছে তাহা পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পূর্ণ কবিতা (২ স্তবক) যথাযথ উদ্‌ধৃত করিলে বুঝা যাইবে।

যদি তোমার খোকা না হয়ে
আমি মাগো হতেম কুকুর ছানা—
৩ পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
এমনি করে করতে আমায় মানা!
সত্যি করে বল্ আমায়
করিস্‌নে মা ছল!

৮ বল্‌তে আমায় দূর দূর দূর
কোথা থেকে এল এই কুকুর! পাণ্ডু। পৃ ১৯
যা মা তবে যা মা আমায়
কোলের থেকে নামা আমি
খাব না তোর হাতে আমি
১৩ খাব না তোর পাতে!

যদি তোমার খোকা না হয়ে
আমি মাগো হতেম তোমার টিয়ে
৩ খেলা করতে দূরে
আমি পাছে যাই মা উড়ে
রাখ্‌তে আমার পায়ে শিকল দিয়ে!
সত্যি করে বল আমায়
করিস্‌নে মা ছল!
৮ বল্‌তে আমায় ও—রে দুষ্টু পাখী
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি!
তবে নামিয়ে দেমা, আমায়
ভালবাসিস্ নেমা আমি
রব না তোর কোলে আমি
১৩ বনেই যাব চলে! / পাণ্ডু। পৃ ২০

উদ্ধৃত পাণ্ডুলিপির পাঠে ও মুদ্রিত পাঠে (সংস্করণ-নির্বিশেষে) শব্দ ও ছন্দো-গত পার্থক্য পাঠক মিলাইতে পারিবেন। এটুকু লক্ষ্য করা দরকার, পাণ্ডুলিপিতে উভয় স্তবকই ১৩ ছত্র-পরিমিত আর মুদ্রিত কাব্যে দ্বিতীয় স্তবকে একটি ছত্র কম, কেননা পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ছত্র (অথবা তাহার কোনো বিকল্প) সে স্থলে নাই —ইহা বিশেষ মুদ্রণ-প্রমাদ ('ছাড়্') বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয় স্তবকের অষ্টম ছত্রে 'হতভাগা' কাটিয়া 'ও—রে দুষ্টু' করা হয়, মুদ্রণ সময়ে পূর্বপাঠ ফিরিয়া আসে।

১৩ প্রশ্ন / ছ ৯ 'ভাবতে পারি মনে' স্থলে ছিল : মনে করতে পারি / পাণ্ডু। পৃ ২১
ছ ৫: চাষার দল / পাণ্ডু। পৃ ২১
ছ ১ 'হবে না' স্থলে : না হবে / পাণ্ডু। পৃ ২১

১৪ মাস্টার বাবু/স্ত ১।ছ ১ : জানো আমি মাষ্টার মশায় / পাণ্ডু। পৃ ২২
ছ ৩ : পড়ায় বড়ই অবহেলা / পাণ্ডু। পৃ ২২
স্ত ২। ছ ৩ 'সব পড়া' স্থলে : পড়াশুনো / পাণ্ডু। পৃ ২৩
ছ ১ 'দুষ্টুমি করে' স্থলে : ও কেবল / পাণ্ডু। পৃ ২৩

১৫ বিচিত্র সাধ/স্ত ১। ছ ২ : পাশের গলি / পাণ্ডু। পৃ ২৪
ছ ৩ প্রথম পাঠ : হয় পাছে তার/পরে : হয় গো পাছে/('বা' স্থলে : গো) পাণ্ডু। পৃ ২৪

১৬ লুকোচুরি/স্ত ১। ছ ৩ 'মা গো,' স্থলে : আগা- / পাণ্ডু। পৃ ২৮
স্ত ২। ছ ২ 'নয়ন' স্থলে : আঁখি / পাণ্ডু। পৃ ২৮
স্ত ৪। ছ ৪ 'করে মা' স্থলে : করিয়ে/পাণ্ডু। পৃ ২৯/কাব্য (১৩১০)/কাব্য (১৯১৬)
কবি হিন্দুস্থান রেকর্ডে (৩৪২নং) এই কবিতাটি ক্ষুদ্র ভূমিকা -সহ ১৩-২-১৯৩৬ তারিখে (দ্র রবীন্দ্রনির্দেশিকা/১৩৬৯/শ্রীনির্মলেন্দু রায় চৌধুরী -সংকলিত) আবৃত্তি করেন। ভূমিকাটি হইল : এই ছেলেটার ভারী ইচ্ছে গেছে লুকোচুরি খেলায় সে মাকে হারিয়ে দিয়ে তাঁকে জব্দ করবে। অনেকবার চেষ্টা করেছে। কখনো খাটের তলায় লুকিয়ে, কখনো আল্‌মারির পিছনে, একবার লুকিয়েছিল ঐ ধোবার বাড়িতে ময়লা কাপড় দিচ্ছিল, সেই কাপড়ের বস্তার ভিতরে ঢুকে, ভেবেছিল তাকে কেউ ধরতে পারবে না— সেবারেও সে ধরা পড়েছিল। তার মনে তাই দুঃখ ছিল ; মনে মনে ভাবছে যে, যদি আমি চাঁপা ফুল হয়ে চাঁপা গাছের ডালে ফুটে উঠতে পারি, মা তো তা হলে ধরতে পারবে না ; ব'সে ব'সে মাকে সেই মনের বাসনাটা সে শোনাচ্ছে। এই, ব্যাপারটা হল এই।/ কবির আবৃত্তিতে দ্বিতীয় স্তবকে কয়েকটি পাঠান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা :—
স্ত ২। ছ ১ 'যখন' স্থলে : তখন/
ছ ২ : সব আমি তা দেখব নয়ন মেলে/
ছ ৫ 'এখান দিয়ে' স্থলে : এখেন দিয়ে ঐ/

১৮ নৌকাযাত্রা / স্ত ২। ছ ৬ 'সোনা মানিক' স্থলে : সোনার বোঝা / পাণ্ডু। পৃ ৩০
ছ ৭ : রাধু যাবে বিপিন যাবে সাথে / পাণ্ডু। পৃ ৩০

১৯ বিজ্ঞ / স্ত ১। ছ ৯ 'শিশুশিক্ষা' স্থলে : দ্বিতীয় ভাগ / পাণ্ডু। পৃ ৩২
ছ ২১ : বাবা ত মা কলকাতাতে আছে / পাণ্ডু। পৃ ৩২ / প্রচলিত পাঠের উদ্ভব রবীন্দ্র-পত্রে ; কবি পত্রে পাণ্ডুলিপির পাঠ লিখিতে গিয়া কাটিয়া দিয়াছেন।
এ কবিতার ছত্র ৪-৮ ও ২১-২৮ পৃষ্ঠার দু দিকের মার্জিনে লিখিয়া পরে

যোগ করা হয়। মুদ্রিত ছত্র ৯-১২ ও ১৩-১৬ পাণ্ডুলিপিতে ছত্র ১৩-১৬ ও ৯-১২ রূপে লিখিত, অর্থাৎ গ্রন্থে এই চার-চার ছত্রের বিন্যাসে ওলট-পালট করা হইয়াছে।

২১ ভিতরে ও বাহিরে / স্ত ১। ছ ১০ 'অসাড়কেও' স্থলে : জড়কে তিনি / পাণ্ডু। পৃ ৩৬

স্ত ২। ছ ১০ : তরুলতা / পাণ্ডু। পৃ ৩৭

ছ ১২ : কোনো কথা / পাণ্ডু। পৃ ৩৭

ছ ১৩ 'ডালে' স্থলে : গাছে / পাণ্ডু। পৃ ৩৭

ছ ১৯ 'জানেই' স্থলে : জানে / পাণ্ডু। পৃ ৩৭

ছ ১৬-১৩ : কঙ্কাবতীর গল্প তারে / শুধাই যদি—
দেয় না সাড়া কালার মত/বহে নদী/পাণ্ডু। পৃ ৩৮
(মুদ্রিত পাঠ : দিঘি থাকে ইত্যাদি)

ছ ৪-৩ : বিশ্বগুরু আছে বসে / স্তব্ধ হয়ে / পাণ্ডু। পৃ ৩৮

২২ ব্যাকুল / স্ত ১। ছ ২ : খোকাকে / পাণ্ডু। পৃ ৩৯

স্ত ২। ছ ৩ : পূর্বপাঠ 'সিটি' কাটিয়া : সেটি / পাণ্ডু। পৃ ৩৯
অথচ কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) : সিটি / ইহাই প্রচলিত পাঠ।

ছ ৪ : মা গো বেলা যাচ্ছে বয়ে / পাণ্ডু। পৃ ৩৯

স্ত ৪। ছ ১ 'আমার' স্থলে : খোকার / পাণ্ডু। পৃ ৩৯

স্ত ৫। ছ ৩ 'কক্‌খন' স্থলে : কখ্‌খন / পাণ্ডু। পৃ ৪০ / কাব্য (১৩১০) / কাব্য (১৯১৬)

২৩ বৈজ্ঞানিক / স্ত ১। ছ ৮ 'দিয়ে' স্থলে : দিলে / পাণ্ডু। পৃ ৪১

স্ত ৪। ছ ৩ 'আছে' স্থলে : নাচে / পাণ্ডু। পৃ ৪২

২৪ জ্যোতিষশাস্ত্র / স্ত১। ছ ৯ : তোর মত কি দেখেছে কেউ বোকা—/ পাণ্ডু। পৃ ৪৩
তোর মতন দেখি নেইক বোকা ! / কাব্য (১৩১০) / কাব্য (১৯১৬)
'তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা' প্রচলিত পাঠ।

ছ ৫ 'জানলার' স্থলে : জানালার / পাণ্ডু। পৃ ৪৩

স্ত ২। ছ ১০ 'চাঁদ যদি এই' স্থলে : চাঁদ যদি/পাণ্ডু। পৃ ৪৪/কাব্য (১৩১০)/কাব্য (১৯১৬)

ছ ৭ 'ইস্কুলে যে' স্থলে : ইস্কুলেতে / পাণ্ডু। পৃ ৪৪
প্রথম স্তবকের শেষ ছত্র (পৃ ৪৩), দ্বিতীয় স্তবকের নবম ছত্র (পৃ ৪৩), সর্বশেষ ছত্র (৪৪ পৃ) পাণ্ডুলিপিতে : তোর মত কি দেখেছে কেউ বোকা !/ সব ক্ষেত্রেই প্রচলিত পাঠ : তোর মত আর দেখি নাই তো বোকা !/ অন্তর্বর্তীপাঠ (কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ ও ১৯১৬) নানা ছত্রে নানারূপ।

২৫ সমালোচক / স্ত ১। ছ ২ 'লেখেন' স্থলে : লেখে / পাণ্ডু। পৃ ৪৪

স্ত৪। ছ৩ 'করলে' স্থলে : কল্লে / পাণ্ডু। পৃ ৪৫

ছ ২ 'বল্‌ তো' স্থলে : বল্‌ মা / পাণ্ডু। পৃ ৪৫

২৬ ছোটো বড়ো / স্ত ১ । ছ ৫ : দাদা যদি পড়তে তখন···/ পাণ্ডু । পৃ ৪৭

স্ত ২ । ছ ১ 'আসি এখন' স্থলে : এখন আসি / পাণ্ডু । পৃ ৪৭

স্ত ৩ । ছ ১ : আমায় খেলা করতে নিয়ে যেতে / পাণ্ডু । পৃ ৪৮

ছ ৩ ··· কব ধমক দিয়ে / পাণ্ডু । পৃ ৪৮

ছ ১ কপাল-টুকনি : আমাদের সেই ছোট খোকা নাই ত

এবং : খোকা এখন খোকা হয়ে নাই ত ! / পাণ্ডু । পৃ ৪৮

স্ত ৫ । ছ ৬ : ছোট খোকা তেমনি আছে বুঝি / পাণ্ডু । পৃ ৪৮

(রবীন্দ্র-পত্রে ও গ্রন্থে : খোকা তেম্‌নি খোকাই আছে বুঝি /)

স্ত ৬ । ছ ১-১২ গ্রন্থে বর্জিত এই অতিরিক্ত স্তবকেব নিম্নরূপ রবীন্দ্রনাথের পত্রে :

দিদিমা রোজ বলেন মিছিমিছি
"খোকার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক !"
মা শুনে কন্‌ "আগে আমার খোকা
৪ তোমার মতন বড় হয়ে নিক্‌।"
বড় হব যত শীগ্‌গির পারি,
হাঁকিয়ে আস্‌ব জুড়িঘোড়ার গাড়ি,
বাজ্‌বে শানাই জল্‌বে মোমের বাতি,
৮ উঠোনেতে লোক হবে ঢের জড় !
তখন এসে বল্‌ব দিদিমাকে
"তোমার চেয়ে আজ হয়েছি বড় !"
তখন মা আর কেমন করে ক'বে
"বড় হলে খোকার বিয়ে হবে !"

পাণ্ডুলিপি-ধৃত পূর্বপাঠ (পৃ ৪৯) স্থানে স্থানে পৃথক্‌— ছ১ 'মিছিমিছি' স্থলে : মাকে এসে / ছ ৪ 'মতন' স্থলে : মত / ছ ৯ : বলব এসে— দিদিমা তোর বিয়ে / স্তবকটি কেন বাদ দেওয়া হয় তাহা তথ্যপঞ্জীতে যথাস্থানে আলোচিত ।

২৭ বনবাস / স্ত ১ । ছ ৩-৪ : আমি যেতে··· / ভাব্‌চ তুমি মনে ? / পাণ্ডু । পৃ ৫০

ছ ৪ 'পারি যেতে' কাটিয়া : নাই বা জানি । পাণ্ডু । পৃ ৫০ । পরে বর্জন-চিহ্নিত পাঠই মুদ্রিত ।

স্ত ৩ । ছ ৪ : গলায় মাথায় চুলে / পাণ্ডু । পৃ ৫০

স্ত ৪ । ছ ৫ : পিঠেতে ন্যাজ তুলে / পাণ্ডু । পৃ ৫১

ছ ৪ 'যেতেম' কাটিয়া : পড়ি / পাণ্ডু । পৃ ৫১ । বর্জনচিহ্নিত পাঠ মুদ্রিত ।

স্ত ৫ । ছ ৬ : 'শিয়াল' স্থলে : শেয়াল / পাণ্ডু । পৃ ৫১ / কাব্য (১৩১০) / কাব্য (১৯১৬)

২৮ বীরপুরুষ / স্ত ৪ । ছ ২ 'ঐ যে' স্থলে : ঐ রে / পাণ্ডু। পৃ ৫৪
ছ ৪ : 'ঠাকুর দেবতা' স্থলে : দেব্‌তারে মা / পাণ্ডু। পৃ ৫৪
ছ ১ : ···কেন মা ভয় করো ! / পাণ্ডু। পৃ ৫৪
স্ত ৫ । ছ ৩ 'বলি' স্থলে : বল্লেম / পাণ্ডু। পৃ ৫৫
ছ ৩ 'দেব' স্থলে : দেবে / পাণ্ডু। পৃ ৫৫
স্ত ৬ । ছ ৩ 'শুনে' স্থলে : শুন্‌লে / পাণ্ডু। পৃ ৫৫

৩৪২ নং হিন্দুস্থান রেকর্ডে ('ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী') ১৩. ২. ১৯৩৬ তারিখে (দ্র রবীন্দ্রনির্দেশিকা / ১৩৬৯ / শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী -সংকলিত) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার আবৃত্তি করেন। আবৃত্তির একটি গদ্য ভূমিকাও দেন : অনেক বড়ো বড়ো বীরপুরুষের কাহিনী তো বলা হয়েছে, তারা যুদ্ধ ক'রে মাকে উদ্ধার করেছে। আমি বলব—একটি ছোট্ট বীরপুরুষ সে, এখনো বীরত্ব তার শুরু হয় নি, সে কল্পনা করছে বড়ো হলে বোধ হয় সে মার জন্যে লড়াই করবে ও মাকে উদ্ধার করবে। / এই আবৃত্তিতে পঞ্চম স্তবকের সপ্তম ছত্রে 'উঠে' স্থলে 'ওঠে' ব্যতীত আর কোনো পাঠান্তরের সৃষ্টি হয় নাই।

৩০ বিদায় / স্ত ১ । ছ ১ 'যাই গো তবে' স্থলে : যাই তবে গো / পাণ্ডু। পৃ ৫৯
স্ত ৬ । ছ ৩ 'নেইরে' স্থলে : নেইক / পাণ্ডু। পৃ ৬০
স্ত ৭ । ছ ৩ বোলো— সে কি কোথাও হারায় / পাণ্ডু। পৃ ৬০

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে স্তবক ৬ ও ৭ পাওয়া যায় ; তাহাই মুদ্রিত পাঠের আদর্শ।

৩১ জন্মকথা / স্ত ১ । ছ ১ 'ইচ্ছা' স্থলে : ইচ্ছে / পাণ্ডু। পৃ ৬১
স্ত ২ । ছ ২ 'প্রভাতে' স্থলে : ভোরে / পাণ্ডু। পৃ ৬১
ছ ১ 'তাঁরি পূজায়' স্থলে : তাঁর পূজাতে / পাণ্ডু। পৃ ৬১
স্ত ৩ । ছ ২ 'গৃহদেবীর' স্থলে : গৃহলক্ষ্মীর / পাণ্ডু। পৃ ৬১
ছ ১ 'লুকিয়ে ছিলি' স্থলে : লুকিয়ে খেলিস্‌ / পাণ্ডু। পৃ ৬১
স্ত ৪ । ছ ২ 'প্রস্ফুটিয়া' স্থলে : বিকাশিয়া / পাণ্ডু। পৃ ৬১
স্ত ৫ । ছ ২ : তুই যে চির সুচিরন্তন / পাণ্ডু। পৃ ৬১
স্ত ৭ । ছ ৪ 'মায়ায়' কাটিয়া : মায়া / পাণ্ডু। পৃ ৬২ / 'মায়ায়' মুদ্রিত।

৩২ অস্তসখী / [১৫] স্ত ৩ । ছ ২ 'যাবে' কাটিয়া : গেল / পাণ্ডু। পৃ ৬৩ / 'যাবে' মুদ্রিত।

---

১৫ রজনী একাদশী পোহায় ধীরে ধীরে / পাণ্ডুলিপিতে ও প্রচলিত সংস্করণে একটি ছত্র (এ স্থলে সেই হিসাবেই ছত্রনির্দেশ), পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী বহু সংস্করণে দুটি ছত্র। এইরূপ শেষ পর্যন্ত।

অস্তসখী, বিচ্ছেদ, উপহার, পরিচয় (সংখ্যা ৩২-৩৫)— রবীন্দ্রনাথ এই ৪টি রচনায় পুরাতনেরই নবকলেবর দিয়াছেন। পরে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যাইবে।

স্ত ৫। ছ ১ 'পথে' স্থলে : পানে / পাণ্ডু। পৃ ৬৪ / কাব্য (১৩১০ ও ১৯১৬) / শিশু (১৯১৯) 'পথে' মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

স্ত ৭। ছ ২ 'ভালোবেসে' স্থলে : হেসে হেসে / পাণ্ডু। পৃ ৬৪

৩৩ বিচ্ছেদ / স্ত ১। ছ ৯ 'আমাদের' স্থলে : যে ছিল / পাণ্ডু। পৃ ৬৫
প্রথম স্তবকের ১৬টি ছত্র শুধু 'শিশু'র পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

৩৪ উপহার / স্ত ১। ছ ৭ : এখন যে কত বাকি আছে হাতে / পাণ্ডু। পৃ ৬৬
ছ 8 ট্যাঁকশালে / পাণ্ডু। পৃ ৬৬ / মুদ্রিত 'ট্যাকশালে' শিশু (১৯১৯) অবধি।
সঞ্চয়িতা'য় (১৩৩৮) : টাঁকশালে /

স্ত ৩। ছ ৮ ও ৯ 'নিস' ও 'যাস' স্থলে : নিবি / যাবি / পাণ্ডু। পৃ ৬৮

ছ ১২ : তাহাতে কি যায় কি আসে ! / পাণ্ডু। পৃ ৬৮
চতুর্থ বা অন্তিম স্তবক সম্পূর্ণ নূতন রচনা (পৃ ৬৯), পুরাতন কবিতার অংশবিশেষের নূতন সংস্করণ নয়, পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির ভিতর দিয়া যেরূপ উদ্ভাবিত, গ্রন্থে তাহাই ছাপা হইয়াছে।

৩৫ পরিচয় / স্ত ১। ছ ৮ : আমার আছে সন্দেহ / পাণ্ডু। পৃ ৭০
ছ ১০ 'যে কোথা' স্থলে : কোথা যে / পাণ্ডু। পৃ ৭০
ছ ১৩ 'শুধু' স্থলে : কেবল / পাণ্ডু। পৃ ৭০

স্ত ২। ছ ১-৮ পরবর্তী সংযোজন, মার্জিনে লেখা। / পাণ্ডু। পৃ ৭০

স্ত ৩। সম্পূর্ণ। ঐরূপ সংযোজন। পাণ্ডু। পৃ ৭১

স্ত ২। ছ ৯-১০ : আমি যখন ব্যস্ত হয়ে / বলি, "একটু র'স মা !" / পাণ্ডু। পৃ ৭০

স্ত ৩। ছ ২ 'গো' স্থলে : যে / পাণ্ডু। পৃ ৭১

স্ত ৪। ছ ১০ 'এতে' স্থলে : আর / 'না' স্থলে : না ত / পাণ্ডু। পৃ ৭২
ছ 8 'তাহার' স্থলে : তাঁহার / পাণ্ডু। পৃ ৭২ / কাব্য (১৩১০ ও ১৯১৬)

৩৬ জগৎ পারাবারের তীরে ইত্যাদি

স্ত ১ 'ফেনিল ওই সুনীল জল' স্থলে : অকূল ওই অতল জল / পাণ্ডু। পৃ ৭৩

স্ত ৪ 'ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে' স্থলে : সাগর হাসে তাদের চেয়ে / পাণ্ডু। পৃ ৭৪
'তরল তানে' স্থলে : মধুর গানে / পাণ্ডু। পৃ ৭৪
'যেমন গানে' স্থলে : যেমন তানে / পাণ্ডু। পৃ ৭৪

শেষে 'সাগর খেলে শিশুর সাথে' স্থলে : সাগর খেলে তাদের নিয়ে / পাণ্ডু। পৃ ৭৪

পুরাতন কবিতার নূতন সংস্করণ

অন্তসখী (৩২)— 'শরতের শুকতারা' শিরোনামে ভারতী পত্রে (অগ্রহায়ণ ১২৯১) মুদ্রিত ও কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে সংকলিত কবিতার নূতন রূপ। বর্তমান কবিতায় ২৮ ছত্র, যে স্থলে মূলে ৪০ ছত্র

ছিল। ভাষাগত, স্থানে স্থানে ভাবগত, সংস্কার ছাড়া ছন্দেও ঈষৎ পার্থক্য দেখা যায়, কেননা সূচনার 'একাদশী রজনী / পোহায় ধীরে ধীরে ;— / রাঙা মেঘ দাঁড়ায় / উষারে ঘিরে ঘিরে।' বদল করিয়া হইয়াছে :

রজনী একাদশী / পোহায় ধীরে ধীরে,

রঙিন মেঘমালা / উষারে বাঁধে ঘিরে। / মাত্রার বিন্যাস '৪+৩ / ৩+৪' বদলাইয়া : ৩+৪ / ৩+৪। ভারতী (১২৯১) অথবা কড়ি ও কোমলের (১২৯৩) সহিত তুলনায় পাঠভেদের প্রাচুর্য ও বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে।

বিচ্ছেদ (৩৩)— তুলনীয় কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে : পত্র / মা গো আমার লক্ষ্মী ইত্যাদি। মূল কবিতার প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ স্তবক (৪৪ ছত্র) বর্জিত। মূলের তৃতীয় স্তবকে ও শিশু কাব্যে মুদ্রিত প্রথম স্তবকে (পাণ্ডুলিপি-ধৃত এক মাত্র স্তবকে) ভাব ভাষা ছন্দো-গত কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

উপহার (৩৪)— তুলনীয় বালকে (১২৯২ চৈত্র) মুদ্রিত এবং কড়ি ও কোমলে (১২৯৩) সংকলিত : জন্মতিথির উপহার / স্নেহ-উপহার এনেছিরে দিতে ইত্যাদি। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তবকে পরিবর্তন প্রচুর। চতুর্থ স্তবক সম্পূর্ণ নূতন।

পরিচয় (৩৫)— তুলনীয় বালকে (১২৯২ ফাল্গুন) মুদ্রিত এবং কড়ি ও কোমলে (১২৯৩) সংকলিত : চিঠি / চিঠি লিখব কথা ছিল ইত্যাদি। মূল কবিতার সূচনার ৩৪ ছত্র বাদ দিয়া 'আমি বাপু একটি কেবল / দুষ্টু মেয়ের খবর জানি' এই বাক্য হইতে উভয় কবিতায় সাদৃশ্য খুঁজিতে হয়। সাদৃশ্য যৎসামান্য। মূলের পরবর্তী স্তবকে (নাম যদি তার জিগেস কর ইত্যাদি / ইহার পরেও মূল কবিতায় ৩২ ছত্রের এক স্তবক) এবং নূতন কবিতার শেষ স্তবকে পুনশ্চ অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় কবিতার কয়েকটি স্তবকে উপমা অলংকার বাক্য কিংবা বাগ্‌ভঙ্গী -গত সাদৃশ্য যাহাই থাকুক, একটি বিশেষ পার্থক্য কাহারও দৃষ্টি এড়াইবে না। মূল কবিতার উদ্দিষ্টা এক বালিকা ; নূতন কবিতায় যে ছোটো খুকীটির চরিতাখ্যান সে হয়তো হামা দেয় মাত্র, কথাও ভালো শিখে নাই। অর্থাৎ, এক সময় কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে (বয়স তখন ১২ হইতে পারে) লক্ষ্য করিয়া যাহা লেখা হইয়াছিল বর্তমানে বিষয়বস্তুর দিক দিয়াই তাহা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া উঠিয়াছে— কবির নিজের কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) রেণুকা (রানী) বা মীরার দূরাগত শৈশবের লীলামাধুরী ইহার রচনাকালে মনে জাগিয়াছিল এ অনুমান অমূলক হইবে না।

রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

(১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্রে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত)

তথ্যপঞ্জীর ভিতরে, মুখ্যতঃ কবিতাগুলির রচনাকাল-নির্ণয়ের উদ্দেশে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠির নানা অংশ ইতঃপূর্বে সংকলিত। শিশুর প্রসঙ্গ আছে বা কবির ঐ সময়ের মন-মেজাজ বুঝিতে সুবিধা হয় এরূপ আরও কতকগুলি বাক্য / অনুচ্ছেদ এ স্থলে সংকলন করা যাইতেছে। (মূলে যেখানে নূতন প্যারা, উদ্ধৃতিতে দণ্ডচিহ্ন আরোপিত।) অনেকগুলি চিঠির তারিখ নাই, স্থিরীকৃত পারম্পর্য অনুমানিক বুঝিতে হইবে।—

কবিতাগুলির নাম চট্ করে মনে আস্‌চে না। নাম সব সময় বাপে দেয় না পিতৃবন্ধুও দিয়ে থাকে অতএব আপনার উপর নামকরণের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম। এই সমস্ত কবিতা গ্রন্থাবলীর যে ভাগে যাবে তার নাম "কুমার" বা "কিশোর" না দিয়ে "শিশু" দেওয়াই ভাল।... যে কবিতাগুলি আপনাকে পাঠালুম তার কোনটাই যদি শিশুর ভূমিকায় যাবার যোগ্য না মনে করে [ন] তাহলে "আশীর্ব্বাদ" কবিতাটি সেই জায়গায় বসাতে পারেন।... / ...পেটের অসুখে পড়েছি। / বাদলা চল্‌চে। [৫ শ্রাবণ ১৩১০ তারিখের পরে ?]

এ কয়দিন পেটের অসুখ চল্‌চে বলে আহারাদি বন্ধ করে চুপচাপ চৌকিতে বসে বসে কবিতা লিখচি। এখনও সেই কাজেই চল্লুম। [১৩ শ্রাবণ ১৩১০ তারিখের পূর্বে ?]

"শৈশবচাতুরী" নামের "শৈশব"টা বাদ দিলেও চলে। বাকি নামগুলি স্বীকার করে নিলুম। / বছর দুই তিনের মধ্যে মুকুলে শিশুপাঠ্য আর একটা কবিতা বেরিয়েছিল— তার নাম কি দিয়েছিলেম কে জানে! হয়ত "পূজার কাপড়" [পূজার সাজ] কিম্বা ঐরকম একটা কিছু। শৈলেশকে বলবেন সেটা সন্ধান করে বের করতে। / মধ্যাহ্ন, পোড়োবাড়ি এবং মঙ্গলগীতি শিশুখণ্ডে যাবার মত কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ ভাষায় ভাবে ধরণে অন্য কবিতাগুলোর সঙ্গে যেন খাপ খাচ্চে না। অন্তত মঙ্গলগীতিটা এ বইয়ের পক্ষে হয়ত কিছু গুরুতর— কারণ সেটা একটা lecture বিশেষ; মধ্যাহ্নে তপোবনকন্যাদের এবং পোড়োবাড়িতে বালক বালিকাদের কথা আছে অতএব শিশুখণ্ডে তাদের কথঞ্চিৎ দাবী আছে। / ... "মহীয়সী মহিমা"কে "পরিপূর্ণ মহিমা" করে দেবেন। "সাধ" "পুরাতন বট" প্রভৃতি কবিতায় যেরকম ছাঁটতে ইচ্ছে করেন ছেঁটেছুঁটে পরিষ্কার করে দেবেন। / কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণের যে কবিতা থেকে নামকরণ তত্ত্ব তুলে দিয়েছেন সেটা শিশুখণ্ডে দেওয়া চল্‌বে। মালক্ষ্মীও মন্দ নয়। [আনুমানিক ১৩ শ্রাবণ ১৩১০]

আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়চে। / ... আজ এখানে মেঘাবরণ উন্মুক্ত— হিমালয়ের তুষারললাট প্রভাত-আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। সমস্ত দুঃখ দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমার চিত্ত আনন্দে প্রসারিত হয়ে যাচ্চে। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩১০

নামকরণ করে দেবেন। / ইত্যাদি। তথ্যপঞ্জীতে উদ্ধৃত। তারিখ : '১৭ই শ্রাবণ ১৩১০'

এই ত ২২টা হল। / ইত্যাদি। ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত। তারিখ : '২৩শে শ্রাবণ ১৩১০'

['২২এ শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে মোহিতচন্দ্র: "বিজ্ঞ" এবং "সমব্যথী" এই দুটি নাম আপনার এক পাঠিকা[১৬] দিয়েছেন— আপনি 'খোকা'দের কথা যেমন লিখেছেন 'খুকী'দের কথা তেমন করে লেখেন

১৬ মোহিতচন্দ্রের পত্নী। ইঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, কন্যা ছিল।

নি— এজন্যে তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন··· / "মধ্যাহ্নে" আর "পড়োবাড়ি" শিশুখণ্ডে যেতে পারে, কিন্তু 'খেলা' সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়— ওটার মর‍্যাল, শিশুরা কেন, বুড়োরাও বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ।··· "মঙ্গলগীতি" দিতে বড় ইচ্ছা করছে।[১৭]]

আপনি বুঝি আমার পাঠিকাকেও[১৬] খাটিয়ে নিচ্চেন? তিনি যে দুটি নাম দিয়েছেন সে ঠিকই হয়েছে কিন্তু তাঁর নালিশ সম্বন্ধে আমার তরফে দুটি একটি কথা বল্‌বার আছে। আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে— তার একটি প্রধান কারণ এই— যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে সেই তার লেখনীর সম্বল— খুকীর চিত্ত তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে— খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটি আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— তখন খুকী ছিল না— মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ছিল— সেই জন্যে লিখ্‌তে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এইরকম খেলা খেল্‌চে— তাকে নিবারণ করতে পারিনে। শিশুখণ্ডের কবিতাগুলি আপনি যে রকম সাজিয়েছেন তথাস্তু। কেবল একটি বক্তব্য আছে। খোকা নিজের জবানীতে যে কবিতাগুলির নায়ক সেগুলিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া কি চলে? বস্তুত সেটা একই মানুষের চরিত্রচিত্রাবলীর মত— তারা সবগুলি জড়িয়ে একটি খোকাকে প্রকাশ করচে— সে যে কেবল সাধারণ খোকার type মাত্র তা নয়— সে একটি বিশেষ খোকাও বটে— কাজেই এই কবিতাপর্য্যায়ের মাঝে মাঝে অন্য কবিতার প্রবেশ কি অনধিকার প্রবেশ হবে না? / আচ্ছা বেশ, "খেলা" না হয় বুড়োদের জন্যেই রইল। মঙ্গলগীতি[১৭] গ্রন্থশেষে দেবেন। / শৈলেশ "মাধুরী বিনিময়" নাম দিতে চেয়েছেন সেটা ঠিক সঙ্গত বলে মনে হয় না। খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন, সুন্দর ও মধুর জিনিষ দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই— তখনি বুঝতে পারি আমাদের জন্যে জগৎটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্য্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত— ওর কোন তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না— কিন্তু আমাদের সবরকম ভালবাসার উপলক্ষ্যেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভালবাসা না থাকলে সৌন্দর্য্যের কোন অর্থই থাকে না— মধুর হওয়া, মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ— ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে।··· ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপনে রেখে এমন কোমল আর অপরূপ-ভাবে ফুল হয়ে উঠ্‌চে কেন? আমরা যখন নিজে ভালবেসে মধুর হই মাধুরী দিই মাধুরী লাভ করি তখনি তার তাৎপর্য্য বুঝতে পারি। এই সমস্ত কথা আপনি কি নামের মধ্যে বাঁধতে পারেন জানিনে। মোটের উপর, "মধুর কেন?" এই নামটাতেই ঐ কবিতাটির ভিতরের প্রশ্ন ও তারই উত্তরের আভাস কতকটা ধরা দেয়। কি বলেন? আমাকে প্রথম সংস্করণ কড়ি ও কোমল একবার পাঠাতে পারেন? তার থেকে যদি ভেঙেচুরে বদ্‌লে সদ্‌লে আরো দুটো চারটে জিনিষ গড়ে তোলা যায় তবে চেষ্টা করতে পারি।[১৮] ইতি ২৫শে শ্রাবণ ১৩১০

১৭ ছবি ও গান কাব্যের 'মধ্যাহ্নে' ও 'পোড়োবাড়ি' তেমনি ক্ষণিকা কাব্যের 'খেলা' শিশুতে যায় নাই; 'মঙ্গল-গীত' বা 'মঙ্গল-গীতি' শেষ দিকে সংকলিত।

১৮ এই পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ২২২-২৩) মুদ্রিত। মূল পত্রের যে-যে স্থল বর্তমানে অনায়াসে পড়া যায় না, ঐ মুদ্রণের সাহায্যে তাহার পাঠ স্থির করা হইয়াছে।

এডিটরের দায়িত্ব আপনার। যখন থাম্‌তে হবে, বল্‌বেন "বাস্‌!" আপনি কল চালিয়েছেন এখন "furiously rash driving" বলে আমার নামে নালিশ করতে পারবেন না। ক্রমে উত্তাপ যত বাড়তে থাকে চাকাও তত ছুটে চলে। যতই লিখ্‌চি নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্চে। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় ত থামা আবশ্যক—সে সম্বন্ধে কিন্তু আমার একলার প্রতি নির্ভর করে থাক্‌বেন না—রাশ টেনে ধরবেন। / শিশুখণ্ডে ছন্দগুলির অংশভাগ করে ছাপবেন। অর্থাৎ ত্রিপদীকে তিন লাইনে ছড়িয়ে দেবেন—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি কবিতার বড় লাইনগুলোকে দুই লাইনে ভেঙে দেবেন। একটা কবিতা যে পাতায় শেষ হবে সে পাতায় অন্য কবিতা আরম্ভ করবেন না।[১৯] দুই লাইনের মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক রাখবেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বোধ হয় ১৮ লাইনের বেশি ধরবে না। / এখানে অবিশ্রাম বৃষ্টি—মেঘে চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ। ইতি ২৮শে শ্রাবণ ১৩১০

['৩২এ শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে মোহিতচন্দ্র : শিশু খণ্ডে নূতন কবিতা ত এখন ২৬টা হল। আপনি সচ্ছন্দে লিখ্‌তে থাকুন। আমার হাতে যদি লাগাম থাকে ত আমি ত এমন বাহক পেলে রাশ আল্‌গা করে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বারবার ঘুরতে পারি। বাস্তবিক Wordsworth সেই যে লিখেছিলেন "And see the children play upon the shore" কিন্তু কি খেলা তারা খেল্‌ত তা ত লেখেন নি এইবার তার বৃত্তান্তটি পাওয়া যাচ্ছে।··· / ···আজ "কড়ি ও কোমল" ১ম সংস্করণ পাঠাব।]

ও পাতায় কবিতাটা কপি করতে করতে ঘুমে ঢুলছিলেম। পড়তে পড়তে আপনার যদি সেই দশা উপস্থিত হয় তা হলে মুস্কিল।··· / ছেলেবেলায় আমার মনটা আকাশে পাতালে তেতালার ছাদে একতলার অন্ধকার ঘরে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। আমার প্রকৃতিটা রীতিমত nomad ছিল আর কি (বাংলাভাষায় পণ্ডিতরা আজকাল যাকে "যাযাবর" বলেন)। তখন সব জায়গার জন্যেই home-sickness জন্মাত। একটা কিছু অত্যাশ্চর্য্যের জন্যে মনের ভিতর থেকে প্রতীক্ষা কিছুতেই ঘুচ্‌ত না। রোজই মনে হত আজ একটা কিছু ঘট্‌তে পারে—সেই প্রত্যাশায় এক একদিন ঘুম থেকে উঠেই হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠ্‌ত। / আপনি ছেলেবেলায় অতীতের মধ্যে ছিলেন—আমি ছিলেম একটা অনির্দ্দিষ্ট অনাগত অপরূপের অপেক্ষায়! একটা কিছু দেখ্‌ব, একটা কিছু আস্‌বে, হঠাৎ এক জায়গায় কোথাও যাব এই রকম ছিল আমার মনের উন্মুখ উৎসুক অবস্থা। জগতে সম্ভবপরতার চূড়ান্ত সীমানা যে একেবারে পাকাপাকি হয়ে চুকেবুকে গেছে অনেক বয়স পর্য্যন্ত আমার মন যেন তা মান্‌তে চাইত না। এখন অনেকটা মান্‌তে হয়েছে—কিন্তু এই রঙ্গভূমির অন্তরালে যে একটা প্রচ্ছন্ন নেপথ্য আছে এখনো তারই পর্দ্দার পাশে আমার মন ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্যে বিশ্বের অতিজগৎ রাজ্যে, মনের অতিচেতন লোকে, মানবজন্মের অতিজন্ম অবস্থায় আমি যেন আমার বাসার সন্ধান করে ফিরচি।··· আমি এমন একটা সোনার কাঠির সন্ধান করচি যাতে সুপ্তকে জাগ্রত এবং গোপনকে গোচর করে দেয়। আমি কি সব শুন্‌তে পাই, কিসের আভাস

১৯ কার্যতঃ অন্যরূপ হইয়াছিল।

পাওয়া যায়— যাতে আমাকে কোনো বাঁধা মতের মধ্যে বাসা বাঁধতে দেয় না, আমাকে উদাসীন করে দেয়। [আনুমানিক তারিখ : ৩০ শ্রাবণ ১৩১০]

বাস্ আর নয়! / ইত্যাদি। [ত্রিংশ সংখ্যার কবিতা সম্পর্কে পূর্বোদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য। তারিখ: '৩১শে শ্রাবণ ১৩১০']

কড়ি কোমল হইতে একটু বদল সদল করে একটা পাঠানো গেল। সংসারে যে যাবে এবং যে আস্‌বে, শিশুরা যে তারি মাঝখানকার মধুর বন্ধন— তারা প্রাচীনের কণ্ঠে এক হাত জড়িয়ে রাখে এবং নবীনের হস্তে আর এক হাত সমর্পণ করে— তারা স্নেহের সূত্রে অতীতের এবং আশার সূত্রে ভবিষ্যতের সঙ্গে আবদ্ধ— পূর্ব্ব দিক তাদের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে অগ্রসর করে এবং পশ্চিম দিক্ তাদের আশ্বাসের সঙ্গে আহ্বান করে— অস্তোন্মুখকে তারা শেষ সান্ত্বনা এবং উদয়োন্মুখকে তারা নূতন প্রাণ দেয়— এম্‌নি ভাবে মৃত্যু ও নবজীবনের সন্ধিস্থলে প্রফুল্লসুন্দর শ্রীতে অবতীর্ণ হয়ে দুই দিক্‌কেই তারা মধুর রশ্মি দ্বারা অভিষিক্ত করে, দুয়েরই ললাটে তারা আলোকের টীকা পরিয়ে দেয় এই আভাসটুকুই "অস্তসখী" কবিতায় দেবার চেষ্টা করা গেল— যিনি নেবার চেষ্টা করবেন তিনি বোধ হয় পাবেন। / কড়ি ও কোমল থেকে আরো দুটো চারটে পুরোণো জিনিষের নূতন সংস্কার করে দেওয়া যেতে পারবে— এম্‌নি করে শিশুখণ্ডে পুরাতন নূতনের সম্মিলন হবে। [আনুমানিক তারিখ : ১ ভাদ্র ১৩১০]

যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। মিস্ত্রি ঠুক্‌ঠাক করচে— বিপিনের অভ্রভেদী কণ্ঠস্বরে দেবতাত্মা হিমালয় কম্পমান। একটি সংসারের থালা ঘটি বাটি কাপড়চোপড় ওষুধবিষুধ, কাঁচের পিতলের কাঠের চামড়ার ছোটবড় মাঝারি নানা আবশ্যক অনাবশ্যক সামগ্রীপুঞ্জকে চারিদিক থেকে সংগ্রহ করে যথোপযুক্ত স্থানে গুটিয়ে এনে বন্ধ করা বিষম ব্যাপার। জড়পদার্থের কেবল একটি মহদ্‌গুণ আছে সে কথা কয় না— কিন্তু আর সকল বিষয়ে তার একগুঁয়েমির অন্ত নেই।··· / নামকরণ। "শিশুর বিজ্ঞান" না বলে শুধু "বিজ্ঞান" নাম দিলেই হয়। "ছোটবড়" কবিতায় গুরুমহাশয়[২০] ও দিদিমা সংক্রান্ত দুটো শ্লোক পরিত্যাগ করবেন। / প্রেমতোষবাবুর প্রেমকে আমি বড় ডরাই। ক্ষণিকা ছাপতে তিনি ছ মাস করেছিলেন।···যাই হোক্ চার পাঁচটা প্রেসে ছড়িয়ে দিলে কাজ হয়ত এগোতে পারে।···/ শিশুখণ্ডের একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়ে দিতে পারেন।[২১] আমার মনে হয় প্রত্যেক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বোঝাবার মত গুটিকতক কথা, হয়, তাদের আরম্ভভাগে নয় পরিশিষ্টে দিলে মন্দ হয় না। তাতে সেই খণ্ডের দুর্ব্বোধ বা বিশেষ আলোচ্য কবিতার ব্যাখ্যা চল্‌তে পারে। সাধারণ ভূমিকার মধ্যে এটা সম্ভব হয় না। কতকটা Golden Treasuryর প্ল্যানে করা যেতে পারে। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার অত্যন্ত অভাব থাকাতে এরকমের একটা অবলম্বন সাধারণ পাঠকের দরকার হয়।··· ইতি বৃহস্পতিবার [৩ ভাদ্র ১৩১০]

২০ এই স্তবক (দ্বিতীয়) রাখা হইয়াছে। ২১ কোনো গদ্যভূমিকা দেওয়া হয় নাই।

কাল কলিকাতায় যাত্রা করব।[২২]… / …একটা আস্ত নতুন বইয়ের বোঝা। বোঝা আমি ত নামালুম এবারে আপনাদের কাঁধে পড়ল। এবারে ছাপাখানায় খুব ঘন ঘন তাগিদ লাগান্। আর বিলম্বমাত্র না করে শিশুখণ্ড আপনার পছন্দমত যে কোনো ছাপাখানায় হোক চড়িয়ে দিন্। ছাপ্তে ছাপ্তে শিশু যেন বৃদ্ধ হয়ে না যায়। ইতি রবিবার [৬ ভাদ্র ১৩১০]

২২ এ চিঠির কতক অংশ ৩৫-৩৬ সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে পূর্বেই সংকলিত।

গাথা-সপ্তশতী। অনুবাদ শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯।
দাম ১২·০০ টাকা।

গাথা-সপ্তশতী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত অতিপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আধুনিক যুগে বাংলা দেশে প্রাকৃতের চর্চা কেউ করেন না। কিন্তু একদা এই বাংলাদেশেই পণ্ডিতেরা প্রাকৃত-ভাষায় রীতিমত অনুশীলন করতেন। বাঙালী বৈয়াকরণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অংশরূপে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ জুড়ে দিতেন। বিশাল আকাশে পাখি ওড়ে তার দুটো পাখায় ভর দিয়ে, এক পক্ষে ওড়া সম্ভব হয় না। বিশাল ভাবরাজ্যে বিচরণ-মহাপণ্ডিতের বেলাতেও একমাত্র সংস্কৃত-পক্ষে ভর দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না, তাতে ভাবের অনেক রাজ্যই অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। সুবিশাল প্রাকৃত সাহিত্যের রসগ্রহণ না করলে ভাবরাজ্যের দৈন্য ঘোচে না। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলতেন, "সংস্কৃত জানলেও আমি অপ্রাকৃতজ্ঞকে অর্ধশিক্ষিত বলি।" কাব্যে মহাকাব্যে নাটকে গাথায় এত বড় একটা বিরাট সাহিত্যের খোঁজ আমরা রাখি না, এর মত দুর্ভাগ্য জাতির পক্ষে আর হতে পারে না। প্রবর সেনের সেতুবন্ধ মহাকাব্য টীকাসমেত এই বাংলা-দেশেই আবিষ্কার করে ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক প্রশংসার্হ কাজ করেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভাষা প্রাকৃতেরই সংস্কৃত রূপ— এ কথা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। প্রাকৃতসাহিত্যে বাঙালীর রসজ্ঞান একদা প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল।

কিন্তু যা বলছিলাম, সকল প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে মাধুর্যে এই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত। ভাষার মাধুর্যে এবং রচনার চাতুর্যে গাথা-সপ্তশতীর তুলনা নেই। রচনার চাতুর্য এবং ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত এই গ্রন্থের প্রায় প্রতি গাথায় রয়েছে। এইজন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রসিক আলংকারিকগণ উৎকৃষ্টতম রচনার নিদর্শন দেখাতে প্রায়শই গাথা-সপ্তশতী থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন এবং ঐসব স্থানে ধ্বনি কাব্যের উৎকর্ষ অনুধাবন করেছেন। বাগবন্ধের চাতুর্যে, রসের গাঢ়তায়, শব্দের মাধুর্যে এবং ধ্বন্যর্থের গৌরবে গাথা-সপ্তশতী অতুলনীয় কাব্য। বাংলাভাষায় এই রসকুম্ভকে ঢেলে দেবার প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সেই মহৎ কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

নানা প্রকারের অনুবাদ হয়। কথায় কথায় অনুবাদ করে অনেক সময় ভাব ঠিক ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এইজন্য অক্ষরার্থ গৌণ করে অনেক সময় মূলভাবের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে স্বাধীনভাবে পদসঞ্চার করতে হয়। এটা ভাবানুবাদের পন্থা। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুসরণে অগ্রসর হয়েছেন। গাথাগুলির মধ্যে নিহিতার্থের ব্যঞ্জনাই সর্বস্ব। যা প্রাকৃতে একটু অবকাশে সহজে ফোটে তা বাংলায় সংকীর্ণ পরিধিতে ফুটতে চায় না। মূল গাথা-সপ্তশতী সান্দ্র, গাঢ়-পিনদ্ধ; অনুবাদকে হতে হয়েছে বিশ্লেষধর্মী। কিন্তু সানন্দে ঘোষণা করতে পারি, অনুবাদকের অনুবাদ কোথাও কেন্দ্রচ্যুত হয় নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল গাথা-সপ্তশতীর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সহসা অর্থবোধে চিত্তপ্রসাদ ঘটে না। ধ্যান করতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মানসপ্রত্যক্ষ করতে হয়— তবে ঠিক-ঠিক রসটি আসে। আমার মনে হয়, প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে নবীন যুগ পর্যন্ত টীকাকার-সম্প্রদায় এইজন্যই ব্যাখ্যার প্রারম্ভে পরিবেশের ভূমিকা করে নিয়েছেন। অনুবাদক এই সঙ্কট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ

হয়েছেন। অনুবাদে উপরি কথা বলবার উপায় নেই। তিনি তাঁর অনুবাদে এমন কথার বাঁধুনি দিয়েছেন যে পরিবেশের সূত্রটি আপনি এসে গেছে। এই দিক দিয়ে তাঁর ঝরঝরে স্বাদু অনুবাদে শুধু সুখী নয়— চমৎকৃত হয়েছি। স্থানকাল ঘটনা এমন সহজে এসেছে যে তাঁর অনুবাদকে মৌলিক সৃষ্টি বলতে কোনো আপত্তি থাকে না। প্রাকৃত বা সংস্কৃত ভাষা না জানলেও, মূল না দেখলেও একে সুখপাঠ্য প্রসন্ন রচনা বলে মনে হবে। গাথা-সপ্তশতীকে আমার চিরকাল মনে হয়েছে— এ যেন আঙুরের রস। অনুবাদেও আমি সেই রস পেয়েছি।

আমি মনে করি, নিজে কবি না হয়ে কাব্যব্যাখ্যাও করা চলে না, অনুবাদ-কার্যেও অগ্রসর হওয়া যায় না। সপ্তশতীর সাত শো গাথার সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা অনুবাদক এমন অবলীলায় করে গিয়েছেন যে আমি তাঁকে 'কবি' বলে অভিনন্দিত করতে পারি। আমি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি একখানা প্রাচীন কাব্যের রসক্ষেপ কেমন করে একজন আধুনিক কালের মানুষকে তন্ময় ক'রে তুলেছে। কারণও আছে, গাথা-সপ্তশতী মানব-মানবীর হৃদয়ের চিরন্তন কথা। কালচক্র চলেছে কিন্তু হৃদয়রাজ্যের মৌলিক অংশের তো কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ঘটে না বলেই সপ্তশতী আজও 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার আধুনিকতা সম্মুখে রেখেও বুঝি বলা চলে 'হালোচ্ছিষ্টমিদং জগৎ'।

ভূমিকায় বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গাথা-সপ্তশতীর মত অনিবদ্ধ বা টুকরো টুকরো কবিতা সংকলনের রূপ-বিচারেও এই কাব্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের তৌলন পন্থায় এবং এই কাব্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারে গ্রন্থকার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে একজন নিরপেক্ষ বিচারক এবং ভাবুক সমালোচক বলে গ্রহণ করতে পারি।

অন্ধ্রবংশের বিস্তৃত ইতিহাস ও অন্ধ্র-সাম্রাজ্যের মানচিত্র গ্রন্থগৌরব বর্ধিত করেছে। ভাষাতাত্ত্বিক টিপ্পনী কাজের কাজ হয়েছে। দেশী শব্দগুলির মূল নির্দেশ পরবর্তী সংস্করণে আশা করব। আর আশা করব গাথাছন্দের সম্যক্ বিশ্লেষণ।

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

A BOOK OF BENGALI VERSE, Compiled & Edited by Nandagopal Sengupta, Indian Publication, Calcutta 1, Price Re 1·00

গত শতকের প্রারম্ভেই বাংলা কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ শুরু হয়। কওয়েলএর 'চণ্ডীমঙ্গল' (এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রথম প্রকাশিত), চ্যাপম্যানের 'বাংলা ধর্মগীতি' বা টম্‌সন ও আর্চারএর 'বাংলা শাক্ত পদাবলী' ইংরেজিতে প্রকাশের বহু আগে কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কবিগানের তর্জমা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'এরও তর্জমা করেন। সাম্প্রতিক কালেও বেশ কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। তার মধ্যে সিগ্‌নেট প্রেস প্রকাশিত 'মডার্ন বেঙ্গলী পোয়েমস্' বা 'বেঙ্গলী লিটারেচার কোয়ার্টারলি' পত্রিকা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা 'ডম্বরু' পত্রিকাও এবিষয় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত -কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত আলোচ্য বইটি এর একটি

উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই সংকলনেই প্রথম চর্যাপদ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত হাজার বছরের শতাধিক কবির কবিতা একত্র সংকলিত হয়েছে। সংকলিত হয়েছে বৌদ্ধ চর্যাগীতি, বৈষ্ণব কবিতা, পৌরাণিক গাথা, শ্যামাসংগীত, বাউল প্রভৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের সমাজ-সচেতন কবিতা পর্যন্ত সবই।

কবিতা কি, তা নিয়ে বহু বিতর্ক, বহু আলোচনা হয়েছে। অসংখ্য মুনি অসংখ্য মত ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্যদর্পণে আছে 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'। কিন্তু রস কি? কিই বা রসাত্মক, সে চেতনাই তো যুগে যুগে পরিবর্তিত। তেমনি পরিবর্তিত সাধনার পথ। দশম একাদশ শতকে চর্যাপদে যে বাংলা কবিতার জন্ম বহু পথ অতিক্রম করে তা আজকের রূপ পেয়েছে, সে যুগের ভাষা ছন্দ বক্তব্য কিছুই আজ মেলে না, অথচ উভয়ই সমান আগ্রহে, সমান দরদে পঠিত।

চর্যার শতাধিক বছর পরে, বাংলায় সেন-রাজাদের রাজত্বে, পুনরায় সংস্কৃতে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে দরবারী সাহিত্যের পুনঃ সূচনা দেখা দিল। জয়দেব লিখলেন গীতগোবিন্দ, অবশ্য সংস্কৃতে রচনা করেও জয়দেব বাঙালী কবিই রইলেন। এবং তাঁর রচনার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিল বাংলা কাব্যসাহিত্যে। ভাষা হয়ে উঠল অলংকারবহুল, ঘটল রসের প্রাধান্য। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সৃষ্টি হল রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা সংস্করণ। সহজ ভাষায় ও ভাবে সাধারণের হৃদয় জয় করতে একালের সাহিত্যের সময় লাগে নি। লেখা হল নানা মঙ্গলকাব্য। বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিরা মৈথিলী উপভাষায় রচনা করলেন কৃষ্ণের লীলাকীর্তন।

বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশাল কাব্যসাহিত্যের একটি প্রতিনিধিমূলক সংকলন তৈরী করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি পরিশ্রমসাপেক্ষ। কবির সংখ্যা বহু। ভালো কবিতার সংখ্যা আরও অনেক। যে কোনও সংকলনে বহু ভালো কবিতা তথা কবি বাদ পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সে সংকলন যদি বিদেশী পাঠকের জন্য অনুবাদের সংকলন হয়। সেখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন থেকে যায় সার্থক অনুবাদের। সুন্দর অনুবাদ সার্থক নাও হতে পারে— বিশেষতঃ কবিতার। মূলের চিত্রকল্প ধ্বনি ও ছন্দোমাধুর্য বজায় রেখে ভালো অনুবাদ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরণের বেশ কয়েকটি অনুবাদ এই সংকলনে পাওয়া গেল।

অধিকন্তু এই বইএর মুখবন্ধে শতাব্দী অনুযায়ী দশম শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তদানীন্তন কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের যে chronological chart সম্পাদক প্রস্তুত করে দিয়েছেন তা এই সংকলনের মূল্য অনেক বাড়িয়েছে, তবে এই সঙ্গে যদি একটি সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি দেওয়া হত, তাহলে সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

প্রদীপ্ত সেন

বাংলা সমালোচনা পরিচয়। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি, কলিকাতা ১২। মূল্য ১২.৫০ টাকা।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলার শিক্ষিত মহলে তিন যুগ ধরে একটি অতি সুপরিচিত নাম। ইংরেজিতে ও বাংলায় তাঁর সমান অধিকার। দুই সাহিত্যক্ষেত্রেই তিনি অবাধে বিচরণ করেন, তা ছাড়া সংস্কৃত রস-সাহিত্যেও তাঁর বিপুল জ্ঞান। তিনি কৃতী অধ্যাপক, গুণী বিচারক, সুধী মননশীল লেখক বলে পরিচিত।

তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদল বহুবিস্তৃত। এসব বিশেষণ আজকের আলোচনায় প্রক্ষিপ্ত মনে হলেও যে বিশেষজ্ঞের চিন্তাধারা-প্রসূত বিচার-বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ সমালোচনার রীতি বা সাহিত্যের বিশিষ্ট ভাবমূর্তির বা রসপ্রতীতির আলোচনার কথা আমরা উপস্থিত করছি, তিনি কী ও কে, সেটা সামান্য একটু জানা থাকলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশৈলীকে বুঝবার ও বোঝাবার সাহায্য করবে।

তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারার প্রসঙ্গ নিয়েই এবং সমালোচনার স্বরূপ কি হওয়া উচিত— তত্ত্বের দিক থেকে, তথ্যের দিক থেকে, জীবন জিজ্ঞাসার রূপ থেকে, যুগযন্ত্রণার পরিচিতি থেকে— তারই একটি সঠিক নির্দেশিকা এই গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করেছেন।

আসলে সাহিত্য যদি রচয়িতার সমগ্র মনের সৃষ্টি হয়, তা হলে পাঠককে এর সামগ্রিক পরিচয় দেওয়াই সাহিত্য-সমালোচকের কাজ। কিন্তু লেখকের সামগ্রিক মন দেশকাল-অতীত নয়, নীতি-নিরপেক্ষ নয়, নিয়ম-বহির্ভূত নয়, এবং তাঁর সৃষ্টিতে পরিবেশের প্রভাব পড়তে বাধ্য। দু-একজন বিরাট শিল্পীকে দেখা যায় যাঁরা পথিকৃৎ— নিজের সৃষ্টি দ্বারা ক্ষমতার দ্বারা কল্পনার দ্বারা সাহিত্যের নিয়ম ও নীতিকে বদলে দিতে পারেন। সমালোচনার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে লেখক রোমাণ্টিক ক্লাসিকাল ও রিয়েলিস্ট সমালোচনা -পদ্ধতির যে সুষ্ঠু ও জ্ঞাতব্য আলোচনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় এক নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেয়। অবশ্য একটি কথা মনে রাখা উচিত যে এই ধরণের সমালোচনা-সাহিত্য স্বাভাবিক ভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এর মধ্যেও নানা শ্রেণীবিভাগ স্তরবিভাগ আছে, যেমন ক্লাসিকাল বা রিয়েলিস্ট। দুই পক্ষই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সমালোচনার ক্রম নির্দেশ করতে পারেন, এবং নিজেদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেন সেই মাল-মসলার পরিপ্রেক্ষিতে।

লেখক বলেছেন যে বাংলা সাহিত্য সমালোচনা বিভাগের বয়স কিঞ্চিদধিক এক শো বছর, অর্থাৎ কালের হিসাবে সম্পূর্ণভাবে এই যুগেরই কীর্তি এবং সেই কারণেই আমরা সাধারণভাবে ধরে নিই যে এই রীতি পাশ্চাত্য সমালোচনা-ধারার দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত ও বিধৃত। এই রীতিশাস্ত্রের উদ্ভব প্লেটোর জিজ্ঞাসায়, এরিস্টটলের 'পোয়েটিকসে', গ্রীক রসিকদের মনে এবং বার্নার্ড শ'র ভাষার একটু অদল বদল করে বলা যায় যা চলে আসছে 'in apostolic succession from Aeschylus to myself'। কিন্তু তারও পরে পাশ্চাত্য সমালোচনায় যে একটা নূতন স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, সে কথাও লেখক স্বীকার করেছেন। গড়ে উঠছেন একদল যাঁরা বাক্যগঠন শব্দচয়ন রূপকল্প প্রকাশভঙ্গীকেই প্রাধান্য দেন। ভাষাতত্ত্ব (linguistics) ও শব্দার্থবিদ্যা (semantics), এই দুই শাস্ত্রের আজ খুব প্রসার। লেখক ঠিকই বলেছেন যে কোলরিজ-ব্র্যাডলি-পন্থী সমালোচনা ও আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা— এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে, তার মূলে আছে বাক্ ও অর্থের বিচ্ছেদ। আমি যদি কালিদাসের কালে জন্মাতাম তাহলে বলতাম যে বাক্-অর্থ যদি সম্পৃক্ত না হয় তাহলে বাগর্থের প্রতিপত্তি হবে কোথা থেকে— এই অর্ধনারীশ্বর মিলনই সাহিত্যের আস্বাদকে অ-লৌকিক করে তোলে, বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে। তাই সংস্কৃত সাহিত্য -তত্ত্ববিদ্‌দের মতে কাব্য কাব্যই, ইতিহাসও নয়, অর্থনীতি বা সমাজনীতির ব্যাখ্যাও নয়। ভারতীয় আলংকারিকরা এই বলে অনেক সমস্যাকে এড়াতে গিয়েছেন, কিন্তু অন্যভাবে সমাধান করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তাঁরা বাক্যার্থকে গৌণ করে ধ্বনিপ্রধান কাব্যকেই উত্তমোত্তম কাব্য বলে থেমে গেলেন। গ্রন্থাকার একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন তুলেছেন— সমালোচনার সার্থকতা

কি? নিন্দা, প্রশংসা, সম-আলোচনা বা দোষগুণ-নির্ধারণ?— কবি লেখেন তাঁর নিজের রসানুভূতিতে, পরিবেশের চাপে, প্রকাশের দাবীতে— অবশ্য আজকাল প্রচারধর্মী সাহিত্যও গড়ে উঠছে— কিন্তু আসলে সত্যিকার সাহিত্যের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করাই সমালোচকের কাজ— তবে সে সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ হওয়া চাই।

বাংলা সমালোচনার প্রথমযুগ, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমোত্তর সমালোচনা, তার সূত্র ও প্রয়োগ, সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকদের নানা আলোচনা, শরৎচন্দ্রের কথা, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত'র রসতত্ত্ব, রবীন্দ্রোত্তর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য এবং সর্বশেষ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যরসোপলব্ধির একটা সুষ্ঠু ও সঙ্গত বিচার এই গ্রন্থে আছে। সহৃদয় পাঠকরা দেখবেন যে এই ধরণের আলাপ-আলোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণ, তার রীতিনীতি নির্ধারণের উপায় ও অপায় সাধারণভাবে ওয়ালটার পেটার, কোলরিজ, ব্র্যাডলি, ক্রোচে, আনন্দবর্ধন, মল্লীনাথ, নীলকণ্ঠের দু-একটা ভাসাভাসা পংক্তি উদ্ধৃত করলেই সুষ্ঠু হয় না— পুস্তকটির সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে মতানৈক্য না হলেও তার প্রতিটি ছত্রে গভীর অধ্যয়ন, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ধরণের বিচার আজন্ম পঠন-পাঠন সাধনার পরিচয় দেয়।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা শুধু একটি বিপুলায়নতন বিশিষ্ট ক্ষেত্রই অধিকার করে নেই, তাঁর উদ্দেশ্যগত নিষ্ঠাও লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। সুবোধবাবুই প্রথম যিনি বৈজ্ঞানিকভাবে তাঁর অবলম্বিত রীতিনীতির একটা সমগ্র পর্যালোচনা করলেন। এটাকে গুরু-দক্ষিণা বলব না, বলব সমগ্রতার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত একজন ন্যায়নিষ্ঠ রসিক ব্যক্তির সৃষ্টি-দৃষ্টিযোগের সুষ্ঠু প্রয়োগের ব্যাখ্যা— যেখানে প্রয়োজনের যুগে আনন্দের যোগ ও বুদ্ধির যোগ, দ্বৈত মিলনে অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞাটিকে ধরবার চেষ্টা করেছে এবং বহুলাংশে সফল হয়েছে। শ্রীকুমারবাবুর সেই ক্ষমতা ছিল ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য ও অনুরাগী সুবোধবাবুর তা আছে। সাহিত্য অ-লৌকিক অনুভূতির রূপায়ণ বটে, কিন্তু তার প্রকাশের পারিপাট্যের, গঠনের সুষমার ব্যঞ্জনা, বৈচিত্র্যের, ঔচিত্যের মূল্যও দিতে হয়। এক দিকে যেমন উপলব্ধির নিবিড়তা আর-এক দিকে তেমনি প্রসাধনের নিপুণতা— সাহিত্য রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি। দুই মিলেই তার রসায়নবিদগ্ধ স্বরূপ, তার ন্যায়নির্ণয়, সামগ্রিক ছন্দ, শব্দনির্ভর সৌষম্য হৃদি প্রতীয্যা। যে যুগে যে সাহিত্য গড়ে উঠবে সে যুগের স্বাদ আহ্লাদ, সুখ দুঃখ, ভাব ভাবনা, আনন্দ বিক্ষোভ, সমাজচেতনা তাতে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সাহিত্য শুধু craftsmanship বা কারুশিল্প নয়, শুধু রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি নয় (রসের অর্থ যদি আজকের পরিভাষায় সীমিত করে ধরি), ধ্বনির আলোকে নয় (এখানেও ধ্বনি অর্থাৎ rhythm কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে বলছি), চরিত্র-চিত্রায়ণে নয়, একটা সমগ্রতার অনির্বচনীয়তায়।

সমালোচনা-রীতি শুধু কি objective assessment, না, subjective valuation, না, intuitive process এই সম্বন্ধে বিচার করতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "The Future Poetry"তে বলেছেন— Everywhere is a seeking after some new thing, a discontent with the moulds, ideas and powers of the past, a spirit of innovation, a desire to get at deeper powers of language, rhythm, form, because a subtler and vaster life is in birth. There

are deeper and more significant things to be said than have yet been spoken and poetry, the highest essencee of speech, must find a fitting voice for them। কিন্তু তাহলে কি 'রীতিষু রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতম্' আলংকারিকদের এইসব কথার কোনো মূল্য নেই, না, শ্লেষ ওজঃ প্রভৃতি গুণের ? সুবোধবাবুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনিই প্রায় প্রথম দেখালেন যে, তা নয়, সব কিছুকেই সমালোচনা-রীতিতে মিলিয়ে দেওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যের ও তার রসপ্রস্থান বিচারের প্রধান কৃতিত্বই হচ্ছে রসকে অলংকার হতে মুক্ত করে দেখা এবং অলংকারের অঙ্গত্ব প্রতিপাদন করা। রস বা রসনিষ্পত্তি এক নয়, কল্পনার প্রত্যক্ষতা আর ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষতা এক নয়। কিন্তু এই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, সাহিত্যিক তো জীবনের তাগিদে ও প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন এবং তিনি 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা' পরেন। বলা বাহুল্য ব্রহ্মের গুণাবলীকে কাব্যের আচ্ছাদনে আবৃত করতে যাওয়ার চেয়ে Skylark নিয়ে সংগীত রচনা সহজ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কাব্যে চিন্তা বা আধ্যাত্মিকভাব বা সত্যের বাচন থাকবে না। দার্শনিক বিচার করেন নি এমন কোনো মহাকবি পৃথিবীতে নেই। শেলী Skylark সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যেমন লিখলেন স্বাগত স্বাগত হে মূর্ত আনন্দ (Hail to thee blithe Spirit) তেমনি লিখলেন— জীবন বহুবর্ণ ঝড়ের গম্বুজ যেন রঞ্জিত করেছে শাশ্বতের শুভ্র প্রভাকে (Life, like a dome of many coloured glass, stains the white radiance of Eternity)। সংগীত শিল্প কাব্য সেই আদিকাল থেকেই মানুষের গভীরতম ও মহত্তর দৃষ্টিকে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

লেখক দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত সমালোচক বঙ্কিম ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথও বিশ্বনাথের "অপপ্রভাব" থেকে মুক্ত নন্ (পৃ ৬১)। সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের New Essays in Criticism বা The Neo-Romantic Movement in Literatureএর কথাও তিনি সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন। কিন্তু সমালোচকের শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে "তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা হিসাবে উপস্থাপিত করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টিকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়া দেখেন" (পৃ ১৫৮-১৫৯)। সাহিত্যিকের সাহিত্য বিচারে তাঁর ভাবমূর্তিকে নিছক সাহিত্যিক হিসাবে দেখাই উচিত এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য যদি তার জীবনের অন্য প্রকাশময় দিক থাকে সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা। তা ছাড়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে তিনি তো শুধু সাহিত্যিক বঙ্কিমকে নিয়েই আলোচনা করেন নি, তিনি করেছেন সমগ্র বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা। সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়েও কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে এবং অনেক সময় অতিশয়োক্তির জাল বুনে রবীন্দ্রসাহিত্যকে আমরা ঝাপসা করে ফেলেছি এ প্রতিবাদও সত্য। অজিত চক্রবর্তীর মত রবীন্দ্রনাথের উপর সামগ্রিক দৃষ্টি অনেক সমালোচকেরই নেই, তবু সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যিনি নিজের প্রেরণায় সৃষ্টি করেছেন তিনি সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-বিশ্লেষণ নিয়মানুসারে করেছেন কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন তর্কাতীত নয়।

লেখককে ধন্যবাদ যে তিনি সমালোচনা-সাহিত্যের আলোচনায় এক নূতন দিগ্‌দর্শন করলেন যদিও এ পথে প্রথম চরণধ্বনি আমরা শুনেছিলাম অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ধ্বনিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদকে মিলিয়ে দেবার প্রয়াসে।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী)। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ভারতী বুক স্টল, কলকাতা ৯। মূল্য ১৫·০০ টাকা।

সমুদ্র-মন্থন ক'রে সংগৃহীত হয়েছিল গরল ও অমৃত। সুখময়বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ঐতিহাসিকের জাল বিস্তার ক'রে মধ্যযুগের বাংলার স্বাধীন রাজাদের ইতিহাস আহরণ করেছেন। তাঁর সাধনা কেবলমাত্র ফার্সী বই, শিলালিপি বা মুদ্রাতেই সীমাবদ্ধ নয়; সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত বই থেকেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আকর বইগুলির মধ্যে কোন্‌টি নির্ভরযোগ্য, কোন্‌টি প্রশস্তিমূলক, কোন্‌টি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তা লেখকের অজ্ঞাত নয়। ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থের মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা তাঁর অনলস। সত্যের উৎস সন্ধান করবার জন্য তাঁর প্রয়াসের মধ্যে কোনো বিরাম নেই, কোনো অন্ধবিশ্বাস নেই। এর ফলে সুখময়বাবুর ভাষায় নাই ঔদ্ধত্য, বিচারে নাই পক্ষপাতিত্ব, দৃষ্টিতে নাই কল্পনাবিলাস।

ইতিহাসের যাত্রাপথে অনেককেই দেখা যায়। ঐতিহাসিকের দক্ষতা অনুসারেই রাজনীতি-তরঙ্গের উত্থান-পতনে শাসকশ্রেণীর সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে। সুখময়বাবু ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের কাল থেকে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মহ্‌মুদ শাহের পতনের সময় পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন। অনেক স্থলেই তিনি যেমন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সৈয়দ হাসান আস্কারী, আবদুল করিম, দানী প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের অবদান স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার নানা স্থানে তাঁদের ভ্রান্তি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। সুখময়বাবুর যুক্তি অনুধাবন করলে আর সন্দেহ থাকে না যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সঙ্গে ফিরোজ শাহ তুগলকের দু বার সংঘর্ষ হয়েছিল এবং দিল্লীর সুলতান চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারেন নি। এরূপ অন্যান্য সন্দেহও তিনি দূর করেছেন, যথা, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে পারস্যের কবি হাফীজের যোগাযোগ; হিন্দুরাজা গণেশ ও দনুজমর্দনের অভিন্নতা। হাব্‌শী রাজাদের সম্বন্ধে তিনি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্যান্য কোনো কোনো ঐতিহাসিকের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। চারজন হাব্‌শী সুলতানের মধ্যে নিঃসন্দেহ-রূপে ফিরোজ শাহ ও মুজাফ্‌ফর শাহ কেবল হাব্‌শী ছিলেন। ফিরোজ শাহের মতন সুযোগ্য সুলতান বাংলাদেশে বিরল ছিল। রায়মুকুট বৃহস্পতি মিত্রের সঙ্গে বার্‌বক্‌ শাহের সম্বন্ধ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম দেখান। সুখময়বাবু অধিকতর সুদৃঢ় যুক্তির সঙ্গে সুলতান বার্‌বক্‌ শাহ এবং রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের ও কৃত্তিবাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন।

সুখময়বাবুর কৃতিত্ব পূর্বসূরীদের যুক্তির সংযোজনেই সীমাবদ্ধ নয়। গণেশ, রুক্‌নুদ্দীন বার্‌বক্‌ শাহ ও আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সম্বন্ধে তিনি বহু নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা'র প্রাচীন পুঁথিদ্বয়ের ব্যবহার ইতিপূর্বে মাত্র কয়েকজন ঐতিহাসিক করেছেন। সম্ভবতঃ সুখময়বাবু প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি গণেশ ও ইব্রাহিম শার্কির বিরোধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। সত্যপীরের প্রবর্তক যে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নন— এ দেখানোও তাঁর অন্যতম অবদান। অন্যদিকে আবার তিনি প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্যও করেছেন। অর্থাৎ, নিজের সন্দেহগুলি পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করেছেন, যথা, বিদ্যাপতির পদে উল্লিখিত 'গ্যাসদীন সুরতান' (পৃ ৮৭-৮৯); তিনি লিখেছেন যে ঐ পদের রচনা একমাত্র মৈথিল বিদ্যাপতি ব্যতীত অন্য কোনো কবির হতে পারে না

এরূপ ধারণা যুক্তিসংগত নয়, কেননা লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত সব পদগুলি বিখ্যাত বিদ্যাপতির নয়। পূর্বোক্ত পদের ভনিতায় যে গিয়াসুদ্দীনের উল্লেখ রয়েছে তিনি দিল্লীর সুলতান প্রথম বা দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তোগলক হতে পারেন না, এর কারণ হল যে প্রথম গিয়াসুদ্দীন বিদ্যাপতির সমসাময়িক নন এবং দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন একজন নগণ্য সুলতান ছিলেন। 'গ্যাসদীন সুরতান' যে বাংলাদেশের কোনো গিয়াসুদ্দীন—গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৯১-১৪১০ খ্রী) বা গিয়াসুদ্দীন মহমুদ্ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রী)—তা নিশ্চিতরূপে স্থির করা যায় না। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কাব্যরসিক হলেও তিনি বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহের শত্রু ছিলেন। আবার, গিয়াসুদ্দীন মহমুদ্ শাহ অপদার্থ বিলাসী ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির সুলতান ছিলেন।

আলোচ্য বইটির শেষের তিন অধ্যায়ে লেখক তদানীন্তন কালের শাসন ও সামরিক-ব্যবস্থা, স্থাপত্য-কীর্তি এবং সমসাময়িকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বিবরণ দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে একাদশ অধ্যায়টি (সমসাময়িকের দৃষ্টিতে ঐ যুগের বাংলাদেশ) গবেষকদের পক্ষে খুবই উপযোগী। অন্য কোনো লেখকের বইতে এরূপ একত্রে আকর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ নাই।

আধুনিক কালে গবেষণার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। একটি বইতে যাবতীয় তথ্যের চর্চা অসম্ভব। সেইজন্য হয়তো তিনি সামসুদ্দীনের পুত্র কুৎলুখানের উল্লেখ করেন নি। 'মুখজন-মওয়ানী' থেকে জানা যায় যে তিনি ধর্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুখময়বাবু মহমুদ শাহী বা হুসেন শাহী আমলে বিহারের চেরু ও উজৈনিয়া রাজপুতদের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা লেখেন্ নি। বাংলার সুলতানদের রাজ্যবিস্তারের আলোচনাকালে সব তথ্য দেওয়া সম্ভবপর যে নয় তার অন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুখময়বাবু লিখেছেন, "বিহারের কতকাংশ যে নাসিরুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই" (পৃ ১৮১)। কিন্তু জৌনপুরের রাজা মহমুদ্ শাহের আমলের ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে তাঁর অধীনস্থ বিহারের মুক্তি (muqti) নাসীর ইবন্ বহর্এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরই আমলে ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আরো দুটি শিলালিপি বিহারে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং অন্তত ১৪৪৩ ও ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের অধিকাংশ ভূভাগ শার্কিদের অধীনে ছিল। হয়তো কেবলমাত্র ভাগলপুর অঞ্চল বাংলার সুলতান নাসীরুদ্দীনের অধীনে ছিল। সুখময়বাবুর বিচারশক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি বলেই সামাজিক ইতিহাসে সুফীদের কেন্দ্র এবং তাঁদের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চাই। সুফী সাহিত্য-আলোচনা কালে রাজনৈতিক ইতিহাসের নূতন তথ্য পাওয়া যাবে। 'মলফুজুস্-সফর' থেকে জানা যায় যে ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ বাংলার নৃপতি ছিলেন। সুতরাং মুদ্রা ছাড়াও ঐ সুলতানের নাম আকর গ্রন্থে পাওয়া গেল।

লেখক বইটির পরবর্তী সংস্করণে যদি সব আকর গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা সন্নিবেশিত করেন তা হলে গবেষকদের বিশেষ সুবিধা হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন সুলতানদের আমলে শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কোথায়? যে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ পাল ও সেন আমলে হয়েছিল তার পরিণতি মুসলমান রাজত্বকালে কিরূপ হল? প্রান্তীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পার্থক্য কোথায়? তৃতীয়তঃ, মধ্যযুগে বাংলার সমৃদ্ধির মধ্যে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে কেন কড়ির ব্যবহার আর কেনই-বা বাঙালী ক্রীতদাসদাসীরূপে রূপান্তরিত? চৈনিক ফেই-শিন (১৪৩৬ খ্রী) ভেনিসীয় নিকলো কন্তি (১৪১০-১৪১৯ খ্রী), ইতালীয় ভারথেমা (১৫০৩-১৫০৮ খ্রী) প্রভৃতি পর্যটকেরা লিখেছেন যে বাংলাদেশ থেকে সোনা রূপা সাটিন রেশম

মূল্যবান পাথর এবং মুক্তা রপ্তানী হত (পৃ ৪৮৩, ৪৮৫)। ভারথেমা বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখেছেন, "এখানেই আমি সবচেয়ে ধনী বণিকদের দেখা পেয়েছি। এই স্থানে প্রতি বছর পঞ্চাশটি জাহাজ তুলা ও রেশমের দ্রব্যে (রপ্তানীর জন্য) বোঝাই হয়" (পৃ ৪৯৩)। সুতরাং মা হোয়ান ও পূর্বোক্ত পর্যটকেরা দেখেছেন যে এক দিকে বাংলা থেকে সোনা রপ্তানী হত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হত, অথচ অন্য দিকে সাধারণ ক্রয়বিক্রয় কড়িতে চলত। এ ধরণের পরিস্থিতি বিরল।

ভকতপ্রসাদ মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য। প্রণবরঞ্জন ঘোষ। লেখাপড়া, কলিকাতা-১২। দাম ৮·০০ টাকা।

যে গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালী-মানসের আলোচনা থাকে তা স্বতই আমাদের কৌতূহল আকর্ষণ করে। অধুনা গতিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আমরা কালের আকাশে নিত্য ধাবমান হলেও অতিক্রান্ত অতীতের প্রতি নীরব ঔদাসীন্য দেখাতে পারি না। কারণ দুপায়ে চলার মতো মানুষের চেতনাও দুপায়ের উপর ভর দিয়ে চলে। বর্তমানের সেতুর মারফতে অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্পর্ক স্থাপনই মানব-ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড়ো কথা। বাংলা দেশের উনিশ শতকের ইতিহাস যে বিচিত্র মনন-প্রকৃতির প্রভাবে গড়ে উঠেছে সাহিত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়বে। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ বেশ কিছুকাল ধরে বাঙালীর উনিশ শতকী মননধারা সম্পর্কে গবেষণা করছেন, ইতিপূর্বে তাঁর দুখানি গ্রন্থে ('বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ') এই পর্বের প্রধান দুটি ভাবরূপের যে আলোচনা করেছেন, তা থেকেই তাঁর বক্তব্যের স্বরূপ বোঝা যাবে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার গাত্রাবরণ তুলে ফেললে দেখা যাবে তার তলায় রয়েছে হেলেনীয় ঐতিহ্যের সুদৃঢ় গ্রানাইট শিলা। তেমনি আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতির অন্তরালে গত শতাব্দীর সাধনা ও ধ্যানধর্ম বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করে অজস্র চরিতার্থতার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। বাঙালী-মানসের সেই তীর্থযাত্রার কথা, জীবনকে ও জীবনসমুখ যাবতীয় অভিপ্রায়কে বৃহৎ চেতনার অঙ্গীভূত করে দেখাই বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য। তিনি এই গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মনীষী ও মহাপুরুষের মর্মকথা আলোচনা করে তার অন্তরালে অবস্থিত জ্ঞানকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

ভূমিকায় লেখক নিজের গ্রন্থকে 'বাঙালীর মননেতিহাসের সূচনা-গ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছেন। উনিশ শতকের মননলোকে প্রবেশের এটি হল ভূমিকা। এই প্রবেশক-গ্রন্থের দেউড়ি পার হয়ে লেখক আমাদের 'অন্তরতম বাসনালোকে' নিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ শতকের বাঙালীর চারিত্রমূর্তিকে অবধারণ করতে হলে উনিশ শতকে তার চিত্তপ্রণালীর স্বরূপ আগে জানতে হবে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি গত শতাব্দীর এমন কয়েকজনের জীবন কর্ম ও সাধনার কথা আলোচনা করেছেন, যার বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যমুখী এবং নিবন্ধভিত্তিক। মোট ন'টি প্রবন্ধে তিনি বাঙালী-মননের যথার্থ পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। রামমোহন, ডিরোজিও, প্যারীচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ— নয়টি পরিচ্ছেদে বাঙালী-সংস্কৃতির যে-রূপটি বিশ্লেষিত হয়েছে তা

মূলতঃ সাহিত্যকেন্দ্রিক। অবশ্য ডিরোজিও ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শীর্ষক অধ্যায়-দুটিতে বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা পরিচালিত হয় নি। প্রত্যক্ষভাবে এঁদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সংযোগ ছিল না। কিন্তু বাঙালী জাতির মননের সঙ্গে এঁদের আত্মীয়তার বন্ধন অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আঘাতে ও প্রভাবে নতুনরূপে গড়ে-ওঠা উনিশ শতকের বাঙালী-মননের ইতিবৃত্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখক অধিকাংশ স্থলেই গদ্যনিবন্ধের মধ্যে অনুসন্ধানকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা সমাজাদর্শ রাষ্ট্রচিন্তা ও নীতিবোধের সংস্পর্শে আসবার পূর্বেই বাঙালীর একটি বিশেষ জীবনচেতনা সমগ্র জাতিমানসের অন্তর্লোকে ক্রিয়াশীল ছিল, এ কথা ইতিহাসের দিক থেকে অতি সত্য। যাকে বলে *tabula rasa*, ইংরেজ আসবার আগে বাংলাদেশ ঠিক সেরকম শূন্য ফলক ছিল না। মৃন্ময়ী বাংলায় বড় একটা শিল্পফলক পাওয়া যায় না, পলিমাটির বুকে যে পদচিহ্ন পড়ে বিপুল কালস্রোতে তা অচিরে মুছে যায়। দু হাতে সঞ্চয় এবং অপচয়— এই বোধ হয় বাঙালীর স্বভাবধর্ম। এক দিকে যেমন চৈতন্য-ভাবাদর্শ, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী, বাউল গান রচিত হয়েছে, তেমনি আবার অন্যদিকে আছে নব্যন্যায়ের মননপ্রাধান্য। আবেগ ও মনন— এই দুই বৈষম্যের সমন্বয়ে এ জাতির পুরাতন জীবনাদর্শ গঠিত হয়েছে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় বাইরের দিকের কিছু-কিছু পরিবর্তন হলেও এ জাতির অন্তর্লোকের গড়নটির যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল, তা মনে হয় না। পরে মধ্যযুগের অবসানে এবং আধুনিক যুগের হঠাৎ আবির্ভাবের ফলে এ জাতির অর্ধসুপ্ত চেতনা সহসা জেগে উঠল। সে জাগরণের অর্থ— প্রথমে কৌতূহল ও বিস্ময়, পরে তার তাৎপর্য আবিষ্কারের জন্য মননশক্তির প্রয়োগ। উনিশ শতকের বাঙালী-মননের সেই বিকাশ ও পরিণাম যেমন ধর্ম সমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বিধৃত হয়েছে, তেমনি বাংলা গদ্যসাহিত্য অর্থাৎ চিন্তামূলক নিবন্ধের মধ্যে তার সূক্ষ্ম ভাবশরীরটি ধরা পড়েছে। বর্তমান লেখক তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত বাঙালী-সমাজের বৈশিষ্ট্যটি উপযুক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা অবধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য, বাংলা নিবন্ধ-সাহিত্যের দিক্‌পালদের রচনা বিশ্লেষণ ক'রে উনিশ শতকের চিত্তসংকটের মূল তাৎপর্য আবিষ্কার। বাঙালী একদিকে যেমন আগন্তুক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকে চিদ্‌বৃত্তিকে অধিকতর তীক্ষ্ণ করেছে, তেমনি আবার আবেগব্যাকুল হৃদ্‌বৃত্তিকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। রামমোহনের মধ্যে এই দুই বৃত্তির ঐক্যের যে প্রাথমিক চেষ্টা দেখা যায়, পরবর্তীকালের প্রধান প্রধান চিন্তানায়ক—অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রভৃতি—মনীষীদের মধ্য দিয়ে সেই ঐক্যই অধিকতর সুদৃঢ় হয়েছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, উনিশ শতকের মননপ্রকৃতির মধ্যে অনেক সময়ে কিছু কিছু স্ববিরোধ দেখা দিয়েছিল। লেখকের এ কথা অতি সত্য— "রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের জীবনে ও মননে অনেক সময় স্ববিরোধ দেখা দিয়েছে।" শুধু রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যেই নয়, হিন্দুকলেজের ডিরোজীওপন্থী 'কালাপাহাড়ী' তরুণের দল, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, বিদ্যাসাগর— কেউই সেই স্ববিরোধের হাত এড়াতে পারেন নি। লেখকের মতে সেই সংকট, অর্থাৎ জ্ঞান প্রেম ও কর্মের সংঘাত, থেকে যে সমন্বয়ের আবির্ভাব হল তার প্রতীকপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। তুরীয় লোকবাসী অধ্যাত্মচেতনা ও বাস্তব কর্মযজ্ঞ, এ দুয়ের আপাতঃ বৈপরীত্য কীভাবে বাঙালীর মননের উৎকণ্ঠা নিবারণ করল, সে বিষয়ে লেখক যথার্থই বলেছেন—

"উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একদিকে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা, আর-একদিকে য়ুরোপীয় রাজনৈতিক চেতনা—এ দুয়ের প্রভাবে আধুনিক ভারতবাসীর মননভূমি গড়ে উঠেছে। প্রথম ক্ষেত্রে সেই অধ্যাত্ম চেতনার মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মননে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার সার্থক সূচনা রামমোহনের অগ্রগামিতায়। আজকের ভারতবাসী তাই এই দুই মহাপুরুষের কাছেই তার বর্তমান জীবনবোধের ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সবচেয়ে বেশী ঋণী।" পৃ ২৩০

সেই ঋণের স্বরূপ নির্ধারণ এবং তার পরিশোধের ব্যবস্থা বিশ শতকের ভারতবাসী কত দূর আন্তরিকতার সঙ্গে করতে পেরেছে তার পরিচয় আগামী কালের ইতিহাসে লেখা থাকবে। পিপ্পলীশাখায় অধিষ্ঠিত দুই সুপর্ণের যথার্থ মিলন হয়েছে কিনা, খাঁচার পাখি ও আকাশের পাখির মধ্যেকার শলার ব্যবধান ঘুচেছে কিনা, আগামী দিনের মননধারার উত্তর-সাধকগণ তার জবাব দেবেন। কিন্তু লেখক ঘোষ তাঁর এই গবেষণা-গ্রন্থে বাঙালী-মননের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে শুধু স্থাবর সত্তা ও 'প্রাগমাটিক' প্রয়োজনের ক্ষণচেতনাকেই প্রাধান্য দেন নি, মানুষের জৈবসত্তার ঊর্ধ্বচারী বৃহৎ চেতনার সত্যাবধারণে নিজ বিশ্লেষণ-বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত ও সক্রিয় রেখেছেন। এ জন্য তিনি মনন-রসিকের প্রীতি লাভ করবেন। উনিশ শতকের বাঙালী-মননের এমন নিপুণ বিশ্লেষণ এবং সমগ্র রূপনির্মিতির কলাকৃতি আলোচনা আমরা ইদানীং খুব কম লেখকের মধ্যেই পেয়ে থাকি। অধুনা বিপরীত বন্যাধারায় ভাসমান অব্যবস্থিতচিত্ত বাঙালী যদি পিছন ফিরে তাকিয়ে নিজেদের পৈতামহিক সংস্কারের যথার্থ স্বরূপ সন্ধান করতে পারে, এই ইচ্ছায় লেখক গত শতাব্দীর মননধর্মের মাপজোখ করতে চেয়েছেন। তাঁর এ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, এর পর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-ঐতিহ্যের অন্যান্য শাখা অবলম্বন করে তাঁর গবেষণা নতুন পথে চলবে, ক্রমে ক্রমে আমরা তাঁর সেই সমস্ত বিচিত্র অনুসন্ধান-প্রণালীর কথা জানতে পারব। এ জন্য আগে থেকেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।

গ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, এর কোনো কোনো অংশ আর-একটু বিস্তারিত হলে ভালো হত। যেমন—ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংক্রান্ত আলোচনা। স্থিতধী ভূদেবের প্রথম-যৌবনের জীবনচাঞ্চল্য এবং পরিণত-বয়সের অটল গাম্ভীর্য, দর্শনভঙ্গীতে রাজসিকতা ও সাত্ত্বিকতার মিলন, প্রাচীন ভারত ও নবীন য়ুরোপের পারস্পরিক আদান-প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি এখনও আমাদের নবযুগের দিশারী হতে পারেন। এ ছাড়া আরও দু-একটি স্থান কিন্তু বিস্তৃত হলে ভালো হত। রাজনারায়ণ সম্বন্ধে যতটা স্থান দেওয়া হয়েছে, কেশবচন্দ্রকে কিন্তু ততটা স্থান দেওয়া হয় নি। গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা আছে বটে, কিন্তু উনিশ শতকের মননের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে কেশবচন্দ্রকে একান্তে রাখলে চলবে না। সকলের উপরে, এ গ্রন্থে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিমগোষ্ঠী সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নেই। উনিশ শতকের মননের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কারণ এই শতকের শেষ দশক এবং তার পরেও বাংলার মনোজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র আধিপত্যে বিরাজিত। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বানুসন্ধান নির্বাহ না হলে বাংলার আধুনিক মনঃপ্রকৃতির ভূপরিক্রমা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। অনুমান করি, পরবর্তী খণ্ডসমূহে লেখক এ বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন। তা হলে উনিশ শতকের বাঙালী-মানসের পূর্ণ বলয়িত রূপটিও যথাযথ মর্যাদা পাবে। আর-

একটি কথা, গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্ট সংযোজিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তা হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনেক সুবিধা হবে।

ইদানীং নানাবিধ সামাজিক কারণে বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল চিত্তপ্রবাহ যখন গড্ডলপ্রবাহে পরিণত হতে চলেছে, তখন লেখক আমাদের পরম সম্পদ ও কুলাচার— অর্থাৎ মননধর্ম, তাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচারবিশ্লেষণ করে চিত্তের জড়ত্ব মোচনের চেষ্টা করেছেন। এজন্য চিন্তাশীল পাঠকেরা লেখককে নিশ্চয় সাধুবাদ দেবেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শতবর্ষের আলোয়। অসীমা মৈত্র সম্পাদিত। চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-৯। মূল্য ১৫·০০ টাকা।

আশা করেছিলাম, বইটি হাতে পেয়ে যে উল্লাস হয়, পড়ার পরে তা বর্ধিত হবে। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, তা হয় নি ; বরং অনেকাংশে কমে গিয়েছে।

'শতবর্ষের আলোয়' নামটি লোভনীয়, এবং ভূমিকায় সম্পাদিকার এই প্রথম বাক্যটিও ভালো লাগে : 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা স্মরণীয় এবং বরণীয়, সুদীর্ঘকালের ব্যবধানেও যাঁদের কর্ম ও চিন্তা-ধারা উত্তরকালের মানুষকে পথনির্দেশে সহায়তা করেছে এবং করবে, তাঁদের জীবন ও কর্মের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অনুশীলন ও আলোচনা যোগ্য।' কিন্তু যা পেলাম, তা প্রথমত বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন ব্যক্তির কখনো তথ্যবহুল কখনো চলনসই প্রবন্ধ, প্রায়ই এমনকি প্রায় সব ক্ষেত্রেই একের সঙ্গে অন্যের যোগসূত্র নেই, কেন্দ্রিক একটা লক্ষ্য খাড়া করে এত জাতের মালমসলাকে গ্রন্থনের চেষ্টা নেই, তাই যা হয়েছে, তা বড়জোর মোটামুটি একটা সংকলন মাত্র, গ্রন্থ নয়। তবে কি বলা হবে শত বা শতাধিক বর্ষের যাঁরা, তাঁদের একত্র করাতেই সেই কেন্দ্রিক লক্ষ্যের দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়েছে? কিন্তু লক্ষ্য হিসেবে সেটা যথেষ্ট নয়, এবং তর্কের খাতিরে যদি যথেষ্ট বলে মেনেও নিই, তখন প্রশ্ন হবে, শত বা শতাধিক বর্ষের সকলকেই কি এখানে একত্র করা হয়েছে? হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ, অনেকের মধ্যে এ-দুটো নাম মনে আসছে, যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হন নি। সকলকে একত্র করা সম্ভব নয়, বাছবিচার করতেই হয়, এবং বাছবিচারের প্রশ্ন যে মুহূর্তে উঠবে, লক্ষ্যের প্রশ্নও উঠবে।

দ্বিতীয় ও আরো প্রধান বক্তব্য, 'শতবর্ষের আলোয়' নামটা একেবারে অর্থহীন হয়ে গেছে। যেহেতু একমাত্র বাঙালীরাই এ সংকলনের আলোচ্য, এ কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে উনবিংশ শতাব্দীর রনেসাঁস বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। ব্যাপকতায় ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবে তার সঙ্গে তুলনা চলে হয়তো একমাত্র উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের, কারণ সেখানেও ঐ একই সময়ে চিন্তা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত সামগ্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন ওঠে, এতদিনে প্রায় থেমে-আসা যার কিছু ঢেউ মাঝে-মাঝে আজো ধ্বনিত। ফ্রান্স ও বাংলাদেশ অবশ্য দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মানসিক নিসর্গ, এবং তুলনামূলক প্রসঙ্গটা পেয়েছি বলেই এটুকুও যোগ করা উচিত হবে যে আকস্মিকতায়

আমাদের উনবিংশ শতাব্দীটা আরো অনেক বেশি চমকপ্রদ, কারণ ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক জাগরণের কোমর-বাঁধা প্রস্তুতি আবহমান কাল হতে ছিল ও সদাসর্বদা রয়েছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে একটার পর একটা যে-ভীষণ আলোকদীপ্ত বল্লম তুললেন, তা প্রায় বলা যায় একেবারে ঘোর অন্ধকার হতেই।

এদিকে গত এক শো বছরের মধ্যে, বিশেষত অতি সম্প্রতিকালে, আমাদের সকল মূল্যবোধে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে, সকল স্থিতাবস্থার ভাঙনের এই মুহূর্তে আমরা কখনো ইচ্ছায় কখনো নাচার হয়ে নাচছি এক তুমুল তোলপাড়ে। ঠিক যেমন করে এককালীন বহু বনেদী প্রাসাদ আজ ধ্বংসস্তূপের সামিল, এককালীন বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আজ বস্তিবাসী, যেমন করে এককালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোকেরা আজ ক্রমশই ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে, তেমনি করেই উনবিংশ শতাব্দীর রনেসাঁসএর যে-একমাত্র ধারক ও বাহক আমরা, সেই মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায় তার সকল মূল্যবোধ নিয়ে আজ ধূলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, ইতিহাসের এক বিরাট মোড়ের সে আজ মুখোমুখি। এ সংকলনে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রবন্ধে শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য যে-দুটি পঙক্তির (পৃ ১৪৯) উল্লেখ করেছেন ("আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া / খাইয়া যাইবে যুদ্ধে") তা নিশ্চয় আজো খানিকটা সত্য সোচ্চার বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা মোটা অংশ সম্বন্ধে; তবু চিন্তায়-অনুশীলনে-অভীপ্সায় যুগান্তকারী পরিবর্তন যে একটা এসেছেই, সেটা অস্বীকার করা বাতুলতা হবে। আর, অত কথার দরকারই বা কী, যখন চোখের সামনে রয়েছে আরো-একটা জলজ্যান্ত প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত গান্ধীর শতবার্ষিকী বছরে। গান্ধী অবশ্য বাঙালী ছিলেন না, তবু মাত্র বিশ বছর আগেও ভারতের প্রতিভূ হিসেবে তিনি হিমালয় সমান এক ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হতেন। আজো গণ্য হন কি না জানি না— তবু বলবই, আমাদের আজকের যুগের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ কেউই খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রশ্নটা আজকেরই, তাই করাও উচিত: কী এমন হল ইতিমধ্যে যাতে দেশটা এত বদলে গেল?

চেয়েছিলাম, 'আলো' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে বলেই 'শতবর্ষের আলোয়' আলো ফেলুক সেই প্রশ্নের উপর, মাতুক অতীত ও বর্তমানের মিলন ও বিচ্ছেদের বিশ্লেষণে, নতুন মূল্যায়নে— যা একেবারেই হয় নি। যা পাওয়া গেল, তা কতকগুলি মামুলি তথ্য মাত্র— তাও যে-প্রবন্ধগুলি অপেক্ষাকৃত ভালো, সেইগুলিতেই, সর্বত্র নয়। যেমন, কে কী করেছিলেন, কোন্ পরিবার থেকে এসেছিলেন, কখনো এটা-ওটা ঘটনার ইতিবৃত্ত, ইত্যাদি। তার উপর রয়েছে অজস্র ছাপার ভুল, এত ছাপার ভুল কোনো বইতে সচরাচর নজরে পড়ে না।

এত সত্ত্বেও সবসুদ্ধ ২৬টি প্রবন্ধ সম্বলিত এই সংকলনটি পড়তে যে-সাহসী পাঠক এগিয়ে আসবেন, তিনি যে একেবারেই কিছু পাবেন না, তা নয়। কারণ যে-তথ্যগুলো আছে, সেগুলো মামুলি হতে পারে, তবু তথ্য তো বটেই। তাই বিশেষত ইতিহাসের ছাত্রদের ঔৎসুক্য জাগাতে পারে। আলোচ্য ব্যক্তিরা সকলেই শ্রদ্ধেয়, তাঁদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যাঁদের নাম এ যুগের বহু শিক্ষিত ছেলেমেয়ে আগে কখনো শোনে নি— জ্ঞানবর্ধনের কিছুটা দায়িত্ব এ-সংকলন সম্পন্ন করবে। প্রবন্ধকারেরাও প্রায় সবাই বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেকেই স্বনামধন্য। এরই মধ্যে আমার কাছে যে-প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য ঠেকল— কোনোটি মোটামুটিভাবে, কোনোটি আরো বিশেষ করে— সেগুলি হল নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

'রামমোহন রায় ও বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন', কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র', প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', বিজিতকুমার দত্তের 'রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা', যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ : শেষ অধ্যায়', রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়', কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী', যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' (যদিও বিদ্যানিধি মহাশয় এখানে হয়তো তাঁর নিজের কথাই একটু বেশি বলেছেন), লীলা মজুমদারের 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নগেন্দ্রনাথ বসু', ভবতোষ দত্তের 'ড. দীনেশচন্দ্র সেন', হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' এবং উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের 'প্রমথ চৌধুরী'। এ ছাড়াও রয়েছে সতীশচন্দ্র রায়ের উপর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ বিদগ্ধ রচনা।

প্রবোধচন্দ্র সেনের পাণ্ডিত্য সুবিদিত এবং তা ন্যায্যতই পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তবু রামপ্রসাদ সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপর তাঁর তুলনামূলক আলোচনাটি যে কী করে এই সংকলনে স্থান পেল, বুঝলাম না। হয়তো এর কারণ প্রবোধচন্দ্র সেন স্বয়ং নন, কারণ সম্পাদিকা জানাচ্ছেন যে সংকলনটির অধিকাংশ প্রবন্ধ নানান পত্র-পত্রিকা হতে সংগৃহীত। মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ নাকি সংকলনের জন্য বিশেষ-ভাবে লিখিত, কিন্তু জানা গেল না সেগুলি কোন্-কোন্টি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন কথা বলার বিশেষ অবকাশ নেই, থাকলেও তা বলা দুঃসাহসের কাজ। কারণ দুর্ভাগ্যবশত বাঙালীজীবনের ট্যাবুর মধ্যে আজ রবীন্দ্রনাথও অন্যতম হয়ে উঠেছেন। তবু নীহাররঞ্জন রায়ের রসবোধ রবীন্দ্র-প্রতিভাকে পরিচিত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। আজো সত্য হিসেবে টিঁকে আছে বলেই তাঁর এই উক্তিটি (পৃ ১৭৫) পড়তে মন্দ লাগে না : "রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন প্রায় মধ্যগগন স্পর্শ করেছে তখন বাংলাদেশে নূতন স্বদেশ ও স্বাজাত্য -বোধের প্রথম অরুণোদয় ; আর আজ যখন সে প্রতিভাসূর্য অস্তমিত হল তখন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ধন ও রাজ্যলোভে বিভ্রান্ত নরমাংসলুব্ধ শ্মশান-কুকুরদের কাড়াকাড়ির উন্মত্ত নৃত্য চলেছে। কালসমুদ্রের এই দুই বিন্দুর মাঝখানে বিচিত্র ভাব ও আদর্শে বিক্ষুব্ধ বিচিত্র চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনায় লীলাচঞ্চলিত বাংলাদেশের একটি সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অধ্যায় বিধৃত হয়ে আছে। যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যে এই সুদীর্ঘ অধ্যায়টির সমগ্ররূপ এক অখণ্ডতায় ধরা পড়েছে, সে প্রতিভার অধিকারী একক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।"

সংকলটিতে ভালো লেখা যে একেবারেই নেই, তা নয়। হঠাৎ হঠাৎ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল উক্তিও নজরে পড়ে, যেমন রামমোহনের উপর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এক জায়গায় (পৃ ৩৭) বলছেন, "রামমোহনের মানবতা ধর্মভিত্তিক ছিল না, তাই তাঁর অনুপ্রেরণা থেকে দেশে জেগেছিল ইতিহাসনিষ্ঠা, বিজ্ঞানসন্ধিৎসা ও সাহিত্য-প্রীতি। ধর্ম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন করেছিলেন তাঁর বিরোধী শিবির। তাই দেখি মননধর্মে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল ও হরিশ মুখুজ্যে তাঁর যত কাছের, কেশব, বঙ্কিম বা তাঁদের ভাবী উত্তরাধিকারীদ্বয়, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, তা নন। এই শেষোক্ত চার জনই অবশ্য সমন্বয়বাদী এবং সেকালের সঙ্গে একালের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সমাজমানসে তা রক্ষণশীলতার বাতাবরণকেই দৃঢ় করেছে।"

এখানে-ওখানে এমন দুয়েকটি প্রশ্নও তোলা হয়েছে দেখলাম, যার উত্তরটি ভাববার বিষয়। যেমন,

প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলছেন (পৃ ৩৮২) : "বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিক যুক্তিবাদ, ভাষার সংহতিগুণ, বুদ্ধির আধিপত্য, বাক্‌নৈপুণ্য, এইসব নতুন লক্ষণে অন্বিত করার মতো মানসিক প্রস্তুতি প্রমথ চৌধুরী পেলেন কোথা থেকে ?" উত্তরটা অবশ্য প্রবন্ধকার নিজেই দিচ্ছেন, তবু সেই সূত্রে আরো-একটি প্রশ্ন জাগে : এ-হেন প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব সত্ত্বেও আমাদের প্রবন্ধ ও আলোচনা -সাহিত্য কেন আজ পর্যন্ত তেমন দানা বাঁধল না, কেন তা আজো মুখ্যত এক শিরদাঁড়াহীন ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়ে আছে ? সন্দেহ হয়, তার কারণ বাঙালী মানসে রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ধ্রুপদী গুণের আশ্চর্য প্রাচুর্য নিশ্চয় ছিল, কিন্তু ভিজে মাটির লোক বাঙালীরা তাঁর একমাত্র ভাবপ্রবণ দিকটির মধ্যেই নিজেদের সত্তা খুঁজে পেয়েছে। ভাবালুতার দিকে আমাদের ঝোঁকটা একটু কম হলে এ সংকলনের অধিকাংশ প্রবন্ধ অন্য রূপ নিত।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান

কাছে ছিলে, দূরে গেলে— দূর হতে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি— সে এখনো বসে আছে॥
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারো নি ভালো—
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে॥
জটিল হয়েছে জাল, প্রতিকূল হল কাল—
উন্মাদ তানে তানে কেটে গেছে তাল।
কে জানে তোমার বীণা সুরে ফিরে যাবে কিনা—
নিঠুর বিধির টানে তার ছিঁড়ে যায় পাছে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II মা মা রা । সা -া -া I মা মা [ম]গা । পা -া -া I ক্ষা -পা -ধা । -না -র্সা -র্গা I
কা ছে ছি লে ০ ০ দূ রে গে লে ০ ০ দূ ০ ০ ০ ০ র্

I র্রা র্সা -না । ধা পা -ক্ষা I ধা পা -মা । -া -া -া I র্সা র্সা না । র্রা র্রা র্সনা I
হ তে ০ এ সো ০ কা ছে ০ ০ ০ ০ ভু ব ন ভ্র মি লে০

I [র্স]র্রা র্সা -া । -া -া -া I সা সা সা । রা -া -া I রা গা রা । গা -া -া I
তু মি ০ ০ ০ ০ সে এ খ নো ০ ০ ব সে আ ছে ০ ০

I গা মা গা । মা -া -া I গা -মা -পা । -ধা -না -র্সা I -র্সা -ধা -া । -পা -মা -া II
ব সে আ ছে ০ ০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০

II পা ধা পা । না ধা না I র্সা -া -না । র্সা -া -া I র্সা র্গা [র্র]র্গা । র্রা র্রা র্সা I
ছি ল না প্রে মে র আ ০ ০ লো ০ ০ চি নি তে পা রো নি

I র্সা -া -না । র্সা -ধা -না I র্সা র্সর্গা র্গা । র্রা র্রর্সা র্সা I র্সা -া -না । র্সা -ধা -পা I
ভা ০ ০ লো ০ ০ এ খ০ নো বি র০ হা ন ০ ০ লে ০ ০

I রা রা গা । গা গা গা I গা গা -মা । -া -া -া I রা -া -গা । -রা -া -পা I
প্রে মা ন ল জ্ব লি য়া ছে ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০

I মা -গা -মা । -রা -সা -া I সা সা সা । রা রা রা I রা -গা -া । -া -া -া I
হা ০ ০ ০ ০ ০ জ টি ল হ য়ে ছে জা ০ ০ ০ ০ ল্

I সা সা রা । রা গা গা I গা -মা -া । -া -া -া I মগা -পা পা । পা হ্মা পা I
প্র তি কূ ল হ ল কা ০ ০ ০ ০ ল্ উ০ ন্ মা দ তা নে

I ধা না -া । ধা পা -হ্মা I পধা ধপা -মা । মা -া -া I পা ধা পা । না ধা না I
তা নে ০ কে টে ০ গে০ ছে ০ তা ০ ল্ কে জা নে তো মা র

I র্সা -া -না । র্সা -া -া I র্সা র্সর্গা র্গা । র্গর্রা র্রর্সা র্সা I র্সা -া -না । র্সা -ধা -না I
বী ০ ০ ণা ০ ০ সু রে০ ফি রে০ যা০ বে কি ০ ০ না ০ ০

I র্সা র্গা র্গা । র্গা র্মা র্পা I র্মর্পা -র্মা -র্মর্গা । র্রর্গা -া -র্রর্সনা I না -া -া । র্সা র্রর্সা -না I
নি ঠু র বি ধি র টা০ ০ ০০ নে ০০০০ তা ০ র্ ছিঁ ড়ে০ ০

I ধপা -া -মা । -া -া -া I সমা -া মা । মা মা -া I মগা গা -পা । -া -া -া I
যা০ ০ ০ ০ ০ য়্ তা০ র্ ছিঁ ড়ে যা য়্ পা০ ছে ০ ০ ০ ০

I হ্মা -পা -ধা । -না -র্সা -া I -ধা -পা -া । -মা -া -া II II
হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় কর্তৃক প্রকাশিত • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯
চিত্র ও মলাট মুদ্রক • রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট • ৭/১ বিধান সরণী • কলিকাতা ৬

বর্ষ ২৭ · সংখ্যা ২

কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭ · ১৮৯২ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭ · ১৮৯২ শক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদসিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।।

২৪ ভাদ্র
১৩৪৬

বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।— এমন দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে নিয়ে যেতে চায়, সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করে নি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে তার পথে সহস্র বাঁধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্তু চারিত্রবল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্রবল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত, সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্রবল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মানতে পারে না। মানসিক চারিত্রবলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগরমহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে বড়ো হয়ে লেগেছে।

বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস। যারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানব-জীবনের পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে বলে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ

নিবিষ্ট হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে, সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; তারা বলে যে, তাদের ধর্ম-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের যা-কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে; তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে নি, সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে জিনিসটাই তাদের নয়।

এইরূপে সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমন-কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকলপ্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্যেই আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব করে ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে, তিনি কত বড়ো সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে গৌরব করতে পারি নে। কারণ সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দরকার। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে যাঁরা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে জয়ী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু যাঁর অন্তর চিরনবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড়ো রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশি বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন

এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত-বিদ্যারই চর্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে দেন। কিন্তু বাধাই যে দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ব্রাহ্মণ-তনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন তা হলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না। কিন্তু যাঁরা বড়ো, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি করবার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

এ কথা মানতেই হবে যে, বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন; তার কারণ হচ্ছে যে, যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড়ো তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পান নি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে— অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষে আর-এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ করে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব-নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন। আমরা অনুভব করতে পারি না যে, এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। যারা ছোটো, বড়োর বড়োত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড়ো অপরাধ বলে গণ্য করে। এই কারণেই ছোটোর আঘাতই বড়োর পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।

যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্যে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত যা অলব্ধ তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন-দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয় নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি! তাই বলে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবী কালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পা'কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা'কে পিছনে টেনে রাখত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয়, যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। এক দিকে আমরা ভাবী কালে সম্পূর্ণ আস্থাবান হতে পারছি না, অন্য দিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাকতেও পারছি না। তাই আমরা এক দিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্যসহচর করেছি, আবার অন্য দিকে বলছি যে, বিজ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে, না পিছে, কোনো দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বলব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে কৃপণের ধনের মতো মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করতে উদ্যমশীল হয়েছেন, তাঁরাই চিরস্মরণীয়, কারণ তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক।

তাঁদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অনুসারে সার্থকতার তারতম্য হয়েছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এঁদের মতো লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্যবিদ্যার যে সম্মান করছি তা কতকটা দেশাভিমানবশত। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা-বশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ করবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করছি কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হই নি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহক রূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে এমন একদিন আসবে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাকব না, যেদিন 'যুদ্ধং দেহি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যাঁরা প্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাঁদের বলব, 'ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয় নি; তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল।'

সত্যপথের পথিক রূপে, সন্ধানী রূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবী কালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বলতে পারব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

ভাদ্র ১৩২৯

'বিদ্যাসাগরচরিত' গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১

বিদ্যাসাগর-চরিত-পরিক্রমা

ভারতবর্ষের প্রজ্ঞাদৃষ্টি মানবজীবনের চরিতার্থতাকে তিনটি যোগাযোগের ফল মনে করেছে— মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষসংশ্রয়। এক হিসাবে পরবর্তী দুটি সূত্র প্রথম শর্তেরই স্বাভাবিক পরিণতি, তাই প্রথমটি না থাকলে শেষ দুটির প্রশ্নই ওঠে না। আবার মনুষ্যত্বের অধিকারীকেও সাধনা ও প্রযত্নের দ্বারা পরামুক্তি ও মুক্তিসাধকদের পুণ্যসঙ্গ অর্জন করতে হয়।

মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ কি, এ প্রশ্নের সবচেয়ে সুন্দর উত্তর রয়েছে যোগবাশিষ্ঠের 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি' কথাটুকুর মধ্যে। মননের দ্বারা যে বেঁচে থাকে, সেই মানুষ এবং সেইখানেই সাধারণের বেঁচে থাকায় এবং অসাধারণের প্রজ্ঞায় পার্থক্য। জীবনের সব স্তর যে এক নয়, এ কথা আমাদের মনে থাকে না বলেই যাঁরা শ্রমকেন্দ্রিক জীবনের কথা ভাবেন তাঁরা ভাবময় জীবনের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেন এবং যাঁরা ভাবসাধনার তুঙ্গশিখরে আরোহী তাঁরা বস্তুগত জীবনসত্যকে প্রায়শঃ উপেক্ষা করে থাকেন। মানবচৈতন্যের অন্নময় অধিষ্ঠান থেকে আনন্দময় বিজ্ঞানময় পরমসীমায় উত্তরণ অবধি সবটাই মানবজীবনসত্য— স্তরভেদে এবং প্রয়োজনভেদে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার সেই নিজস্ব সার্থকতার স্বীকৃতি ভারতীয় জীবনদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নবজাগরণের যে ঋত্বিকদল প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার সমন্বয়সাধনে উৎসুক হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই বহুযুগের হৃত মনুষ্যত্ববোধ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে দেখা গিয়েছিল। তথাকথিত শাস্ত্র, বিচারহীন গুরুবাদ ও অলঙ্ঘনীয় দেশাচারে আচ্ছন্ন এবং রাজনৈতিক সংহতি ও স্বাধীনতার অভাবে মেরুদণ্ডহীন এ জাতির পুনরুদ্ধারে যে স্বাভাবিক বিচারশীল ঋজু দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের আহ্বানেই রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগ-পরিচালকদের আবির্ভাব।

রামমোহন আমাদের মননযুদ্ধের সেনাপতি, দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাত্মপ্রেরণার ভাবশিল্পী, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্মের মর্মবেত্তা ভারতের চিরন্তন ধ্যানমূর্তি, কেশবচন্দ্র প্রাচ্য প্রতীচ্য ভাবসম্মেলনের অপূর্ব রূপকার, বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ইতিহাসের সন্ধানী পথিক, বিবেকানন্দ বেদান্তের অভীঃমন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ, আর বিদ্যাসাগর সব চিন্তা, কর্ম ও ভাগবত আন্দোলনের মূলে যে অটল মনুষ্যত্বের অধিকার, যে মানবিকতার একান্ত প্রয়োজন, তারই অন্যতর বিকাশ। বিদ্যাসাগর ছাড়া আর যে-সব মনীষীর নাম এক্ষেত্রে করেছি, তাঁরা সকলেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরে বিশেষজ্ঞ ও আপন আপন আদর্শ জীবনে ও সমাজে সঞ্চারিত করতে আগ্রহী। ধর্মান্দোলনের এই ঘূর্ণিপ্রবাহে বিদ্যাসাগরই একমাত্র মানুষের পার্থিব জীবনবৃত্তে স্থিরলক্ষ্যে সমাসীন। ইহলোকের ঊর্ধ্বে বা অন্তরালে কোনো বাস্তব বা অবাস্তব জিজ্ঞাসা তাঁকে পীড়িত করে নি। অথচ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই একটি মানুষকে আত্মীয়তম জেনে সেদিনও বরণ করেছে, আজও সমান শ্রদ্ধায় স্মরণনত।

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের মধ্যে আর-একটু নির্বাচনে অগ্রসর হয়ে বলা চলে, মনুষ্যত্বের প্রতীক বিদ্যাসাগর, মুমুক্ষুত্বের প্রতীক দেবেন্দ্রনাথ, মহাপুরুষ-সংশ্রয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গধন্য বিবেকানন্দ। দেবেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে তিনটি লক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগর যেন আপন নিগূঢ় প্রেরণাবশে মনুষ্যত্ববোধের গণ্ডীতে অটল থেকেই মুক্তিসাধনা বা সাধকগুরুর আশ্রয়গ্রহণ-জাতীয় অধ্যাত্মমার্গকে পরিহার করে চলেছেন। ফলে সেকালের বা একালের নিরীশ্বরবাদীরা অনেকেই বিদ্যাসাগরকে নিজেদের সগোত্র মনে করে উৎসাহিত হয়েছেন, বা এখনো হন। এমন-কি বুদ্ধদেবের মানবকরুণার আদর্শ ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মৌন থাকার কথাও তুলনামূলকভাবে তাঁদের মনে জাগে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, সংসারবাসনার ক্ষণসত্যকে পরিহার করে নির্বাণের পরমাগতিই বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মাদর্শ। বিদ্যাসাগরের জীবনে ও মননে এজাতীয় ত্যাগ ও পারমার্থিকতার নিদর্শন মেলা সম্ভব নয়। তিনি সন্ন্যাসমুক্তির সঙ্কল্পও যেমন নেন নি, তেমনি রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শও গ্রহণ করেন নি। হিন্দুর আচারনিষ্ঠ সমাজব্যবস্থাকে যতই তিনি বিচারবিশ্লেষণ করুন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শকেই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। স্বসমাজ ও স্বগোষ্ঠীতে থেকেই উদ্যত সংগ্রামে সমগ্র জাতির মর্মমূলে এক জীবনযোদ্ধার আদর্শ সঞ্চার করেছিলেন। রামায়ণ মহাভারতে দেখি, ক্ষত্রিয় রাজকুমারেরা অন্যান্য বিদ্যার মতো অস্ত্রবিদ্যাও ব্রাহ্মণগুরুদের কাছে আয়ত্ত করতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের মতো ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আর দ্বিতীয় কেউ ন'ন।

য়ুরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে যাঁরা বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আগ্রহী, তাঁরা পরকাল সম্বন্ধে অনাগ্রহী বিদ্যাসাগরের মানবিক চেতনায় য়ুরোপীয় নবজাগৃতির সাধর্ম্য খুঁজে পাবেন। এ সাধর্ম্য বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতি, শিক্ষাসংস্কার, কর্মকুশলতা অনেক কিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবেই এ মানবিকতার সৃষ্টি, এমন কোনো প্রমাণ বিদ্যাসাগর-জীবনীতে মেলে না। ডিরোজিওর শিক্ষাদৃষ্টিতে প্রভাবিত যে নব্যবঙ্গ (young Bengal) উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমার্ধের তারুণ্যের প্রতীক, তাঁদের সঙ্গে তরুণ বিদ্যাসাগরের মানসিকতার মিল ও অমিল দুইই এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের একান্ত সান্নিধ্যসত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যমনীষার পরিমণ্ডলে গঠিত বলেই আজীবন বসনে ভূষণে, আচার ব্যবহারে, শিক্ষা ও সাহিত্যরুচিতে উদার গ্রহণশীলতার সঙ্গে প্রখর স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির পরিচয়ও বজায় রেখেছেন। সমকালীন বিলিতিয়ানার ভক্তরা বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেন নি। বরং বিদ্যাসাগরের এই স্বাতন্ত্র্যই সমকালীন বিদেশী অনুকরণের উন্মত্ততা থেকে সেকালের তরুণদের অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। পোষাক আর মনুষ্যত্ব যে সমার্থবাচক নয়, তা একালের আমরা ভুলতে বসেছি, কিন্তু সেকালের বিদ্যাসাগর কখনো ভুল করেন নি। চটি পরলেই বিদ্যাসাগর হয়তো হওয়া যায় না, কিন্তু দেশ-কালের বিশেষত্বহীন পোষাকেও মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না— একথা 'স্বাধীন' ভারতবর্ষ যত মনে রাখে ততই কল্যাণ।

বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়— 'স্বাতন্ত্র্যে শেকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে'। বিদ্যাসাগরের এই চরিত্রস্বাতন্ত্র্য স্বমহিমায় সমকালীন সাধারণ মানুষের গড়পড়তা মানদণ্ডের এত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো মনীষীরা একবাক্যে তাঁকে

বাঙালীসমাজে ব্যতিক্রম বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের শ্রদ্ধেয় ভক্তিপরায়ণতাকে স্বীকার করেও প্রশ্ন করা চলে, সত্যিই কি তিনি আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ অভাবনীয় আবির্ভাব? যে শতাব্দীর উষালগ্নে রামমোহনের মতো উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যে শতাব্দীর শেষপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মতো মনীষার দীপ্তবিকাশ— সে শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব কি অকল্পনীয়?

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিদ্যাসাগরচরিত' ('চারিত্রপূজা' দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' থেকে বিদ্যাসাগরের পিতামহ, পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর জীবন ও চরিত্র বিদ্যাসাগরজীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উদাহরণমালা সাজিয়ে দিয়েছেন। বাঙালী চরিত্রের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও বাঙালী প্রতিভার এই নিহিত উপাদানগুলি বিদ্যাসাগর-চরিত্রে উপযুক্ত প্রতিভার আশ্রয়ে বিকশিত হয়েছে— এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। শুধু বিদ্যাসাগরই ন'ন, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে মহাপুরুষদের শতবার্ষিকী, সার্ধ শতবার্ষিকী, বা দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে গৌরববোধ করে থাকি, তাঁরা সকলেই বাঙালীর অন্তর্নিহিত অপরাজেয় মনুষ্যত্বের সমুজ্জ্বল উদাহরণ। বঙ্কিমের অনুসরণে আশা করতে পারি, যাদের সামান্য অতীত এত গৌরবমণ্ডিত, তাদের ভবিষ্যৎও অনন্ত সম্ভাবনাময়।

বাংলা দেশের মননশীলতায় আপাতবিপরীত দুটি ধারা বহুকাল থেকেই গঙ্গাযমুনার যুক্তবেণী রচনা করে প্রবাহিত। একদিকে গভীর আবেগ উচ্ছলতা, আর একদিকে নিপুণ বুদ্ধির খরদীপ্তি। এ দুয়ের শুভসম্মেলনে যে ক'টি বিশিষ্ট বাঙালীচরিত্র গড়ে উঠেছে বিদ্যাসগর তাদের অন্যতম। 'বিদ্যাসাগর' উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত বাংলাদেশে আরো দেখা গেছে, কিন্তু বাংলাভাষায় বিদ্যাসাগর শব্দটি এক বিশেষ মনুষ্যত্বের প্রতীক হয়ে আছে। তার কারণ অগাধ বিদ্যার সঙ্গে অপার করুণার সংযোগ। বস্তুত তাঁর অশ্রুসজল করুণাবিহ্বল রূপটি তাঁর মনীষীরূপকে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্ববর্ণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ায়, ইংরেজী বিদ্যাপ্রসারে আন্তরিক প্রযত্নে, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বশাস্ত্রমন্থনে, বিদেশী ও স্বদেশী কর্তৃপক্ষের উদ্ধত শাসনদণ্ডের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলায়, মানবকল্যাণে ও আর্তের সেবায় অনলস আত্মত্যাগে যে নির্ভীক জীবনযোদ্ধার পরিচয় মেলে, তার চেয়ে আরো আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় সর্বস্তরের ব্যথিত ও বিপন্ন মানবের সমবেদনায় তাঁর বিগলিত অশ্রুনির্ঝর। কিন্তু এই তো স্বাভাবিক! বুদ্ধি জীবনের আংশিক সত্যকে প্রতিফলিত করে, সমগ্র জীবনকে ধারণ করে হৃদয়। পৃথিবীর কোনো ভাবান্দোলনই কেবলমাত্র দার্শনিকের মতামতকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয় না, অথবা যেখানে হয় সেখানে প্রাণহীন নিয়মতন্ত্রের আরাধনা সভ্যতার প্রাণশক্তিকে খর্ব করে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'ইয়ং বেঙ্গল' নয়, বিদ্যাসাগরই সে যুগের ধারণীশক্তির প্রতীক। প্রতীচ্যসভ্যতার প্রভাবকে যাঁরা আত্মস্থ করে ভারতবর্ষের আলো আকাশ হাওয়া মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরাই যুগস্রষ্টা। সে-অর্থে নবযুগসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিন্দু কলেজের মধুসূদন বা তাঁর অনুবর্তীরা ন'ন, সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাসাগরই সে সম্মানের অধিকারী। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর ভক্তিমিশ্রিত শ্রদ্ধানিবেদনে স্বয়ং মধুসূদন নানাভাবে বিদ্যাসাগরের যে চরিত্রমহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন তার মূলে বিদ্যাসাগরের এই আত্মস্থ মৌলিকতা।

২

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেও দেখি বাংলা গদ্যের মূল ধারাটি অগ্রসর হয়েছে সংস্কৃত ভাষা ও সে-ভাষাবিদ্‌দের প্রভাবে। বিদ্যাসাগরকে যাঁরা সে যুগে 'বাংলা গদ্যের জনক' মনে করতেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে খুব আপত্তি করা চলে না এইজন্য যে, সংস্কৃত শব্দসুষমার শিল্পসম্মত প্রয়োগে বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যকে প্রথম শ্রেণীর আভিজাত্য এনে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ বাংলা সাধু গদ্যের সেকাল ও একালের সেরা শিল্পীদের শোভাযাত্রা।

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ কৃতিত্বের মূলে রয়েছে জীবন ও মননের সব সংগ্রামের অন্তরালবাসী বিদ্যাসাগরের কবিহৃদয়। আর এই কবিসত্তার দিক থেকেও বিদ্যাসাগরের অভিষ্ট কবি শেক্সপীয়র ন'ন (যদিচ শেক্সপীয়র-অনুরাগ তাঁর কম ছিল না), তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি কালিদাস। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেক্সপীয়র-প্রীতির মূলে সাহিত্যরুচির যে পরিবর্তন, তার অন্তরালে রয়েছে পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রতি আমাদের নবজাত অনুরাগ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় একটু বিলম্বিত হলেও পরবর্তী জীবনেও কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি মত পরিবর্তন করেন নি। তার কারণও ভারতীয় জীবনবোধের ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে কালিদাস-সাহিত্যের উপলব্ধিই নয় কি? অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কালিদাসের ব্যাখ্যায় নূতন সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, সেজাতীয় কিছু বিদ্যাসাগরের রচনায় মেলে না। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে কালিদাস-চর্চার আদি প্রেরণা যে তিনি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের সামান্য আগে বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্যোগে কালিদাস-সাহিত্য য়ুরোপের মন হরণ করেছে। তরুণ বিদ্যাসাগর পূর্বগামী এই বিদেশী পণ্ডিতদের দ্বারা নিশ্চয় প্রভাবিত। কিন্তু পরবর্তীকালের প্রসারিত সাহিত্যরুচিতেও তুলনামূলকভাবে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর অবিচল আস্থা ছিল। 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' যে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যবোধের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, বাংলাসাহিত্যের আলোচনায় সেই শক্তি নিয়োজিত হলে আমাদের সমালোচনাসাহিত্য লাভবান হতো সন্দেহ নেই।

কিন্তু সমকালীন সমালোচকেরা অনেকেই যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতিত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি, সে কথাও সমান সত্য। সার্ধশতাব্দীর এপারে দাঁড়িয়ে সমকালীন বাংলাগদ্যের গঠমান রূপের কথা ভেবে দেখলে মনে হয়, নানাজাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্দোলনে তখন অবধি বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের লেখকবৃন্দ অনেকটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, দেবেন্দ্র-নাথ, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বাংলা গদ্যের যে পরিবর্তন চলেছিল তার মধ্যে কোন্ গদ্যরীতিটি ভবিষ্যতে নিশ্চিত পথনির্মাণ করবে এ বিষয়ে তখনকার দিনে কারো পক্ষেই নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব ছিল না। কেরী অবশ্য তাঁর অনুবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীকে বাংলাভাষার সংস্কৃত-উৎসের প্রতি মনোযোগী হতে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সেই শুভসিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ ফল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরীতি। প্রথম-জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মীরূপে বিদ্যাসাগরের রচনার সূত্রপাত 'বাসুদেবচরিতে'। সুতরাং উইলিয়ম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নেতৃত্বের কিছুটা অনুসরণ বিদ্যাসাগরও করেছেন। কিন্তু বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তক রচনার স্তর থেকে মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির

সুযোগ্য বাহনরূপে পরিণত করায় শিল্পী বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব। এই অর্থেই বাংলা সাধুগদ্যের আদর্শরূপস্রষ্টা বিদ্যাসাগর 'বাংলাভাষার জনক' আখ্যায় ভূষিত।

কিন্তু বাংলা সাধুগদ্যের যুগ যখন অবসিতপ্রায় তখন বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আধুনিক বাঙালীর মনোভাব কী দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচিত অংশ ছাড়া আজকের বাঙালী বিদ্যাসাগরীয় রচনার অতি সামান্য অংশের সঙ্গেই পরিচিত। প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের যুগ্ম-নেতৃত্বে বাংলা গদ্যের মূল বাহনরূপে যখন থেকে চলতি গদ্যরীতিই নির্বাচিত হল তখন থেকেই ধীরে ধীরে সাধুভাষা আপন গণ্ডী সংকীর্ণ করে এনেছে।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অবধি মূলতঃ সাধুভাষারই প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এই তিন কথাশিল্পীই বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করেছেন। এঁদের মধ্যে আধুনিক-কালের শিল্পচেতনার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ। সাধু ও চলতি—দুই গদ্যরীতিরই সেরা দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায়।

আধুনিকযুগে স্বভাবতঃই চলতি গদ্যের রাজত্ব। তবু প্রশ্ন থাকে, সাধু গদ্যের নিজস্ব ভূমিকা কি বাংলা সাহিত্যে আজ একেবারে অনাবশ্যক? অনেক মনস্বী লেখকের মনেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সাহিত্যের ভাষামাত্রেই রূপদক্ষের অপেক্ষা রাখে। সাধুগদ্য হয়তো একেবারে মুখের ভাষা নয়, কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকদের কেই বা একেবারে মুখের ভাষায় লিখেছেন? এর ব্যতিক্রমও হয়তো আছে। বাংলা চলতি গদ্যের প্রথম যুগের সবচেয়ে জোরালো সমর্থক বিবেকানন্দও তাঁর সবচাইতে মননঋদ্ধ রচনা 'বর্তমান ভারত' লিখেছেন সংহততম সাধুগদ্যে। সুতরাং এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সাধুগদ্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনি-সুষমা ও পরিশীলিত আভিজাত্যে বাঙালীর মননধর্মের চিরকালীন প্রকাশের একটি আদর্শরূপ বিধৃত। যোগ্য অধিকারীর কলমে বাংলা সাধুগদ্য যে আবার পরিপূর্ণ প্রাণবেগে মহিমান্বিত হতে পারে এবং হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, তার কারণ এই সাধুগদ্যের আদি ভগীরথ বিদ্যাসাগর।

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষারীতির পরিবর্তন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রটি মনে রেখে বলা চলে, বাংলা গদ্যের বিভিন্ন প্রয়োজন বিভিন্ন লেখকের দ্বারা সাধিত হয়েছে। রামমোহনের গদ্যরীতির প্রাথমিক পরুষতা সত্ত্বেও যে যুক্তিপ্রধান বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনারীতি রামমোহনের বৈশিষ্ট্য তা শুধু সমকালীন প্রয়োজন মেটায় নি, একালের ভাবালুতাসর্বস্ব গদ্যরীতির যুগেও সেই মননযুদ্ধের শাণিত আয়ুধদীপ্তি কম প্রার্থনীয় নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষাশিল্পে সহজাত নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র দুরূহ বাক্যচ্ছটার অন্তরালে শাস্ত্রার্থ আলোচনার যে ভাষারীতি, আজ অবধি আমাদের শাস্ত্রালোচনার মূলরীতি তাতেই প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের মননভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধশাখার অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়-কুমার দত্ত বিষয়গৌরবী রচনারীতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে আজকের দিনের পাঠককেও চমকিত করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার—হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি দুই মনীষী যখন উত্তরকালে বাংলা গদ্যে সর্বজনবোধ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তার আগেই বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু বাংলা গদ্যকে অভিজাত বিষয়বস্তুর উচ্চমঞ্চ থেকে প্রতিদিনের জীবনচর্যার

কাছাকাছি নিয়ে আসতে তাঁদের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'শকুন্তলা' যে একই বছরে (১৮৫৪) প্রকাশিত, সে আশ্চর্য যোগাযোগের কথাও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়।

বিদ্যাসাগরের সমকালীন এইসব লেখকমণ্ডলীর পাশে সবচেয়ে কম আলোচিত হয়ে থাকেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার কারণ বোধ হয় এই যে, মহর্ষির ব্যক্তিত্ব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে অনেক পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে। সাহিত্যশৈলী যে লেখকব্যক্তিত্বের অন্তরতম নির্যাস—এ কথাটি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রমাণিত দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থে। এদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পুরোগামী এবং পরবর্তী রবীন্দ্র-গদ্যরীতিতেও অনেক পরিমাণে প্রভাববিস্তারকারী।

সংবাদপত্র, বিতর্কসাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক-রচনা, অনুবাদ ও অনুসরণ—এই বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলা গদ্য যখন আত্মপ্রকাশের দ্রুতসিদ্ধির প্রার্থনায় ব্যাকুল, তখনই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে এমন এক সংগতি সামঞ্জস্য ভারসাম্য ও ছন্দোবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করলেন, যার বলে এই দেড় শো বছরের মধ্যেই বাংলাভাষা শ্রেষ্ঠ মনন ও কল্পনার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত। সাধুগদ্যের স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষণায় তাঁর যাত্রা শুরু। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস-জাতীয় কথাসাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর অন্তরবাসী কথাশিল্পিসত্তার পূর্ণ বিকাশ। আত্মচরিত ও বেনামী রচনার মাধ্যমে চলতিভাষার প্রান্তে এসে তাঁর গদ্যসাধনার শেষসংকেত। তিনি হয়তো নিজেও জানতেন না বাংলাভাষায় কী লাবণ্য তিনি সঞ্চার করে গেছেন, তা নইলে 'শকুন্তলা'র ভূমিকায় পাছে কালিদাসের যোগ্য মর্যাদা না হয়ে থাকে, সেজন্য এত সন্ত্রস্ততা কেন? তাঁর অগোচরেই 'শকুন্তলা' বাংলাসাহিত্যের চিরন্তন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত। আপন সৃষ্টিতে অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ স্বভাবশিল্পীর ধর্ম।

বিদ্যাসাগর যেমন কালিদাসের ঐতিহ্যকে বাংলাসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি উপনিষদের ভাব ও ভাষাসম্পদে বাংলা গদ্যের সরসতা ও গভীরতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়েছেন। রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ছিন্নপত্র শুধু তাঁর অধ্যাত্মসংকটেই পথনির্দেশ করে নি, তাঁর ভাষণে ও লেখনে উপনিষদের কবিত্বসঞ্চারেও সহায়তা করেছে। বৈদিক বা ঔপনিষদিক ভাষাসৌন্দর্যের সচেতন সাহিত্যিক প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথেরই উত্তরসূরী।

৩

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ অবধি বাঙালীর মননেতিহাসে একটি মূল জিজ্ঞাসা মানব-জীবনের অধ্যাত্মস্বরূপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সৌভাগ্যবশতঃ এর ফলে বেদ উপনিষদ গীতা পুরাণসাহিত্য রামায়ণ মহাভারত বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্য, শঙ্করাচার্য রচিত অদ্বৈতদর্শনের গ্রন্থরাজি, কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি স্বদেশ ও বিদেশের বহু সাধনগ্রন্থই উনবিংশ শতাব্দীর মননভূমিকে নব নব আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছে। রাজা রামমোহনের পরে বাংলাভাষায় তুলনামূলক ধর্মালোচনায় স্মরণীয় প্রচেষ্টা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের। কিন্তু প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে ভারতের অতীত ও বর্তমানের সমগ্র সাধনার ইতিবৃত্ত রূপায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঈশ্বরতন্ময় ব্যক্তিত্বে।

বিদ্যাসাগর আপন স্বাতন্ত্র্যে এই ধর্মান্দোলন বা অধ্যাত্মসাধনা থেকে দূরে থেকেছেন। সমকালীন ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কৌতুকস্নিগ্ধ আলাপচারীতে—"আমি বেত খাবার

ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মারো। তারপর মনে কর আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি; তার জন্য বেতের হুকুম হোল। তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে ঐরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে। নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেবো?"

এই অপূর্ব আলাপচারীতে যে শুধু মজাদার কথাই আছে তা নয়, আমাদের ধারণায় এইটিই ঈশ্বর-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের অভিমত। যাঁরা অনন্তসত্যের কোনো এক অংশকে পেয়েই সমগ্রতার দাবী করেন, তাঁদের নিজস্ব সার্থকতা যাই থাক-না কেন, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করে বিচার-বিতণ্ডার ঝড় তোলার চাইতে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌন থাকাই যথার্থ জ্ঞানান্বেষীর লক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ বা কেশবচন্দ্র যে অধ্যাত্ম-আলোকের সন্ধানী বিদ্যাসাগর মর্ত্যলোকের প্রেমে সে আলোকের পৃথক প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিন্তু তাঁর এই মানবমমতায় যে নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের আদর্শ মেলে তা আধ্যাত্মিকতারও আবশ্যিক সর্ত। 'জীবে দয়া' বা 'জীবে প্রেম'—কোনোটিই এ ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব নয়।

বিদ্যাসাগরের অধ্যাত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সবচেয়ে দামী কথা বলে গেছেন সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ।—"ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ ক'রছে—কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন—জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।"

স্বভাবতঃই এ যুগের পাঠকের মনে হতে পারে পরোপকারের এই মহাব্রতের পরে আর ঈশ্বরের প্রসঙ্গে কীই বা প্রয়োজন? বিদ্যাসাগরও মনে করতেন, যথাসাধ্য পরোপকারই মানুষের কর্তব্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ যখন অজ্ঞেয়, তখন এর চেয়ে বড়ো কর্তব্য মানুষের আর কিছু থাকতে পারে না। অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর-সন্দর্শনে সমাগত শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এমন-কি তাঁর মতে মানুষের মহত্ত্বই এইখানে যে, সে অনন্ত ঈশ্বরকে ধারণায় আনতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর এ দুই যুগপুরুষের সাক্ষাৎকারে নবীন ভারতবর্ষের প্রাণের জিজ্ঞাসাই রূপায়িত। সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী ভারতবর্ষ একদা ঋষিকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল, আমরা সবাই অমৃতের পুত্র। দুঃখ মৃত্যু বিচ্ছেদের কারাগার থেকে বন্ধনমোচনের এই বাণীই মানব-অন্তরে অভয় অমৃত শাশ্বত উপলব্ধির উৎস খুলে দিল। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সব দেশে সব কালে এমন কিছু কিছু মানুষ দেখা দিয়েছেন, যাঁদের চারিত্র্যে ও সাধনায় অনন্তের পরমসংকেত মানবজন্মের সব অপূর্ণতাকে আশ্বস্ত করেছে। রামমোহনের যুক্তিবাদী ধর্মচর্চার থেকে দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধিময় অনুরাগের আদর্শে তাই তন্ময়তার স্পর্শ অনেক বেশি। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়সাধনায় শুধু বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ঐক্যই স্থাপিত হয় না, সত্যের সন্ধানে মানব-অন্তরের সর্বস্তরের ব্যাকুলতা ও প্রাপ্তির নিশ্চিত অভিজ্ঞান মেলে। কেশবচন্দ্রের নববিধানে সর্বতোমুখী

ভাবগত ব্যাপ্তি সমকালীন তরুণসমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আত্মোপলব্ধির এই অন্তরতম সত্যেই সমাজকল্যাণ বা পরোপকারের বাসনার যথার্থ অধিষ্ঠান। অধ্যাত্মচেতনাবর্জিত পরোপকারের ধারণায় দেশে দেশে নির্দিষ্ট মত ও দলের দাসত্বে মানবজাতির নূতন শৃঙ্খলরচনার সাক্ষ্য তো আজ প্রতিদিনের ইতিহাস। অন্ন-বস্ত্র-সংস্থান ও সাধারণ শিক্ষার বিস্তারের আদর্শ অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্যার কথা মনে রেখেই অন্নময় জগতের প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

উপনিষদ তাই পরা ও অপরা দু'জাতীয় বিদ্যার কথাই বলেছেন। ভারতীয় শিক্ষাদর্শ এ দুয়ের যে-কোনো একটির অভাবেই অপূর্ণ। সুতরাং বিদ্যাসাগরের জীবন ও চরিত্রের অনুধ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— 'অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে।' সেই স্পর্শমণির সন্ধানেই ভারতাত্মার যুগযুগান্তবাহী তীর্থযাত্রা।

কেউ কেউ মনে করেন, বিদ্যাসাগর যে বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন বলে মন্তব্য করেছিলেন, এটি তাঁর সুচিন্তিত দার্শনিক অভিমত। বিদ্যাসাগরের কোনো রচনায় বা আলাপ-আলোচনায় এ সম্বন্ধে কোনো দার্শনিক বিশ্লেষণ নেই। প্রত্যেক দার্শনিকমতকেই খণ্ডন বা স্থাপন করবার যুক্তিসম্মত পদ্ধতি আছে। তার অভাবে শুধুমাত্র মন্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া চলে না। তবু উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বেদান্তদর্শনের পুনরালোচনার পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের এ মন্তব্য কম অর্থবহ নয়। সাধারণভাবে বিচার করলে অর্থাৎ বেদান্তের পারিভাষিকতায় বিচার না করে যে সুলভ বেদান্তব্যাখ্যা আমাদের মধ্যে প্রচলিত সেদিক থেকে বিচার করলে বেদান্তের সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের সমন্বয় ঘটানো দুরূহ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। রামমোহন স্বয়ং উপনিষদের অনুবাদক বা বেদান্তদর্শনের প্রচারক হয়েও তরুণছাত্রদের পক্ষে বেদান্তের পঠনপাঠন নিষিদ্ধ করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বেদান্তের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া কেমন করে মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে, সে সম্বন্ধে অন্য কোনো সমাধানও রেখে যান নি। বিদ্যাসাগরের বেদান্ত সম্বন্ধে অনীহাও সে দিক থেকে প্রত্যক্ষভিত্তিক জীবনদর্শনের পরিণাম মনে করলে খুব ভুল করা হয় না। কিন্তু যে-কারণেই হোক, স্বয়ং বিদ্যাসাগর যখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নি, তখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই ভালো। তবে এ বিষয়ে উত্তরসূরী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শনের মধ্যে একমাত্র বেদান্তই বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম সত্যকেও স্বীকার করে স্বমহিমায় অটল থাকতে পারে, বেদান্তই বিশেষ কোনো সম্প্রদায়, ব্যক্তি বা ঈশ্বরকে অবলম্বন না করেও আত্মার অনন্তশক্তি ও মহিমার কথা ঘোষণা করে। তাই ধর্মমতনির্বিশেষে সকলেই বেদান্তের আত্মসত্যকে গ্রহণ করে জীবনের ক্ষেত্রে তার সুপ্রয়োগের দ্বারা আপন আপন বৈশিষ্ট্যকেই বহুগুণে বর্ধিত করতে পারে, এমন-কি পরমসত্যেও উপনীত হতে পারে। সুতরাং ধর্মাদর্শগত ও ব্যবহারগত জীবনসত্যকে বিবেকানন্দের দৃষ্টির আলোকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন নেই। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার পার্থক্য কেবল মাত্রাভেদে। তাই শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান ধ্যানজপ প্রাণায়াম— এ সবই এক সত্যে উপনীত হবার বিভিন্ন পন্থামাত্র। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের সেবাব্রতও এমন এক পন্থা হয়ে উঠতে পারে। আস্তিকতাকেই ধর্মবোধের একমাত্র সর্তরূপে বিবেকানন্দ নির্দেশ করেন নি। স্বার্থসর্বস্ব তথাকথিত আস্তিক্যবাদীর চেয়ে চিরনিঃস্বার্থ বিদ্যাসাগর, যাঁর ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চিতি কখনো ঘোচে নি, নিশ্চয় বিবেকানন্দের বন্দনীয়। তবু বেদান্তকে বিবেকানন্দ ভারতমনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং

এই বেদান্তের অন্তর্নিহিত অভয়সত্য তাঁর বাণীতে 'অভীঃ' মন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র ভারতের নবজাগরণের সহায়ক হয়েছে।

৪

সামাজিক আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের বিশেষভূমিকা অবশ্যই বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে, যদিচ বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও আশ্চর্যরকম আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণ সবচেয়ে বেশী ঋণী রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কাছে। তবু আজকের দিনে এ প্রশ্ন মনে জাগে, এ জাগরণের ফলভোগী কারা? এ দেশের শ্রমিক-কৃষকদের সমাজ যখন উচ্চবর্ণের অনুকরণ করেছে, তখনই সমস্যা। তা নইলে সহমরণ বা বিধবাবিবাহের সমস্যা তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। বাঙালী হিন্দুসমাজে আজ অবধি যে-কোনো ধরণের বিবাহই সমস্যা, তার মুখ্য দিকটি অর্থনৈতিক, গৌণ দিকটি নানা অবান্তর জাতি ও গোষ্ঠীভেদ।

বৈধব্যব্রত এ দেশের শাস্ত্রকারদের কাছে সাধনার মূল্য পেয়েছে বলেই সমাজের একশ্রেণী বিধবাদের নিষ্ঠা ও শুচিতার এত মূল্য দিয়েছেন। মানবজীবনের উদ্দেশ্য যদি মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, তবে যত বেশি নিষ্কাম সাধনার দিকে তাকে অগ্রসর করানো যাবে, ততই দেশের কল্যাণ— এই ছিল ধারণা। ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল সরকার প্রভৃতির বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির মূল বক্তব্য অনেকটা এ ধরণের। কিন্তু পুরুষমানুষের বেলায় কেন যে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়, তা বোধহয় সেকালে দুএকজন ছাড়া কেউ ভেবে দেখেন নি। যে কারণে সন্ন্যাসের বাহুল্য সমাজের পক্ষে অস্বাভাবিক, সেই কারণেই বৈধব্যব্রতকে অবশ্যপালনীয় শর্তে পরিণত করা অস্বাভাবিক— এই সহজ সমাজসত্যটি আমাদের ধারণায় আনতেই বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রমন্থন ও পণ্ডিতী মূঢ়তার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম। তবু যে কাজকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মনে করতেন, পরবর্তী সমাজচেতনা তার দ্বারা অতি সামান্যই প্রভাবিত। সর্বব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা নারী পুরুষ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধন প্রভৃতি সব ধরণের অধিকারভেদের অবসান যতদিন না হবে ততদিন সরকারী আইনের সহায়ে সামাজিক আন্দোলনের পরিণতি এর চেয়ে ফলপ্রদ হতে পারে না।

কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামীদের সাফল্য কোনো বিশেষ উদ্যোগের সার্থকতায় নয়। অনিঃশেষ সংগ্রাম-চেতনাই মানবসাধারণের স্বল্পতৃপ্ত স্বার্থসংকীর্ণ জীবনবৃত্তে তাঁদের সবচেয়ে বড়ো দান। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনময় যে কর্মতপস্যা তাঁকে দীন দরিদ্র আর্তের দুর্গতিমোচনে উদ্বুদ্ধ করেছে সেই নিরলস উদ্যম যে-কোনো দেশেই শ্রদ্ধার বিষয় হলেও আমাদের বাঙালী চরিত্রের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন'— কিন্তু সে দুঃখ শতগুণ হয়ে দেখা দেয়, যখন তা প্রিয়জনের হাত থেকেই মেলে, সব চেয়ে যে অনুগৃহীত সেই যখন সবচেয়ে দুর্বিনীত শত্রুতে পরিণত হয়। কিন্তু না, তিক্ততায় অভিজ্ঞতার পাত্রটি পূর্ণ হয়ে উঠলেও মানুষের ব্যথা বেদনায় তাঁর করুণাসিন্ধু কখনো অনুদ্বেল থাকে নি।

সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হয়েও লোককল্যাণের জন্য প্রধানতঃ পাঠ্যপুস্তকে তাঁর রচনাবলী সীমাবদ্ধ। তেমন করে পড়াশুনো করতে পারলেন না বলে শেষবয়সে তিনি চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মানুষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষার অভাবের বেদনা যাঁর অন্তরে অঙ্কুশের মতো আঘাত করে চলেছে, মননের দুরূহ শিখরে আত্মলীন হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তারই মধ্যে সংস্কৃত বাংলা

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে সমগ্র দেশের জ্ঞানভিত্তি স্থাপনের ভারও বিধাতা অনেক পরিমাণে তাঁর উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার আয়োজনে শুধু মানসিক পরিশ্রম নয়, আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিরকালের মতো হৃতস্বাস্থ্যও হয়েছেন। তবু মনে হয়, তাঁর অগাধ বিদ্যাভাণ্ডারের উপযুক্ত আরও কিছু মননগ্রন্থ যদি তিনি রচনা করে যেতে পারতেন, বাংলা ও ভারতের সাহিত্যে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণায় বাংলার কত মনীষী সাহিত্যিক সমাজসেবক ধর্মান্দোলনকারী তরুণ সেযুগে আপন আপন অভীষ্টপথে অগ্রসর হয়েছেন, তার তো সীমাসংখ্যা নেই। বিশেষ কোনো মতবাদের প্রচারক ন'ন বলেই হয়তো সব ধরণের মানুষই অভাবে অভিযোগে বিদ্যাসাগরের উদার অকৃপণ হাতের স্পর্শ পেয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরউদ্যত, অথচ অন্তরে চিরক্ষমার প্রস্রবণ এই মানুষটির কাছে আপন পুত্র জামাতা বন্ধু আত্মীয়— কেউ ন্যায়দণ্ডের বাইরে ছিলেন না। সমস্ত জীবন সকলের উপকার করেও শেষজীবনে অন্তরের অন্তরে নির্বাসিতের বেদনাবহন করে তাঁর জীবন কেটেছে। সে নির্বাসন তাঁর চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক পরিণতি। আশ্চর্য, তবু কখনো তিনি কোনো অন্যায়কারীরই অকল্যাণ কামনা করতে পারেন নি। সত্ত্বগুণাশ্রিত হৃদয়ের দয়াবৃত্তি মানুষকে কতখানি দেবমহিমায় দীপ্ত করে তোলে বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনা সেই সত্যের প্রতিরূপ।

আজকের দিনের বুদ্ধিজীবীরা বাংলার নবজাগরণকে সংশয়িত দৃষ্টিতে দেখতে চান। অনেকেরই ধারণা, পাশ্চাত্যপ্রভাবিত এ জাগরণ সমাজের এক খণ্ডিত অংশকে সাময়িকভাবে আলোকিত করলেও সমগ্র জাতীয় চিত্তের দিক থেকে এ জাগরণের তাৎপর্য অতি সামান্য। উত্তরে বলা যায়, কোনো দেশের চিত্তজাগরণই আশুলভ্য ইতিহাসের পরিণতি নয়, বিশেষত, ভারতবর্ষের মতো বহুবিচিত্র জীবনাবর্তে সঙ্কুল বিপুল ঐতিহ্যময় দেশের ক্ষেত্রে তো নয়ই। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ আমাদের ভবিষ্যৎ জাগরণের সূচনা মাত্র এবং সে সূচনাও ঘটেছিল পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবর্ষের পটভূমিকায়। কিন্তু সব দেশে ও সমাজেই এক নূতন সভ্যতার জাগরণ কি সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষার অভ্যুদয়েই সূচিত হয় না? রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি ব্যাপ্ত উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আর সবাইকে বাদ দিলেও অন্ততঃ একটি অনন্য মানুষ তো দেখা দিয়েছিলেন যাঁর প্রেম তিতিক্ষা সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গে আমরা মনুষ্যত্বের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শকে পেয়েছিলাম, আর জেনেছিলাম জীবনসংগ্রামে শ্রেষ্ঠ বীরের বিজয়-তিলক তাঁরই ললাটে উদ্ভাসিত হয়, যিনি সঙ্কল্পে অবিচল, বঞ্চনায় ভ্রূক্ষেপহীন, বেদনায় অন্তরঙ্গ, সেইসঙ্গে সানন্দে এই ধূলিমাটির নিত্যপরিচয়ের পৃথিবীর সব বোঝা, সব দায়িত্ব বহনে অগ্রসর। এমন একটি 'মানুষে'র আবির্ভাবই ভারতের অন্তর্লোকে মহাজাগরণের ধ্রুবসংকেত।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সহায়ক গ্রন্থসূচী

বিবেকচূড়ামণি : শঙ্করাচার্য
চারিত্রপূজা : রবীন্দ্রনাথ
চরিতকথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর ; বিহারীলাল সরকার
বিদ্যাসাগর-জীবন-চরিত : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড
বাণী ও রচনার ভূমিকা : ঐ, ১ম খণ্ড : ভগিনী নিবেদিতা
শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ ও ৩য় ভাগ
মুণ্ডক উপনিষদ
সাম্য ; বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র
বিদ্যাসাগর-রচনা-সম্ভার : ভূমিকা : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ভূমিকা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিদ্যাসাগর-প্রতিভা : একটি অনালোচিত দিক

"যখন পীড়া একই প্রকারের, তখন বড়লোক ও দরিদ্র ব্যক্তি নির্বিশেষে এক প্রকারই ঔষধ হওয়া উচিত"—বলেছিলেন বিদ্যাসাগর[১]। কুইনাইন দুর্মূল্য হওয়ায় ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র দরিদ্রদের সিংকোনা ব্যবহার করবার প্রস্তাব করলে এ কথা বলেছিলেন তিনি। তাঁর এই উক্তিটি থেকে একদিকে যেমন দরিদ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি পরিচয় মেলে সত্যিকারের একটি যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞান-সচেতন মনের। যতদূর জানি. বিদ্যাসাগর-প্রতিভার এই শেষোক্ত দিকটি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা আজও অবধি হয় নি। কী বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহপ্রথা রোধে, আবার কী বিধবাবিবাহ চালু করার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই বিজ্ঞান-সচেতন মন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন,

> অপ্রমত্ত শরীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্‌বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত শৈশবজায়াপতিসম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতি-বিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনকজননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্বল্য ও সর্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

২

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর ছিলেন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা সম্প্রসারণের অনুরাগী। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনে তৎকালীন কাউন্সিল অব্ এডুকেশন-এর সেক্রেটারী এফ্. জে. মৌয়াট্ -এর কাছে তিনি যে রিপোর্ট[২] পাঠিয়েছিলেন তা'তে তাঁর এই বিজ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা লীলাবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। দুটি গ্রন্থই সংক্ষিপ্ত, শৃঙ্খলাহীন এবং অত্যন্ত কঠিন করে লেখা। ইংলণ্ডে প্রচলিত এ-ধরণের গ্রন্থের সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই। অথচ এদের পড়তে ছাত্রদের সময় লাগে দীর্ঘ চার বৎসর। তাই অবিলম্বে এই পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন দরকার। পাশ্চাত্য লেখকদের গ্রন্থ থেকে অঙ্ক বীজগণিত ও জ্যামিতির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা উচিত। হার্শেল প্রমুখ মনীষীদের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ্য করা প্রয়োজন।

অবশ্য পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞানবিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর অনেক আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন, তখন নিয়ম ছিল, অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্ররা লীলাবতী ও বীজগণিত পড়বে, কিন্তু সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রদের

১ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : 'স্বাধীনাবস্থা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা।

কেউই অঙ্ক শিখবার জন্যে জ্যোতিষের শ্রেণীতে যাবে না। ফলে, সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্ররা প্রায়ই অঙ্কে ফেল করত।

শিক্ষার এই ত্রুটি দূর করার জন্যে বিদ্যাসাগর সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রদের অঙ্ক শেখাবার ব্যবস্থা করেন এবং জোর দেন প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির উপর। কারণ, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানগ্রন্থ একই সঙ্গে পাঠ্য রেখে এদের মধ্যে যথার্থ মিল দেখানো সব সময় সম্ভব হবে না। আর, এমনকি সম্ভব যদি হয়ও তো ভারতের তথাকথিত 'জ্ঞানী'রা উন্নত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণে কিছুতেই রাজী হবেন না। কারণ, তাঁরা দীর্ঘদিন সঞ্চিত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাঁদের ধারণা, এদেশের শাস্ত্রপ্রণেতারা সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। অতএব তাঁরা যা-কিছু লিখেছেন তাই সত্য, অভ্রান্ত।

বিদ্যাসাগর বললেন, ঋষিভক্ত এই অন্ধ 'জ্ঞানী'দের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র পথ সারা দেশ জুড়ে নতুন যুগের শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করা, জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করে একদল যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলা।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে এরূপ প্রগতিশীল মনোভাব ছিল বলেই বিদ্যাসাগর কলকাতায় মেডিকেল কলেজ[৩] স্থাপনে সুখী হয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে 'বাঙ্গালার ইতিহাস'এ (১৮৪৮) তিনি লিখছেন[৪]—

> লার্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, দেশীয় লোকদিগকে য়ুরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত, কলিকাতায়, মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিশয় মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত, ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ের পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বহু দরিদ্র ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়বার সুযোগ পেত। ছেলেদের তিনি নিজের বাড়িতে রেখে পড়াতেন। এ-সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখছেন, "কয়েক বৎসরের মধ্যে বীরসিংহ বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করে।"[৫]

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা[৬] স্থাপনেও বিদ্যাসাগরের অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নেতৃত্বে এই সভা স্থাপিত হয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারকল্পে বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানকে ১০০০৲ দিয়েছিলেন।[৭]

৩

শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এই যে বিজ্ঞানানুরাগ, এর পিছনে ছিল তাঁর দীর্ঘকালের প্রস্তুতি। ইংরেজী অঙ্ক শিখবেন বলে তরুণ বয়সে তিনি শোভাবাজার বাড়িতে আনন্দকৃষ্ণ বসু, অমৃতলাল মিত্র ও শ্রীনাথ ঘোষের[৮] কাছে যেতেন। ঐ রাজবাড়িতেই অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ।

---

৩ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ; পৃ ১৮৩।

৫ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। 'চাকরি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬ বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ ভাদ্র।

৭ বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লোকসেবায় বিদ্যাসাগর' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮ অমৃতলাল মিত্র শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যম জামাতা, শ্রীনাথ ঘোষ কনিষ্ঠ জামাতা এবং আনন্দকৃষ্ণ বসু দৌহিত্র। এঁরা সকলেই হিন্দু কলেজে পড়ে ইংরেজীতে সুপণ্ডিত হন।

অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজী ও অঙ্ক চর্চা করবেন বলে শোভাবাজার রাজবাড়িতে যেতেন। ছাদে বসে খড়ি দিয়ে অঙ্ক কষতেন ওঁরা; জ্যামিতি-চর্চা করতেন। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও দেখা হত না।

একদিন, ঠিক দেখা না হলেও অদ্ভুত একটা যোগাযোগ ঘটে গেল ওঁদের মধ্যে। আড়ালে থেকে উভয়ে উভয়কে জানবার সুযোগ পেলেন।

বিদ্যাসাগর আনন্দবাবুর বাড়িতে বসে আছেন। এমন সময়ে অক্ষয়বাবুর একটা লেখা এল। প্রায়ই আসত এমন। অক্ষয়বাবুর নিজের লেখাই শুধু নয়, তত্ত্ববোধিনীর অন্যান্য অনেকের লেখাও আনন্দকৃষ্ণ প্রমুখ বিদগ্ধজনেরা সংশোধন করে দিতেন।

আনন্দবাবু অক্ষয়কুমারের লেখাটা বিদ্যাসাগরকে পড়ে শোনালেন। বিদ্যাসাগর লেখা শুনে খুশি হলেন খুবই, কিছু কিছু সমালোচনাও করলেন। লেখাটি জায়গায় জায়গায় যে অনুবাদগন্ধী ও ইংরেজী ভাবে দুষ্ট তা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না। আনন্দবাবুর দিক থেকে অনুরোধ এল তখন, লেখাটা সংশোধন করে দিতে হবে।

শোনা যায়, বিদ্যাসাগর সংশোধন করেছিলেন। এই একবারই শুধু নয়, আরও বহুবার। অক্ষয়কুমার সেইসব সংশোধন দেখে খুশি হতেন। কিন্তু লোক মারফত প্রবন্ধ যাতায়াত করত বলে বিদ্যাসাগরকে তখনও তিনি ঠিক জানতেন না। একদিন কৌতূহলবশে তিনি আনন্দবাবুর বাড়িতে এলেন এবং সেইদিনই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ-পরিচয় হল। এই পরিচয়ের পর থেকে অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ লেখাই বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন।[৯]

জর্জ কুম্ব-এর 'কন্‌স্টিটিউশন অব ম্যান' অবলম্বনে লেখা অক্ষয়বাবুর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক বইটির আগাগোড়া বিদ্যাসাগর দেখে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, বহু দুরূহ বিদেশী শব্দের বাংলা পরিভাষা করার ব্যাপারে অক্ষয়বাবুকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে সংযোগ ছিল বলেই এ কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ন্যায়-শাস্ত্রের শ্রেণীতে পড়বার সময় তিনি 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্'[১০] নামে একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থটি রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। মিয়র নামে এক সিবিলিয়ান একবার প্রস্তাব করলেন, পুরাণ, সূর্যসিদ্ধান্ত ও ইয়োরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে যে ছাত্রের লেখা শ্লোক সর্বোৎকৃষ্ট হবে, তিনি তাকে এক শত টাকা পুরস্কার দেবেন। বিদ্যাসাগর ও তাঁর কয়েকজন সহপাঠী শ্লোক-রচনায় উদ্যোগী হন এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরই পুরস্কার লাভ করেন।

'ভূগোলখগোলবর্ণনম্'এ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেই বিদ্যাসাগরের স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানচিন্তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে 'জীবনচরিত' (১৮৪৯) ও 'বোধোদয়' (১৮৫১) গ্রন্থদ্বয়ে।

৯ বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার।

১০ 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১২৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'জীবনচরিত' তিনি লিখেছিলেন চেম্বার্সএর 'Exemplary Biography' অবলম্বনে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মহাপুরুষদের জীবনী বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হলে ছাত্রদের উপকার হবে। কিন্তু সময়াভাব এবং আরও নানা কারণে ঐ বইটির সবটুকু তিনি অনুবাদ করতে পারেন নি; মোট নয় জন মনীষীর জীবনী অনুবাদ করেছিলেন। ঐ সব মনীষীর মধ্যে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল প্রমুখ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানীরা আছেন।

'জীবনচরিত' লিখবার সময় উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদ্যাসাগরকে অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে এবং বহু নূতন নূতন শব্দ সংকলন করে পরিভাষা তিনি নিজেই গঠন করলেন। 'জীবনচরিত'এ ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা হল— অস্থিত পাটীগণিত (Arithmetic of Infinites), কক্ষ (Orbit), গ্রহনীহারিকা (Planetary Nebulae), ছায়াপথ (Milky way), জলোচ্ছ্বাস (Tide), দূরবীক্ষণ (Telescope), উপগ্রহ (Satellite), স্থিতিস্থাপক (Elasticity) ইত্যাদি।

পরিভাষার ব্যবহারেই শুধু নয়, গ্রন্থটির রচনারীতিতেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর ভাষা এত প্রাঞ্জল যে অনুবাদ বলে ধরা যায় না। মনে হয়, আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাব ও ভাষার দিকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ করাতেই চরিতকাহিনীগুলি এত সুখপাঠ্য হয়েছে।

বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ছয় মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অনেকেই গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন[১১]—

> জীবনচরিতের বিষয়ীভূত চরিত্র পাঠে ধারণা জন্মে, তাঁহারাই মনুষ্যের আদর্শ, সুতরাং তাঁহাদের অন্যান্য আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতিও অনুকরণীয়। কাজেই সেই সকলের অনুকরণেই প্রবৃত্তি সহজে ধাবিত হয়। মনে হয়, এই সকলের অনুকরণেই সেইরূপ আদর্শে উপস্থিত হওয়া যায়। সত্য সত্য সে সব কিছু আর হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় নহে। হিন্দুর তাহাতেই অধঃপতন।

আসলে এই ধরণের গ্রন্থ-রচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় উত্থানের পথকেই প্রশস্ত করার চেষ্টা করছিলেন বিদ্যাসাগর। কারণ, তাঁর আগে বাংলা ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট জীবনচরিত কেউ সংকলন বা অনুবাদ করেন নি। এ-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন,[১২]

> অগ্রজ মহাশয়ের সুন্দর অনুবাদ ও ললিত রচনাপ্রণালী দর্শনে, সকলে অপরিসীম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সাধারণের নিকট অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সাধুভাষায় ইংরেজী পুস্তকের এরূপ অনুবাদ করিতে কেউ সক্ষম হন নাই।

এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, রচনাকে সহজ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর এখানে তথ্যের অযথা কাটছাঁট করেন নি। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল গ্রন্থের ভাবানুসরণ করেছেন। ফলে, রচনা একদিকে যেমন প্রাঞ্জল, অপরদিকে তেমনি তথ্যনির্ভর হতে পেরেছে।

'জীবনচরিত'এর কিছুদিন পর 'বোধোদয়' প্রকাশিত হয়। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এটি সংকলিত হয়েছিল। পণ্ডিত মনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ পড়ে ছাত্রছাত্রীরা এ বইটি

---

১১ বিদ্যাসাগর, পৃ ২৫২।

১২ বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। 'চাকরি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পড়বে, এ-উদ্দেশ্যেই এর নামকরণ করা হয়েছিল শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ। চেম্বার্সএর 'Rudiments of Knowledge' অবলম্বনে বোধোদয় লেখা। অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে শারীরবিদ্যা, গণিত, পদার্থ, রসায়ন এবং প্রাণিবিদ্যা, নিয়ে বহু মনোজ্ঞ আলোচনা এতে আছে। রচনা যাতে কঠিন না হয়, যা'তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বইটি পড়ে সহজেই বুঝতে পারে, সেজন্যে বিজ্ঞানের টেক্‌নিক্যালিটিকে এখানে সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

'বোধোদয়' অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়। কিন্তু কটূক্তি[১৩] করতে এবারেও কেউ কেউ ছাড়েন নি। বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন,[১৪] বোধোদয় হিন্দু-সন্তানের সম্যক পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা।

৫

বিজ্ঞানভিত্তিক বাংলা রচনাতেই শুধু নয়, বিজ্ঞাননির্ভর সংস্কৃত দার্শনিক রচনা সংকলনেও বিদ্যাসাগর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহঃ' তাঁরই সম্পাদনায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

মাধবাচার্য ছিলেন মধ্যযুগের ভারতসাধনার পথিকৃৎ। বেদে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। সর্বদর্শনসংগ্রহে ভারতীয় দর্শনের সব-ক'টি ধারা সম্বন্ধেই তিনি আলোচনা করেছেন।

এই মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে প্রস্তাব করলেন নতুন করে এটিকে প্রকাশ করবার জন্যে। প্রস্তাব গৃহীত হল। কলকাতার দুইটি এবং বারাণসীর তিনটি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সর্বদর্শনসংগ্রহঃ সযত্নে সম্পাদনা করলেন বিদ্যাসাগর। এ ছাড়া, লোসন-সংকলিত ও পিয়ার্স-অনুবাদিত 'পদাবলী'[১৫] গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৫২) প্রকাশের সময় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেন তিনি, চন্দ্রকান্ত শর্মাকে 'গণিতাঙ্কুর' (সংবৎ ১৯১৬) এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে 'বীজগণিত' লেখার পরামর্শ দেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বাংলায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রথম বীজগণিত প্রসন্নকুমার লেখেন। বীজগণিত ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯১৬ ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

১৩ 'বোধোদয়'এর অসঙ্গতি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের ১৬ই তারিখের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গবাসী'তে।

১৪ বিদ্যাসাগর।

১৫ প্রথম প্রকাশ—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। এতে জীবজন্তু নিয়ে লেখা প্রায় সব ক'টি প্রসঙ্গই গল্পের মতো সুখসাধ্য।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭০-১৮৯৯

ঊনত্রিশ বছর মাত্র যাঁর পরমায়ু, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে অলক্ষিত সূক্ষ্ম পরিহাসের কথাই মনে হয় সর্বাগ্রে। তবে এ অনুষ্ঠান তো আক্ষরিক নয়, স্বাক্ষরিক। এক নিঃসংশয় সাহিত্যপ্রতিভার সশ্রদ্ধ স্মৃতি ও স্বীকৃতি— যার পরিণতির সম্ভাবনা পূর্ণতা পেল না। 'বলু'র অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে শোক পেয়েছিলেন, সে শুধু নিকট-আত্মীয়ের বিয়োগব্যথাই নয়। তার সঙ্গে জড়িত ছিল এক নিশ্চিত প্রতিভার শোচনীয় অন্তিমে অপূরণীয় ক্ষতির জন্য গভীর বেদনা-বোধ। কবি তাঁর স্নেহ ও মানস শিষ্যত্ব অযোগ্য পাত্রে অর্পণ করেন নি।

বর্তমান কালে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, তাঁর রচনার মূল্য কি ভাবে কি পরিমাণে নিরূপিত হবে, তা ঠিক বলা যায় না। কারণ যে স্বভাবশ্রী তাঁর দেখা বাইরের জগৎ ও মনোজগৎকে আচ্ছন্ন করে ছিল এবং যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি শিল্প ও প্রাকৃত সৌন্দর্যকে দেখেছিলেন, হয়তো তার অন্য রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে ধরনের হোক, তার একটা বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। সুতরাং তাঁর সাহিত্য-মানস ও প্রচেষ্টার স্বরূপ বুঝতে হলে দু একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এমন একটি বিশিষ্ট পরিবারে জন্মে তিনি শিল্প কাব্য সহিত্যের চর্চা করে গেছেন যে তাঁর প্রয়াসকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা ও রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর মানসমণ্ডলকে ঘিরে আছে একটি আবেষ্টনীর মতন। অতএব এই রকম সুনির্দিষ্ট সংসার-পরিবেশ ও সুপরিচ্ছন্ন সংস্কৃতির আবহাওয়ার মধ্যে বলেন্দ্রনাথের যে ধরনের সাহিত্যকর্ম ও ভাবনা তৈরী হয়েছিল, তাই হওয়া স্বাভাবিক।

আর-একটি কথা এই, যে নন্দনচর্চা যে সহজ রূপসৌন্দর্য-বোধ বলেন্দ্রনাথের স্বভাবগুণ বা স্বধর্ম, সেই ভাবের প্রবণতা এবং মনোধর্ম জন্মাতে পারে অবসর-ভুঞ্জনেই। সংস্কৃত ভাষার যে দীর্ঘ অবকাশপ্রসূত ধীরমন্থর মন্দাক্রান্তা গতির কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন কাদম্বরী-প্রসঙ্গে, সেই রসায়িত পদন্যাস এবং নিরঙ্কুশ অবসর-রঙ্গিনী দৃষ্টিকে তিনি উজ্জীবিত করে রেখেছেন তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'গল্পগুচ্ছ' রচনায়। এরই আভাস যেন পরিস্ফুট হয়েছে বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থে এবং 'ক্ষণিক শূন্যতা'র মতো একাধিক প্রবন্ধে।

এই অবকাশ-লালিত উপভোগ-দৃষ্টিকে আভিজাত্যের লক্ষণ বা ভাববিলাস যা'ই বলা হোক, সেটাও শিল্প ও সাধনার বস্তু। রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ দু'জনেই সাহিত্য রচনা করেছেন অবসরের অনুকূল পরিবেশে, এ কথা স্বীকার করেও বলা যায় নিশ্চয়ই যে তাঁরা জানতেন, সাহিত্য শুধু একটা বিলাসের সামগ্রী নয়, মনোরঞ্জনের উপকরণ মাত্রও নয়। ভাষাশৈলীর গঠনে, বিন্যাসে কতখানি সংযম-সাধনা ও সামঞ্জস্য-জ্ঞানের দরকার হয়, একটি স্বাভাবিক অথচ সুন্যস্ত সৌন্দর্যের অবতারণা করতে হলে কতটা কলাকুশল হতে হয়, সেটা রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, বলেন্দ্রনাথও অতি যত্নে ও পরিশ্রমে প্রমাণ করে গেছেন। প্রভেদ এই যে রবীন্দ্রনাথের অনুভব উপলব্ধি আরও সূক্ষ্ম গভীর, শব্দবাহী ভাষার বাহনে তিনি এমন একটি দৃষ্টিস্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যেখানে শব্দের চেয়ে ভাবের ঐশ্বর্যদ্যুতি আরও মহৎ, বাক্যের মাধ্যমে অথচ বাক্যের

চেয়ে সত্য বড়। আর বলেন্দ্রনাথ হচ্ছেন এক সচেতন শিল্পী। প্রকৃত কারুশিল্পীর মতই শব্দগুলির ওজন বুঝে ব্যবহার করেছেন, শব্দের বর্ণ-সুষমা ও অন্তর্নিহিত ধ্বনিকে ফুটিয়ে তুলে ভাষার অঙ্গ-সৌষ্ঠব নির্মাণ করেছেন।

তাই তিনি কেবল 'শ্রাবণী' আর 'মাধবিকা'য় কবি নন, গদ্যরচনাতেই তাঁর সমধিক ও সত্যকার কৃতিত্ব। সেখানে তিনি এক বিশেষ ধরণের ছন্দ ও ঝংকার আমদানি করেছিলেন। সেই ঝংকার ও বাঙ্ময় যাদু পড়ার শেষে শুধু কানেই বাজে না, একটি দুর্লভ স্মৃতি হয়ে রসাস্বাদের ঘরে জমা হয়ে থাকে। বহুকাল পরে এখনও মনে হয়, এমন মিষ্টি হাত শুধু তাঁরই হয় যিনি জন্মেছিলেন কবিহৃদয় নিয়ে, যিনি কাব্যের প্রসাদগুণ যেন অবলীলায় ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত রচনায়। আয়াসের অস্তিত্ব-চিহ্ন তাই চোখে পড়ে না; কবিকর্ম আর লিপিকৌশল বিষয়বস্তুকেও রসে নিষিক্ত করে তোলে। ভাষাগঠনের প্রক্রিয়া এমন বেমালুম যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রসঙ্গগুলি যেন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ কেমন করে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-স্তরগুলি পেরিয়ে পুরোপুরি আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন, এটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যায়ু; রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ মোটামুটি দীর্ঘায়ু। স্টাইল গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সময় তাঁরা পেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে বলেন্দ্রনাথের মাত্র তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ প্রথম প্রবন্ধের বইখানিতেই তিনি জাত-লিখিয়ের প্রমাণসহ আসরে নামলেন। 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থের গদ্যরীতিতে এই প্রাণের পূর্ণতা দেখা যায়। এখানে একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের রস-বিশ্লেষণ, অপর দিকে তেমনি সংস্কৃত কাব্যের মতই তার চিত্রধর্মিতা। এই দুটি জিনিসের এমন অঙ্গাঙ্গি-মিলন সহজ ও সুলভ নয়।

কবি কালিদাসের চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ অনেকটা নিজের ভাষা দিয়েই দেখিয়েছেন, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের কেমন আনন্দ, কত নিপুণতা। আবার 'উত্তর চরিতে'র আলোচনার বলেন্দ্রনাথের ভাষাও দৃশ্যকাব্যের অনুরূপ, করুণ-গম্ভীর সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত। ভবভূতির পরম অনুরাগী ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। তাই হয়তো কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি তেমন সমগ্র বিচারবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি, যেমনটি পেরেছিলেন বঙ্কিম তাঁর যুক্তিবাদী আলোচনায়। বঙ্কিমের মননশীল বিতর্কস্পর্শী সমালোচনার ধারা বলেন্দ্রনাথের নয়। তিনি হচ্ছেন মূলতঃ রস-সাহিত্যের ব্যাখ্যান-কার। তাই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বর্ণনায় তিনি কোনও নতুন বা সূক্ষ্ম দিক্ নির্দেশ করেন নি। তাঁর মুখ্য কাজ মন্তব্য বা প্রতিপাদ্য গঠন নয়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণও নয়। আবেগ-স্পন্দিত মনোরম শব্দবিন্যাসে রসের কল্পলোক সৃষ্টি করা। প্রাচীন সাহিত্যের মধুস্বাদকে মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় ধরে রাখা এবং পাঠকের চোখে তারই মায়াঞ্জন বুলিয়ে দেওয়া।

আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে এই ধরণের সহজ ভাবাবিষ্ট রূপ-উদ্‌ঘাটন মনঃপূত হবার কথা নয়। মননশীল পাঠক-সমালোচক চাইবেন তথ্যভিত্তিক আলোচনা, তত্ত্বের সন্ধান, যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টি। এ ধরণের মানস বা মনীষা বলেন্দ্রনাথের ছিল না, তা স্বীকার করতে হবে। তাঁর আলোচনার ধারাটি হচ্ছে 'রানিং কমেণ্টারি'র মতো। তিনি যা যা দেখেছেন, যে ভাবে বুঝেছেন, যেমন করে তাঁর হৃদয় সাড়া দিয়েছে, তেমনি করে আপনার অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে রসভোগে তারিয়ে তারিয়ে যতটা লেখনী দ্বারা সাধ্য ও সম্ভব, ততটাই পাঠকের চিত্তে বহন করে দেওয়াই তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। বলেন্দ্রনাথের আলোচনা-

ভঙ্গী হল মর্মস্পর্শী; সমালোচনার কাজে তিনি কিছু পরিমাণে মোহাবিষ্ট। তবে তিনি যে রসস্রষ্টা, এ কথা নিঃসংশয়। এই দিক থেকে তাঁর দৃষ্টির মধ্যে সমগ্রতা ও সংশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যা দেখেন, তা পুরোপুরি দেখেন এবং খণ্ড-চিত্রের মাধ্যমে তিনি এক অখণ্ড সৌন্দর্যের পরিচিতি দেন। আপনার আনন্দানুভূতি আর দর্শক-পাঠকের উপভোগ, এ দুয়ের মধ্যে সেতু রচনা করেছে তাঁর অপূর্ব ভাষার বন্ধনী।

এই ভাষাকে বলা যায় কারুশিল্পীর ভাষা, রূপামোদী শিল্পী যার গঠনে ও সংযোজনায় পাঠক-হৃদয়ের সঙ্গে ঘটকতার কাজ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্ররচনা হোক অথবা উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র কিংবা দিল্লীর চিত্রশালিকাই হোক, শ্রাবণের বারিধারা প্রসঙ্গে নিভৃত চিন্তা হোক অথবা কণারকের বিষাদগম্ভীর মহৎ সৌন্দর্যের অভিভূতি হোক, এক সর্বস্পর্শী দৃষ্টির কোমল-উজ্জ্বল আলোয় বিষয়গুলির মৌলিক প্রকৃতি, সম্পূর্ণ চরিত্র যেন উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। একটি ভাব-মেদুর রসমন্থর আবহসৃষ্টিতে বলেন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেউ নেই, একমাত্র তাঁর গদ্যরচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। বলেন্দ্রনাথের 'অ্যাটিচ্যুড' অর্থাৎ মানসভঙ্গী, প্রাচীনকালের সাহিত্য-শিল্পকলার সশ্রদ্ধ উপসরণ আর ভাষার বলয়িত গতিমাধুর্য, এই তিনটির সমন্বয় তাঁকে লিরিস্ট-এর পর্যায়ে তুলে দিয়েছে। পুরাতন ঐতিহ্যের অনুশীলনে এবং ব্যাখ্যায় বলেন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারা গ্রহণ করেছেন।

'চিত্র ও কাব্য' বইখানির কথা একাধিকবার উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে, এইখান থেকেই বলেন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ বিকাশ দেখা গেল। এর পূর্বে তাঁর কিশোর ও তরুণ বয়সের যে সব রচনা, সেগুলি এক রকম অস্পষ্ট। আবেগে স্পন্দনে ভাবালুতায় শিথিল। কিন্তু 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যখন রচিত হয়, তখন তিনি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। ললিত শিল্পের প্রতি অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যে আসক্তি এবং নিজেকে উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ করার আকুলতা তখন দানা বেঁধে এক সার্থক রূপ সন্ধান করছে। এই সময়ে বলেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের যে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল, তার জন্য সাল-তারিখের প্রয়োজন নেই, বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার করে না। 'ভারতী-সাধনা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ তখন প্রৌঢ় পরিণত শিল্পী। 'মেঘদূত', 'নিশীথে', কিংবা 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর লেখকের বাগ্‌বিন্যাসে যে যাদু, তা বলেন্দ্রনাথের লেখায় যদি আদর্শমোহ বিস্তার করে থাকে, তাতে অস্বাভাবিকত্ব নেই। 'কণারক' 'কলবেদনা' অথবা 'গৃহকোণ' প্রবন্ধে যে মর্মরিত সৌন্দর্য এবং শুভ্রতা, তার তুলনার জন্য একমাত্র পিতৃব্য-রচনার শরণাপন্ন হতে হয়।

শেষ পাঁচ ছয় বছরে বলেন্দ্রনাথের লেখায় ব্যক্তিগত সুর কমে গিয়ে একটি নৈর্ব্যক্তিক রূপ ফুটে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন একটি উচ্চাঙ্গ ভাষাশিল্পের বাহকতায় নিখিল মনের সঙ্গে সখ্য এবং আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছিল। প্রসঙ্গ আর পদ্ধতি, দুই দিক দিয়েই তিনি আরও ব্যাপক, আরও গভীর হতে পেরেছিলেন। 'শুভ উৎসব' 'নিমন্ত্রণ-সভা' 'প্রাচীন উড়িষ্যা' আর 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা' পড়লে মনে হয়, বলেন্দ্রনাথ বর্ণনের অতিরিক্ত সত্যের স্থির ও দৃঢ় আবেদনে উপনীত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রচনার এই দুর্লভ স্তরে স্থায়ী হতে না হতেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। আরও এক যুগ বেঁচে থাকলে তাঁর সত্তা ও স্টাইল কেমন ভাবে ও কোন্ পথে এসে সার্থক পরিণতি লাভ করত সর্ব প্রভাব-মুক্ত হয়ে, সেটা চিরকালই অনুমানের বিষয় হয়ে রইল।

বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধ এবং সহজ উপভোগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য বা সঙ্গতি ধরা পড়ে। সঞ্জীবচন্দ্রও সহজ দৃষ্টি দিয়ে সৌন্দর্য দেখেছিলেন প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে। তাঁর রচনায় যে সরস কোমলতা, সে গুণটি তাঁর কথাবার্তায় আলাপে আচরণে ফুটে উঠত। তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন তেমন কঠিন ছিল না যেমনটি ছিল রাশভারি বঙ্কিমের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ সে কথা লিখেই গেছেন। মানুষটি পুরোপুরি সহজ ছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টি ও প্রকাশ -ভঙ্গীর মধ্যে সহজ সৌন্দর্য ও লালিত্যের মতন একটি বিরল গুণ সর্বদাই চোখে পড়ে। তিনি যখন উপভোগ করতেন, কেতাবি আইন-কানুন মেনে শিল্প-রীতির নিয়ন্ত্রণ অনুসারে তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করতেন না। হৃদয় ও মন খুলেই তিনি সৌন্দর্যের প্রশস্তি রচনা করতেন। কিন্তু একটি সৌন্দর্য-চিত্রের রূপায়ণে ধারিণী শক্তির উজ্জ্বল পরিচয় দিলেও, সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টি অনেক সময়ে সেই সৌন্দর্যের একটি বিশেষ দিক্ বা অংশের উপর নিবদ্ধ হত।

'পালামৌ' বইখানি পড়লে ও আলোচনা করলে এই তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থ চিত্রধর্মী' অনেক খণ্ড দৃশ্য বা চিত্র পাওয়া যাবে এখানে, যার পিছনে একটি সরস সংবেদনশীল মন নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রসারিত সৌন্দর্য-বোধ থম্‌কে দাঁড়ায় এক একটি বিশেষ জায়গায়। তখন দুটি একটি সহজ কথায় ও মন্তব্যে সৌন্দর্যের একটি বিশেষ অবয়বকে তিনি মূর্ত করে দেন। অন্য দিকে দৃষ্টি সঞ্চারী হয়ে ঘোরে না। উদাহরণস্বরূপ কোল যুবতীদের সম্মিলিত নৃত্যের কথাই ধরা যাক্। সাজসজ্জা ও প্রস্তুতির কথা বলতে বলতে তিনি মন্তব্য করেন যে মাদলে ঘা পড়তেই রমণীদের দেহে যেন কোলাহল পড়ে গেল। এই মুহূর্তের একটি নাটকীয় আবেদন রয়েছে, যেটি সঞ্জীবচন্দ্রের দৃষ্টি লেখনীর অগ্রভাগে তুলে ধরেছে একটি মাত্র শব্দ 'কোলাহলের' সাহায্যে। দৃষ্টি সমগ্র, কিন্তু সৌন্দর্যের কোনো বিশেষ দিকে (এখানে 'মুভমেণ্ট') ঝোঁকটা গিয়ে পড়ছে।

অবশ্য প্রকৃত শিল্পীর পরিচয় এইখানেই। এটা খণ্ডিত বা আংশিক দৃষ্টি নয়। শুধু বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত থেকে অংশ-বিশেষে দৃষ্টি সরে আসছে এবং দর্শকের চোখে সেই বিশেষ জায়গাটিকে বেশি উজ্জ্বল করে দিচ্ছে। বলেন্দ্রনাথেরও যেন অনেকটা সেই ধরণ। সৌন্দর্য-জ্ঞান সহজ, বিস্তৃত। কিন্তু রূপচিত্রণে কয়েকটি বিশেষ অবস্থানের ওপর তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে। এই যে 'eye for detail', এটাই বলেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। ভাষা অবশ্য তাঁর নিজস্ব। সঞ্জীবচন্দ্রের চেয়ে আরও বেশি অলংকৃত ও ধ্বনিতরঙ্গিত। কিন্তু গতি আর ছন্দ, নাটকীয় সংস্থান,—এগুলির প্রতি দুজনেরই সমান পক্ষপাত। প্রমাণ, 'গুজরাটে গরবা'। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণনা ও চিত্রের প্রাধান্য। কিন্তু সৌন্দর্যের একটা দিকই বেশি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। তার কারণ, বলেন্দ্রনাথের বর্ণনায় কল্পনার সঙ্গে নাট্যকারের দৃষ্টি মিশেছিল। যে-ঘটনা বা দৃশ্য আপাত-দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ, বলেন্দ্রনাথের চোখে সেটি তাৎপর্যে মণ্ডিত। যেখানে অনেক দ্রষ্টব্যের ভিড়, সেখানে একটা ক্ষুদ্র অসংলগ্ন বস্তুকে তিনি দর্শকের সামনে কৌশলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার কারণ, ঐ ছোট্ট 'ডীটেল'এর মধ্যে এমন বিশেষত্ব রয়েছে, যাকে হারিয়ে যেতে দিলে বা ভিড়ের মধ্যে পাশ কাটিয়ে গেলে সমগ্র দৃশ্য সৌন্দর্যের অঙ্গহানি হয়।

ধরা যাক্ 'চন্দ্রপুরের হাট'। হাটের মধ্যে কত কি জিনিস, হাটের পথেও নিত্য জনস্রোত। কিন্তু সে সবকে ছাপিয়ে লেখক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একটা বিশেষ দৃশ্যের ওপর :

'এই পথ দিয়া চন্দ্রপুরের বাবুদের একজন সরকার ও হিন্দুস্থানী দ্বারবান চলিয়াছে; হাটটি চন্দ্রপুরের

বাবুদের, এই জন্য তাঁহারা প্রতি হাটে তোলা পাইয়া থাকেন। কেহ একটা মৎস্য, কেহ আধসের আলু, কেহ গোটাকতক কাঁচকলা, আবার কেহ কেহ দুই তিনটি পয়সা দিয়া থাকে।'

এই তোলা-আদায়ের দৃশ্যটি না থাকলে চিত্রটি সম্পূর্ণ হত না। বস্তুতঃ বলেন্দ্রনাথের বর্ণনামূলক রচনার এইটিই ঐশ্বর্য।

'এক রাত্রি' প্রবন্ধটিতেও এই জিনিস পরিষ্কার ভাবে ফুটেছে। একটি পুরাতন গাছ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তারই খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে রচনা শুরু হয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি, নালার জল, কাদায় পিছল মেঠো পথ, সব কিছু দিয়ে একটি সুন্দর চিত্র আঁকা হল। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের কাছে সেটা সম্পূর্ণ বলে গ্রাহ্য হয় না যতক্ষণ না তিনি কর্দমাক্ত পথে পথিকের পায়ের পাঁচটি আঙ্গুলের ছাপ পরিষ্কার করে আঁকতে পারেন। হয় তো নিতান্তই সাধারণ মাঠের দৃশ্য, দূর থেকে হামেশাই যা আমাদের নজরে পড়ে। কিন্তু তারই মধ্যে অ-সাধারণত্ব আছে, যা বলেন্দ্রনাথের চোখে-দেখা ছবি আঁকার ক্ষমতা। একটি বিন্দুর উপর দৃষ্টিকে সংহত করে আনবার নাটকীয় দক্ষতা।

এই প্রবন্ধে নিসর্গই প্রধান, মানুষ যেন দূর-থেকে-দেখা সন্ধ্যার আবছায়া। বলেন্দ্রনাথ লিখছেন :

"এইরূপ একটি দিনে বর্দ্ধমান হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত একটি মাঠে একটি মনুষ্যের আবছা আবছা ছায়া দেখা যায়···বাতাস থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার সজোরে সোঁ সোঁ করিয়া উঠিতেছে। বৃষ্টি পড়িব পড়িব করিতেছে, কিন্তু বোধ হয়, বসন্তের খাতিরে পড়িয়া লজ্জায় পড়িতে পারিতেছে না। ঠিক এইরূপ সময়ে সেই ছায়াটিকে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে দেখিতে পাওয়া গেল।"

এর পরে আছে খণ্ড খণ্ড চিত্রের সাহায্যে একটি আবহ সৃষ্টির প্রয়াস। কিন্তু শেষের দিকে দেখা যায়, প্রকৃতির বর্ণনা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ঐ মানুষটিকেই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। মানুষটির রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন পড়ি, "চলিতে চলিতে পথিক মাঝে মাঝে দুই এক খাবল করিয়া মুড়ি খাইতেছে। পথিকের রং শ্যামবর্ণ, দেখিতে নেহাৎ মন্দ নহে।" এবারে ঐ 'মন্দ নহে' চেহারা আরও নিকটে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠছে :

"ললাটদেশের দক্ষিণভাগে একটি আঁচিল আছে, সেই আঁচিলের চারিধারে দুই-চারি গাছি পাতলা চুল ফর ফর করিতেছে···বাম ভাগে একটি কাটা দাগ আছে, সেটি বোধ হয়, বাল্যকালে পড়িয়া যাওয়ার দাগ। নাসিকা মধ্যম গোছের, সেই নাসিকাগিরির দুইটি গহ্বর হইতে অবিশ্রাম ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতেছে।"

রচনাশেষে এই অবয়ব মূর্ত না হলে নিছক নিসর্গ-শোভা বেমানান্ হত। বিশেষ করে, ঐ আঁচিলটি। ওর নিখুঁত বর্ণনায় বর্ধমানের বিস্তৃত মাঠ একটি মানুষের মুখমণ্ডলে এসে ঠেকেছে, মেঘ কেটে গিয়ে সব আলোটা এসে পড়েছে কপালে আর নাকে। আঁচিলের পাতলা দুই চারি গাছি চুল এখন আর তুচ্ছ অসঙ্গতি নয়। অশ্বত্থ গাছ, মেঠো রাস্তা, বৃষ্টি আর কাদা, আর দু এক খাবল মুড়ি খাওয়ার মতন অতি সাধারণ দৃশ্যের সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখা ঐ কপালের আঁচিলটি চমৎকার সঙ্গতি রক্ষা করেছে।

এই বিশেষ দৃষ্টির কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। এ দৃষ্টিতে মোট দৃশ্য-সৌন্দর্যের একটা বিশেষ দিক্ বা অংশ বেশি করে ফুটে ওঠে। তাতে বর্ণনার রসসৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন হয় না। বিশিষ্ট হয়েই সমগ্রের মধ্যে নিজস্ব স্থান অধিকার করে থাকে। কিন্তু চেঁচায় না, বলে না 'আমাকে দেখো'। তুলির হাল্কা কিন্তু নিশ্চিত টানে তার অনুগ্র অথচ স্পষ্ট প্রকাশ। ভিড়ের মধ্যেও পাঠকের চোখ এড়ায় না।

এই বর্ণনার শক্তি তার প্রাচুর্য, তার সূক্ষ্মতা দিয়ে আমাদের আকৃষ্ট করে। বর্ণনার মধ্যেই বলেন্দ্রনাথের

কল্পনা স্বচ্ছন্দ ও সানন্দ মুক্তি পেয়েছে, সৃষ্টির পর্যায়ে উঠেছে। যে জিনিস নিয়ে যখন তিনি কলম ধরেছেন, সেই জিনিসের নিহিত ভাবরসে তিনি তখন নিজেকে নিষিক্ত, স্নিগ্ধ করেছেন। নইলে বর্ণনীয়ের মধ্যে যে সত্যকারের অনির্বচনীয় রূপ থাকে, তাকে ধরা যায় না। বস্তুর যেটা বহিরঙ্গ, তাকে আঁকতে হলে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার প্রয়োজন। তার জন্য চাই উপযুক্ত ভাষা। বস্তুর যেটা অন্তরঙ্গ, সেই ভাবমূর্তিকে ফোটাতে হলে চাই কল্পনা। তার জন্যও চাই যথোপযোগী একটি মাধ্যম। বলেন্দ্রনাথের স্বাধিকার ছিল এমন একটি ভাষা, যা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরী। তিনি কবি, আবার বাস্তব-রসিক। তাই বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর ভাষায় বিচিত্র কারুকার্যের শোভা। নিসর্গের বর্ণনায় তাঁর ভাষা শ্যামল-কোমল, লতা-পাতা ফুল-ফলের সৌন্দর্যভারে আনত। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচয়ে তাঁর প্রকাশভঙ্গী স্মিত-সরস কৌতুকে উজ্জ্বল। সামাজিক স্মৃতির আলোড়নে তাঁর ভাষা অতীত দিনের চিত্রবর্ণে আপনাকে ডুবিয়ে নিয়ে বিষণ্ন অথচ প্রসন্ন হয় ওঠে। তাঁর ভাষায় কার্পণ্য নেই আবার অকারণ কারুণ্যও নেই। যখন তিনি চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে লেখেন, তখন ভাব ও বুদ্ধির সমন্বয়ে তাঁর ভাষাও ঋজু অথচ মধুর। 'নগ্নতার সৌন্দর্য' প্রবন্ধটিতে এ উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

পূর্বেই অবশ্য বলেছি যে বলেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য শুধু যুক্তি-শৃঙ্খলায় কিংবা বিশ্লেষণে নয়। যুক্তি-ন্যস্ত কল্পনাতেই তাঁর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ। এ জাতীয় প্রবন্ধগুলি তাঁর কলমে নিছক তথ্যপূর্ণ বা মননশীল হয় নি। বিষয়গত ধারণাশক্তির সঙ্গে হৃদয়গত সহানুভূতি মিশিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরণের ভঙ্গী সৃষ্টি করে নেন, যার মধ্যে সত্যসন্ধানী সৌন্দর্য-প্রবণতারই প্রাধান্য। তাই এখানে ভাষাও সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করে, যেমন—

"নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্তি হয়, এই জন্য তাহার সৌন্দর্য কূলে কূলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নগ্ন সৌন্দর্য স্বপ্রকাশ। উষার সৌন্দর্য কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়? শকুন্তলা, সূর্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর দেখ প্রফুল্লমুখী—ব্যাখ্যা না করিলে তাহার সৌন্দর্য কোথায়? প্রাচীন নিষ্কাম ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়া চৌধুরাণী স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন; দরবার, রাজত্ব সকলই ভাগ্যে জুটিয়াছিল, ভাবও নিষ্কাম, তথাপি সে চরিত্র ফুটিল না—যেন জাঁতায় পেষা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পাশে শৈবলিনীকে দেখ, নগ্ন সৌন্দর্যে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজায় আছে। নগ্নতায় সৌন্দর্য ফুটে অধিক। তাহার মর্মে কি যেন 'লজ্জাহীনা পবিত্রতা' জাগিয়া আছে।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতির দরকার হল কেননা, এর মধ্য দিয়েই বলেন্দ্রনাথের ভঙ্গী ও ভাষার পরিষ্কার চরিত্র বোঝা যাচ্ছে। বিশ্লেষণ করতে গিয়েও তিনি সৌন্দর্যবোধের সাহায্যই নিয়েছেন। অর্থ সুস্পষ্ট, যুক্তিরও পারম্পর্য রয়েছে। কিন্তু হৃদয়-বৃত্তিরই প্রাধান্য, 'পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে'—এইটাই মূল কথা এবং ঐ কথাটিকে ঘিরেই তাঁর স্বভাবকল্পনা অগ্রসর হচ্ছে বিস্তৃত পরিধির সন্ধানে। যে-সব তুলনা তিনি করলেন, যে যুক্তি দেখালেন, সেখানে তথ্যবন্ধনের চেয়ে সত্য-কল্পনাই বড়। 'ক্ষণিক শূন্যতা' বা 'অতীত' প্রবন্ধেও এই ধরণের ভাব ও ভাষার সুন্দর মিশ্রণ হয়েছে। একটাই মূল সত্য, তাকে

কেন্দ্র করে তাঁর কল্পনার জাল রচিত হচ্ছে গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়ে। যে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছেন, ভাষাও তারই সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলেছে, যেমন—

"বর্তমানের স্মৃতি কোথায়? অতীতেরই স্মৃতি। আমরা বর্তমানে অনেক জিনিস এত বেশী করিয়া দেখি যে তাহার রহস্যটুকু, সৌন্দর্যটুকু মুছিয়া যায়। ছবি নিকটে আসিয়া দেখিলে অনেক সময়ে দেখা এত অধিক হয় যে রঙের আতিশয্য বই আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়া উঠে···বলা বাহুল্য প্রথমাবস্থায় আমরা তাহার সমস্তটাই দেখিতে পাই। চিত্রে তাহার অস্ফুট ছায়ামাত্র দেখি, বস্তু গিয়াছে, ভাবমাত্র অবশিষ্ট।"

এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের স্মিত তুলনাপ্রয়োগ এবং অর্থ-সমন্বিত ভাবের সরস বিকাশ শেষ হত না। তাই আরও একটু ভাষার প্রয়োজন, আরও একটু কবিত্বময় সাদৃশ্যের বিস্তার। অতএব তিনি বলেন—

"অতীতে ও বস্তু গিয়াছে— ভাব আছে মাত্র। সেই ভাবই স্মৃতি। স্মৃতিতেই অতীত মধুর। বর্তমানে বস্তুরই অধিকার— ভাব যেন ফুটিতে পায় না। বস্তু স্থায়ী নহে, ভাব স্থায়ী। এই জন্য অতীত হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে, অতীতের জন্য আমরা বিলাপ করি। বর্তমান প্রতিদিন শুকাইয়া যায়। অতীত আসিয়া সেই শুষ্ক ভূমির উপরে শ্যামল উদ্যান রচনা করে।"

এখানে ভাব ও ভাষার কি সংশ্লেষ হয় নি? হয়তো আধুনিক দৃষ্টিতে এটা অতি-কথন বলে মনে হবে। যতটা পরিসরে তিনি অতীতের স্মৃতিধর্ম বুঝিয়েছেন, তার চেয়ে আরও সংক্ষেপে ঘনবদ্ধ যুক্তিতে একটিমাত্র প্রতিপাদ্যকে খাড়া করতে পারতেন। কিন্তু প্রাচুর্য আর সরসতাই তাঁর মনের ও কলমের সহজাত ধর্ম। একে বাগ্‌বাহুল্য বলব না, বলব মর্ম-বিস্তার। একটি বক্তব্যকে ঘিরে কথার জাল বুনন চলছে। এটা অবশ্যই কল্পনা-বিলাস। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর কাছে এটা অপরিহার্য। ভাষাকে সঙ্কুচিত করে আনলে 'অতীত' প্রবন্ধটির বিষয়গত ত্রুটি হত না। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রাণহানি ঘটত। তাই মনে হয়, বলেন্দ্রনাথে ব্যক্তিত্বে আর স্টাইলে দুটি ভিন্নধর্মী জিনিসের সমন্বয় ঘটেছিল। সৌন্দর্য-পিপাসায় তিনি মুক্ত। আলোচনায়, ব্যাখ্যায় এবং টিপ্পনীতে তিনি অভিব্যক্ত। এই 'ফ্রীডম্' আর 'সোফিস্টিকেশ্যনে'র মিশ্রণ তাঁর দৃষ্টিকে সহজ অথচ তীক্ষ্ণ এবং ভাষাকে মুখর অথচ উজ্জ্বল করেছিল।

ঘরোয়া আটপৌরে জিনিসের বর্ণনাতেও বলেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি স্ফূর্তি লাভ করে। সরসতা ও প্রাঞ্জলতা, যা তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য, তা নষ্ট হয় না। এ দিক থেকে 'গৃহকোণ' প্রবন্ধটি তাঁর প্রতিভার প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে। মাটির প্রদীপের ক্ষীণ শিখায় গৃহকোণ এমন ভাবে আলোকিত হয়েছে যে ছোট খাটো জিনিসগুলি নজর এড়ায় না। তারপর গৃহকোণের গৃহলক্ষ্মী, পুকুরপাড়, আম-বাগান, বাঁশঝাড়, সরষে-ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আঁক-বাঁকা পথ, ঘরের থালা-বাসন, পূজার দ্রব্য— সব কিছু মিলে একটা ভাব-ঘন সুন্যস্ত গার্হস্থ্য চিত্র মনের পটে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে যায়। তেমনি 'শুভ উৎসব', এবং 'নিমন্ত্রণ-সভা'। মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতায় এগুলি ভরপুর। সূক্ষ্ম কৌতুকের অভাব নেই, আবার অতীত দিনের সামাজিক প্রথা ও আচারগুলি খাঁটি স্বদেশী ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সরল দৈনন্দিন জীবনের আলো-ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে, পাঠকের মনে অনতিরঞ্জিত সমাজ-স্মৃতি জাগ্রত করে। 'নিমন্ত্রণ-সভা'র আরম্ভেই বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

"ধনীই হই বা দরিদ্রই হই, আমাদের নিমন্ত্রণশালার সজ্জায়োজন বড় অধিক নহে। কদলীপত্র ও মৃৎপাত্র হইলেই আমাদের বৃহৎ যজ্ঞ অনায়াসে সমাধা হয়, এবং ইহার উপরে যদি একখানি কুশাসন জুটে, তাহা হইলে যজ্ঞশালা সজ্জার কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকে না।···ইংরাজের মত দশ কুড়িটি অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু লইয়া আমাদের কারবার নহে।"

আবার প্রবন্ধশেষে—

"সব শুদ্ধ অতিথিপরায়ণতা প্রাচ্য জাতির একটি বিশেষ ভাব···আমাদের সকল ব্যাপারেরই অন্তরে অন্তরে যে একটি শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমুদয় আকর্ষণ। এবং এই শুভ সংকল্পটুকু ক্রমশঃ আমাদের অন্তঃপুর হইতেও যে তিরোহিত হইতেছে, ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়।"

এই মন্তব্যটি পড়লে লেখকের বিজাতীয় ভাব বর্জন আর বিগত বাংলার সামাজিক সদাচারের প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মানসলোক তার সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি, স্পর্শকাতরতা, 'উইস্ট্‌ফুলনেস' অর্থাৎ আকরুণ আকুলতা, কাব্যের প্রসন্ন প্রাণবন্ত মূর্তি নিয়ে চোখের সামনে ভাসে তাঁর এই স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে। নানা ধরনের স্মৃতি, অতীতের ও বর্তমানের অজস্র উপভোগের কোমল উত্তাপ ছড়িয়ে আছে 'যাত্রা', 'জানলার ধারে' 'কাহিনী', 'এক রাত্রি', 'বনপ্রান্ত' এবং 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি রচনায়। এগুলি বার বার পড়লে পাঠকের মন ভাষার ও কল্পনার মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এ-সব লেখায় স্মৃতি পটভূমির কাজ করে, আবেগ আর কল্পনা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। 'যাত্রা' প্রবন্ধটিতে ভাষা যেন পুরাতন অভিজ্ঞতার এক আবছা স্মৃতিতে ধূসর ও মধুর হয়ে ওঠে, একটা অস্পষ্টতার রহস্য ঘনিয়ে তোলে,— যেমন 'বনপ্রান্ত' লেখাটির শেষ অংশে গরুর গাড়ির ঢিমে চাল নিঃশব্দ কল্পনার মন্থর আবর্তনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে যায়—'আমার সেই গরুর গাড়ীটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ীও চলিয়াছে, বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই; তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই।'

দুটি প্রবন্ধেই একই চিত্ররূপী কল্পলোক— যেখানে অফুরন্ত যাত্রার ম্লান নিঃসঙ্গতা বিদায়ের ও অপরিচয়ের বেদনাকে আকাশে বাতাসে কম্পিত করে রেখে যায়। 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' এমনি আর একটি অনবদ্য রচনা, যার সুকুমার সৌন্দর্য দুপুরের গরম হাওয়াতেও মুখের উপর এক ঝলক শীতল শান্তি বুলিয়ে দিয়ে যায়। এ প্রবন্ধে বোলতাকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে বলেন্দ্রনাথ প্রেমের ও কাব্যের যে তীব্র দহন-সুখ, তার যথার্থ রূপটি এঁকে দিয়েছেন। এই বিগলিতস্বর্ণ-ময় দ্বিপ্রহরের অসীম আলস্য ও নৈরাশ্য যেন বিধুনিত বায়ুতরঙ্গে ভেসে বেড়ায়। এক বছর আগেকার রচনা 'বোলতা' দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে পরিণতি লাভ করেছে, বঙ্কিমী ঢং থেকে মুক্ত হয়ে কাব্যের মর্মকোষ উন্মুক্ত করেছে।

এই-সব স্মৃতিমূলক রচনা পড়লে মনে হয়, সৌন্দর্যের কত সহজ, কত অতৃপ্ত সাধক ছিলেন বলেন্দ্রনাথ! এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধস্পর্শ-ভরা নিত্য প্রবহমান সৌন্দর্য-স্রোতকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করতে পারবেন না বলেই কি তাঁর এত বিষণ্ণ বিহ্বলতা? 'উত্তরচরিত'-আলোচনায় কি তাই কীটসের 'নাইটিংগেল' কবিতা থেকে তিনি একটি সমশ্রেণীর অভিজ্ঞতার আক্ষেপোক্তি সযত্নে উদ্ধৃত করেছিলেন?

> 'My heart aches and a drowsy numbness pains
> My sense, as though of hemlock I had drunk···'

বলেন্দ্রনাথ কবি। 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থে তিনি যে কবি, তার চেয়ে অনেক সার্থক ও পরিণত কবি তিনি তাঁর গদ্যরচনায়। প্রকৃতি-বিলাসে, নিসর্গের মোহিনী মায়ার আবিষ্টতায়, সৌন্দর্য-অনুধাবনে তিনি যে অবিমিশ্র কাব্য-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার উজ্জ্বল প্রমাণ রয়ে গেছে 'সন্ধ্যা' 'আষাঢ় ও শ্রাবণ' 'শরৎ ও বসন্ত' এবং 'বসন্তের কবিতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে। এই কবি-কল্পনার আবার নানা ভাব-পরিচয়। 'কুজনা'য় যে পুরোপুরি রোম্যান্টিক ভাব, 'হৃদয়াঞ্জলি'তে সেটা আরও গাঢ় হয়ে অন্তরের বিষাদ ও প্রেমের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। লেখা দুটি অপেক্ষাকৃত অপরিণত, কিন্তু বলেন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রবণতার বীজ এখানেও ছড়িয়ে আছে। স্মৃতি আর কল্পনাধর্মী রচনার সংখ্যাই বেশি এবং সেগুলির মধ্য দিয়েই বলেন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।

ভাষা ও সাহিত্য -গুণের দিক্ থেকে বলা চলে, বলেন্দ্রনাথ এই জাতীয় প্রবন্ধে ব্যক্তিগত দৃষ্টি ও প্রকাশ-শৈলীর মাধ্যমে একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাব, প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং অনন্ত-ভাব-রূপময় বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য-আবেদন ঘনীভূত করতে পেরেছিলেন। এ কাজ একমাত্র তিনিই পারেন যিনি ভাষা ও ভাবের শিল্পী। ভাষায় সরস হবার ক্ষমতা একাধিক বাঙালী লেখক দেখিয়েছেন কিন্তু সরস কোমলতাকে স্থিরতা ও দৃঢ়তায় পরিণত করতে হলে চাই সংযম ও সামঞ্জস্যের জ্ঞান, শব্দচয়নে বাক্য-রচনায় সযত্ন নিরীক্ষা।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকায় এ-সব বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন,

'লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল, উভয়ের মূলস্থ শক্তি সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম। এই দুইটি না থাকিলে সুরুচি থাকে না। বলেন্দ্রনাথের যে এই সংযম প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার ভাষাতেও যেমন বুঝা যায়, তাঁহার ভাবগ্রাহিতাতেও তেমনি বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতেন; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া মেরুদণ্ডহীনের মত ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই।'

এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্রনাথের ভাষা-প্রসঙ্গে গঠনসৌষ্ঠবের নৈপুণ্য, কারুশিল্পীর নিষ্ঠা, স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা আর মনের দিক থেকে বিদেশী শিক্ষার মোহমুক্তি, স্বদেশী সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগপ্রীতি আর প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি যে কয়টি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে গেছেন, তাতে রামেন্দ্রসুন্দরের তীক্ষ্ণ সাহিত্যিক বিচার-বুদ্ধিরই পরিচয় পাই। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি। নিরভিমান পাণ্ডিত্য আর অসাধারণ প্রকাশ -কৌশলের সঙ্গে সাহিত্যের গুণগ্রাহিতা ও প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশস্তি অন্য কোনও মনীষী বাঙালীর কলমে এমন প্রসন্নভাবে ধরা দিয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক শক্তির প্রকাশ্য ঘোষণায় তিনি অগ্রণী বিশেষ। নূতন ও মৌলিক দানসম্পর্কে অর্ধসচেতন উদাসীন বাঙালীকে তিনি আপনার জাগ্রত উদারতা দিয়ে অনেক লজ্জার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে গেছেন। বলেন্দ্রনাথের দেহান্তে এক পক্ষ যখন তাঁর রচনাকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিক মূল্য দিয়ে বসলেন, আর অপর পক্ষ যখন সমান তালে তাঁর সৃষ্টিকে রবীন্দ্র-প্রভাবিত ও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত বলে অর্বাচীন মনে করলেন, তখন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরই কবির স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট বলেন্দ্রনাথের নিঃসংশয় স্বকীয় প্রতিভাকে যথোপযুক্ত প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বলেন্দ্রনাথের অতি যত্নে গড়ে-তোলা স্টাইলের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল বোধ হয় 'প্রাচীন উড়িষ্যা' 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' ও 'কণারক' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে। এ স্টাইলের সৌন্দর্য এবং এ জাতীয় প্রবন্ধের আঙ্গিক কৌশলে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কিন্তু সমগ্র রূপটি শুধু ধারণারই সামগ্রী। কারণ এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ উপলব্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যায়, আর দীর্ঘ বিসর্পিত শব্দযোজনায় তার বিস্তার পেয়েছে, ফলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। 'দিল্লীর চিত্রশালিকা'য় বলেন্দ্রনাথ তো কেবল চিত্র বর্ণনা করেন নি, নূতন আলেখ্য রচনা করেছেন। একেই বলা যায়— 'ক্রিয়েটিভ ক্রিটিসিজম', সৃষ্টিধর্মী আলোচনা। সুদূর অতীতকে মৃদু স্নিগ্ধ সৌরভে মাখিয়ে, রাজকীয় আরামে আলস্যে অভিষিক্ত করে, তাঁর চিত্তাভিসার পলাতক স্মৃতিকে ধরে এনেছে। বিগত যুগের মনোরম মোহকে তাঁর নন্দনবিলাসী কল্পনা স্বর্ণাক্ষরে আবেগবান্ করে তুলেছে। উদ্ধৃতি দিয়ে এ স্বপ্ন-সৌন্দর্যের পূর্ণতা ফোটানো যাবে না, স্মৃতি-বিস্মৃতির পেলব ইন্দ্রজালের খানিক ভগ্নাংশ দেখানো যেতে পারে মাত্র।

বর্তমানের মন ও দৃষ্টি এই লুপ্তপ্রায় শিল্পজগতে যেন দূরাগত পান্থ; সৌন্দর্য-প্রতীতির প্রসর্পিত অলিন্দে তারা দিশাহারা হয়ে যায়। প্রাচীন উড়িষ্যার ভগ্নশেষ গৌরব, কণারকের বালুস্তূপে প্রোথিত জীর্ণ পরিত্যক্ত সূর্যমন্দিরের সূর্যাস্ত-শোভা আর দিল্লীর চিত্রশালার চিত্তবিভ্রমকারী রূপমায়া কেমন করে বলেন্দ্রনাথের তুলিতে তাদের সমস্ত যাদু নিঃশেষ করে ধরা দিয়েছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অন্ততঃ যিনি বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য মেনেও 'ফর্ম'-এর স্বতন্ত্র দায়িত্ব উপলব্ধি করেন, তিনি তো আশ্চর্য হবেনই। এখানে স্টাইল এবং স্টাইলিস্ট্ যেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। রূপধ্যানী শিল্পী একাত্মবোধে অভিন্নদৃষ্টিতে ভাষার কবি, ভাষার ভাস্কর এবং চিত্রকর হয়ে উঠেছেন। এত আয়াস-লেশহীন দক্ষতা, এত রূপচেতনা আর এতখানি বিহ্বল অথচ তদ্গত কল্পনা শুধু 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর কবি-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

বলেন্দ্রনাথকে শুধু ঐতিহ্য-আমোদী নন্দনস্মৃতিবিলাসী 'এসকেপিস্ট' শিল্পীরূপে দেখলে তাঁর প্রতি কিছু অবিচার করা হবে। তাঁর রচনায় সৌন্দর্য-প্রয়াণ অস্বীকার করবার জিনিস নয়। কিন্তু তাঁর চিত্রধর্মী মন, স্বপ্নালু দৃষ্টি আর বর্ণাঢ্য ভাষাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর সামাজিক দৃষ্টি ও চেতনা। অতীতের রূপায়ণে তাঁর হৃদয় স্ফূর্তি ও মুক্তি পেয়েছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু বর্তমানের বিজাতীয়পনা ও অন্ধ অনুকরণ, স্বাজাত্যবোধের অভাব, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সংস্কারের বিচার— এগুলিও তাঁর আলোচনার বহির্ভূত বিষয় ছিল না। তিনি কেবল 'ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা'য় হাবুডুবু খান নি, 'বেণো জলে'র স্বরূপও চিনেছিলেন। এবং ভালো করে চিনেছিলেন বলেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জ্বালাহীন মৃদু হাসি কখনও বা তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝে পরিণত হয়েছিল। 'মুসলমান সমাজ' 'স্ত্রী ও পুরুষ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ভাবাকুল পরিকল্পনা নয়, জাগ্রত মন আর সমাজ-বিচারে সরস যুক্তিপ্রিয়তার পরিচয়ও বহন করে।

✓এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি এবং বাংলার অতীত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথা স্মরণ রাখা উচিত। কালিদাস ভবভূতি কিংবা শ্রীহর্ষের কাব্য-আলোচনায় তাঁর যে নৈপুণ্য, এখানে হয়তো তার তেমন নিশ্চিত প্রমাণ দিতে পারেন নি। কিন্তু কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, কেতকা-ক্ষমানন্দ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর নিয়ে তিনি যে রীতিসম্মত আলোচনা শুরু করেছিলেন এ কথা স্বীকার করতে হবে। বিগত দিনের বাংলা সাহিত্যকে তিনি অন্তরে গ্রহণ

করেছিলেন। তাঁর সমালোচনার ধারা বা মতামত সর্বজনগ্রাহ্য না হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু এই জাতের নিবন্ধ রচনায় এক পথিকৃতের সম্মান তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। বিশেষ করে, 'বাংলা সাহিত্যের দেবতা' আর 'ধর্মমঙ্গল' প্রবন্ধ দুটিতে বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রসারকে তিনি নিপুণ ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন।

বলেন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ছিল। সমালোচনার কাজে তিনি স্রষ্টা ও শিল্পী, কিন্তু তাঁর সমালোচনা ভাসা-ভাসা কিংবা পক্ষপাতী বা একদেশদর্শী ছিল না। প্রমাণ, 'স্বভাব ও সাহিত্য' 'স্ত্রী ও পুরুষ' 'ইংরাজী বনাম বাঙলা' এবং 'স্মৃতি ও কবিতা' প্রভৃতি কয়েকটি সারগর্ভ সুচিন্তিত প্রবন্ধ। সমাজ-পরিবেশেই বলেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে প্রাদেশিক সাহিত্যের বিস্তারকে সম্বন্ধিত করেছেন, কাল্পনিক কল্পনা আর সত্য কল্পনার পার্থক্য দেখিয়ে 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল'এর পারস্পরিক চরিত্র বুঝিয়েছেন, উচ্ছ্বসিত আবেগ আর সংহত কাব্য-মুক্তির প্রভেদ কোথায় সে কথাও সুচিন্তিত মন্তব্যে ব্যক্ত করেছেন। আসল কথা এই, বলেন্দ্রনাথের শিল্প ও সমালোচনার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ। তার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের আবেগ ছিল, কিন্তু বিচার-শক্তি কিংবা যুক্তিবত্তার অনুপস্থিতি ছিল না।

বলেন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সম্পর্কে সব কথা হয়তো বলা হল না। তার কারণ বিষয়-বৈচিত্র্য এবং ভাবের প্রাচুর্য। এত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কখনো গম্ভীর কখনো লঘু রচনায় হাত দিয়েছেন, বিষাদ-স্মৃতি কিংবা স্মিত কৌতুক অথবা কোমল প্রেমিকতার আলাদা আলাদা সুর ভরে দিয়েছেন যে মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা তাঁর হাতে এক বিচিত্র যন্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। আর সে যন্ত্রে বলেন্দ্রনাথ অনেক ধ্বনির তরঙ্গই তুলেছিলেন। কখনো মধুর-স্তিমিত, কখনো তীব্র ব্যথাহত, কখনও লঘু লাস্যে ভরপুর, আবার সময়ে সময়ে গম্ভীর উদাত্ত। আলোচ্য বিষয়কে অনুবর্তন করে ভাষার গতি ও ছন্দ নিয়ত বদলেছে। কাব্য ও কলাশীলনের ভাষা এক রকম, অতীত সমাজ ও ধর্মের আলোচনার ভাষা আর এক রকম। আবার গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে কিংবা ঘরোয়া বাঙালী জীবনের উপকরণ বর্ণনায় তাঁর প্রকাশভঙ্গী স্বাভাবিক পরিবেশ-নির্ভর হয়ে উঠেছে। সব কিছুর পিছনে ভাবে ও ভাষায় একটি উজ্জ্বল ধারণা-সূত্র অদৃশ্য ভাবে বিরাজ করছে। বলেন্দ্রনাথ বিষয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে জানতেন, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির নিগূঢ় সংযোগ বেঁধে দিতে পারতেন। যিনি এই ক্ষমতা রাখেন, তিনিই মানুষের দৃষ্টিকে উন্মীলিত করতে জানেন। মনকে উদ্বুদ্ধ করে কানে কানে বলতে পারেন, 'Look thy last on all things lovely'—চোখ খুলে প্রাণ ভরে দেখে নাও, এমন দেখা হয়তো আর দেখা হবে না।

বলেন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য-আকুতি আর মিনতি-দৃষ্টি তাঁর কাব্যেও আছে। তিনি কবিতা লিখেছেন অল্প, কিন্তু যে দুখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি রেখে গেছেন, তাতে তাঁর ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত থাকলেও পরিণতি নেই। কারণ তাঁর স্বল্পায়ু। তবে পরিণতির কামনা ছিল, এ কথা নিশ্চিত। 'শ্রাবণী'র শেষ কবিতা 'অসমাপ্ত'। এখানে সেই অসমাপ্তির সুর করুণ ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।—

> মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায়?
> বলিবার যাহা ছিল সব রয়ে যায়।…
> নিবিড় তিমির ভরে ঘনায় যে ব্যথা

মন-অন্তস্তলে, ভাষা তার নাহি কোথা
পাই খুঁজে খুঁজে। মেঘচন্দ্রে বৃষ্টিধারে,
তড়িত-চকিতে, সূচিভেদ্য অন্ধকারে,
ঘননীল মেঘে, নিবিড় তমাল বনে,
আর্দ্র বসুধা সৌরভে, বিরহ গগনে,
কোন্ ব্যর্থ অভিসারে, কখন কোথায়
ফুটে ফুটে করি' যেন মিলাইয়া যায়।

প্রথম-যৌবনের কবিতা অবশ্যই অপরিণত। কিন্তু গদ্যে যেমন ব্যক্তিগত স্টাইল, পদ্যেও তেমনি একটি ব্যক্তিগত সুর চতুর্দশপদীর আবদ্ধ সীমায় তিনি ফোটাতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া ছন্দের চাতুরী ও পরীক্ষার অবসর না দেখালেও বলেন্দ্রনাথ যুগ্মচরণের সহজ পয়ারে যতিপাতের কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন। শব্দ ও মাত্রাজ্ঞান তাঁর ভালই ছিল। 'মাধবিকা' তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ। এখানে প্রেম ও রমণীর কথাই ষোল আনা। কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, বিশেষ করে 'আশঙ্কা' 'মূঢ়তা' 'অকলঙ্ক' 'উপমা' 'শিঞ্জন' 'সমস্যা' আর 'বৃথা গর্ব' এই সনেটগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়, যুবক বলেন্দ্রনাথ প্রেম ও প্রেমিকার যে বিভিন্ন ভাব-মূর্তি এঁকেছেন, তার মধ্যে দেহ-সৌন্দর্যের আবেদনই বেশি। 'মাধবিকা'য় যেন নারীর অফুরন্ত বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। এক একটি চতুর্দশপদী এক একটি খেয়াল বা 'মুড'এর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তবে 'conceit'এর অভাব নেই। প্রণয়িনীর বিচিত্র ভঙ্গী আর প্রণয়ীর বিভ্রমগুলিকে যে তৃপ্তিহীন সাধনায় চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে ইংরেজি সাহিত্যে ক্যারোলাইন কবি-কুলের ঈষৎ-চটুল প্রেম ও কাব্য-চর্চার বিশিষ্ট রীতির কথাটা মনে পড়ে।

তবে 'মাধবিকা'র চেয়ে 'শ্রাবণী' আরও স্থির ও নম্র-মধুর। ভাবের লঘুতা আর প্রকাশের চটুলতা কেমন ভাবে দৃঢ় ব্যঞ্জনায় উন্নীত হয়েছে, তা বোঝা যায় 'কোথা' 'অন্তরবাসিনী' এবং 'গৃহলক্ষ্মী', এ তিনটি কবিতা নজর করে পড়লে। 'সন্তরণে' ঘনায়মান সন্ধ্যার ছবি 'খেয়া'র কবিকেই স্মরণ করায় আর 'পথে পথে' সনেটটি, কবি কালিদাসের উদ্দেশে রচিত হলেও, রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সান্নিধ্য-কামনা যেন বহন করে আনে প্রথম ও শেষ চরণগুলিতে—

মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিবরধি।···
দুই ধারে ক্ষীয়মাণ ছবি পরে ছবি—
সৌন্দর্যচয়নে দোঁহে মগ্ন শুধু, কবি।

বলেন্দ্রনাথের পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি তাঁর এই অসমাপ্ত কাব্য-প্রচেষ্টার উল্লেখ না করি। একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে তাঁর কাব্য-উত্তরণ সম্ভব হয় নি যেমন গদ্যেও তাঁর ভাষার পূর্ণতম বিবর্তন হয় নি। কিন্তু গদ্যেই তাঁর প্রতিভা। তিনি গদ্যেরই কবি, অর্থাৎ কবির সম্ভাবনা-ঐশ্বর্য তিনি গদ্যেই প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে চিত্রাঙ্কনী ক্ষমতায়, সূক্ষ্ম দৃষ্টির অলংকরণে তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হলে তাঁর ভাব ও ভাষা কেমনতর রূপ নিত, সেটা ভাববার বিষয়।

মনে হয়, বলেন্দ্রনাথ যেমন করে বঙ্কিম-প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতির দিকে

ঝুঁকেছিলেন ('সে' আর 'নীরবে', এ দুটি প্রবন্ধের ভাষা ও সুর লক্ষ্য করলে এই পরিণতির ইঙ্গিত অস্পষ্ট থাকে না), তেমনি শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাটিয়ে উঠে তিনি একটা নিজস্ব স্টাইল ও আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে বার করতেন। তাতে পূর্বসূরীদের দান অগ্রাহ্য হত না, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য আরও নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত হত। আমার ধারণা, *Appreciations* গ্রন্থে Pater যে-ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বলেন্দ্রনাথ হয়তো অনেকটা ঐ ধরণের ভাবে ও ভাষায় উপনীত হতেন। তবে স্টাইলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পিউরিস্ট। বর্তমান কালের শ্লথবাক্ শিথিলবন্ধ সাংবাদিক স্টাইলের যুগে তাঁর খাঁটি অভিজাত সযত্ন ভাষা-চর্চা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলে বোধ হয় লাভই হবে।

বলেন্দ্রনাথ স্বভাবগুণী, কবি— পুনরুক্তি হলেও তা বলতে হয়। তাঁর প্রতিভা-সম্পর্কে যতই বিশদ আলোচনা হোক, অতঃপর এই বিধেয় পদে এসে দাঁড়াতে হয়। কেন না, বলেন্দ্রনাথের সমগ্র ও বহুমুখী কৃতিত্বের বর্ণনা করতে হলে, এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অবশ্য কবির সৃষ্টি আর সমালোচকের দৃষ্টি কিছু স্বতন্ত্র, এ কথা ঠিক। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের হাতে এ দুটো কি ভাবে যেন এক হয়ে গিয়েছিল। কবির সহানুভূতি নিয়ে যিনি কাব্য শিল্প ও অতীতের মর্মরূপ ব্যাখ্যা করেন, আর সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে যিনি চিত্রবহ কাব্য রচনা করেন, তাঁর দৃষ্টি বিষয়গত হলেও মূলগত বিভিন্ন নয়, জীবনের সৌন্দর্য-ব্যাপ্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ্লেষণের সঙ্গে সমগ্রতার অন্বয় ঘটে, মন্তব্যের সঙ্গে রসিত ব্যাখ্যান, পরিচিতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠা। ফলে যে জাতীয় লেখাই তিনি লিখুন, সকলের উপর একটি সঞ্চারী সৃষ্টিরূপ প্রসন্ন-গম্ভীর আকাশের মতই আনতে হয়ে থাকে। এ জায়গায় কবি ও সমালোচকের দুই হাত এক হয়। একটি সৃষ্টিধর্মের অনুকূল মানস-মণ্ডল তৈরী হয়।

রস-সাহিত্য আর রস-সমালোচনা, দুয়ের মধ্যেই মননশক্তি আছে। অথচ আবেগ-নিরপেক্ষ নয় এবং কিছুটা কাব্যপ্রাণও বটে। যিনি চিত্ররসিক, তিনিই জীবন-রসিক। বলেন্দ্রনাথের যে লেখনী থেকে 'উত্তর চরিত', 'নগ্নতার সৌন্দর্য' কিংবা 'কবি সেন্টিমেণ্ট্যাল' বেরিয়েছিল, সেই লেখনীই সরস হয়ে 'ভূতকথা' লিখেছিল, 'অতির গতি' দেখাতে পেরেছিল। আবার বর্ণবহুল তুলিকা হয়ে 'চন্দ্রপুরের হাট' 'গৃহকোণ' 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' 'দেয়ালের ছবি' এবং 'কণারক'এর অপূর্ব ভাব-পরিবেশ রচনা করেছিল। কারণ, বলেন্দ্রনাথ সর্বত্রই 'ইম্প্রেশ্যনিস্ট' শিল্পী। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনার ধর্মই হল স্রষ্টার ধর্ম। বিষয়বস্তুকে revitalise করা, নতুন করে জীবন দেওয়া। সহজ সৌন্দর্যের প্রাণময় সাধনাই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত, রুচিকর শিল্পকর্ম। মোহমুক্ত ভাষ্য কিংবা বস্তুনিষ্ঠ রসহীন যুক্তিবাদ তাঁর আদর্শ নয়, স্বধর্মও নয়। তাই তিনি কবি আর শিল্পী সমালোচক, এক কথায় রস-সাহিত্যিক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনা রবীন্দ্রনাথের সগোত্র, সমবর্ণ। কীট্সের কাব্যপ্রতিভা বোঝাতে গিয়ে ম্যাথু আর্নল্ড যে বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, তাকেই ঘুরিয়ে বলেন্দ্রনাথের বেলায় বলতে ইচ্ছা করে, 'He is ; he is with Rabindranath'। তাঁর রচনার ম্লানোজ্জ্বল সুষমায় রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ধ্বনিত। কিন্তু কেবল প্রতিধ্বনি নয় ; যদি তা থাকে, তা হলে সেটা প্রকৃতিজ। শুভ্রশির দেবতাত্মার স্নেহাশ্লিষ্ট সানুদেশে সোনালি প্রতিস্বর বেজে ওঠা বিচিত্র নয়। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ শুধুই রবীন্দ্রনাথের অনুবৃত্তি, ক্ষুদ্র সংস্করণ— এ কথা ভুল। তাঁর রচনায় ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য আর নবীন ভাবনার শোভন সমাবেশ দেখে এই কথাই মনে হয় যে বলেন্দ্রনাথের মানসগঠনে ঐতিহ্য-শ্রদ্ধার সঙ্গে নতুন উপকরণেরও অভাব ছিল

না। সে সময়ে দেশী-বিদেশী ভাবের সংঘাতে ও প্রতিক্রিয়ায়, জোড়াসাঁকোর ঘাটে জোয়ার জলে অনেক ভালো ও নতুন জিনিস এসে ঠেকেছিল। আর চমক বা ধাক্কা দেবার মতো বিরাট প্রতিভা ঘরেই মজুদ ছিল। এ স্থলে বলেন্দ্রনাথের রচনারীতিতে যে নতুন দীপ্তি ও চেতনা এক সুন্দর রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে বলেন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামক একটি পাণ্ডুলিপি খাতা আছে। এর সূচক সংখ্যা M.1.— খাতাটিকে সযত্নে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছুকাল আগে পুনরায় বাঁধানো হয়েছে, তা ছাড়া এর একটা অবিকল কপিও করানো হয়েছে।[১] পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ নামপত্রটি এইরূপ : 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক/ইহাতে পরিবারের/অন্তর্ভুক্ত/সকলেই/(আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/আপন আপন মনের ভাব-চিন্তা-স্মর্তব্য বিষয়/ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন/ই[তি]'। খাতাটি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত একটি পত্রে[২] রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয় বন্ধুরা যখন যাহা খুসি লিখিতেন।' কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাণ্ডুলিপি খাতার এইরূপ পরিচয় দিয়েছেন, 'আমার মেজজ্যাঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে আই. সি. এস. হয়ে ফেরবার পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না থেকে থাকতেন বালিগঞ্জে। সেখানে তাঁর বাড়িতে আমাদের পরিবারের অনেকেই প্রত্যহ একত্র হতেন বিকালবেলায়। খেলাধুলা গান-বাজনা আলাপ-আলোচনা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। যে ঘরে আড্ডা বসত সেখানে রাখা থাকত একটা মোটা-গোছের বাঁধানো খাতা। যখন যার খেয়াল যেত, যেমন খুশি তাতে লিখে রাখতেন। এরই নাম ছিল "পারিবারিক খাতা"। তার পাতা ওলটালে দেখা যায় হালকা রকমের হাসির কথা মজার কবিতা, নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ চুটকি প্রবন্ধ— কত কি যে ভালোমন্দ খেয়াল মতো লেখা তার পাতায় পাতায় আছে, যা পড়লে বেশ কৌতুক বোধ হয়।'[৩]

ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ ১৩৫২), শারদীয়া দেশ পত্রিকা (১৩৫২ এবং ১৩৫৩), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী প্রভৃতি পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কিছু কিছু

১ মূল খাতার অনেক দুষ্পাঠ্য ও বিনষ্ট অংশের পাঠোদ্ধার করা যায় এই কপিটির সাহায্যে। বর্তমান প্রবন্ধে এই পাঠগুলির গ্রহণযোগ্য অংশ বন্ধনীর মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে।

২ শান্তিনিকেতন থেকে ১৪ বৈশাখ ১৩১২ তারিখে লিখিত ; দ্র° রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃ ৪।

৩ পিতৃস্মৃতি, ১৯৬৬, পৃ ১-২। রথীন্দ্রনাথ অন্যত্র প্রায় একই কথা লিখেছিলেন, In my uncle Satyendranath's house, where the grown-up members of the family gathered almost every evening, there used to lie a bound volume of blank pages in which were jotted down conundrums, witty remarks, nonsense rhymes, as also words of wisdom that occurred to the minds of those who happened to be present. The book was called the PARIBARIK KHATA—the Family Notebook—.*On the Edges of Time*, 1958, p. 1

জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত পাণ্ডুলিপির পরিচয়প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পরিমণ্ডল তাঁহার নবীন মনকে উদ্বোধিত করিতে কিরূপ সহায়তা করিয়াছে, "জীবনস্মৃতি"র পাঠক সে কথা অবগত আছেন।··· রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের যৌবনে এই পরিবেশকে কিভাবে নানা দিকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, খামখেয়ালী সভা, সমালোচনী সভা, সারস্বতসমাজ, সংগীতসমাজ, অভিনয়চর্চা, পত্রিকাপ্রকাশ প্রভৃতির যেসকল বিবরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রাণোৎসাহ তাঁহাদিগকে নিত্য নূতন অনুষ্ঠানে আয়োজনে কল্পনায় প্রবৃত্ত করিত, তাহারই একটা আভাস তাঁহাদেরই "পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তক"' ইত্যাদি।[৪] বর্তমান পাণ্ডুলিপি খাতার চরিত্র বিচার করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "পারিবারিক স্মৃতি" নামে এক খাতায় সাহিত্যিকরা লেখেন নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মত ও মন্তব্য। একই বিষয়ে বহুজনের বহু মত হইতে পারে— পক্ষে ও বিপক্ষে; বিপরীত মত পোষণেও আপত্তি নাই, অদ্ভুত ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয়।···পারিবারিক স্মৃতিপুস্তকের রচনাগুলি শখের লেখা, পত্রিকার তাগিদে লেখা নয়।'[৫]

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর (২১ কার্তিক ১২৯৫) তারিখে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লিখে এই পুস্তকের সূচনা করেন তার শিরোনাম 'philology'।[৬] ঠাকুরপরিবারের একাধিক ব্যক্তি এবং আত্মীয়বর্গ এই খাতার লেখক; পূর্বোক্ত প্রথম লেখক ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথ চৌধুরী, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি অথবা বাংলায় কিংবা ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা কখনো মন্তব্যের মত সূত্রাকারে, কখনো-বা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ-রূপে পরিবেশিত; এমনকি কোথাও কোথাও মূল রচনার উপর অপরের নানাবিধ নোট দেওয়া হয়েছে, মন্তব্য করা হয়েছে। দর্শন সমাজবিদ্যা নন্দনতত্ত্ব ব্যাকরণ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের পাশাপাশি লঘু হাস্যপরিহাস এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গাদিও স্থান পেয়েছে।

প্রাচীনতাবশত পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো ভঙ্গপ্রবণ, কোনো কোনো পাতা কীটদষ্ট অথবা জরাজীর্ণ। খাতার আয়তন— ৩২·৫ সে. মি. × ২০ সে. মি.। সাদা কাগজের উপর নীলচে রঙের রুলটানা খাতার উভয় পৃষ্ঠাই লিখিত। সম্ভবত প্রথম দিকে অথবা খাতা লেখার সময়ে মূল অংশের পৃষ্ঠাঙ্ক হিসেবে বাংলা সংখ্যার (১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদির) ব্যবহার করা হয়; পরবর্তীকালে ব্যাপারটি ইংরেজি সংখ্যার (1, 3, 5, 7 ইত্যাদির) দ্বারা সূচিত হয়েছে। খাতার মূল অংশের প্রথম পৃষ্ঠাটি বাংলা এক (১) এবং ইংরেজি সাত (7), কারণ ইংরেজি সংখ্যার দ্বারা পরবর্তী সময়ে পৃষ্ঠা চিহ্নিত করার কালে পূর্ববর্তী ছয়টি পৃষ্ঠাকে ঐ হিসেবের মধ্যে ধরা হয়। এই অতিরিক্ত প্রথম দিকের ছয়টি পৃষ্ঠার প্রথমটিতে (p 1) লেখা আছে—

৪ পুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি : ১২৯৫-১৩০২', শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৫২, পৃ ৯।

৫ রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭, পৃ ২৪২-৪৩।

৬ প্রথম রচনাটির তারিখ এভাবে দেওয়া হয়েছে '২১ কার্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া 5 Nov 1888' ইত্যাদি; দ্র° পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, পৃ ১, p 7।

'শ্রীমান রথীন্দ্রের/শুভ পঞ্চাশতম জন্মদিনে/বিবি দিদি/২৭।১১।৩৮' ইত্যাদি ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা (pp 2-3) যতদূর মনে হয় অলিখিত ছিল ; চতুর্থ পৃষ্ঠায় (p4) কয়েকটি 'নিষেধ' বর্তমান ; পঞ্চম পৃষ্ঠাটি (p5) নামপত্র ; এবং ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় (p6) বোধ হয় কোনো কিছু লেখা ছিল না। আগেই বলা হয়েছে ইংরেজি সংখ্যায় লিখিত সপ্তম পৃষ্ঠা (p7) থেকে মূল অংশের আরম্ভ, অর্থাৎ পৃ ১ = p 7। বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় স্থলে এতদুভয় পৃষ্ঠা-সংখ্যাই ব্যবহৃত হল।

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত উপরোক্ত 'নিষেধ' (p4) এইরূপ : 'নিষেধ।/১। পেন্সিলে লেখা।/২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া।/৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কা[গজে] অথবা পুস্তকে ছাপান।' পাণ্ডুলিপির মূল অংশের রচনাবলী বাংলা সংখ্যার দ্বারা সূচিত, যেমন— '১. philology', '৩. কুরুক্ষেত্র।', '৯ বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র।', '৩০ সৌন্দর্য্য ও বল।', '৫৫। সৌন্দর্য্য।' ইত্যাদি। কিন্তু খাতার শেষ পর্যন্ত এই রচনা-সংখ্যার প্রয়োগ অব্যাহত নয়, ১০৫ সংখ্যক রচনার (সহজ জ্ঞান ও সহজ নীতি, পৃ ১২৪-২৫,pp 118-19) পর আরও কয়েকটি লেখা থাকলেও ক্রমিক রচনা-সংখ্যাটি আর অনুসৃত হয় নি। পাণ্ডুলিপির মূল অংশের কয়েকটি পৃষ্ঠা (৫৩-৫৪, ৫৯-৬৮ ইত্যাদি) পাওয়া যায় নি ; তবে রচনা-সংখ্যার ধারাবাহিকতা এবং বাংলা সংখ্যায় প্রদত্ত পৃষ্ঠাঙ্ক লক্ষ্য করলে তাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। খাতার কোনো কোনো রচনা শিরোনামবিহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রচনার শেষে লেখকের স্বাক্ষরসহ স্থান ও তারিখ বা রচনাকাল প্রদত্ত, কখনো কখনো লেখার প্রথমে সন তারিখ ও স্থানের উল্লেখ রয়েছে।

এই পাণ্ডুলিপি খাতাখানি শ্রদ্ধেয় ইন্দিরাদেবী দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করার পর ১৯৩৮ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন, পাণ্ডুলিপির প্রথমেই (p1) এই উপহারপত্রটি বিদ্যমান। মূল খাতার ১৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। এর পর আরও যে কতিপয় লিখিত পৃষ্ঠা পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপির একটি স্থলে (p 141) ইন্দিরাদেবী জানিয়েছেন যে ঐগুলি 'মূল খাতার অনুক্রম নহে। বহু পরে সংযোজিত।' এই সংযোজন-বর্জিত মূল খাতার প্রথম রচনাটির লেখক যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রচনাকাল যে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর বা ১২৯৫ সালের ২১ কার্তিক— সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই পর্বের সর্বশেষ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের, রচনাকাল দেওয়া হয় নি ; তবে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী রচনার[৭] তারিখ হল ১৩০২ সালের ৯ অগ্রহায়ণ। এসকল সূত্র অবলম্বনে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের সংযোজন-বর্জিত অংশে বা পাণ্ডুলিপির মূল অংশটিতে ঠাকুর-পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি ও আত্মীয় কর্তৃক ২১ কার্তিক ১২৯৫ সাল থেকে ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণের মধ্যে লিখিত নানাবিধ রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে বলেন্দ্র-রচনাবলী

পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত বলেন্দ্রনাথের (১৮৭০-৯৯) রচনাগুলি বর্তমান প্রবন্ধে সংকলিত হল ; যতদূর জানা যায় এই রচনাবলী ইতিপূর্বে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ১২৭৭ সালের ২১ কার্তিক (৬ নভেম্বর ১৮৭০) তারিখে বলেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯৫ সালের ২১

৭ রচনার শিরোনাম 'বৈষ্ণবধর্ম্ম', লেখক রবীন্দ্রনাথ ; রচনাকাল— '৯ অগ্রহায়ণ। ১৩০২।১৮৯৫/পতিসর/নাগর নদী। বোট।'

কার্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে এই পাণ্ডুলিপির সূত্রপাত হয়। এই তারিখ-সাদৃশ্য দেখে বলা যেতে পারে যে বলেন্দ্রনাথের ঊনবিংশতিতম জন্মদিনে এই পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের সূচনা হয়েছিল।

১

পাণ্ডুলিপি খাতার পঞ্চম রচনাটি বলেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা ; তাঁর পূর্ববর্তী লেখক হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ। পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত তারিখ লক্ষ করলে বোঝা যায় অন্তত প্রথম পাঁচটি রচনা সূচনা-দিবসেই লিখিত হয়েছিল। খাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় (পৃ ২, p 8) বলেন্দ্রনাথের সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এই রচনাটির শিরোনাম 'অক্ষরতত্ত্ব'। এই পৃষ্ঠায় আর-কোনো লেখা নেই। রচনাটি নিম্নরূপ :

> শুধু যে ভাষার কথা থেকেই জাতির অবস্থা বোঝা যায় এমন নয়, ভাষার অক্ষর দেখেও জাতির ভাব কতকটা বোঝা যায় বোধ হয়। বাঙ্গলা ভাষার অক্ষর আর সংস্কৃতর অক্ষর দেখ্‌লেই এটা অনেকটা প্রমাণ হয়। সংস্কৃতর অক্ষরগুলি কেমন গোলগাল, পেটটী বেশ মোটাসোটা, দেখ্‌লেই মনে হ[য়] তারা যেন অনেক দুধ ঘি খেয়ে মানুষ হয়েছে। আর বাঙ্গলা অক্ষরগুলি শুধু যেন অস্থিপঞ্জর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরের মুখ চেয়ে তাদের চল্‌তে হয়, সাহেব দেখাদেখি কখন কখন বুক ফোলাতে যায়, হয় না। ইংরিজী অক্ষরগুলো পরস্পরের সঙ্গে খুব মিশে থাকে— গা[য়ে] গায়ে ঢলাঢলি। ইংরেজ জাতের ঐক্যের তারা যেন প্রমাণস্তম্ভ [।] সংস্কৃত অক্ষরের মধ্যে তেমন মেলামেশা নেই। সেকালে যে সময় দেশে সংস্কৃত জীবন্ত ছিল তখনও সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মিল হয় নি। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, লড়াই দাঙ্গা নিয়েই আছে। আজকা[ল] আমরা যে বাঙ্গলা লিখি সেকালের আমলাদের হিসেব লেখা বাঙ্গলার সঙ্গে ঢের তফাৎ। এরা তবু একটু যেন গায়ে গা[য়ে] ঢ'লে পড়েছে। ইংরিজী শিক্ষার ফলে আমাদের এখন মেল্‌বা[র] দিকেও একটু ঝোঁক গেছে বল্‌তে হবে। আমরা এখন এক জাতি (nation) হ'তে চাই। জর্ম্মন অক্ষর দেখ্‌লে কিরকম জম্‌কালো মনে হয়। আর সেকালে knightদের সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্যও আছে। জর্ম্মন বলবিক্রম অক্ষরেই প্রকাশ পায়। চিনেম্যানদের অক্ষরেও তা'দের দেশের বাক্সটা[ক্স] জিনিষের উপরের কারিগরীর সঙ্গে কেমন একটা মিল আছে বোধ হয়। পারসী অক্ষর বাঁ দিকের বদলে ডান দিক থেকে এসেছে। দুনিয়ার অন্যান্য সকলের প্রতি তাদের কেমন একটা ঘৃণা মনে হয়। তারা যেন এক-একজন নিজের খেয়ালেই চলছে— কেউ সুবিধামত একটা বেশি শূন্য সংগ্রহ ক'রে ধরা[কে] সরা জ্ঞান করে। মুসলমান বাদ্‌শাহদের যেরকম গল্প শোনা যায় তাতে বলা যেতে পারে পারসী অক্ষর তা'দেরই উপযুক্ত বটে। এইরকম ক'রে দেখা যায় জাতির মনের ভাব কথায় বর্ণমালায় যেমন তেমনি অক্ষরের আকৃতি দেখেও কতকটা বোঝা যায়।
>
> ২১ কার্ত্তিক ১২৯৫। শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগেই বলা হয়েছে, পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠায় আর-কোনো রচনা নেই, কেবল পৃষ্ঠাটির বাম দিকের মার্জিনে যে একটু লেখা পাওয়া যায় সম্ভবত তার সঙ্গে মূল প্রবন্ধের সম্পর্ক আছে। লেখাটুকু বড্ড বেশি অস্পষ্ট। মার্জিনে লেখা আছে, 'এ[ও] বলা যায় যে সংস্কৃত অক্ষরের firm strokes দেখে ওদের characterএর জোর এবং বাঙ্গলার কিনকিনে (ফিনফিনে ?) আঁচড় দেখে তাদের মনের দুর্ব্বলতা

বোঝা যায়।' বোধ হয় মূল রচনার তৃতীয় বাক্যটির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে পাণ্ডুলিপির ৯ সংখ্যক রচনার[৮] শেষ অনুচ্ছেদটির সঙ্গে বর্তমান বলেন্দ্র-রচনার ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বর্তমান খাতায় এই জাতীয় রচনা আরও আছে।

বলেন্দ্রনাথ-লিখিত পাণ্ডুলিপির ৬১ সংখ্যক রচনার (পৃ ৭৩-৭৪, pp 67-68) শিরোনাম 'ভাইবোন-সমিতি প্রবন্ধপাঠে'। এর রচনাকাল দেওয়া হয় নি, তবে লোকেন্দ্রনাথ পালিত-লিখিত এর পূর্ববর্তী প্রবন্ধের রচনাকাল ৪ আগস্ট ১৮৮৯ বা ২০ শ্রাবণ ১২৯৬ এবং রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এর পরবর্তী প্রবন্ধের রচনাকাল 'আশ্বিন। সপ্তমী পূজা। ১৮৮৯।' সুতরাং ধরা যেতে পারে বলেন্দ্রনাথের রচনাটি ১২৯৬ সালের ২০ শ্রাবণ থেকে ঐ বৎসরের আশ্বিন মাসের মধ্যে কোনো একটি সময়ে লিখিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি এইরূপ :

> ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধে যা' বলা হয়েছে, তার থেকে আমাদের বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হয়। মোটামুটী আমরা যে অনেকটা ভাল অবস্থার মধ্যে জন্মেছি, তার সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাল অবস্থার মধ্যে জন্মাবার সুবিধে পেলেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত একটা কিছু করবার কতটা সম্ভাবনা আছে, বলা যায় না। আমরা হয়ত একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব, mediocrityর নীচে না পড়লেও কোনও বিষয়ে খুব excel করব বোধ হয় না। তবে ভবিতব্য কে বলতে পারে? হঠাৎ যদি কেউ এক জায়গার থেকে গ[জি]য়ে উঠে জম্‌কে দেয়! কিন্তু সম্ভাবনা কম।
>
> প্রপিতামহের আমলে আমাদের প্রধানতঃ টাকাতেই যা' নাম ছিল, তার পরপুরুষে ধর্ম্ম এবং সমাজসংস্কারেতেই সেটা ফুলে উঠল, তার পরপুরুষে সাহিত্য বলা যেতে পারে। আমাদের আমলে তিনটেরই সংক্ষিপ্তসার দেখা যাচ্ছে না? তৃতীয়টার দিকেই আমাদের আজকাল বেশী ঝোঁক অবিশ্যি। কিন্তু এমনতর একটা জমাট্ কিছু দেখা যাচ্ছে না, যা'তে জাঁকালোরকম ফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে। ধ'রে নেওয়া যাক্, বাড়ীর সব ছেলেই অল্পবিস্তর প্রবন্ধ লিখতে পারে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তার থেকে এইটে বোঝা যায়, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত জ্ঞা[···]র অনেকটা সাহায্য করেছে। আ[চ্ছা,] নতুন ধরণের কি[···]রকমের একটা এমন কি করবার সম্ভাবনা আছে যাতে আমরা নিজে[৯] দাঁড়াতে পারি? সাহিত্যের মধ্যে বিপ্লব বাধাবার মতন আমাদের ক্ষমতা আছে, বোধ হয় না। পৈত্রিক সম্পত্তি আমরা উড়িয়ে না দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের স্থায়ী সম্পত্তি ক'রে রেখে যেতে পারব কি বোধ হয়? চিহ্ন[?] ত বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ধারণাশক্তির চেয়ে সৃজনশক্তি আমাদের ঢের কম। কিন্তু নিজেরা দাঁড়াতে হ'লে ঐটীই চাই বেশী।
>
> টাকার কথাটা বাদ দেওয়াই ভাল। ধর্ম্ম কি সমাজ সম্বন্ধে উঠে প'ড়ে লাগা আমাদের কৈ? আমরা সবেতেই গজেন্দ্রগমনে চলেছি। আমরা সবগুলোই যা' আছে আর না কমে এই চেষ্টা যত কচ্ছি, আরও বাড়ে যাতে সে চেষ্টা তত কচ্ছি বোধ হয় না। আমরা স্থিতিশীল, গতিশীল খুব

৮ শিরোনাম—'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র', লেখক—রবীন্দ্রনাথ; দ্র° পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, পৃ ৪-৫, pp 10-11. অপিচ দ্র°— খেয়াল খাতা, ভারতী, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ৯০-৯৩।

৯ পাণ্ডুলিপিতে এরূপ রেখাঙ্কিত করা হয়েছে।

কম। সাহিত্যের দিকে আমাদের আজকাল লক্ষ্য পড়েছে, কিন্তু যে উদ্যমের ফল ভারতী, যে উদ্যমে বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা রীতিমত ফল ফলেছে, আমাদের মধ্যে কি সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে? আমরা বড়জোর দোতলায় দাঁড়াইতে পারি, কিন্তু তেতালায় ওঠ্‌বার শক্তি এখনও ত বোঝা যায় না। যা'হোক, আর বকাবকি না করে দু'একটা কথা বলি।

আমাদের বাড়ী বল্‌তে সেকালে (জ্যোতিকাকামশায়দের সময়ে) যা' বোঝাত আজকাল ঠিক তা' বোঝায় মনে হয় না। সেরকম শিক্ষার, ভাবের, ধরণধারণের, এবং অনেক জিনিষের সামঞ্জস্য আমাদের মধ্যে নেই।[১০] সেকালে আমাদের বাড়ীর একটা বিশেষ ধরণ ছিল, বিশেষ ভাব ছিল, এখন সে একটা বিশেষ ধরণ, ভাব কি আছে? এখন প্রত্যেক দু'চারজন ব্যক্তির একটা ভাব। এক গিয়ে দুই চার কি ছয় গজিয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার মধ্যে যে শৃঙ্খলা আছে, সেটা আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি। আ[গে] দেহ স্বতন্ত্র থাক্‌লেও spiritটা এক ছিল, এখন অনেকগুলো বেমানান spirit ব'সেছে। সুতরাং আমাদের বাড়ী বল্লে একটু গোলযোগ ঠেকে। আমাদের বাড়ীর একটা বাস্তু-spirit আছে; সেইটে যা'তে বিদেশী spiritএর চাপে না মারা যায় এইটে দেখাই আমাদের আবশ্যক। বিদেশী spiritগুলোকে যত শীঘ্‌ঘির পারা যায় তাড়ান কর্তব্য। তাহ'লে আমাদের বাড়ী পুনরায় সেকালের আমাদের বাড়ী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।

৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফটায় যা' বলা হয়েছে, তার ধারা বোধ হয় ঐ [বাস্তু-spiritটা]কে খাইয়ে খাইয়ে মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট[১১] করা। পৈত্রিক সঞ্চিত[…] বেচারী কিছুদিন [বেঁচে] থাক্‌তে পারে, কিন্তু বিদেশী-spiritএর [অত্যা]চার হ'লে কিছুদিনও অনেকটা ক'মে যাবে। আর বিদেশীবর্গের [আম]দানি না হ'লেও ঐ সঞ্চয়ের উপর নির্ভর ক'রে কতদিন কাট্‌বে? আমরা পৈত্রিক ফণ্ড জমা রেখে নিজেরা ওটাকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ কর্‌তে পারলেই হয় ভাল।

ব.ন.ঠ.

উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদে মোট দুবার যে ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধটির কথা বলা হয়েছে তা বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে নেই; খাতার ৫৯ থেকে ৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে এইটি ছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত ঐ দশটি পৃষ্ঠা বা পাঁচটি পাতা পাওয়া যায় না। ঈষৎ পূর্ববর্তী ও অব্যবহিত পরবর্তী (যথাক্রমে ৫৫ ও ৫৮ সংখ্যক) প্রবন্ধের রচনাকাল দেখে বোঝা যায় যে বক্ষ্যমাণ ৫৭ সংখ্যক রচনাটি ১৮৮৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৯ সালের ২১ মে (৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) তারিখের মধ্যে রচিত হয়। বর্তমান বলেন্দ্র-রচনাটির অবলম্বনে উদ্দিষ্ট ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অবগত হওয়া যায়, এমনকি উক্ত রচনার শেষ অনুচ্ছেদের মর্মও উপলব্ধি করা যেতে পারে। হারানো রচনাটিতে ঠাকুরপরিবারের ঐতিহ্যকথা তথা 'ভূতপূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান', বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষামঞ্চে তার বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছিল। বলেন্দ্র-রচনার শিরোনাম পাঠকালে অনুমিত হয় যে হারানো ৫৭ সংখ্যক রচনাটি ঠাকুরবাড়ির ভাইবোন সমিতিতে পঠিত হয়; অথবা সমিতিতে প্রদত্ত কোনো বক্তৃতার

১০ এর পর কাটাপাঠ—'আমাদের'।

১১ তোলাপাঠে 'হৃষ্টপুষ্ট'।

অবিকল অনুলিপি বা সংক্ষিপ্তসার হল ঐ রচনাটি। বর্তমান বলেন্দ্র-রচনায় উক্ত ভাইবোন সমিতি বিষয়ক কোনো আলোচনা নেই সত্য, কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিরই অন্যত্র সে সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রচনাটির (১০২ সংখ্যক, পৃ ১২০, p 114) শিরোনাম হল 'ভাইবোন্ সমিতি—গাড়ি'। লেখক ঋতেন্দ্রনাথ সে প্রবন্ধে বলেছেন, 'অলস বাবুমাত্রেরই জুড়ি গাড়িতে চেপে হাওয়া খাবার ইচ্ছে হয়। সাহিত্যপ্রিয় অলস্ বাবুরাও সেইরূ[রূ]প কোন এক সমিতিরূ[রূ]প্ জুড়ি গাড়িতে চেপে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন। আমরাও আঁর বচ্ছরে বেড়াবার জন্য এইরকম একটী গাড়ী করেছিলুম্ সেটা মধ্যে ভেঙে যাওয়াতে আবার সারিয়ে ফেলা গেছে। আমরা হচ্ছি বাবু আমরা বেড়াতে যাব।··· সাহিত্য ও সঙ্গীত জুড়ি ঘোঁড়া। স্থায়ী সভাপতি মহাশয়কে বাবুরা চালক্ ঠিক্ করেছেন্। ঘোড়ার পিছনে যে দুজন্ করে সহিস্ থাকে তাও এর আছে সেসব বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই তবে যে বাবুরা দানরূ[রূ]প্ দানা দেন্ সেটা এক্‌বার দেখা ভাল যে সহিস্‌রা ঘোড়াকে খাওয়ায় কি না।' ঋতেন্দ্রনাথের এই লেখাটির রচনাকাল দেওয়া না থাকলেও বোঝা যায় এটি ১২৯৭ সালের ১৪ বৈশাখের মধ্যে রচিত হয়েছিল কারণ তারিখটি ঐ ১০২ সংখ্যক রচনার পরবর্তী কোনো একটি মন্তব্যের শেষে (পৃ ১২১, p 115) পরিবেশিত হয়েছে।

২

পাণ্ডুলিপি খাতার ১১১ পৃষ্ঠা থেকে পরপর যে কয়েকটি বলেন্দ্র-রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তার তালিকা এইরূপ: সুনা-উল্লার গান (৮৮ সংখ্যক, পৃ ১১১-১৩, pp 105-07), Adventure (৮৯ সংখ্যক, পৃ ১১৪, p 108), Architecture (৯০ সংখ্যক, পৃ ১১৫, p 109), Phrenology (৯১ সংখ্যক, পৃ ঐ), Patriotism এবং ছারপোকা (৯২ সংখ্যক, পৃ ১১৫-১৬, pp 109-10), মশা ও ছারপোকা (৯৩ সংখ্যক, পৃ ১১৬, pp 110), ভাবনা ও চিন্তা (৯৪ সংখ্যক, পৃ ঐ), ৺ (৯৫ সংখ্যক, পৃ ঐ), তর্জ্জমা (৯৬ সংখ্যক, পৃ ১১৬-১৭, pp 110-11)। এর মধ্যে কয়েকটি লেখা রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে সিলাইদহে অবস্থানকালে রচিত হয়েছিল; অথবা তখন ডায়েরিতে বা ব্যক্তিগত খাতায় সেগুলি লিপিবদ্ধ হয় এবং পরে কলিকাতায় ফিরে এসে বলেন্দ্রনাথ পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকে কপি করে দেন।

সুনা-উল্লার গান রচনাটি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে। ৮৯ সংখ্যক রচনাটি থেকে পাওয়া যায় যে ১২৯৬ সালের ১১ অগ্রহায়ণে তিনি সিলাইদহে উপনীত হন এবং সম্ভবত ২৩ ও ২৫ অগ্রহায়ণে তিনি সেখানে সুনা-উল্লার গান শুনিতেছিলেন। কারণ পাণ্ডুলিপির ১১২ ও ১১৩ পৃষ্ঠার মার্জিনে যথাক্রমে '২৩শে অগ্রহায়ণ ১২৯৬' এবং '২৫ অগ্রহায়ণ ৯৬' এই দুটো তারিখ পাওয়া যায়। তাই মনে হয় অন্তত ৪ ও ৭ সংখ্যক গান-দুটো ঐ ঐ তারিখে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যেহেতু বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে গান-দুটির পাশেই ঐ তারিখগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ পাণ্ডুলিপির এই রচনার শেষে তারিখ দেওয়া হয়েছে '৭ই ফাল্গুন ১২৯৬'। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ১২৯৬ সালের অগ্রহায়ণের কোনো নোটস যা সিলাইদহে লিখে রাখা হয়েছিল, তার উপর নির্ভর করে কলিকাতায় বসে ফাল্গুন মাসে তিনি ৮৮ সংখ্যক রচনাটি প্রস্তুত করেন। বলা বাহুল্য রচনাটি একান্তভাবে স্মৃতিচারণা নয়, সুনা-উল্লার গানগুলি পাণ্ডুলিপিতে পরিবেশন করার সময় স্মৃতি অপেক্ষা পূর্বেকার কোনো নোটসের উপরেই লেখক নির্ভরশীল

ছিলেন। খাতার মার্জিনে দুটি তারিখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। এই রচনাটির পূর্ণ শিরোনাম—'সিলাইদহ। / সুনা-উল্লার গান।' রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

আমরা যখন সিলাইদহে ছিলুম তখন রোজ রোজ আমাদের বোটে সেখানকার গ্রাম্য গাইয়েদের আমদানি হ'ত। তার মধ্যে দু'জন আমাদের মার্কামারা হ'য়ে পড়েছিল। একজন বষ্টম—সে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের গান গাইত, আর একজন নেড়ে এবং বাচ্ছা—তার গান নানারকম। তার নাম হচ্ছে সুনা-উল্লা। বাপের নাম মোচন—ছেলের মতে সে খুব গাইয়ে ছিল। ভায়ের নাম আভীরুদ্দীন সাপুড়ে। এদের বাড়ী ঘর নেই—নৌকোয় নৌকোয় দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ায়। আর গান গেয়ে এবং সাপ খেলিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করে।

সুনা-উল্লার গানের আমরা যতদূর বুঝ্‌তে পারি তাতে তার কোন সুরই আছে কিনা সন্দেহ। সে যখন গাইত তখন তার নাক থেকে দাড়ি পর্য্যন্ত সমস্তটা চোকের নীচে চ'লে যেত [এবং] সমস্ত পেট্‌টা বারাণ্ডার মত বেরিয়ে আস্‌ত। এ ছাড়া তার সুর সম্বন্ধে আমাদের কারও কিছু বলবার অধিকার নেই।

একএকদিনের পালায় তার ৵০ ক'রে পয়সা বরাদ্দ ছিল। একদিন দু'প[য়]সা পেয়ে সে ত কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। শেষটা ট্যাঁক থেকে আর দু'টো পয়সা বেরোতে শান্ত হ'ল। নিয়মিত বরাদ্দ ছাড়াও কাকীমার[১২] দানশীলতায় তার একখান সাড়ী এবং তাঁর সহচরীর ফস্‌ফরিক সাল্‌সার [এ]কটা খালি বোতল লাভ হয়েছিল। এই ত গেল তার ইতিহাস।

এইবারে তার গানের নমুনা দিচ্ছি। তা' থেকে অবিশ্যি কারও বিশেষ জ্ঞান লাভ হবার আশা করা যায় না; কিন্তু এ দেশের ছোটলোকদের কিরকম বিষয়ে inspiration [আ]সে, তা'দের কবিত্বের দৌড় কতদূর, একরকম মোটামুটি বোঝা যায়। তাদের inspirationএর [গো]ড়ায় না আছে জ্যোৎস্না, না আছে ফুল, না আছে কোকিল পাপিয়া বউ-কথা-কও। ইটকাঠের মধ্যেই তাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, ভক্তির সঙ্গে পয়সা, কবিত্বের ভাব[১৩] খবরের কাগজে[র] সংবাদস্তম্ভের অনুকরণে। সে সম্বন্ধে বেশী কথা বল্‌বার আবশ্যক নেই। গান দেখ্‌লেই সব পরিষ্কার।

১। আজ আমারে বিদায় দেও প্রাণের ভাই।
আমরা দুইটী ভাই অরণ্যে বেড়াই, মা বিনে আমাদের লক্ষ্য কেউ নাই।
পিতার নাম শুনি, মায়ের নাম জানি, মায়ের নাম আমার জনকনন্দিনী।
সে বড় দুঃখিনী।

২। কালীর নাম যে লইব হৃদ্‌কমলে।
একই মনের সাধ ছিল কালী মারে পূজা দিব।
মনে বড় ঢাকা যাব, বাক্স ভইরে টাকা [...][১৪], কালী মায়ের পূজো দেব।

৩। যার পয়সা নেই রে ভাই এ সংসারে মরণ ভাল।

---

১২ রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী।

১৩ কাটাপাঠ 'স্রোত', তোলাপাঠে 'ভাব'।

১৪ জীর্ণতাবশত পাণ্ডুলিপির এ অংশ অধুনালুপ্ত, কপির পাঠ 'আনব'।

পয়সাহীন কর্‌তে গেলে লোকেরা সব ঘেন্না করে,
প্রাণের ভাই স্থর ধরে একবার দেখে আয়।
গগন মণ্ডল (সিলাইদহের ডাক-হরকরা)[১৫] বলে রে ভাই পয়সার কি গুণ বল।

৪। তাহের খাঁ কয় ভাইসকলরা মনের দুঃখু কারে বল্‌ব।
আমার শিশুকাল ব'য়ে গেল, যোয়ান বয়সে ছিলেম ভাল,
আমার আইল বের্দ্ধ (বৃদ্ধ) কাল, ঘটিল জঞ্জাল,
হায় কপালে এই কি ছিল।
পোড়ার বাকি কাঠ ঠেলতে আমার চুলদাড়ি পাকিল।
তাহের খাঁ কয় ওস্তাদ্‌জি তুমি দেশবিদেশে গাচ্ছ যাই,
কেরাসিন বাতির মধ্যে ক্যাবল আছ তুমি।
ভাইনেরে পাই মাধাই মোল্লা[১৬] বোলপুরে বাড়ী,
তাহের খাঁ কয় আতার ভাই কি দায় ঠেকালি।
পশ্চিমে ইন্দু বিশ্বেস, কলম বিশ্বেস, সব বিশ্বেসে আমি জানি ;
তারা গায় শুধু ছড়া পাঁচালী হাকিমচাঁদ আর এনাতুল্লা।[১৭]

৫। ভাই রে ভাল এক রথ করেছে সৃষ্টিধর
কি বাহার দুই চাকার পর কর্‌ছে নিরাকার।
[ক]ত মুনিগণ করি সাধন তপ জপ কয়ে শুনেছি রথের পর।
[উপ]রের খোপে জল্‌ছে বাতি বাহা রথ দেখ্‌তে চমৎকার।
চৌ[ষ]ট্টি মোহন্ত যোগী রথের মধ্যে ছিল,
অমন পের্‌ধান ব্যক্তি থাক্‌তে রথের আল্‌কো (চাকা) খেয়ে গেল।
রথ চিরকাল রবে না।
এ রথ চিরদিন খাড়া থাক্‌বে না।

৬। বিজয় [তা]তে খবর শুন্‌তে পাই, অমন গৈবীতুফান (অগ্নিবৃষ্টি) দেখি নাই,
তাতে গণিমিঞার দালান ভেঙ্গে দেড়হাজার লোক মরে গেল।
জেলায় জেলায় পরোয়ানা গেল।
মিয়ার আয়নাকোঠায় মতিঝিল ছিল, ভেঙ্গে চূর্ণ করিল।
তাহেরকে কয় ভারিতাল্লা দিলা কি শক্ত ঠেলা এই দুনিয়ার পরে।
আর উত্তর থেকে মার্‌ছে ঠেলা ভাঙ্গেছে সব বস্তিটোলা, ফেলাইল খালে।
কজু বলে মহিরুদ্দী (দুই ভাই) এই ছিল পোড়া কপালে!
বংশ বুঝি দেয়াপরীর হাতে (বজ্রের হাতে, দেবতার হাতে),

---

১৫ পাণ্ডুলিপিতেই লেখক এভাবে বন্ধনীর মধ্যে মতামত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

১৬ এর পর কাটাপাঠে 'কি দায় ঠেকালি'।

১৭ এই ৪ সংখ্যক গানটির পাশে মার্জিনে লেখা আছে—'২৪শে অগ্রহায়ণ ১২৯৬'।

আমার চৌধুরী বংশ নির্ব্বংশ হ'ল,
ঢাকা সহরে লোক মরেছে সুমান নেই (হিসাব নেই)
কত গাছ বৃক্ষ উড়িয়ে নিল ভাই।
মোসলমান বলে হে আল্লা রোস্কিয়ামৎ হ'ল (দুর্ভিক্ষ হ'ল)।[১৮]

৭। সন বার শ চুরানব্বই সালে এগারই তারিখ আশ্বিনে
তেহার (বহু লোক) মিলে উজীরপুরেতে।
দশহরার দিন মিলছে তেহার উজীরপুরের মোকামে,
হিন্দু ক্ষেত্রি আর মুসলমানে।
তোরা তেহার দেখে বাহার দিলিরে কত গান বাদ্য শুনে।
দোঁহা মফেজুদ্দীন করেছে তৈয়ার।
পোলের [তক্তা খোসে] কুলুপ ছুটে লোক পড়্ছে নদীর মাঝার।
চুবানি খেয়ে উঠ্ছে শুক্‌নার পর।
দারুণ বিধি হ'য়ে বাদী রে চারজন না পাইল তাহার।
শীঘ্‌ঘির ক'রে সম্বাদ পেয়ে নৌকা লাগাইল উজীরপুর।
পোল হইতে জল চোদ্দ হস্ত দূর।
সাক্ষী পেরমাণ ঠিকটী রাখে দি, লাস পাইলে কমলাপুর।[১৯]

৮। হানিফ কয় ওরে জয়নাল এতদিন ছিলি কোথায় কই(হি) তোমারে।
আমার মিয়া ভাই আকুল ভাই তারে মারিয়াছে কাফেরে।
এ দুখ সয় না প্রাণে মিয়া কোমর বাঁধ সাথে চল,
চলে যাই দামাস্কা সহরে।

৯। কালী ব'লে ডাক না রে মন।
কালী যদি আমার হইত, মুখের ঘাম পুঁছে নিত,
যেমন অসময়ে কর চাঁদবদন।

১০। মনেতে যে উঠে দুখ মনোমত হ'ল না পতি।
হরিঠাকুর বাঞ্ছা করে কত নারী কত ক'রে,
দামে এসে উপুড়বাসে পূজা করে ভগবতী।
মনোমত হ'ল না পতি।

১১। দেখ রে নয়ন গিরি উমা তারা সেজে এল।
কেহ বলে শিব মরেছে, আর কি শিবের মরণ আছে,
কালীহৃদয় চরণ মাঝে আর কি রে বাপ সে বাপ আছে।

---

১৮ এই গানের বলেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত বিভিন্ন শব্দের বন্ধনীমধ্যস্থ ব্যাখ্যা সবক্ষেত্রে সঠিক নয়।

১৯ এই ৭ সংখ্যক গানের পাশে মার্জিনে লেখা হয়েছে—'২৫ অগ্রহায়ণ ৯৬'।

১২। কি কথা ছিল দুইজনে।
ক্রমে কতদিন জানি আমি বসে দিন গণি,
কবে লো বিধুবদনী ঐহিকের সুখ কদিন বল।
শিশুকালে ছিলেম ভাল, বেদ্ধ (বৃদ্ধ) কালে কি ঘটিল।

এ গানের অনেক জায়গায় মানে বোঝা দায়। কিন্তু আমাদের দোষ নেই। যথা শ্রুতং তথা লিখিতং।[২০]

৭ই ফাল্গুন ৯৬। শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতঃপর পাণ্ডুলিপির ৮৯ সংখ্যক রচনাটি পরিবেশিত হল, এর শিরোনাম 'Adventure'। রচনাটি এইরূপ :

আমাদের সিলাইদহে থাকতে একদিন খুব adventure হয়েছিল। তখন টাটকা টাটকা সবেমাত্র গেছি। পদ্মার মাঝে একটা খুব লম্বা চর ছিল, আমি রোজ তারই এদিক ওদিক বেড়াতে যেতুম। একদিন—সেদিন ১৩ই অগ্রহায়ণ, আমাদের সিলাইদহে যাওয়া হয় ১১ই—চরের একদিককার একেবারে শেষে গিয়ে পৌঁছই। তখন বেশ সন্ধ্যে হয়েছে—চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। সেখানে দেখ্‌লুম, একদল বালহাঁস আমাকে দেখে ক্যাঁ কোঁ ক্যাঁ কোঁ কর্‌তে কর্‌তে উড়ে গেল। তাপরে খানিকক্ষণ যেতে আস্তে আস্তে বোটে ফিরে এলুম। খুবই যে আস্তে আস্তে এসেছিলুম তা' নয়—পথ হারাবার ভয়ে জায়গায় জায়গায় ছুটতেও হয়েছিল। কিন্তু আমার directionটা ঠিক ছিল। সুতরাং বোটে ফিরে আস্‌তে কষ্ট পেতে হয়নি। তাপরে কাকীমাকে সেইদিন খাবার আগে চওড়া পদ্মার কথা বল্লুম—বালহাঁস টালহাঁস কোনও কথাই লুকোইনি। কাকীমা আর তাঁর সহচরীতে[২১] মিলে ঠাহরালেন, পরদিন আমার সঙ্গে চরের সেই শেষে গিয়ে পদ্মার বাহারটা একবার দেখে আস্‌বেন। সে রাতটা ত কেটে গেল। পরদিন বিকেল বেলায় স-সহচরী কাকীমা ত পদ্মার সেই বালহাঁসের আড্ডা দেখ্‌তে চল্লেন। দিব্যি যাওয়া গেল। আমি এগিয়ে এগিয়ে চলেছি—যত পাঁকের মধ্যে গিয়ে দেখি যে, পা ব'সে যায়। জুতোশুদ্ধু তো টেনে তুল্লুম, কিন্তু জুতোটা একেবার সেইদিন চটিত্ব পেয়ে বস্‌ল' তখন চটাস্ চটাস্ কর্‌তে কর্‌তে ফেরা গেল। কিন্তু ফির্‌তে ফির্‌তে কোথায় গিয়ে পড়ি! কাকী-মাকে ছোট্‌বার পরামর্শটা একবার দিয়েছিলুম, তিনি তা' শুন্‌লেন না। পথ নিয়ে আবার উভয় পক্ষের মতভেদ উপস্থিত হ'ল! একটা নৌকোর পাল দেখে তিনি ভাব্‌লেন, ঐখেনে তাঁবু আছে। আমি অনেক ক'রে সেটাকে কল্পনা ব'লে প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লুম শেষটা সেই তাঁবু অভিমুখে গিয়ে আর পথ পাইনে। সেদিক দিয়ে গেলে যে একেবারে কিছুতেই বোটে পৌছন যেত না তা' নয়, মোদ্দা অনেকটা ঘোর বটে। সন্ধ্যে ছেড়ে বেশ একটু অন্ধকার হয়েছে—আমরা তখন অগাধ বালি-সমুদ্রের মাঝখানে। যেদিকে চাই কেবলই ধূ ধূ বালি। প্রথমটা পথ হারান' বুঝতে পেরেও

[২০] এই শেষ মন্তব্যটি করার আগে একটু ছোট্ট ছবি আঁকা হয়েছে, ছবিতে একটা হাত এঁকে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়াস স্পষ্ট।

[২১] মৃণালিনী দেবীর এই অজ্ঞাতনামা সহচরীর প্রসঙ্গ ৮৮ সংখ্যক প্রবন্ধেও বর্তমান।

পাছে কেউ নিরাশ হ'য়ে পড়েন আমি ত কিছুতেই সম্পূর্ণ পথ হারান' স্বীকার করলুম না। শেষকালটা বলতেই হ'ল। কাকীমাকে বোঝালুম যে, একটু উঁচু জমিতে উঠলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কাকীমা মন্দ হাঁটতে পারেন না— তিনি প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁর সহচরী বড় গোলযোগ ক'রে তুল্লেন। শুনলুম, তাঁর নাকি গা হিম হ'য়ে আসছে, চলবার সামর্থ্য নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা' ছাড়াও তাঁর এক কাল্পনিক ভয় উপস্থিত হ'ল, মাটী— বালি ফুঁড়ে পাছে একদল ঠেঙ্গাড়ে বের হয়। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! রাজ্যের পেঁকো ডোবা থেকে জল সংগ্রহ ক'রে ক'রে কাকীমা[র] হাতে দিতে লাগলুম। তিনি তাই খাইয়ে ত সহচরীর মূর্চ্ছা বাঁচালেন। তাপরে "গফু" আর "আলো" "আলো" ক'রে চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিলুম। মানুষ কোথায় যে সাড়া দেবে? কেবলই প্রতিধ্বনি— 'উ' 'লো'। অনেক বক্তৃতাদির পর তাঁদের ত একটা উঁচু জায়গায় ওঠবার মত হ'ল। শে[ষে] উঁচু জমিতে উঠতে একদল লোকের বিড়বিড় শোনা যেতে লাগল। ডেকে হেঁকে অনেক ক'রে শেষটা সেই মেছোদের কল্যাণে পথ পাওয়া গেল। তাপর এই adventureএর গল্প যে কতদিন চলেছিল তার ঠিক নেই। বিবিকে adventureএর কথা চিঠিতে লিখি। কলকাতায় কেউ ঠাউরে উঠতে পারেন না যে, আমি ইচ্ছে ক'রে বানিয়ে লিখেছি কি সত্যি কিছু হয়েছিল। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল একটা mysterio[us] ব্যাপার ক'রে সবাইকে হাঁ করিয়ে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। এমনি অদৃষ্ট!

৮ই ফা[ল্গুন।] শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লক্ষণীয় যে উপরের ঘটনাটি ১২৯৬ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ তারিখে সিলাইদহে ঘটেছিল এবং সেই অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ বর্তমান ৮৯ সংখ্যক রচনাটিতে পরিবেশন করা হয় ১২৯৬ সালের ৮ ফাল্গুন বা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে। বলেন্দ্রনাথের রচনার শেষাংশ থেকে জানা যায় যে একই ঘটনার বিবরণ দিয়ে শিলাইদহ থেকে তিনি ইতিপূর্বে 'বিবিকে' বা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সিলাইদহ থেকে ইন্দিরাদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে অনুরূপ ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়, এ প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের (১৯৬৮) ১০ সংখ্যক পত্র বা ছিন্নপত্রাবলীর (১৯৬০) ৩ সংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য। এই চিঠির 'বলু' হলেন বলেন্দ্রনাথ, 'ছোটো মা' বা 'বোটলক্ষ্মী' মৃণালিনী দেবী; রবীন্দ্র-পত্রের 'গফুর' বলেন্দ্র-রচনায় 'গফু'তে পরিণত। বর্তমান ক্ষেত্রে আরও বলা যায় যে ছিন্নপত্রাবলীর অন্তর্গত উক্ত চিঠির রচনাকালের (শিলাইদহ।১৮৮৮) নির্দেশে ভুল রয়েছে, পক্ষান্তরে ছিন্নপত্রে প্রদত্ত কালটি অসম্পূর্ণ হলেও ত্রুটিহীন। বস্তুতপক্ষে উক্ত রবীন্দ্র-পত্রের রচনাকাল ১২৯৬ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হওয়া সঙ্গত।[২২] বর্তমান বলেন্দ্র-রচনা অবলম্বনে কথিত রবীন্দ্র-পত্রটির রচনার তারিখ অনুমান করা সম্ভব। বলেন্দ্রনাথের এই বিবরণ পাঠে জানা যায় যে ১২৯৬ সালের ১১ অগ্রহায়ণ (২৫ নভেম্বর ১৮৮৯) তিনি সিলাইদহে গমন করেন এবং ১৩ অগ্রহায়ণ (২৭ নভেম্বর) তারিখে নদীর চরে একাকী ভ্রমণ করেন; 'পরদিন বিকেলবেলায়' বা ১৪ অগ্রহায়ণে (২৮ নভেম্বর) মৃণালিনীদেবী এবং তাঁর সহচরীর সঙ্গে ভ্রমণকালে অন্ধকারে পদ্মার চরে পথ হারিয়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে এই ঘটনার যে পরিচয়

---

২২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় এই সালটির সপক্ষে একটি প্রবল যুক্তিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। দ্র° রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৮, পাদটীকা ২। অবশ্য বলেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার তারিখ নির্ণয়ে একটু ত্রুটি আছে।

দিয়েছেন তার সূচনায় আছে, 'গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেকক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি' ইত্যাদি। ১৪ অগ্রহায়ণের ঘটনা যদি 'গতকল্যে'র ব্যাপার হয় তাহলে বোঝা যায় বর্তমান অংশটি অন্তত ১৫ অগ্রহায়ণে (২৯ নভেম্বর) লিখিত হয়েছিল। আবার চিঠির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তোকে তিনদিন ধরে এই বিষয়টা বিস্তৃত করে লিখে আমার মন অনেকটা খোলসা হয়ে গেল।' এই দুটি সূত্র ব্যতীত তৃতীয়টি হল এই যে, ইন্দিরাদেবী এ চিঠি কলিকাতায় পেয়েছিলেন আনুমানিক ২ ডিসেম্বর বা ১৮ অগ্রহায়ণে। সব দিক বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে চিঠিটি ১৩ থেকে ১৬ অগ্রহায়ণ (২৭ থেকে ৩০ নভেম্বর) তারিখের মধ্যবর্তী যে কোনো তিনটি দিনে লিখিত হয়েছিল।

পাণ্ডুলিপি-খাতার অন্তর্গত পরবর্তী বলেন্দ্র-রচনার শিরোনাম 'Architecture', রচনাকাল ৯ ফাল্গুন ১২৯৬ বা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০। রচনাটি নিম্নরূপ :

> জাতিবিশেষের ভাষা দেখে তার সম্বন্ধে যেমন অনেক কথা বলবার সুবিধে হয়, সেইরকম আমার বোধ হয় যে, গৃহনির্মাণপ্রণালী (architecture) দেখেও জাতির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বোঝা যায়। গির্জে এবং দেবমন্দিরের ভাবে তুলনা ক'রেই আমার এই বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে। ইংরেজদের church দেখলে— তার সেই সরু উঁচু spire দেখলে তাতে aspirationএর ভাব আছে ব'লে মনে হয়। আর আমাদের মোটাসোটা গড়ানেছাত মন্দিরগুলি দেখলে যেন মনে হয়, concentrationই এর প্রধান ভাব। আমার যেটা মনে হয় সেইটে ঠিক সাধারণের মনে হয় কি না জানিনে, কিন্তু এটা কেবলমাত্র কল্পনা এবং খেয়ালে দেখা ?
>
> শুধু গির্জে আর মন্দির থেকেই যে আমার সিদ্ধান্ত যে, architectureএ জাতীয় ভাব ধরা পড়ে, তা' নয়। জেনানা [...] একরকম খুবরি খুবরি সম্পূর্ণস্পর্শ্য বাড়ী ভালবাসে, সুতরাং সেইরকম তৈরি করে ; যাদের যেমন মুক্ত ভাব তারা তেমনি খোলাখুলি বাড়ী পছন্দ করে। এর থেকে কি বলা যায় না যে ভাবানুযায়ীই নির্মাণ প্রণালী হয় ? মন্দির হাজার উঁচু হোক্‌ না কেন, তার সে ভাব কিছুতেই গির্জে কি মস্‌জিদের মত হবে না। নয় কি ?...
>
> ৯ই ফাল্গুন শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রবন্ধ পাঠকালে বর্তমান পাণ্ডুলিপি-খাতারই ৫ সংখ্যক রচনা বলেন্দ্রনাথ-লিখিত 'অক্ষরতত্ত্বে'র কথা মনে পড়া স্বাভাবিক ; এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র' (৯ সংখ্যক) এবং বলেন্দ্রনাথ-রচিত ৯১ সংখ্যক রচনা ও সর্বশেষ রচনাটিতে (পৃ ১৪০, p 134) একই তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বিত। কিন্তু এই তুলনামূলক জাতিতত্ত্বের প্রয়োগ যে একেবারে ত্রুটিমুক্ত অথবা সর্ববিধ সমালোচনার অতীত ব্যাপার নয় তারও পরিচয় রয়েছে বর্তমান পাণ্ডুলিপিরই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-লিখিত ২৪ সংখ্যক রচনাটিতে (পৃ ১৯-২০, pp 25-26)।

অতঃপর ৯১ সংখ্যক রচনা, শিরোনাম 'phrenology' ; রচনাকাল—৪ মার্চ ১৮৯০ বা ২১ ফাল্গুন ১২৯৬ সাল। রচনাটি নিম্নরূপ :

> নাকের জোরে অনেক কাজ করা যায়—এ theory যদি সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহলে বেচারী

চীনেম্যানদের দশা কি হবে? নাকের prominenceএর উপর যে কাজগুলো নির্ভর করে, সেগুলো কি তারা করতে পারে না? জ্যোতিকাকামশায় "বালকে" বঙ্কিমবাবু এবং রাজনারায়ণবাবুর নাক নিয়ে যেসব কথা বলেছেন—যেসব গুণ ব্যাখ্যা করেছেন, চীনেম্যানদের কি সেসব গুণ কোন কালে হ'বে না? তাদের মধ্যে কখনও বঙ্কিমবাবু অথবা রাজনারায়ণবাবুর আবির্ভাব হ'বে না, এ ত বড় আশার কথা নয়। শোনা যায়, আজকাল যন্ত্রে নাক বাড়াবার উপায় হয়েছে। চীনেম্যান্‌রা যন্ত্রের সাহায্যে যদি নাক বাড়িয়ে নেয়, তাহ'লে কি তাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ? কিন্তু তাহ'লেও ত তাদের মধ্যে গড়াপেটা লোক বৈ রীতিমত geniusএর আবির্ভাব হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ, genius স্বাভাবিক। একটা মীমাংসা প্রার্থনা করি।

৪ঠা মার্চ ১৮৯০ শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বালক পত্রিকায় (১২৯২) মুদ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধটির কথা বলেন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন তার নাম 'মুখ-চেনা'; ঐ পত্রিকার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ প্রভৃতি সংখ্যায় রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে বা বৈশাখ সংখ্যাতেই রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি মুদ্রিত হয়। ঐ সংখ্যায় সাধারণভাবে মুখের গঠন থেকে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি নির্ণীত এবং নাক ঠোঁট কপাল প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে আলোচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজনারায়ণ সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে বলা হয়, 'বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্য্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে। রাজনারায়ণবাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইঁহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়।'[২৩]

'Patriotism এবং ছারপোকা'-শীর্ষক পরবর্তী বলেন্দ্র-রচনাটি (৯২ সংখ্যক) নিম্নরূপ:

দেশীয় p[a]triotএরা ইংরেজদের উপর চটে গিয়ে যখন গোঁ গোঁ করতে থাকেন এবং মনে মনে (আসলটা যদিও মুখে এবং রুদ্ধগৃহে) তা'দের তাড়াবার ফন্দি আঁটেন, তখন খানিকপরেই সমস্তটা আকাশকুসুম দেখে তাঁদের কি দারুণ নৈরাশ্য উপস্থিত হয়? আমি একটা উপায় ঠাহরিয়েছি। ইংলণ্ডে যদি বোতলে ক'রে কোন রকমে জীয়ন্ত ছারপোকা পাঠান যেতে পারে [তাহ']লেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। [ছার]পোকারা রক্ত খেয়ে খেয়ে ইংরেজদের খানিকটা ঠাণ্ডা ক'রে দেয়। আমাদেরও ছারপোকাভাবে রক্তটা জম্‌তে থাকে—খরচ হয় না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যে আমাদের রক্তের তেজ বৃদ্ধি এবং ইংরেজদের তেজ হ্রাস হয়। তখন ত ফলাফল বোঝাই যাচ্ছে। অ্যাঁ?

৪ঠা মার্চ শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনাকাল দেখেই বোঝা যায় ৯১ ও ৯২ সংখ্যক রচনা একই দিনে লিখিত। এর পর ৯৩ সংখ্যক রচনাটি পরিবেশন করা যেতে পারে, এর রচনাকাল অজ্ঞাত, শিরোনাম 'মশা ও ছারপোকা'। রচনাটির

---

২৩ বালক, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৫৫-৫৬।

আয়তন এতই ক্ষুদ্র যে একে একটি সাধারণ মন্তব্যরূপে গ্রহণ করা সমীচীন। বস্তুতপক্ষে আয়তনের দিক থেকে পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকের এই পর্যায়ের বলেন্দ্র-রচনাকে উক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যা হোক ৯৩ সংখ্যক লেখাটি এরূপ :

সংসারে কোন্‌টা হ'য়ে জন্মান সুবিধে? মশা না ছারপোকা? উভয়ই ত রক্ত খেয়ে মানুষ (মানুষ অর্থে মশা এবং ছারপোকা পরে পরে)। মশা উড়তে পারে বটে, কিন্তু বড্ড চড়ে মরে। ছারপোকাকে ধরা দায়। সুগন্ধের জন্যে ছারপোকাকে সব সময়ে মারা সুবিধেরও নয়।

ব: ন. ঠ.।

৯৪ সংখ্যক রচনায় ('ভাবনা ও চিন্তা') বলেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'চিন্তা' শব্দের মানে ছেলেবেলা থেকে 'ভাবনা' শুনে আস্‌ছি। কিন্তু 'চিন্তা' আর 'ভাবনা' কি. [ঠি]ক এক জিনিষ? আমরা যখন কাউকে 'thoughtful' বল্‌তে চাই তখন বলি 'চিন্তাশীল', 'ভাবনাশীল' বল্লেও এ ভাব মনে আসে না। 'চিন্তা করা'কে বরঞ্চ 'ভাবা' বল্লে বোঝা যায়। 'আধুনিক মত ও চিন্তা'কে 'আধুনিক মত ও ভাবনা'য় অনুবাদ করা যায় না। 'ভাবনা' বল্লে এখানে সহজেই দেশরক্ষার ভাবনা, যুদ্ধের ভাবনা, এইসবই বোঝায়। 'চিন্তা' আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেরকম ব্যবহার করা যায়, ভাবনা তেমন ব্যবহার করা যায় না। ভাবনার সঙ্গে সাংসারিক সুখ দুঃখ, কি একটা কিছুর প্রায়ই যোগ থাকে। চিন্তা দার্শনিকের, কবির, ইত্যাদির ইত্যাদির। একটা বই [লিখ্‌তে] হ'লে তার বিষয়গুলো আমরা চিন্তা করি, আর বইটা ছাপা হ'লে বিক্রি হ'বে কি না, [···] সেসব হচ্ছে ভাবনা। 'ভাবনা'র চেয়ে 'চিন্তা' এক হিসেবে immaterial বলা যেতে পারে [···] ভাবনার ইংরেজী কি?

এই লেখার শেষে খাতার বাঁ দিকের মার্জিনে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে 'care'; এবং এর পর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারে একটি সংক্ষিপ্ত দুষ্পাঠ্য স্বাক্ষর বর্তমান। সম্ভবত স্বাক্ষরকারী এই ইংরেজি care শব্দের সাহায্যে 'ভাবনা' বা 'চিন্তা'র তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন; অথবা বলেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে 'ভাবনা'র ইংরেজি care। আগেই বলা হয়েছে, care শব্দটি ছোট্ট হরপে লেখার পর একটি দুষ্পাঠ্য সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর করা হয়েছে; অক্ষরের গঠন দেখে এটিকে বলেন্দ্রনাথের লেখা মনে করারও যথেষ্ট অবকাশ বর্তমান। যা হোক বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে এই জাতীয় পরিভাষা-চিন্তা সংক্রান্ত একাধিক রচনা রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'citizen ও নাগর শব্দ' (১৯ সংখ্যক, পৃ ১২, p 18), 'সহানুভূতি ও সহমর্মিতা' (৫৮ সংখ্যক, পৃ ৬৯, p 63) প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই সকল রচনায় প্রায় সমার্থক শব্দগুলিকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে তাদের অর্থগত স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষিত হয়।

৯৫ সংখ্যক রচনায় বলেন্দ্রনাথ প্রধানত দেশীয় ও তদ্ভব শব্দের স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এর শিরোনাম 'ঁ'। রচনাশেষে কোনো স্বাক্ষর না থাকলেও হস্তাক্ষর স্পষ্টত বলেন্দ্রনাথের। রচনাটি নিম্নরূপ :

সেদিন (১৫ই মার্চ) যোগেশবাবু বল্‌ছিলেন যে, 'ট'-অন্ত কথায় 'ট'-য়ের পূর্বে একটা চন্দ্রবিন্দু (ঁ) আমদানি হ'য়ে থাকে। তিনি উদাহরণস্বরূপ কতকগুলো কথার উচ্চারণসমেত উল্লেখ করেছিলেন; যথা, 'উঁটু', 'পুঁটি', 'খুঁটি', 'ঘুঁটি' ইত্যাদি। 'ড'-অন্ত 'ড়'-অন্ত কথা সম্বন্ধেও

যোগেশবাবুর ঐ মত। তার উদাহরণ দিয়েছিলেন, 'ঘোঁড়া', 'ফোঁড়া', 'গোঁড়া', এখন কথা হচ্ছে যে, যোগেশবাবুর এ মতটা কি ঠিক? বাঙ্গলাদেশের—রাজধানীর—লোকেরা উঁট্‌ বলেন কি উট্‌ বলেন? ঘোঁড়া বলেন কি ঘোড়া বলেন? (̐) চন্দ্রবিন্দুর সম্পর্কহীন টান্ত এবং ড়ান্ত অনেক কথা দেখান যেতে পারে; যথা, তোড়া, মোড়া, নোড়া, পোড়া, জোড়া, ঘাট, খাট, নট, লাট, তট ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘোড়া তোড়া কথাগুলো ঠিক ড়-অন্ত নয় বটে, কিন্তু ওগুলোও যোগেশবাবু যখন ধরেছেন তখন ধরা যেতে পারে। এখন দুই তরফা উদাহরণ থেকে দাঁড়ায় কি?

যদিও উল্লিখিত রচনাটির নির্মাণকাল কোথাও দেওয়া হয় নি তবু প্রবন্ধে ব্যবহৃত তারিখটি থেকে স্বভাবত অনুমিত হয় এটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চের পরবর্তী কোনো এক সময়ে লিখিত হয়। বর্তমান রচনায় উল্লিখিত 'যোগেশবাবু' হলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। পারিবারিক স্মৃতি-লিপি খাতায় তাঁর রচনা রয়েছে, অধিকন্তু নানা লেখকের রচনায় তাঁর নাম ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব' (২৬ সংখ্যক) রচনার 'পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব' পর্যায়ের প্রথমে (পৃ ২৩, p 29) বলা হয়েছে, 'যদিও যোগেশচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত হাসিবেন' ইত্যাদি।[২৪] পাণ্ডুলিপির ১৩৩ পৃষ্ঠায় (p 127) একটি কবিতা আছে, তার শিরোনাম 'নূতন Pump-shoe-র প্রতি'; এর পর কবিতাটির পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়েছে, 'প্রোফেসর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নূতন সেট্‌মিলান পাম্প্‌শু (pumpshoe) পরণোপলক্ষ্যে'। এই পৃষ্ঠার কবিতার ডান দিকের মার্জিনে কবিতায় ব্যবহৃত একটি শব্দ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, 'কথাটা যোগেশবাবুর কাছ থেকে প্রথম শিক্ষা। (See article 95 page 116)' ইত্যাদি এবং এর পর স্বাক্ষর 'B.T.' বলা বাহুল্য এই মন্তব্যকারী বলেন্দ্রনাথ, হস্তাক্ষর তাঁরই; তা ছাড়া উদ্দিষ্ট ৯৫ সংখ্যক রচনাটি হল বলেন্দ্রনাথের উপরোক্ত রচনা। যে শব্দটি সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ এরূপ কথা বলেছেন তার সম্বন্ধে অপর একজন মার্জিনে মন্তব্য করেছেন, 'interpolated by [Jog Ch] Chow himself.'[২৫]

৯৬ সংখ্যক রচনাটির শিরোনাম 'তর্জমা'। লেখক বলেন্দ্রনাথ প্রথমে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিশব্দের প্রয়োগও করেছেন: রচনার দ্বিতীয় বা শেষ অংশে প্রায় সমার্থক শব্দগুলির অর্থগত তারতম্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তোলন করেছেন। রচনাটি এরূপ:

> নিম্নলিখিত কথাগুলির বাঙ্গলা কি হয়?
>
> adventure, Impulsive, phlegmatic ('শ্লেষ্মাপ্রধান' হয় কি?), Eccentric (ক্ষেপাটে, মাথাপাগলা? শুদ্ধ কথা কি?), Magnetism (চৌম্বক হয় কি?), Delicate (Colour, feeling, heaith etc.) Harmony (Mus.), Symmetry, Humble (Cottage), Meek (সহিষ্ণু হয় কি?) playful, Virtue, Vice, Malice, admiration, Enthusiasm, Zeal, Disappointment, Bitt[er.]

---

২৪ পুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি: ১২৯৫-১৩০২'; দ্র° শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৫৩, পৃ ১২, পাদটীকা ১।

২৫ বন্ধনীমধ্যস্থ এই পাঠ পাণ্ডুলিপিতে একান্ত অস্পষ্ট বলে পাণ্ডুলিপির কপি থেকে তা গৃহীত হল।

নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে ভাবের তফাৎ কোথায় ?

ঘেন্না, ঈর্ষা, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ।[২৬] দয়া, মমতা, সহানুভূতি, অনুকম্পা, সহধর্ম্মিতা, সহৃদয়তা, সমবেদনা, করুণা।[২৭] কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, যাতনা, বেদনা, ব্যথা। হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ, সুখ, পুলক। বিষন্ন, মলিন, ম্লান, ম্রিয়মাণ। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য। প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, অনুরাগ। ভক্তি, শ্রদ্ধা। প্রেমিক, ভক্ত। কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাষ, স্পৃহা, সাধ, মানস, আকাঙ্ক্ষা, আশা, ভরসা। ক্ষমা, মার্জ্জনা। তা[চ্ছি]চ্ছল্য, অবজ্ঞা, উপেক্ষা। মান, অভিমান। ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, অবসন্ন। ভাবুক, চিন্তাশীল।[২৮] বিবিধ, বিচিত্র, নানাপ্রকার, [অনে]ক[২৯] রকম। তীব্র, তীক্ষ্ণ, শাণিত।

এই লেখাটির শেষেও বলেন্দ্রনাথ রচনাকালের কোনো নির্দেশ দেন নি। তবে পূর্ববর্তী ৯৫ সংখ্যক রচনায় ব্যবহৃত ১৫ই মার্চ তারিখ ও পরবর্তী ৯৯ সংখ্যক রচনার শেষে প্রদত্ত 'মার্চ্চ ১৮৯০' তারিখ থেকে বোঝা যায় ১৮৯০ সালের মার্চ মাসের শেষার্ধে এটি রচিত হয়। রচনার প্রথমে যে সকল ইংরেজি শব্দ রয়েছে তাদের আরম্ভে বড় বা ছোট হাতের অক্ষর আছে. চিহ্নপ্রয়োগেও বিশেষ নিয়ম মানা হয় নি; শব্দের পরে কোথাও কোথাও বন্ধনীর মধ্যে প্রতিশব্দ সম্পর্কিত বিচিত্র প্রশ্ন উত্থাপিত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে এক-একটি বর্গে (group) প্রায় সমার্থক 'কথাগুলির মধ্যে ভাবের তফাৎ' সন্ধান করেছেন লেখক। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় কয়েকটি বর্গের ক্ষেত্রে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে, সম্ভবত লেখক নূতন কোনো শব্দ পরে লেখা হবে এ-কথা চিন্তা করে এরূপ ফাঁক রেখেছিলেন। সর্বশেষে বলা যায় যে বর্তমান পাণ্ডুলিপির অন্যতম লেখক রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত বলেন্দ্রনাথও এরূপ তুলনামূলক পদ্ধতিতে বস্তু বা শব্দের স্বরূপ বা অভিধা নির্ণয়ে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন; যথা 'মশা ও ছারপোকা' 'ভাবনা ও চিন্তা' ইত্যাদি। এর কয়েক বৎসর পূর্বে বালক পত্রিকায় এভাবে বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞাবিচারের উদ্যম পরিলক্ষিত হয়।[২৯]

৩

বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী পাঠকালে স্পষ্টত উপলব্ধ হয় যে প্রাচীন ও সমকালীন দেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকগণের কৃতিত্ববিচারে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন; পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকের ১০৩

২৬ পাণ্ডুলিপির ৯ সংখ্যক রচনার (বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র, পৃ ৪-৫, pp 10-11) প্রথমে ঘৃণা ও ঘেন্না সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য: 'অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় রূপান্তরিত হয়ে একপ্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন একরকম ইতর বর্বর আকার ধারণ করে। "ঘৃণা" শব্দের মধ্যে একটা মানসিক ভাব আছে। Aversion. indignation, Contempt প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ বিভিন্ন স্থল অনুসারে [...] প্রতিশব্দ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু "ঘেন্না" বল্লেই নাকের কাছে একটা দুর্গন্ধ, চোখের সামনে একটা বীভৎস দৃশ্য, গায়ের কাছাকাছি একটা মলিন অস্পৃশ্য বস্তু কল্পনায় উদিত [হয়।]'— দ্র° খেয়াল খাতা, ভারতী, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ৯০।— অপিচ দ্র° আশুতোষ চৌধুরী, কথার উপকথা, ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৩, পৃ ৩৯২-৯৪।

২৭ 'সহমর্মিতা'র পর তোলাপাঠে 'সহৃদয়তা'। পাণ্ডুলিপির ৫৮ সংখ্যক রচনায় (সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, পৃ ৬৯, p 63)। ইতিপূর্বে এই বর্গের কয়েকটি শব্দের অর্থগত তারতম্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।— দ্র° খেয়াল খাতা, ভারতী, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ৮৯।

২৮ শব্দদুটির অর্থগত স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের চেষ্টা এই পাণ্ডুলিপিতে ইতিপূর্বেই বলেন্দ্রনাথ করেছিলেন।— দ্র° ভাবনা ও চিন্তা, পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকের ৯৪ সংখ্যক রচনা, পৃ ১১৬, p 110.

২৯ পাঠকদিগের প্রতি, বালক, পৌষ ১২৯২, পৃ ৪৪৯; সংজ্ঞাবিচার, বালক, ফাল্গুন ১২৯২, পৃ ৫২৯-৩৪।

সংখ্যক রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে তিনি একটা প্রশংসনীয় উদ্যম গ্রহণ করেছিলেন। রচনাটির শিরোনাম 'রবিকাকার কবিতা' (পৃ ১২১-২২, pp 115-16); ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এটি রচিত হয়। রচনাটি নিম্নরূপ :

> অন্তরের ভাবের সহিত [ক]বিতার যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এক একজন কবির সম্পূর্ণ রচনা আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা বেশ সুন্দর বুঝা যায়। শেলী, কিট্‌স্ প্রভৃতির রচনা হইতে তাঁহাদের জীবনে ভাববিশেষের বিকাশ অথবা বিলয় অনুভব করা দুরূহ নহে। কিন্তু শেলী কিট্‌স্‌কে আমরা তেমন সম্পূর্ণরূপে জানি না— কতকটা জীবনী পাঠ করিয়া এবং কতকটা কবিতা দেখিয়া জানি মাত্র। আমার মনে হয়, তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিয়া জানার মতন কিছুতেই জানা হয় না। এমন একজন কবি, যাঁহাকে আমরা চোখে চোখে দেখি, নানা কারণে কবিতা বাদে অন্যরূপে যাঁহার প্রভাব অনুভব করিবার অবসর পাই, তাঁহার রচনা আলোচনা করিলে কবিতার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ সমধিক পরিস্ফুট হ[ই]য়া উঠে। আমাদের এ সুবিধাও বেশ আছে। রবিকাকার কবিতা এবং ব্যক্তি আমাদের উভয়ই প্রত্যক্ষ। আমরা এই দুয়ে মিলাইয়া দেখিতে পারি।
>
> আজকাল রবি[কাকার] যে সকল কবিতা বাহির হয় তাহার সহিত কিছুদিন পূর্বের কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে [আমার] যেন মনে হয় যে, দুই রবিকাকার মধ্যে মিল থাকিলেও যথেষ্ট তফাৎ হইয়াছে। শুধু কবিতা হইতে আমার এ মত খাড়া হয় নাই, রবিকাকার সমস্ত লেখার মধ্য হইতে আমার মতের [সপক্ষে অনেক] প্রমাণ পাইয়াছি। একে একে সংক্ষেপে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।
>
> ১। প্রথমতঃ রবিকাকার [লিখি]বার Style। প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীতের সহিত কড়ি ও কোমলে[র] এমন একটা তফাৎ [দে]খা যায় যে, সহসা একই কবির রচনা বলিয়া ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। সঙ্গীতে একটা [ছুটন্ত ভাব]। Styleও ছুটন্ত। তাহার মধ্যে একটা নূতন জীবনের প্রবল বিকাশ [অনুভব হয়। কড়ি ও কোমলে] ভাব যেন কেন্দ্রীভূত। Styleও ধীর। সঙ্গীতে আমার মনে হয় [একটা বাধাবি]ঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইবার ভাব— তাহার মধ্যে [···] -নের প্রাবল্য আছে। ইদানীংকার রচনায় গঠন-ভাব যথেষ্ট পরিস্ফুট। সঙ্গীত এবং 'কড়ি ও কোমলে'র ছন্দ তুলনা করিয়া দেখিলেও আমার [পক্ষে বো]ধ করি যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
>
> ২। রবিকাকার আজকালকার লেখায় একটা সংযত উচ্ছ্বাস অনুভব হয়। মনে হয়, তাহার মধ্যে লেখকের একটা সমালোচনা আছে। প্রথম কবিতাগুলিতে [যে]মন উষার [ভাব] প্রবল, আজকাল তেমনি সন্ধ্যার। অর্থাৎ সেগুলি বিস্তৃতিপ্রধান— অন্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়া বাহিরে যাইতে চায়। কবিতা গিয়া যেন প্রকৃতিতে মিশিয়াছে। এখনকার কবিতায় মনে হয় যেন বাহির অন্তরে আসিয়া ফুটিয়াছে। প্রথমে অন্তর বাহিরে প্রকৃতিতে গিয়া তাহার তাপে বিকশিয়া উঠিত। এখন প্রকৃতি অন্তরের তাপে ফুটিয়া উঠে।
>
> ৩। আধুনিক লেখায় একটা গঠিত মত এবং বিশেষ পুরুষভাব। আরও তাহার মধ্যে একটা প্রণালীবদ্ধ কিছু আছে। এবং বোধ করি সেইজন্যই সংসারের ভিতর এবং বাহিরের সেখানে যেন একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। পূর্বের কবিতাগুলি সবশুদ্ধ যেন অনেকটা একদিক ছাড়িয়া। জানি না,

আজকাল রবিকাকার নাটক বাহির হওয়ার সহিত এ সামঞ্জস্যের কোনও যোগ আছে কি না। কিন্তু আমি নিজে যেন একটা যোগ অনুভব করি।

৪। সমস্ত লেখা দেখিয়া আমার মনে হয়, কিছুদিন পূর্বে রবিকাকা সমাজের ছিলেন, এখন সমাজও কতকটা রবিকাকার। এইটাই সন্ধ্যারও ভাব। উষা জগতের। জগৎ সন্ধ্যার।

এ বিষয়ে আর অধিক বলা চলে না। যাহা বলিলাম তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক কি না কে জানে। তবে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই এত কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি সকল বইগুলি ভাল করিয়া দেখি নাই। এখন তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইল। এ খাতায় অন্যান্য অনেক লিখিবার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর ৯০। ব. ন. ঠ.

৪

পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকের রচনা-সংখ্যার ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নি। ১০৫ সংখ্যক রচনা (সহজ জ্ঞান ও সহজ নীতি, পৃ ১২৪-২৫, pp 118-19) পর্যন্ত ক্রমিক রচনা-সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে, তারপর আরও লেখা থাকলেও ধারাবাহিক রচনা-সংখ্যাটি আর প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু এর পর ধারাবাহিক রচনা-সংখ্যার চিহ্ন-বর্ণিত একটি বলেন্দ্র-রচনার সন্ধান পাওয়া যায় এই পাণ্ডুলিপির ১৪০ পৃষ্ঠায় (p 134)। রচনাটি শিরোনামহীন, রচনার শেষে লেখকের নাম বা রচনাকাল দেওয়া হয় নি; কেবল হস্তাক্ষর থেকে বোঝা যায় এটি বলেন্দ্রনাথের। এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনা রবীন্দ্রনাথের, রচনাকাল যথাক্রমে ৬ এপ্রিল ১৮৯১ এবং ৫ আগস্ট ১৮৯১ ; এবং এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোনো তৃতীয় ব্যক্তির লেখা নেই। অতএব বলা যেতে পারে যে ১৮৯১ সালের ৬ এপ্রিল থেকে ৫ আগস্টের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে প্রাগুক্ত বলেন্দ্র-রচনাটি লিখিত হয়েছিল। যা হোক, রচনাটি নিম্নে পরিবেশিত হল :

জলাভূমিতে যাদের বাস তাদের প্রকৃতি আমার বোধ হয় সাধারণতঃ একটু 'জোলো' রকমের হ'য়ে পড়ে। চরিত্রে কিম্বা স্বভাবে তেমন একটা নিরেট solid কিছু থাকে না। এমন অবিশ্যি বলা যায় না যে, জলাভূমির অধিবাসী হ'লেই তাদের কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র দৃঢ়তা থাক্‌বে না, মনুষ্যত্ব থেকে তারা বঞ্চিত হবে, কিন্তু মোটামুটি একটা মনে হয়, যেন তাদের নিরেটত্ব একটু ক'মে আসে। এইজন্য বাঙ্গালী জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আমার মনে একএকবার ভয়ানক নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। এইরকম একটা নৈরাশ্যের অবস্থায় আমি একবার জলধর্মের সঙ্গে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির কতকগুলো মিল বের করেছিলুম। একটু একটু যা' মনে আছে এইখেনে লিখে রাখ্‌লুম।

১ম। জলের ধর্ম তরলতা। অর্থাৎ solid জিনিষের মতন তার নিজের একটা কঠিন গঠন নেই। পরমাণুগুলো পরস্পরের সঙ্গে বেশ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন নয়। এইজন্যে ইচ্ছে অনুসারে solid জিনিষের চাপে তার বিভিন্ন গঠন [দে]খা যায়।

আমাদের প্রকৃতিও তরল। যে দিকে যেরকম ভাবে বেঁকিয়ে দাও একরকম থেকে যায়। আঁটসাট্ বড় নেই— [শি]থিলরকম সরল একটা ভাব। কোনোরকম কেবল জীবনযাত্রা নির্বাহ করা মাত্র।

সমাজবন্ধনও আমাদের সেরকম দৃঢ় নয়। সমস্ত সমাজের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির বড় একটা যোগ নেই। কতকগুলো ব্যক্তিসমষ্টি এক জায়[গায়] জড় হয়েছে। দু'দশজন স'রে গেলেও বড় টের পাওয়া যায় না, না স'রে গেলেও কিছু মনে হয় না।

২য়। জল যেমন smoothly ব'হে যায় আমাদের জীবনও তেমনি নির্বিরোধে কোনো গতিকে ব'হে চলেছে। বাধা পেলেই থেমে যায়। তবে উঁচু জমি থেকে বেগে নেমে এলে একটু তোড় হয়— এমনকি বাধা অতিক্রম ক'রে ফেলে। ইংলণ্ডের উঁচু জমি থেকে নেমে এলে আমাদেরও তোড় হয়। উঁচু জমিতে প্রতিষ্ঠা না পেলেই আমরা মাটী।

৩য়। জলের ধর্ম উচ্ছ্বাস। চৈতন্যের আমলে বাঙ্গালী জাতের মধ্যে একবার এই উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন ধ'রে এ ভাব থাকে না। জলেরও ত উচ্ছ্বাস দীর্ঘ কাল থাকে না। বায়ু কিম্বা অন্য একটা কিছুর প্রভাবে[র] উপর নির্ভরও করে।

পাণ্ডুলিপি-খাতায় অন্যান্য প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ

পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকের ৭ সংখ্যক রচনার শিরোনাম 'রবিকাকার সন্তান'। এই মূল রচনার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি মন্তব্য যুক্ত বলে উল্লিখিত প্রথম রচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল আলোচনার সুবিধার্থে: 'Nov. 1888 / রবিকাকার একটী মান্যবান ও সৌভাগ্যবান পুত্র হইবে কন্যা হইবে না। সে রবিকাকার মত তেমন হাস্যরসপ্রিয় হইবে না রবিকাকার অপেক্ষা গম্ভীর হইবে। সে সমাজের কার্য্যে ঘুরিবার অপেক্ষা দূরে দূরে একাকী অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবে / প্রথম পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে[৩০] লিখিত শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ইত্যাদি। এর পরবর্তী ৮ সংখ্যক রচনার নাম 'যুদ্ধ', লেখক S. P. G. বা সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এই ৭ ও ৮ সংখ্যক রচনার মধ্যে যেটুকু জায়গা ফাঁকা ছিল সেখানেই পরবর্তী কালে বলেন্দ্রনাথ ঐ ৭ সংখ্যক রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। আবার ৭ সংখ্যক রচনা ও বলেন্দ্র-মন্তব্যের মধ্যবর্তী স্থলে একটা তারিখ পাওয়া যায়— 'March 1890'। যা হোক বলেন্দ্রনাথের মন্তব্যটি এইরূপ:

> হিন্দা, [তোমার] ভবিষ্যদ্বাণী ত এখন চাক্ষুষ—। প্রকৃতিটা গম্ভীর যা' [···] তা' অস্বীকার করবার যো নেই। তবে কিনা সামাজিক জীব না হ'য়ে খোকা যে আরণ্যক ঋষি হবে তা'ও [···] মনে হয় না। আর গম্ভীর হয়েছে ব'লে যে হাস্‌বে না তা নয়। রবিকাকারও প্রকৃতি আসলে যদি [ধর গম্ভী]র। গম্ভীর এবং গোম্‌ষায় তফাৎ আছে। হাস্‌লেই যে গাম্ভীর্য্য মারা যায় এমনও বোধ হয় না। আসল কথা, গভীরতা, সেটা আবশ্যক — হাসি মানে সারাক্ষণ দাঁত বের ক'রে থাকা না।
>
> B. T.

এই মন্তব্যের মার্জিনে অপর একজন লিখেছেন, 'বোল্‌দা, এক হিসেবে হিন্দা ঠিক বলেছেন। খোকা যোগ করুক আর না করুক যথেষ্ট গোলযোগ করছে। March 1890' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের যে সন্তানের জন্মের পূর্বে তার সম্বন্ধে হিতেন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেই রথীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালের

৩০ কাটাপাঠ—'বির্জীতলায়'; তোলা পাঠে—'প্রথম পার্ক ষ্ট্রীটের'।

স্মৃতিচারণায় মার্জিনের এই ছোট্ট মন্তব্যকারীরূপে সরলা দেবীচৌধুরানীর নামোল্লেখ করেছেন ;[৩১] বস্তুত পাণ্ডুলিপির বর্তমান অংশে কারও কোনো নামোল্লেখ বা স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। তাছাড়া একটি তারিখ দুবার উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে বলেন্দ্রনাথ উপরোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এবং হিতেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যে মার্জিনের মন্তব্যকারী তা বোঝা যায় 'বোল্‌দা' ও 'হিদ্দা' শব্দদুটি দেখে। সে যা হোক, উপরের অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের মন্তব্যের পরে পাওয়া যায় সত্যপ্রসাদ-লিখিত ৮ সংখ্যক রচনা 'যুদ্ধ'। এই রচনাটির শেষে যে অলিখিত অংশ ছিল তাতেই পরবর্তী কালে বলেন্দ্রনাথ পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে চলেছিলেন। এবারে এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যটুকু উদ্ধার করা যায় :

> খোকা বেচারা যোগই করুক্ আর গোলযোগই করুক, জন্মাবার আগে থেকে তার উপর যেরকম সমালোচনা চলেছে তা'তে তার পক্ষে কতদূর সুবিধের বল্‌তে পারিনে। বড় হ'লে সে বেচারীর না জানি আরও কত সইতে হবে। কিন্তু তখন হয়ত প্রতিবাদ করতে শিখবে—এরকম নীরবে সহ্য করবে না। রাম না হ'তে যে, রামায়ণ হয়েছিল সে বিষয়ে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস দেখ্‌বার আবশ্যক নেই—হাতে কলমে প্রমাণ এইখেনেই। B. T.

পাণ্ডুলিপির ঐ একই পাতায় এর পরেও ছোট্ট আর-একটু মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, এবারের লেখক পূর্বেকার সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি অথবা গুরুজন স্থানীয় অপর কেউ। রথীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই বিতর্ক তিনি আগাগোড়া অনুসরণ করে বলেছেন, 'আজকালকার ছেলেদের মান কত। আমাদের কালের ছেলেদের Biography মরবার পর লেখা [হ'ত এখন হয়] জন্মাবার আগে।' বলা প্রয়োজন যে এই সর্বশেষ মন্তব্যটি রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মন্তব্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে ; এবং *On the Edges of Time* গ্রন্থে ইতিপূর্বে কেবলমাত্র হিতেন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ও বলেন্দ্রনাথের প্রথম মন্তব্যের ভাবানুবাদ ব্যতীত সরলার মন্তব্য বা বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মন্তব্য প্রভৃতি কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নি।

বর্তমান পাণ্ডুলিপির ৯৯ সংখ্যক রচনার শিরোনাম 'Hints to Dramatists' ; লেখক-নাম দেওয়া হয় নি, রচনার কাল ১৮৯০ সালের মার্চ মাস। এর মধ্যে বলা হয়েছে, 'আজকাল আর নাটক লেখবার ভাবনা রইল না। Plot-টা বেশ ঘনিয়ে এনে যাদের বেঁচে থাকাটা সুবিধে বোধ হবে না তাদের influenza কিম্বা suppressed বসন্ত দিয়ে মেরে ফেল্‌লেই ল্যাটা চুকে যাবে। ভরসা করি আমার এই hints পাবার পর কলিকাতা সহরে dramatists-এর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। অলমিতি বিস্তরেণ। মার্চ ১৮৯০' ইত্যাদি। এর পরবর্তী রচনার সংখ্যা ১০০, লেখক বলেন্দ্রনাথ ; ঐ ৯৯ সংখ্যক রচনার প্রসঙ্গেই বলেন্দ্রনাথের বর্তমান মন্তব্যটি লিখিত হয়। এটি নিম্নরূপ :

> ঠিক বলেছ। কিন্তু নাটকের চেয়ে নভেল লেখ্‌বারই এতে বেশী সুবিধে। মনে কর, যখন দুইটী দীর্ঘনিশ্বাসময় বাধাপ্রাপ্ত প্রণয়স্রোত দু'জনকার শূন্য হৃদয়-গুহা হ'তে প্রবল বেগে গড়িয়ে এসে কোনও প্রকারে মেশ্‌বার সুবিধে পায়, আর পাদ্রীসাহেবের অদৃষ্ট[৩২] সেই দুটী শূন্য হৃদয় পূর্ণ করবার

৩১ পিতৃস্মৃতি, পৃ ৩ ; দ্র° বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ ২৮৪-৮৫।
৩২ তোলা পাঠে 'পাদ্রীসাহেবের অদৃষ্টে'।

অবসর জোটে, এমন সময়ে[৩৩] influenza-র খবর। কোথায় ডিংডাং ঘণ্টাধ্বনি, পাত্রীর প্রফুল্ল মুখশ্রী, কন্যাকর্তা বরকর্তাদের আনন্দ আহ্লাদ, আর কোথায় গিয়ে influenza— মৃত্যু— etc etc! নভেলের বেশী সুবিধে নয়?

উপরের মন্তব্যের অন্তর্গত 'ঠিক বলেছ' বা 'মনে কর' প্রভৃতি বাক্য বা বাক্যাংশ পাঠকালে মনে হয় প্রাগুক্ত ৯৯ সংখ্যক রচনাটি বলেন্দ্রনাথের কোনো সমবয়সী বা অনুজের রচনা। বর্তমান বলেন্দ্র-রচনাটি ১৮৯০ সালের ২৪ মার্চের মধ্যে লিখিত হয়েছিল কারণ এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনার নির্মাণকাল যথাক্রমে 'মার্চ ১৮৯০' (৯৯ সংখ্যক) এবং '২৪।৩।৯০' (১০১ সংখ্যক)।

পারিবারিক স্মৃতি-লিপি পুস্তকের ১২৭ থেকে ১৩২ পৃষ্ঠায় (pp 121-126) একটি কবিতা আছে; এর শিরোনাম 'দ্বিজের আশীর্বাদ', লেখক সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথ। কবিতাটি S. P. G. বা সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে রচিত হয়েছিল বোধ হয়। যা হোক, সম্পূর্ণ কবিতাটি বর্তমান পাণ্ডুলিপি-খাতায় কপি করেছেন বলেন্দ্রনাথ, কারণ হস্তাক্ষর দ্বিজেন্দ্রনাথের নয় এবং তা প্রকৃত পক্ষে বলেন্দ্রনাথেরই। পাণ্ডুলিপির অপর একটি স্থলে বলেন্দ্র-প্রসঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। খাতার ১৩৩ পৃষ্ঠায় (p 127) 'নূতন pump-shoe-র প্রতি' শীর্ষক যে কবিতা রয়েছে সেটিও সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা। এই কবিতায় ব্যবহৃত কোনো একটি শব্দ সম্পর্কে ডান দিকে মার্জিনে বলেন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত যে মন্তব্যটুকু পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

পশুপতি শাশমল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮৭০-১৯২৫

প্রতি যুগেরই নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকে। বিশেষ বিশেষ রাজনীতিক পরিবেশে এবং অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ পরম্পরায় এগুলি তৈরী হয়, জনমনস্তত্ত্ব আবর্তিতও হয় এদের বেষ্টন ক'রে, যদিও স্পষ্ট বা পরিচ্ছন্ন রূপে তা ব্যক্ত করতে পারেন না তাঁরা। যেসব নায়ক ও লেখক এই জনমনের গুহাস্থিত বক্তব্যকে সর্বোত্তম রূপে ভাষা দেন তাঁরাই হন অগ্রনেতা হিসাবে সম্মানিত। চিত্তরঞ্জন আমাদের যুগে তেমনি একজন নেতা। স্বদেশী আন্দোলন এবং তার পরবর্তী পরিণতি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ফলের দিক থেকে ব্যর্থ হলে, বিদেশী শাসকরা যখন কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করলেন এবং শাসন-সংস্কারের নামে কিছু সংখ্যক অপ্রধান মন্ত্রী-দপ্তর নরমপন্থী জাতীয়-নেতাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে আন্দোলনের ধার ভোঁতা করতে উদ্যত হলেন, তখন দেখা দিলেন গান্ধীজী। শহরের বক্তৃতামঞ্চ থেকে রাজনীতিকে তিনি গ্রামের মাটিতে নিয়ে গেলেন, চাষী কারিগর ও দেহশ্রমী মানুষদের এনে দাঁড় করালেন শিক্ষিত মানুষদের সহযাত্রী রূপে এবং আবেদন-নিবেদনেও না, হত্যা ও সন্ত্রাসের পথেও না, স্বাধীনতা-অর্জনের পথনির্দেশ করলেন তিনি অহিংস অসহযোগের পথে। এর নাম তিনি দিলেন সত্যাগ্রহ এবং এই সত্যাগ্রহের পরিপূরক রূপে প্রচার করলেন গ্রামোন্নয়ন, বিদেশী পণ্য বর্জন, সামাজিক অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কর্মসূচী।

৩৩ এর পর কাটা পাঠ 'মনে কর'।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

নূতন নেতৃত্ব ও সেই নেতার দ্বারা প্রবর্তিত নূতন রাজনীতিক দর্শন হাতে পেয়ে দেশের মানুষ আবার সজীব হয়ে উঠলেন এবং বলতে গেলে সেই প্রথম সর্বাত্মক জনজাগরণের সূচনা হল আমাদের ইতিহাসে। এর প্রভাব যে কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রূপেই বলা যেতে পারে যে সুখ্যাত কবি এবং সফলকাম আইনজীবি সি. আর. দাশ তাঁর আরাম ও ঐশ্বর্যের জীবন ছেড়ে ধ্রুতব্রত সৈনিকের জীবন স্বাগত করে নিলেন, এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজীর ছত্রচ্ছায়ায়। তার পর আপন ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি ও অদম্য কর্মশক্তির গুণে অল্পদিনেই মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালবীয়, লালা লজপত রায়, চক্রবর্তী রাজগোপালাচারিয়া প্রমুখ গণনীয়দের সঙ্গে তিনিও গান্ধীগোষ্ঠী রূপে সারা দেশে সম্মানিত হলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৌলিকতা এখানেই যে গান্ধী-অনুগামী রূপে যাত্রা আরম্ভ করলেও এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজী সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেও, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিরোধিতা করতেও কুণ্ঠিত হন নি, নিজস্ব চিন্তা ও মননের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কংগ্রেসী পরিমণ্ডলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের অভিপ্রেত নীতিকে রূপ দেবার প্রয়োজনে পৃথক দল গড়তেও দ্বিধা করেন নি। নিষ্ঠার মধ্যেই এই আত্মস্বাতন্ত্র্য, অনুবর্তিতার মধ্যেই ঔচিত্যের আদর্শটি তুলে ধরার এই পৌরুষ তাঁকে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব দিয়েছিল, আর এখানেই বোধ হয় তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

কিন্তু এদিককার প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। তার আগে চিত্তরঞ্জনের সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ১৮৭০ থেকে ১৯২৫— মাত্র পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তিনি যত কাজ করেছেন, যত বিচিত্র পথে তাঁর প্রতিভা ও সামর্থ্য নিয়োগ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এমন সর্বতোমুখী শক্তি সাধারণত দেখা যায় না। অথচ এর যে-কোনোটার উপর অখণ্ড মনোনিবেশ করলে চিত্তরঞ্জন সেখানেই নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠতার স্বাক্ষর রাখতে পারতেন। কবি ও সাহিত্যবেত্তা, শিক্ষা-সংস্কারক, সমাজসেবক, আইনবিদ, রাজনীতিক তত্ত্ব প্রবক্তা— যেদিক থেকে দেখা যায় সেখানেই তাঁর অতুলনীয় এককতা এবং অনন্য ঔজ্জ্বল্যে অবাক হতে হয়। প্রতিভার এই বহুমুখীনতাকে সংহত করেই তিনি দেশসেবক হয়েছিলেন। তাই খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর অগোচরেই এক অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মস্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরুর মধ্যেও এমনি একটা সমন্বয়িত নেতৃত্বের চেহারা আমরা দেখেছি। কিন্তু রাজনীতিক কর্মচাঞ্চল্যের দুনিয়ায় এই ধরণের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বড়-একটা হতে দেখা যায় না। আর তা যায় না বলেই একদিনের অতি-সম্বর্ধিত নামও আর-এক দিন প্রত্নতত্ত্বের নথীভুক্ত হয়ে পড়ে। প্রবহমান কালের মিছিল তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

২

চিত্তরঞ্জনের এই ভিতরকার সত্তাটি যাচাই করলে দেখি সাহিত্য সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল যা একেবারেই চলতি ধারার অনুকূল নয়। বিতর্কের, এমনকি বিরোধিতারও, হয়তো অবকাশ আছে তাঁর বেশির ভাগ বক্তব্য নিয়ে, তবু তাঁর চিন্তা ও মননশীলতার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে হবে। তিনি মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের যে অধ্যায়কে আমরা আধুনিক বলি, অর্থাৎ উনবিংশ শতক থেকে যার সূচনা, তা জন্মেছে জাতীয়-প্রবণতার মৃত্তিকাভ্রষ্ট হয়ে, একান্তভাবে বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রাণরসে পরিপুষ্ট হয়ে। এই সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— স্বাদেশিকতা, প্রকৃতি-চেতনা ও নরনারীর

সম্পর্ক নির্ণয়— তিনটিই অভারতীয় ভাবধারা এবং আদর্শের অনুগামী। কালিদাস, ভবভূতি থেকে চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ পর্যন্ত আমাদের যে সাহিত্যিক উত্তরাধিকার চলে এসেছে, তার সঙ্গে এ সাহিত্যের কোনো প্রাণগত একত্ব নেই: তা সত্ত্বেও মধুসূদন দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন চিত্তরঞ্জন। জাতীয়-জাগরণ ও লোকমঙ্গলের সহায়ক রূপে তাঁদের দানের মহত্ত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। বিরূপ মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে তার রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে, যদিও কবি হিসাবে তিনি একান্তভাবেই রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলভুক্ত। তাঁর ভাববিশ্ব, ভাষা, বিন্যাসরীতি— সর্বত্র রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু সে কথা থাক্, মূলগতভাবে এ কথা অনস্বীকার্য নয় যে, বিদেশী শিক্ষা সংস্কৃতির ঐকান্তিক অনুশীলন এবং আমাদের পুরুষানুক্রমিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অচর্চার ফলে আমাদের রুচি চিন্তা ও প্রবণতাগুলি বৈদেশিক ছাঁচেই গড়ে উঠেছে। তাই সাহিত্যে শিল্পেই হোক, আর প্রাত্যহিক জীবনচর্যাতেই হোক, আমরা পরম্পরাগত ঐতিহ্য ধরে চলি না। কিন্তু তা বোধ হয় চলেন না পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষই। ভূগোল, ভাষা ও ধর্মের সীমিত গণ্ডী পার হয়ে মানুষ সর্বদেশের মাটি এবং মন ছুঁয়েই তো মহৎ হয়েছে। কাজেই সাহিত্যের মূল্য নিরূপণে এ মাপকাঠি গ্রহণীয় হয়তো নয়। তবু শিক্ষাব্যবস্থার সামূহিক স্বাজাত্যকরণ সম্বন্ধে দেশবন্ধুর বক্তব্য নিশ্চিতই প্রণিধানযোগ্য। আমাদের জগৎচেতনা, জীবন-বোধ সত্যাসত্য ও উচিতানুচিতের মূল্যবোধ, সৌন্দর্যদৃষ্টি, মানবপ্রেম— কোনোটার মধ্যেই যদি ভারতীয়ত্ব এক ফোঁটাও না থাকে তাহলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে আমরা আপন ভাবব কেমন করে? কার্যত তা ভাবিও না আমরা, তার কারণ আমাদের পাঠ্যবস্তু ও পঠনপাঠনের ছাঁচটা ষোল আনাই অন্যের চোখ দিয়ে দেখে এবং অন্যের মন দিয়ে ভেবে তৈরি করা। সে মন ও চোখ দুইই বিদেশীদের, যাঁরা প্রভুজাতিরূপে এদেশের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের পরিপূরক রূপে শিক্ষা সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ চলতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলবে না, জাতীয়-আদর্শে উদ্বুদ্ধ নূতন ছাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় চাই বলেছিলেন চিত্তরঞ্জন এবং সে বক্তব্য তাঁর অভ্রান্ত।

শিক্ষার এই স্বাজাত্যকরণের সহায়ক রূপেই তিনি চেয়েছিলেন সমাজের আমূল রূপান্তর। ব্যক্তিগত বদান্যতার জন্যে যদিও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল, তবু চিত্তরঞ্জন এ কথা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের দানে কখনো দারিদ্র্য মোচন হয় না। দেশজোড়া দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় হল সমাজ-বিন্যাসের আমূল রূপান্তর। এক তরফে অন্যায়ভাবে যদি জাতীয়-ঐশ্বর্যের সবটাই এসে জমা হয় তাহলে অন্য তরফ বঞ্চিত না হয়ে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত সেই বঞ্চিত অংশটাই এ দেশে বৃহত্তম, তাই সারা দেশই আমাদের অনাহার ও অনুযোগ প্রপীড়িত। এই অসাম্য ভাঙতে হবে বলেছিলেন দেশবন্ধু। কিন্তু কি ভাবে? যদিও রুশবিপ্লব এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের আবির্ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিপ্রাণতা তথা বৈষ্ণবজীবনবোধ তাঁকে ঐ পথের অনুবর্তী হতে বাধা দিয়েছে। তবে ধনাধিকারীদেরও তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে সর্বগ্রাসের মনোভাব ছেড়ে বিবেকের নির্দেশ না মানলে সর্বনাশের স্রোত কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না তাঁরা। সাম্য ও সমাজতন্ত্র তিনিও চেয়েছেন, কিন্তু যা চেয়েছেন তা আসবে সদ্বুদ্ধির প্রবর্তনায় এবং এ জায়গায় ফেবিয়ানদের তথা গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর চিন্তার মিল দেখা যায়। রক্তরাঙা পথে সমাজবিপ্লবকে স্বাগত করেন নি চিত্তরঞ্জন।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে তিনি অশিক্ষার অনিবার্য কুফল বলে যথার্থ ভাবেই অভিহিত করেছেন

এবং বলেছেন যে সার্থক ও সার্বজনীন শিক্ষা যেদিন বিকিরণ হবে দেশে, সেদিন নীচের ধাপের মানুষ আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনিই উঠে এসে দাঁড়াবেন উপরের ধাপের মানুষদের পাশে। আনাগোনা, খানাপিনা ও বিয়ে-থাওয়া আসবে পরের অধ্যায়ে এরই অনতিক্রম্য পরিণতি হিসাবে। লোক দেখিয়ে এক পঙক্তিতে বসে খাওয়া বা একসঙ্গে দেবার্চনা করার দ্বারা সমাজচেতনা পাল্টাবে না। ধনবণ্টন ও শিক্ষাবিকিরণে সাম্য আনা হলে তার অনুপ্রেরণায় আপনা থেকেই আসবে সামাজিক সাম্য এবং এজন্যে গলাবাজীও দরকার নেই, তলোয়ার ঘোরানোও নিরর্থক বলেছেন তিনি! আগেই বলা হয়েছে এইসব মতবাদের প্রত্যেকটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন এক্ষেত্রে বোধ হয় নিরর্থক। আমরা দেশবন্ধুর অতিখ্যাত ও বহু-আলোচিত রাজনীতিক জীবনের আড়ালে তাঁর ব্যক্তিসত্তার যে অন্যবিধ দিকগুলি রয়েছে তার মোটা কথাগুলো ছুঁয়ে এবার তাঁর সুবিদিত রূপ যেটি, যার জন্যে দেশ ও জাতি তাঁকে কোনোদিন ভুলতে পারেন না, তার আলোচনায় আসছি।

৩

আগেই বলা হয়েছে যে ১৯১৯এ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হলে যখন নরমপন্থীরা মন্ত্রীত্বের টোপ গিললেন এবং গান্ধীজী অসহযোগের আদর্শ প্রচার করে দেশকে নূতন সংগ্রামে প্রেরণা দিলেন, দেশবন্ধু রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখনি। অবশ্য আলিপুর বোমা-মামলায় অরবিন্দ-বারীন্দ্রের পক্ষ নিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি আগেই। কিন্তু তখনো তিনি ব্যবসায়িক সাফল্যের শীর্ষে এবং সেখান থেকে কোনোদিন স্বেচ্ছায় নেমে এসে তিনি দারিদ্র্যবরণ করবেন ও সেইজন্যেই মুগ্ধ দেশবাসীর কাছে পাবেন দেশবন্ধুর অভিধা, এ ভাবা অসম্ভব ছিল। সেই অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু লক্ষণীয় যে গান্ধীগোষ্ঠীর প্রধান এক জন হলেও মত ও পথ নিয়ে গান্ধীজীর প্রতিকূলতা করেছেন তিনি বরাবরই। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী তাঁর রাজনীতির কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করে অহিংস অসহযোগকে নীতি হিসাবে গ্রহণীয় বললেন। চিত্তরঞ্জন অহিংসাকে কৌশল হিসাবে গ্রাহ্য বললেও অনড় নৈতিক বিধান রূপে মানতে চাইলেন না। তা ছাড়া দেশ তখনি সরাসরি সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত কি না তা নিয়েও সন্দেহ ছিল তাঁর। বলা দরকার যে এর পরেই হল তাঁর কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর নিজস্ব মতে অবিচল থাকলেন এবং পর বৎসর আমেদাবাদ কংগ্রেসে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রকাশ করলেন। আন্দোলন শুরু হল বারদৌলিতে, কিন্তু তা অহিংস থাকল না। উত্তেজিত জনতা চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে বসল এবং ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। দেশ জুড়ে নামল নৈরাশ্য।

বোঝা গেল চিত্তরঞ্জনই ঠিক বলেছেন, দেশ তৈরি হয় নি তখনো। এর পরেই কারামুক্ত হয়ে দেশবন্ধু রচনা করলেন এক নূতন কর্মসূচী। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে তিনি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সদস্য হয়ে প্রবেশ করার এবং ভিতর থেকে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে শাসনযন্ত্র বিকল করে দেওয়ার আদর্শ। অসহযোগবাদী গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা সবাই বিরুদ্ধাচরণ করলেন, কিন্তু দমিত হলেন না চিত্তরঞ্জন। মতিলাল নেহরুর সঙ্গে গড়ে তুললেন তিনি স্বরাজ্য দল এবং বিভিন্ন আইনসভা ও পৌরসভা দখল করে এই দল যথার্থই নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করল দেশে। খাস কংগ্রেসই

তখন নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার হঁ্যা-বদল ও না-বদল দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে। দূরদর্শী গান্ধীজী বুঝলেন যে চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের মত নেতাদের তফাতে রেখে দেশ অগ্রসর হতে পারবে না। নিষ্পত্তির জন্যে এগিয়ে এলেন তিনি। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে আবার হল গান্ধী-চিত্তরঞ্জনে মিলন এবং স্বরাজ্য দল অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল কংগ্রেসের মধ্যেই। এখান থেকেই দেশবন্ধু অভিষিক্ত হলেন সর্বভারতীয় নেতৃত্বে এবং লক্ষণীয় যে তাঁর সে নেতৃত্ব শুধু কংগ্রেসীরা নন, বিপ্লববাদীরাও মেনে নিলেন।

কিন্তু দেহ দ্রুত ভেঙে আসছিল তাঁর। প্রথমত অতি শ্রম ও দুশ্চিন্তায়, দ্বিতীয়ত বিলাস-ব্যসনের জীবন থেকে হঠাৎ দৈন্য ও কৃচ্ছ্রতার জীবনে নেমে আসায় তাঁর স্বাস্থ্য অপটু হয়ে পড়েছিল। তবু ১৯২৫ সালে, অর্থাৎ যে বৎসর তাঁর জীবনান্ত হয় সে বছরই, ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যে নূতনতর কর্মব্যবস্থাপনার কাঠামো তুলে ধরেন, অনেকে মনে করেন তার মধ্যে নিহিত ছিল একটা সমাধানসূত্র যা বৃটিশ সরকার মেনে নিতে সম্মত হয়েছিলেন। কি সেই সমাধানসূত্র, কি কথাবার্তা হয়েছিল তাঁর ভাইসরয় লর্ড রেডিং ও তাঁর মাধ্যমে ভারত-সচিবের সঙ্গে, তা নিয়ে অলস জল্পনায় লাভ নেই। তবে বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক (হিন্দু-মুসলমান) সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও শর্তাধীন ভাবে গোটা ভারতের ঔপনিবেশিক স্বাধিকার লাভ গোছের একটা কোনো বোঝাপড়া হয়েছিল, যা কার্যকর হলে বাইশ বছর পরে ভারতবর্ষ হয়তো বিভক্ত হত না এবং আজকের সংকট ও দুঃখ-দুর্দশাগুলোরও বেশির ভাগই ঘটত না হয়তো। কারণ ওখান থেকে সার্বিক স্বাধীনতার পথ দূরবর্তী হত না বিশেষ। কিন্তু অকালমৃত্যুই সব সম্ভাবনীয়তার উপর যবনিকা টেনে দিল, তীক্ষ্ণ সাম্প্রদায়িক বিভেদের খড়্গে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হল এবং সেই খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে হিংসার বেদীতে স্বয়ং গান্ধীজীকে জীবন দিতে হল।

আজ চিত্তরঞ্জন-জন্মশতবর্ষে তাঁর বর্ণাঢ্য ও বহুবিচিত্র জীবনের কথা যেমন মনে পড়বে সকলের, তেমনি ভাবতে হবে তিনি যা করেছেন এবং আরও যা করতে পারতেন সেই কথা। অনেকে বলেন চিত্তরঞ্জন ছিলেন রোমান্টিক জাতীয়তাবাদী এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষাই ছিল তাঁর রাজনীতিক কর্মপরিকল্পনার গোড়ার কথা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ খুবই উপর থেকে দেখা সিদ্ধান্ত। চিত্তরঞ্জন বিপ্লবী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু বিপ্লববিরোধী ছিলেন না, প্রতিবিপ্লবী তো নয়ই। অহিংসার নৈতিক ভিত্তি নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমতের কথা আমরা গোড়াতেই আলোচনা করেছি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রবক্তা রূপে তাঁর মহৎ দান হল ঐতিহাসিক প্যাক্ট বা চুক্তি, যার বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তীকালে কেউ কেউ। আসলে সমতার ভিত্তিতে সমঝোতা চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন, এ তাঁর ঔদার্য ও অবিবেচনা নয়, ভারত-বিভাগের কঠিন মূল্যে আজ আমরা নিশ্চয় তা বুঝেছি।

সব শেষে আর-একটি কথা, পূর্ব ও পশ্চিম -এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি নিয়ে তিনি যে এশীয় রাষ্ট্রজোটের কাঠামো রচনার প্রস্তাব করেছিলেন তা কার্যকর হত যদি, তাহলে সমগ্র প্রাচ্য রাজনীতির ছাঁদই শুধু বদলে যেত না, নিখিল এশিয়ার সংহত শক্তি পারস্পরিক সহযোগিতায় বেড়ে উঠত এবং পদে পদে পশ্চিমী দুনিয়ার মুখাপেক্ষী না হয়েও প্রত্যেক দেশ মহত্ত্বে উন্নীত হত। কিন্তু সমসাময়িকরা এই পরিকল্পনাকে কোনো গুরুত্বই দেন নি সেদিন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

VISVA BHARATI
SANTINIKETAN INDIA

১লা জুলাই
১৯২৫

আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনও বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্ত্তব্য-পালনের উপদেশমাত্র নহে; তাহা সেই সৃষ্টিশক্তি-শালী মহাতপস্যা যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব

শান্তিদেব ঘোষ

শতাধিকবর্ষ পূর্বে বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গ হিন্দী গান, তার রাগরাগিণী ও তালের বিস্তারিত আলোচনামূলক বই প্রথম রচিত হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলি ভালো করে আলোচনা করলে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের রাগরাগিণী ও তালের প্রচলিত নিয়ম কি ছিল তা জানতে কোনো অসুবিধা হয় না। বেশ বোঝা যায় যে, সে যুগের সংগীতের সঙ্গে এ যুগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব নিয়ে আলোচনার আগে বাংলাদেশের উনবিংশ শতকের ঠুংরির গান বলতে কি বোঝাত এবং বর্তমানে তার কি পরিবর্তন ঘটেছে এইসব বইয়ের সাহায্যে তা না জানলে তার সঠিক বিচার করা সহজ হবে না।

আগেকার দিনের ঠুংরি গানের বিষয়ে জানা যায় যে, ঠুংরি নামে একটি তাল তখন খুবই প্রচলিত ছিল। এবং তখনকার দিনের সংগীত-রসিকদের কাছে এই তালটি সুপরিচিত ছিল বলেই সব বইয়ে ঠুংরি তালের আলোচনা যথাযথ স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রামাণ্য সংগীতের বইগুলিতে সে যুগের ঠুংরির পরিচয় যা পাই তারই কিছু নমুনা এখানে প্রথম তুলে দিই।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাগকল্পদ্রুম' নামে বহুশত হিন্দী ও অন্যান্য গানের সংগ্রহ-পুস্তকে নানা রাগরাগিণীযুক্ত ঠুংরি তালের বহু গান পাওয়া যায়। কিন্তু এই বইটিতে ঠুংরি গান বা ঠুংরি তালের উপপত্তিক কোনো বিশ্লেষণ নেই।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠুংরির পরিচয় প্রথম প্রকাশ করে বললেন, "ঠুংরি অতিক্ষুদ্র রাগে এবং ক্ষুদ্রতালে রচিত হইয়া থাকে, ইহার সুপরিপাট্য এমন মধুর যে, অতি শীঘ্রই লোকের চিত্ত হরণ করে।"

ঠুংরি তালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "ঠুংরি চারি মাত্রার তাল, ইহাতে একটি তাল এবং একটি শূন্য থাকে। ঠেকা যথা—

+		০	
।	।	।	।
ধা দ্ধা	গে দিন্	তা দ্ধা	গে ধিন্।"

দুই মাত্রার ভাগে মোট চারটি মাত্রার তাল রূপে দেখানো হয়েছে। প্রথম মাত্রায় সম্ এবং তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক। ক্ষেত্রমোহনবাবু আরও বললেন, "টপ্পা নানাপ্রকার। তন্মধ্যে ঠুংরি, গজল, রেক্তা, রুবাই, সোহেলা, হোরি, জিগর ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ।"

এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, সে যুগে ঠুংরিকে টপ্পারই একটি শাখা রূপে মনে করা হত।

বাংলার প্রখ্যাত সংগীত-তত্ত্ববিদ্ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে ঠুংরি বিষয়ে বলছেন,

"যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং অদ্ধাকাওয়ালী ও ঠুংরি তালে গীত হয় তাহাকে ঠুংরি গান কহে। কাপ্তান উইলার্ড সাহেব, ঠুংরি নামক পৃথক রাগ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"হিন্দুস্থানে ঠুংরি নামে একজাতীয় গান প্রচলিত আছে; তাহা নানাবিধ রাগে গীত হইয়া থাকে।

লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুংরি গানের অতিশয় আদর হয়,…অনেকের বিশ্বাস যে, শোরী, ঠুংরি রাগের না হউক, ঠুংরি গান প্রণালীর উদ্ভাবক।…এরূপ বিশ্বাস হয় যে, শোরীর টপ্পা আরও সংক্ষেপ করিয়া লওয়াতে, তাহা হইতে ঠুংরি গানের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের তরফাওয়ালী গায়িকারা ঠুংরি গান সর্বদা গাইয়া থাকে; এইজন্য কলাবৎ ওস্তাদেরা ঠুংরি গানকে অতিশয় ঘৃণা করেন।… ঠুংরি গানের স্বর পর্যালোচনা করিলে, ইহার দুইটি সৌন্দর্য দেখা যায়:—একটি গাইবার রীতি, অপরটি বিচিত্রতা।… ঠুংরি স্বরে বিচিত্রতার তাৎপর্য এই যে, ইহার কলেবর যেরূপ সংক্ষেপ, তাহার তুলনায় ইহাতে বিচিত্রতা অধিক। সেই বিচিত্রতাকে চলতি কথায় 'জঙ্গলা' বলে, অর্থাৎ এক গানের একই কলিতে দুই-তিন রাগের সংযোগ। এইরূপ আশ্চর্য কৌশলে ঐ যোগ সম্পাদিত হয় যে, তজ্জন্য উহা অসংগত শুনায় না। …সংগীতানভিজ্ঞ লোকে উহার কান্ স্থানে কোন্ রাগ লাগিতেছে, তাহা কখনই বুঝিতে পারেন না,…

"ঠুংরি গানের কয়েক প্রকার ভেদ আছে, যথা—খেমটা, কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি। খেমটা, ভরওঙ্গা, কাহারবা প্রভৃতি তালে ঐ সকল গান গীত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই উহাদের ঐ প্রকার নাম হইয়াছে।"

যদিও ঠুংরি নামে কোনো প্রকার রাগ বা রাগিণীর কথা এ যুগে আমরা শুনিনা কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কাপ্তান উইলিয়ার্ড সাহেব ঐ নামের একটি রাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সে যুগের শেষার্ধের সংগীতগুণী দক্ষিণারঞ্জন সেন তাঁর একটি বইতে ঠুংরি রাগের একটি বাংলা গান স্বর সমেত ছাপিয়েছিলেন। এই রাগের বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, "ঠুংরী এক জাতীয় গীত। ইহাতে দুই বা ততোধিক রাগের সমাবেশ দেখা যায়। এই প্রকার গীতের রাগিণীকে ঠুংরি রাগিণী কহে।" দক্ষিণাবাবুর প্রকাশিত গানটি হল—

ঠুংরি-আদ্ধা

৩ ০ ১ +
সা পা । মা পা -া -া । পা র্সা -া ণধা । পা -া -া মা । গা -া -া -া ।
সা ধের প্রে মে ০ ০ ০ না ০ পূ রি ০ ০ ল সা ০ ০ ০

৩ ০ ১ +
। -সা -গা -মা -পা । মা -া জ্ঞা জ্ঞা । সা -া রা ণ্া । সা -া -া -া ।
০ ০ ০ ০ ধ ০ এ কি রে ০ ০ বি ষা ০ ০ ০

৩ ০ ১ +
। সা -া মা পা । না -া -া না । র্সা র্সা -া -া । না -া র্সা -া ।
দ ০ অ প রা ০ ০ ধি নি র ০ ০ ব ০ ধি ০

ঠুংরি তাল বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণধনবাবু লিখছেন—

"এই তাল কাওয়ালীর প্রকারভেদ মাত্র, অর্থাৎ ইহাতেও চারিটি হ্রস্বমাত্রা অন্তর প্রস্বর্ণ ও তালি পড়ে।…যে চতুর্মাত্রিক তালের গানের অক্ষর সকল বারম্বার এরূপে লঘু গুরু হয়, যাহাতে প্রত্যেক চারি মাত্রা অন্তরে স্বভাবত প্রবল রূপে প্রস্বন দিতে ইচ্ছা হয়… সেই ঠেকায় সমধিক প্রস্বন বিশিষ্ট যে

বোল ব্যবহার হইয়াছে, তাহারই নাম ঠুংরি। উল্লিখিত কোনো ছন্দের ন্যায় গানের গতি হইলেই, তাহা ঠুংরি তালের অন্তর্গত,...ঠুংরিতে সকল প্রস্বনই বলবৎ হওয়াতে মনে হয় যেন সম শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতেছে, এইজন্য ঠুংরিতে এক তালির পরই, অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বিতীয় তালিতেই সম হয়। অতএব দুই তালিতেই ইহার ঠেকার ছন্দ পূর্ণ হওয়াতে ইহা কাওয়ালীর অর্ধ হইয়াছে।...ঠেকা যথা—

+ ২
। ধা ধা কেটে তাক্ । নে ধা কেটে তাক্ ।

"ঐ প্রথম ধা-এর উপরই সম। এই তালের সকল স্থান হইতেই গানারম্ভ হইতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত লক্ষ্মৌ ঠুংরির উর্দু গানটির ছন্দ—

+ ২ + ২
দি ল । খুঁ ০ শু দা । লগ্ ০ যো গ ঃ যা ০ হৈ মে । রা ০

"যদি ঠুংরির গানের প্রত্যেক কলির প্রস্বন-সংখ্যা ৪-এর বিভাজ্য হয় তবে তিন তালি এক ফাঁক অনুসারে তাহাতে কাওয়ালীর ঠেকা দেওয়া যায়। ঠুংরি-তালীয় অনেক গানের আস্থায়ীতে এরূপ দৃষ্ট হয় যে সমের প্রস্বনকে প্রবল করণার্থ তাহার পূর্ববর্তী প্রস্বনের উপর কোনো বর্ণ থাকে না। যথা—

২ + ২ +
। ০ ঘ ০ রে I রৈ ০ তে ০ । ০ না ০ দি I লে ০ ০ ০ ।

২ + ২ +
হিন্দী। ০ কো ০ হি I ন ০ হি ০ । ০ আ ০ প I না ০ ০ ০ ।"

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত দুটি ঠুংরি তালের উর্দু গানের নমুনা পুরোনো বই থেকে স্বরলিপিসহ তুলে দিচ্ছি। প্রথমটি স্বয়ং নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ কলকাতায় বন্দী থাকা কালে রচনা করেছিলেন বলে কথিত। দ্বিতীয়টি রচনা করেছিলেন 'সরসার' নামে লক্ষ্মৌর একজন খ্যাতনামা টপ্পা-গায়ক। শোনা যায় ইনি গান-রচনায় 'শোরী' ও 'হম্‌দম্'-এর ন্যায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১ **খাম্বাজ-ঠুংরি**

যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী,
কহুঁ হাল আদম্ পর ক্যা গুজরী ॥
আদম্ গুজরী, সদমো গুজরী,
যব হম্ গুজরে, দুনিয়া গুজরী ॥

+ ২ + ২
রা গা I সা -রা সা মা । গা -া গা গা I মা -া মা ধা । পা -া মা গা I
য ব ছো ০ ড় চ লে ০ ল খ্ নৌ ০ ন গ রী ০ ০ কহুঁ

+ ২ + ২
I মা -া পা পা । পা ধা র্সা ণা I ধা -া পা মা । গা -া র্রা গা I
হা ০ ল আ দ ম্ প র ক্যা ০ গু জ রী ০ "য ব"

+ ২ + ১
মা গা I মা -া ধা ধা । ধা -া ধা ধা I ণণা র্রসা ণাধা । পা -া মা গা I
আ দ ম্ ০ গু জ রী ০ স দ্ মা ০ ০ ০ গু জ রী ০ য ব

+ ২ + ২
I মা -া পা পা । পা ধা র্সা ণা I ধা -া পা মা । গা -া রা গা I
হ ম্ গু জ রে ০ তু নি য়া ০ গু জ রী ০ "য ব"

২ খাম্বাজ-ঠুংরি

ভলা নিমক্ হরাম্‌নে মুলুক ডুবায়া
হজরত জাতে হেঁ লণ্ডন কো।
মহল মহল মে বেগম রোয়েঁ
গলি গলি রোয়ে পাতুরিয়া॥

+ ০ + ০
মা গা I মা ধা ধা ধা । ধা ণা র্সা -া I ধা র্সা -া ণা । ধা -া পা -া I
ভ লা নি ম ক হ রা ম্ নে ০ মু লু ক্ ডু বা ০ য়া ০

+ ০ + ০
I পা ধা মা পা । মা গা রা গা I মা -া ণা -া । ধা -া মা গা I
হ জ্ র ত্ জা • তে হৈঁ ল ন্ ড ন্ কো • 'ভ লা'

+ ০ + ০
-া -া I মা মা মা ধা । ধা ধা না -া I র্সা -া না -া । র্সা -া র্সা -া I
০ ০ ম হ ল ম হ ল মে ০ বে ০ গ ম্ রো ০ য়েঁ ০

+ ০ + ০
I ধা ধণা র্সা ণা । ধা -পা মা গা I মা -া ধা পা । ধা -া মা গা I
গ লি ০ গ লি রো ০ য়ে ০ পা ০ তু রি য়া ০ 'ভ লা'

প্রথম গানটিতে ঠুংরি মোট আট মাত্রার তাল। এ গানের স্বরলিপিকার প্রথম মাত্রায় সম ও পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক না দিয়ে তালি দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় গানের স্বরলিপিকারও ঠুংরি তালকে মোট আট মাত্রার সমষ্টি বলেছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথম মাত্রায় সম ও পঞ্চম মাত্রায় খালি চিহ্নিত করেছেন।

'সচিত্র বিশ্বসংগীত' নামে একটি বইয়ের লেখক বলছেন, "ঠুংরি একপ্রকার তালের নাম। যে সকল টপ্পা ঠুংরি তালে গীত হয়, তাহাদিগকে সচরাচর ঠুংরি বলা যায়। এতদ্ব্যতীত ঠুংরি আদ্ধাকাওয়ালীতে গীত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানের তরফাওয়ালীরা এই গান গাহিয়া থাকে; এজন্য কলাবৎ ওস্তাদগণ ইহা পসন্দ করেন না। ঠুংরির এক বিচিত্র গুণ এই যে, ইহার এক কলিতে দুই তিন রাগিণীর সংযোগ লক্ষিত হয়, সেই সংযোগকে 'জঙ্গলা' বলে।

"ঠুংরি চারি মাত্রার তাল। ইহাতে একটি তাল এবং একটি শূন্য থাকে। ঠেকা যথা—

+ ০
ধা ন্ধা গে দিন তা ন্ধা গে দিন।"

এই বইটিতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মতানুসারেই আলোচনা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

নানাপ্রকার সংগীতগ্রন্থ-প্রণেতা ও ভারতীয় ঐকতান সংগীতের প্রসিদ্ধ প্রচারক দক্ষিণাচরণ সেন ঠুংরি রাগের গান ও তাল নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা হল—

"ইহা আট মাত্রার তাল, এবং চারি মাত্রা বিশিষ্ট দুইটি পদে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ স্থলে পদের প্রথমে একটি দীর্ঘ বর্ণ ও পরে দুইটি হ্রস্ব বর্ণ থাকে। ঠুংরির ছন্দ অনেকটা কাব্পার ন্যায় কিন্তু বিশেষ প্রভেদ এই যে, কাব্পার অনেকস্থলে কোনো কোনো সমের পদ হইতে প্রত্যেক চতুর্থ পদের শেষে একটি দ্বিমাত্রক বা ত্রিমাত্রক বর্ণ থাকে। কিন্তু ঠুংরিতে এইরূপ বিন্যাস প্রায় দেখা যায় না। ইহার সঙ্গতের ঠেকা যথা—

+ ১
। ধা ধা কেটে তাক্ । নে ধা কেটে তাগ্।"

ঠেকাটি অবিকল গীতসূত্রসারের ন্যায়।

লক্ষ্ণৌ ঠুংরির অনুসরণে সে যুগে বাংলা ভাষায় যে ভাবে গান রচিত হত, এবারে তার কিছু উদাহরণ তুলে দিই।

ঊনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে হিন্দুমেলার প্রয়োজনে আগ্রানিবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত জাতীয়-সঙ্গীত 'কতকাল পরে বল ভারত রে' গানটি খাম্বাজ রাগিণীতে ওয়াজিদ আলি শাহ'এর 'যব ছোড় চলি লখ্‌নৌ নগরী' গানটির অনুকরণে লক্ষ্ণৌ ঠুংরি তালে রচনা করেছিলেন। গানটির দক্ষিণাচরণ সেন-কৃত স্বরলিপি হল এই রকমের, যথা—

খাম্বাজ—ঠুংরি

সা সা I রগমপা মপা মা মা । গা -া গা গা I মা -া পা মা । পমা গরগা গা গা I
ক ত কা০০০০ ০০ ল প রে ০ ব ল ভা ০ র ত রে০ ০০০ দুঃ খ

I মা -া পা পা । পধা পধর্সা র্সা ণধা I পধপা -মপা মা মা । গা -া সা সা I
সা ০ গ র সা০ ০০০ ত রি০ পা০০ ০০ র হ বে ০ 'ক ত'

উপরোক্ত গানের ছন্দ নিয়ে আলোচনা কালে ঠুংরি তাল সম্পর্কে নতুন যে একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তা এখানে উল্লেখ করি।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে 'তোটক' নামে একটি ছন্দ আছে। বাংলা কাব্যে এই ছন্দটিকে ঊনবিংশ শতকের কবিরা অনেকেই ব্যবহার করেছেন। বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত 'তোটক' ছন্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর প্রতি পংক্তির মোট মাত্রাসংখ্যা ১৬। এর দুই চরণ বা পংক্তিতে আছে মোট ২৪টি অক্ষর সমান ভাবে এবং প্রতি ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১ ও ২৪ সংখ্যার অক্ষরের বর্ণ গুরু, বাকিগুলির বর্ণ লঘু। অর্থাৎ

প্রথম চরণ বা পংক্তির মোট ১২টি অক্ষরের প্রতি ৩, ৬, ৯ এবং ১২ অক্ষরের উপর একটি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে হয়। উনবিংশ শতকের একটি বাংলা কবিতার পংক্তি বা চরণ নিয়ে কথাটি একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করি। যেমন—

তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো।

কবিতার এই পংক্তি দুটিকে 'তোটক' ছন্দের নিয়মে বিশ্লেষণ করলে এর মাত্রা ভাগ হবে—

| | || | | | | | | | | |
তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।

অর্থাৎ, এই কবিতাটি আবৃত্তির সময়ে ছন্দের ঝোঁকগুলি পড়ছে ৩, ৬, ৯, এবং ১২ সংখ্যার 'প' 'নী' 'ভা' এবং 'লো' অক্ষর কটির উপর। 'তোটক' ছন্দে রচিত এইরূপ আরো কয়েকটি প্রাচীন বাংলা কবিতার পংক্তি উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করছি—

| | | |
১ রমণীমণি নাগর রাজকবি।
| | | |
রতিনাথ - বিনিন্দিত-চারুছবি।

| | | |
২ শর নির্ণয় দুষ্কর কার্য হবে,
| | | |
অতি অশ্রুত মর্ত্য অমর্ত্য সবে,
| | | |
যদি রক্ষহ অঙ্গুরি আত্মসনে,
| | | |
লভিবে স্থির কুন্তক শান্ত মনে।

| | | |
৩ অতিরোষ মনে রাজপুত সবে
| | | |
যবনের হয়ে বল ঘোর রবে।
| | | |
নবরক্ত ছটা তরবার পরে।
| | | |
রবিরশ্মি ভরে কত রাগ ধরে।

এই কটি কবিতার সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের রচিত বিখ্যাত

| | | |
কত কাল পরে, বল ভারত রে,
| | | |
দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে?

খাম্বাজ রাগিণী ও ঠুংরি তালের গানটির পংক্তি-দুটি আবৃত্তি করলে দেখতে পাবো যে এটি 'তোটক' ছন্দেরই বাংলা কবিতা। এর প্রতি পংক্তি ১২টি অক্ষরে সম্পূর্ণ এবং মোট ১৬টি মাত্রায় বিভক্ত। যেমন—

কত কাল পরে, বল ভারত রে,

দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে।

এই প্রসঙ্গে আমি নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ্-রচিত 'যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী' গানটির অক্ষরগুলির মাথায় মাত্রাচিহ্নের দ্বারা ছন্দটির স্বরূপ প্রকাশে চেষ্টা করছি—

যব ছোড় চলে লখ্নৌ নগরী

কহ্ হাল আদম্ পর ক্যা গুজরী।

উর্দু ভাষার এই গানটির প্রতি পংক্তি মোট ১৬টি মাত্রায় সম্পূর্ণ। আবৃত্তি-কালে বাংলা কবিতার মত ছন্দের ঝোঁক আপনা থেকেই এতে এসে যায়। 'কত কাল পরে বল ভারত রে' এবং 'যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী' গান দুটির লক্ষণীয় বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এর কথাগুলিকে যেরূপ ছন্দের ঝোঁকে গাইতে হয় তা হুবহু কবিতার ছন্দের অনুরূপ। এতে মনে হয়, এই ছন্দটির জন্যেই উত্তর-ভারতীয় সংগীতে ঠুংরি তালের উৎপত্তি হয়েছিল। সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দটি বোধহয় হিন্দী গানে ঠুংরি তালে পরিণত হয়েছে। আরও মনে হয় যে, 'তোটক' ছন্দের গানে ঠুংরি তালের ব্যবহার উত্তর-ভারতে বহু যুগ থেকেই চলে আসচে।

বিংশ শতকের গোড়ার দিককার বাংলা সংগীতগ্রন্থেও ঠুংরি বিষয়ে আগের যুগের মতামতই পাই। বিষ্ণুপুরের সংগীতগুরু রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠুংরি তালের বিষয়ে বলেছেন—

"ঠুংরি আটমাত্রার তাল, ইহাতে একটি আঘাত ও একটি শূন্য। ঠেকা যথা—

+ o
। ধা ধা কেটে তাগ্ । না ধি ধা তেরে কেটে।"

তাঁর বইতে তিনি মধ্যগতির ঠুংরি তালের একটি বাংলা গানের যে স্বরলিপি দিয়েছেন, তা হল—

রা গা I সা -রা সা মা । গা -া গা গা I মা -া মা ধা । পা -া মা গা I
স ম রে ০ না চে রে ০ কা র এ ০ র ম নী ০ না শি

I মা -া পা পা । পা ধা র্সা ণা I ধা মপধা পা মা । গা -া"
ছে ০ তি মি রে ০ তি মি র ০০০ ব র নী ০

'তোটক' ছন্দের বাংলা কবিতার অনুসরণে গানটি রচিত, এ ছাড়া সুর ছন্দ ও তালের গঠনে এ গানটি ওয়াজিদ্ আলি শা'র ঠুংরি গানটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

রামপ্রসন্নবাবু ঠুংরি তালের স্বতন্ত্র একটি হিন্দী গানেরও স্বরলিপি করেছিলেন। যেমন :—

খাম্বাজ ঠুংরি

	+					o					+					o				
I	-।	সা।	গা।	গা।	।	মা।	মা।	পা।	-।	I	-গা।	মা।	পা।	পা।	।	মপা।	ধধা।	পমা।	গগা।	I
	॰	বু	ন্দ	ন		ব	র	খে	॰		॰	আ	জু	ঘ		ন॰	॰॰	॰॰	॰॰	

	+					o					+					o				
I	-।	মপা।	মা।	ধা।	।	ধা।	ধা।	ধা।	ধা।	I	ণা।	ধা।	না।	র্সা।	।	ধর্সা।	ণধা।	পমা।	গগা।	I
	॰	চল	ত	প		ব	ন	ব	ন		স	ন	ন	ন		বো॰	॰॰	লি॰	॰॰	

রামপ্রসন্নবাবু-রচিত মৃদঙ্গ ও তবলার তালের একটি স্বতন্ত্র বই আছে। তাতে তিনি মোট পাঁচ রকমের ঠুংরি তালের উল্লেখ করেছেন। তাল-পরিচয়ে বলেছেন, "ইহা ৮টি হ্রস্ব মাত্রার তাল, ইহাতে একটি তাল ও একটি ফাঁক। ঠেকা যথা—

	+					o			
	।	।	।	।		।	।	।	।
১	ধা	ধা	কেটে	তাগ্	।	না	ধি	ধা	তেরেকিটি
	+					o			
	।	।	।	।		।	।	।	।
২	ধি	ধা	গি	তা	।	না	ধি	কিটি	তাক্।
	+					o			
	।	।	।	।		।	।	।	।
৩	ধা	ধা	ধা	তিন	।	না	ধি	ধা	তিন্।
	+					o			
	।	।	।	।		।	।	।	।
৪	ধাঃ	দ্বা	গি	তা	।	না	ধি	ধা	ত্রেকে।
	+					o			
	।	।	।	।		।	।	।	।
৫	ধা	তি	ধাগ্	তি	।	না	ধি	ধধা	তি।"

ঠুংরি গান বিষয়ে রামপ্রসন্নবাবুর মত হল, "ছেপকা, কহরবা, ঠুংরি, কবালী প্রভৃতি তেতালারই অর্ধ,··· কবালী ও ঠুংরি এই দুইটি ছন্দও একপ্রকার। হিন্দুস্থানী 'তালপদ্ধতি' নামক সংগীতগ্রন্থে দেখা যায় যে, কবাল জাতিরা উক্ত কবালী তাল ব্যবহার করে বলিয়া উহার নাম কবালী হইয়াছে, আবার ঐ

তালই লখ্‌নৌএ ঠুংরি বলিয়া প্রচলিত; সুতরাং একই তাল দেশভেদে নামভেদ হইয়াছে মাত্র। এতদ্দেশে কেহ কেহ ঠুংরিকে তেতালার ন্যায় চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই।"

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থে বলেছেন, "টপ্পার রাগিণীতে, কবালী, আদ্ধা, ঠুংরি, খেমটা, কহারবা ইত্যাদি তালে যে গান হয় তাহাকে ঠুংরি কহে।"

'বেহালাদর্পণ' পুস্তকে নবীনকৃষ্ণ হালদার ঠুংরি তালের ঠেকার উল্লেখ করে বলেছেন, "ঠুংরি চারি মাত্রা।

+	০	১	০
।	।	।	।
ধেদ্ধা	কিটী	নেদ্ধা	কিটী।"

'গীতউপক্রমণিকা'তে মণিলাল সেনশর্মা লিখেছেন, "লক্ষ্ণৌ নগরে ঠুমরি গানের সৃষ্টি হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ্ আলী শাহ প্রথমে ঠুমরি গানের সৃষ্টি করেন এবং সনদ ও কদর নামে দুইজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইহাকে নানাভাবে বিস্তৃত করেন। এই তিন জনই ঠুমরি গায়ক ও গীত-রচয়িতা ছিলেন।··· দয়াসখী, কৃপাসখী প্রভৃতি কয়েকজন সংগীতজ্ঞ উৎকৃষ্ট ঠুমরি গান রচনা করিয়া সংগীতজগতে যশস্বী হইয়াছেন।

"ঠুংরি আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। যে-সব ছন্দে চারি মাত্রার পর পর স্বাভাবিক ঝোঁক আছে তাহা ঠুংরির অন্তর্গত। ঠুংরির এক-এক পদে চার মাত্রা। ইহার ফাঁক নাই, প্রথমেই সম। ঠেকা—

	+					২				
।	ধা	ধিন্	ধা	ধিন্	।	তা	ধিন্	ধা	ধিন্।"	

'সঙ্গীতপরিক্রমা' বইটি পুরানো নয়। কিন্তু এতে সংক্ষেপে প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ঠুংরির কথা যা আছে, তা হল—

"ঠুংরি শব্দটির কেউ কেউ অর্থ করেছেন চটুল ভাবাপন্ন গান। এই নামের একটি তালও আছে এবং সম্ভবতঃ প্রথমে ঠুংরি তালে গীত গানকেই ঠুংরি বলা হত। যেমন বর্তমানে দাদ্‌রা তালে গীত ঠুংরি-শ্রেণীর একরকম গানকে বলা হয় 'দাদ্‌রা'।

"প্রধানতঃ টপ্পার তালেও খেয়াল-টপ্পার যুক্ত অলঙ্কারে ঠুংরি গান সমৃদ্ধ। মীড়, মূর্ছনা ও তান ইত্যাদি অলংকার এতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হলেও গমক ব্যবহার নেই বললেই হয়। কৃন্তন ও ছোট ছোট স্বরসমষ্টি একে বিশেষ শ্রুতিসুখকর করে। এই গানে সুরের একটি নৃত্যশীল (লাস্য) ভঙ্গির বিশেষ প্রকাশ হয়। ত্রিতাল, যৎ, আদ্ধা-কাওয়ালী, দাদ্‌রা, ঠুংরি, কাহর্বা ইত্যাদি তাল ঠুংরিতে ব্যবহৃত হয়।

"ঠুংরিতে রাগব্যাকরণ যথাযথভাবে মেনে চলা হয় না।··· ঠুংরি-গাইয়েরা রাগবহির্ভূত নানা স্বরসমষ্টি ব্যবহার করেন। ভৈরবী, পিলু, মাণ্ড, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, দেশ, বেহাগ, কাফি, বিহারী, তিলক-কামোদ, গারা ইত্যাদি রাগ ঠুংরি গানের বিশেষ উপযুক্ত।

"ঠুংরি প্রধানতঃ দু রকমের—ওস্তাদি বা ক্লাসিক্যাল ও বাইজী ঠুংরি। ওস্তাদি ঠুংরিতে বিলম্বিত তাল ও খেয়াল-টপ্পার অলংকার (embellishment) বেশি ব্যবহার হয় অর্থাৎ ওস্তাদি ঠুংরিতে মার্গ-সংগীতের প্রভাব বেশি। বাইজী ঠুংরিতে দ্রুততাল ও ছোট ছোট কর্তবের ব্যবহার বেশি ও বাইজীরা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে গানের ভাব (ভাঁও) প্রকাশ করে।

"নবাব ওয়াজেদ আলি শা ও লক্ষ্ণৌকে কেন্দ্র করেই ঠুংরি গান বেড়ে উঠেছে। কদরপিয়া, সনদ, কৃপাসখী প্রভৃতি গুণীরা ঠুংরির আদিযুগের দিকপাল। পরবর্তীযুগে মৈজুদ্দিন, ভাইয়া সাহেব ইত্যাদি গুণীরা বহু ঠুংরি গানের প্রচলন করে গেছেন।"

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ' গ্রন্থে বলেছেন—

"ঠুমরি গান কেবল নৃত্যেই প্রচলিত ছিল। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শা বাহাদুরের সংগীতের দিকে শৌখীনতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার দরবারের বিখ্যাত গায়ক 'সনদ' ও 'কদর' এই দুইজন টপ্পা গানের রাগে হালকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরের কারুকার্যের বিন্যাসে প্রেমবিষয়ক সরল কথার দ্বারা এবং সহজ তালে নৃত্যের ভঙ্গিতে যে একরকম গান তৈয়ারী করেন, তাহাকে 'ঠুম্‌রি' নামে প্রচার করা হয়।

"ঠুম্‌রি নামে যে একটি তাল আছে, তাহা আজকাল অনেক সংগীতজ্ঞ অস্বীকার করেন।… আমাদের দেশে… তালের মধ্যেও 'ঠুম্‌রি' নামে একটি তাল বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

"[ঠুম্‌রি] গান সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, এক নতুন প্রকার ছন্দের রচিত গান একদিন নাচের সঙ্গে তবলার ঠেকা এমন সুন্দর ভাবাবেগ উত্থিত হইল, যাহা সেই দিন হইতে সেই সুন্দর ঠেকাটি ঠুম্‌রি গানের একটি পৃথক ভাবে বিশেষত্বপূর্ণ তাল হইয়া ঐ শ্রেণীর গানের নামে নামকরণ হইয়া 'ঠুম্‌রি তাল' নামে প্রচলিত হইল। ইহার ছন্দের গঠনে যেসমস্ত গান আছে, তাহারা চতুর্মাত্রিক তালের কোনোটির সঙ্গেই খাপ খায় না।

"ঠুমরি তালের ব্যবহার কেবলমাত্র ঠুমরি সুরের গানেই দেখা যায়। এই তাল আটমাত্রা-বিশিষ্ট। ইহাতে একটি সমের তাল ও একটি ফাঁকতাল, মাত্র দুইটি তাল আছে। তালের ভাগ চারি মাত্রা করিয়া। ইহার ছন্দ একটু আড় ধরণের—

বাজাইবার ঠেকা—

```
  +                     o
     ।     ।    ।    ।    ।    ।    ।
। ধাঁ  ধিঁ  গি  তা । না  ধি  ধা  তেরেকেটে।
```

প্রকারান্তর

```
  +                     o
     ।    ।    ।    ।    ।    ।    ।
।       ধি   গি   তা । না   তি   নাঁ   তাঁ ।
```

'সংগীতে অবিধান' প্রণেতা অপূর্বকুমার চৌধুরী ঠুংরি তালের স্বতন্ত্র প্রকারের একটি ঠেকার কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— ৮ মাত্রা, ৩ আঘাত, ১ শূন্য, ২য় তালে সম। ঠেকা—

```
   ।
   ২          ৩          ০          ১
   ।    ।    ।    ।    ।    ।    ।    ।
। ধা  ধিন  ধধা  ধিন্ । তা  ধিন্  ধাতাক্  ধিন্ ।
```

'নব-সঙ্গীতকল্পতরু' নামক একটি গ্রন্থের ১৩৪০ সনের ৮ম সংস্করণে কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ঠুংরি তালের

একাধিক ঠেকার উল্লেখ করে তাদের দুই দলে ভাগ করেছেন। প্রথম দলের ঠেকার বোল তিন তালি ও একটি ফাঁক।

+ ৩ ০ ১
। । । ।
১ ধেধা কিটি নেধা কিটি ।

+ ৩ ০ ১
। । । ।
২ ধাদ্ধা ধাতেন তাদ্ধা ধাধেন ।

দ্বিতীয় দলের ঠুংরি চারি মাত্রার তাল। দুই তাল ও দুই শূন্য। যথা—

+ ০ + ০
। । । ।
১ ধেধা কিটি, নেধা কিটি ।

+ ০ + ০
। । । ।
২ তাত্রাকি থুন, ধা থুন্না ।

+ ০ + ০
। । । ।
৩ ধাক্ ধিন্, ধেধা গেদিন্ ।

+ ০ + ০
। । । ।
৪ ধাগে ধিন্‌ধিন্ ধাগে ধিন্‌ধিন্ ।

শ্রীসুবোধ নন্দী -কৃত 'ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ' গ্রন্থটিতে ঠুংরিকে বলা হয়েছে ৮ মাত্রার তাল। তালী এক, ফাঁক এক। ৪ মাত্রার ছন্দ। ঠেকা—

+ ০
। ধা ধিন্ নাগে তেটে । ধা থুন নানা তেটে ।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা ভাষার বইগুলি থেকে ঠুংরি বিষয়ে যা জানা গেল তা হচ্ছে—

১. ঠুংরি ক্ষুদ্র রাগের ও তালের গান। সহজেই এ গান শ্রোতার মনোহরণ করে। টপ্পা গানেরই একটি সহজ শাখা রূপে পরিচিত ছিল। এই নামের একটি আলাদা রাগিণীও পাওয়া যায়। যে সকল টপ্পা ঠুংরি তালে গীত হয় তাকে ঠুংরি গান বলা হত। ভরফাওয়ালিদের গান বলে ওস্তাদেরা এ গান একসময়ে গাইতেন না, পছন্দও করতেন না। এ গানে একাধিক রাগের সমাবেশ বা মিশ্রণ দেখা যায়।

২. ঠুংরি ছিল একসময়ে একটি প্রচলিত তাল। মোট ৮ মাত্রার তাল এটি। দুই বা চার মাত্রার ভাগে বিভক্ত। এক মতে, সম প্রথম মাত্রায় পড়ে আর পাঁচ মাত্রায় ফাঁক। দ্বিতীয় মতে, এই তালে ফাঁক নেই, পাঁচ মাত্রায় তালি। তৃতীয় মতে, এই তাল দুই মাত্রায় চারটি ভাগে বিভক্ত। সম-সমেত

তিনটি তালি ও একটি ফাঁক এতে আছে। চতুর্থ মতে, এটি মোট ৪ মাত্রায় তাল। প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক। সমমাত্রার দ্রুত ছন্দের ঝোঁকটি এ তালের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ঠুংরির প্রভাব থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরিবারও মুক্ত ছিলেন না। তাঁদের রচিত ঠুংরি গানের কথাগুলিকে আগেকার দিনের ঠুংরি তাল ও তার ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে সাজানো হত। গুরুদেবের অগ্রজরা ২ মাত্রা ভাগে মোট ৮ মাত্রার ঠুংরি তালকেই পছন্দ করতেন। এ ছন্দে সম-সমেত তিন তালি ও এক ফাঁক বর্তমান।

গুরুদেবের জন্মকালে, তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'কর তাঁর নামগান' গানটি রচিত হয়, ঝিঁঝিট রাগিণীতে ও ঠুংরি তালে। মোট ৮ মাত্রার তালকে ২ মাত্রায় চারটি ভাগে ভাগ করে এর স্বরলিপি করা হয়েছিল এইভাবে—

। ।
১ ২ ॰ ৩ ১ ২ ॰ ৩
রা রা II গা পা । -া পা । পা -ধা । -পা ধা I মা -া । -া -া । -া -া । র্সা র্সা I
ক র তাঁ ॰ ॰ র না ॰ ॰ ম গা ॰ ॰ ॰ ॰ ন্ ক র

এরই কাছাকাছি কোনো-এক সময়ে গুরুদেবের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠুংরি তালে কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তারই একটি তাল ও তার মাত্রাভাগ পূর্ববর্তী গানটিরই অনুরূপ। যেমন—

। ।
১ ২ ॰ ৩ ১ ২ ॰ ৩
সা II { ঋা -পা । মা মা । মা মা । মপা মা I জ্ঞাঃ রঃ । জ্ঞা মা । জ্ঞমা -জ্ঞঋা । (সা সা)} I
দ য়া ॰ ঘ ন তো মা হে ॰ ন কে ॰ হি ত কা ॰ ॰ রী, "দ"

গুরুদেবের অপর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উচ্চাঙ্গ-সংগীতশাস্ত্রবিদ্। ১২৯৮ সালে তিনি তাঁর একটি লেখাতে বলেছেন, "ঠুংরির প্রতি পদের মধ্যে নিয়মিত অন্তরে গুরুমাত্রা আসায় কাওয়ালি অপেক্ষা প্রস্বনাধিক্য হইয়া থাকে।" ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "গানের কথার লঘু-গুরু-ভেদেও ঝোঁক-ভেদে তাল-বিশেষের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। এইসকল তালের মধ্যে কতকগুলি চতুর্মাত্রিক, যথা— কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা ইত্যাদি।

"কাওয়ালির ছন্দ ও লয় ভেদে, ঠুংরি, আড়াঠেকা প্রভৃতি উৎপন্ন। ঠুংরির সহিত কাওয়ালির প্রভেদ এই যে, ঠুংরির প্রতি তালি-বিভাগের মধ্যে নিয়মিত অন্তরে গুরুমাত্রা আসায় কাওয়ালী অপেক্ষা ঝোঁকের আধিক্য হইয়া থাকে।"

ঠুংরি যে দ্রুতলয়ের তাল এ কথাও তিনি জানিয়েছেন। 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় প্রদত্ত ঠুংরি তালের ঠেকাটি এইরূপ—

।
১ ২
। ধা ধা কেটে তাক্ । নে ধা কেটে তাক্।

মনে হয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে এই ঠেকাটি তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় নিজের রচিত ঠুংরি তালের যে গানটির স্বরলিপি দিয়েছেন তার তালের মাত্রাভাগ

প্রদত্ত ঠেকার সঙ্গে মেলে না। এ গানের স্বরলিপিতে তিনি তাঁর অগ্রজদেরই অনুসরণ করেছেন। গানটি হল—

ঝুম্-ঝিঝিট্—ঠুংরি

১ ২ ৩ ০

II { ন্ধ্াঃ ধ্ঃ । সরা সরা । গগা -রসা । সগা রসা } I

কি০ ক রি০ স্ব০ জনি ০০ সে০ বিনে

'স্বরলিপি গীতিমালা'য় গুরুদেবের 'এ কি আকুলতা ভুবনে' গানটি আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানটিকে ঠুংরি তালের গানরূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু, ৪ মাত্রার তাল হলেও মোট ১৬ মাত্রার ত্রিতালের মত সাজানো হয়েছে কথাগুলিকে। সব সমেত তিন তালি ও এক ফাঁক। একে ঠুংরি তালের গান কেন বলা হল তা জানি না। স্বরলিপিতে এইভাবে গানটি আছে—

২ ৩ ০

। া া ধা ধা I ধা -ণধা -পা মা । মপা -া -জ্ঞা -া । -মা -জ্ঞা মা -জ্ঞা ।

এ কি আ ০০ কু ল তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২ ৩ ০

। জ্ঞণা -া -ধা -া I -া -না না না । নর্সা -া -া -া । -া -া র্সা র্সা ।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ভু ব নে ০ ০ ০ ০ ০ এ কি

বাইশ বৎসর বয়সে গুরুদেবের রচিত গানের সংখ্যা মোট দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুই শতের মত। এর মধ্যে ঠুংরি রাগিণীর গান একটিও নেই, কিন্তু ঠুংরি তালের গান কিছু আছে। তারই নমুনা হিসেবে একটি গান স্বরলিপি সমেত তুলে দিচ্ছি। গানটি হল ধর্মসংগীতের অন্তর্গত 'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'। এই গানটি তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী' গানটির সুর ও তালের অনুকরণে রচিত। যেমন—

১ ২ ০ ৩ ১ ২ ০ ৩

সা II { ঋা -পা । মা মা । মা -া । মপা মা I জ্ঞাঃ -রঃ । জ্ঞা মা । জ্ঞঋা -জ্ঞঋা । (সা -সা)} I

ব রি ০ ষ ধ রা ০ মা ঝে শা ন্ তি র বা র ০ রি, 'ব'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কাঙ্গালীচরণ সেন -কৃত 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' গ্রন্থের মোট ৬ খণ্ডে (১৩১১ থেকে ১৩১৮) গুরুদেব রচিত ঠুংরি তালে আরও যে-কটি পাই তা এই 'বরিষ ধরা মাঝে' গানটিরই অনুরূপ। সেখান থেকে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটির স্বরলিপি দিচ্ছি—

ভৈরবী-ঠুংরি

১ ২ ০ ৩ ১ ২ ০ ৩

I তো মা । র প । তা ০ । কা ০ I যা রে । দা ও । তা ০ । রে ০ I

ঝিঁঝিট—ঠুংরি

| ১ ২ ০ ৩ | ১ ২ ০ ৩ |
I শা ন্ । ত হ । রে ০ । ম ম I চি ০ । ত্ত নি । রা ০ । কু ল I

লুম্‌খাম্বাজ—ঠুংরি

১ ২ ০ ৩ ১ ২ ০ ২
আ জি I য ত । তা ০ । রা ০ । ত ব I আ ০ । কা ০ । সে ০ । স বে I

কালাংড়া—ঠুংরি

১ ২ ০ ৩ ১ ২ ০ ৩
I ই ০ । চ্ছা হ । বে ০ । য বে I ল ই । য়ো ০০ । পা ০ । রে ০ I

আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতলিপি' নামে গুরুদেব-রচিত ধর্মসংগীতের ৬ খণ্ড স্বরলিপি-পুস্তক প্রকাশ করেন ১৩১৭ সালে। তাতে ঠুংরি তালে রচিত মোট ৮টি পাই। সুরেন্দ্রবাবু কিন্তু এইসব গানে তাঁদের পরিবারে প্রচলিত মত অনুসারে ঠুংরি তালের মাত্রা-ভাগ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথম মাত্রায় সম ও পঞ্চম মাত্রায় খালি। কাঙ্গালীচরণ সেনের মত ২ মাত্রা ভাগে স্বরলিপি করেন নি। সুরেন্দ্রবাবুর স্বরলিপির নমুনা হল—

খাম্বাজ—ঠুংরি

১ ০ ১ ০
II { গমা -পবা -ণর্সা ণা । ধা -া ধা -মা I মা -ধা -পধণা ণা । ণণা -ধধা পা -গা I
 রূ০ ০০ ০প সা গ ০ রে ০ ড়ু ০ ০০ব্ দি স্নে০ ০০ ছি ০

খাম্বাজ—ঠুংরি

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন সংগীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রবাসী উচ্চাঙ্গহিন্দী-সংগীতের গায়ক পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী দেবনাগরী অক্ষরে এবং ভাতখণ্ডে-প্রবর্তিত স্বরলিপিতে গুরুদেবের 'গীতাঞ্জলি'র এবং অন্য আরো কয়েকটি গান সমেত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সঙ্গীত গীতাঞ্জলি' নামে একটি স্বরলিপির বই প্রকাশ করেন। এই বইটিতে 'গীতলিপি'র ঠুংরি তালের পাঁচটি গান আছে। ভীমরাও শাস্ত্রী কিন্তু গানগুলিকে ঠুংরি তালের বলে উল্লেখ করলেন না। পরিবর্তে তিনি বললেন 'ধুমালী' তাল। তালটির পরিচয় তিনি এই ভাবে দিয়েছেন—

"ধুমালী মাত্রা ৮।ভাগ ২ মাত্রা মেঁ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
।ধি ধি । না ধিঁ । নক্ ধি । নাগি তৃক্ ।

'ধুমলী' মহারাষ্ট্র দেশের থিয়েটার, তামাশা নাটক এবং মারাঠি কীর্তন গানের একটি প্রচলিত তাল।

কিন্তু গুরুদেবের গানগুলির স্বরলিপির সময় এই ঠেকাটি ভীমরাও শাস্ত্রী গ্রহণ করলেন না। ৮ মাত্রাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে, প্রথম মাত্রায় সম্ ও পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক দেখালেন। যেমন—

"রাগ খমাজ ॥ তা : ধুমালী ॥ মধ্যলয় ॥ মাত্রা ৮

```
   ১                            •                          ১                              •
।। গমা -পধা ণর্সা ণা  I  ধা -া ধা -মা  I  মা -ধা -পধণা ণা  I  ণণা ধধা পা গা  I
   রূ০   ০০   ০প্ সা     গ  ০ রে  ০       ডু  ০   ০০ব্ দি        য়ে০ ০০ ছি ০
```

ভীমরাও শাস্ত্রী যদিও ধুমালী তালের মাত্রাভাগ ও ঠেকা স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু গানের উপরে ধুমালী তালটির উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও স্বরলিপির বেলায় তিনি যে সুরেন্দ্রনাথকে হুবহু অনুসরণ করেছেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর থেকে মনে হয় যে ঠুংরিকে তাল হিসেবে বোধহয় সে যুগের ভাতখণ্ডের অনুগামীরা স্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ঠুংরি তালের এই আলোচনা থেকে তালের মাত্রা-ভাগের যে নমুনা পাওয়া গেল তাকে নিম্নোক্ত মোট চারিটি দলে সাজানো যেতে পারে। যেমন :—

```
          +       •
১       । ১  ২  ৩  ৪ ।                         = মোট ৪ মাত্রার তাল।
          +               ২
২       । ১  ২  ৩  ৪ ।  ৫  ৬  ৭  ৮ ।        = মোট ৮ মাত্রার তাল।
          +               •
৩       । ১  ২  ৩  ৪ ।  ৫  ৬  ৭  ৮ ।        = মোট ৮ মাত্রার তাল।
          +       ২         •         ৩
৪       । ১ ২ । ৩ ৪ । ৫ ৬ । ৭ ৮ ।          = মোট ৮ মাত্রার তাল।
```

গুরুদেব নিজে ঠুংরিকে যে তাল হিসেবেই জানতেন সে কথা স্পষ্ট জানা যায় তাঁরই একটি চিঠিতে। এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন বৃদ্ধবয়সে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবীকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে। চিঠিতে তিনি বলছেন—

"তুই আমার গান সম্বন্ধে লিখেছিস এতে আমার বলার কথা কিছু কি থাকতে পারে? ছোট্ট একটি কথা বলা চলে— যে যে তালে আমি গান রচনা করচি তার তালিকা দেব সেটা চেষ্টা করে দেখিস্—

রূপক, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, একতাল, কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা, দুই একটা চৌতাল— দাদরা, যত, কাশ্মীরি খেমটা, একাদশী, নবমী।"

এই তালিকাতে অতি প্রচলিত সুরফাক্তাল, আড়াচৌতাল, তেওড়াতাল-কটির— যা তাঁর নিজের গানে বহুবার ব্যবহার করেছেন— নাম উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এ ছাড়া, রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত আরো কয়েকটি নতুন তালেরও উল্লেখ নেই। অথচ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের যুগে যে-তালিকাটির ব্যবহার গায়ক-মহলে প্রায় উঠেই গিয়েছিল সেই ঠুংরি তালে রচিত নিজের গান রচনার কথা তিনি ভোলেন নি। এই তালিকায় তার উল্লেখ সে দিক থেকে লক্ষ্য করার মত। এ থেকে অনায়াসেই বলা যেতে পারে

যে আগের যুগের গায়ক ও গান-রচয়িতাদের মত ঠুংরি তালের সঙ্গে গুরুদেবের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। এই পরিচয়ের একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন হল ১৩০০ সালে 'চিরকুমারসভা' নাটকটির

কত কাল রবে বল' ভারত রে,
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে।

গানটি।

হিন্দুমেলার যুগে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের খাম্বাজ রাগিণী ও ঠুংরি তালের জাতীয়-সংগীতটির হুবহু অনুকরণে গুরুদেব এ গানটি রচনা করেছিলেন। গুরুদেবের গানে ঠুংরি তালের ব্যবহার সঠিক নির্ণয় করা সহজ হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সংগীতগ্রন্থ ও তাঁর গানের স্বরলিপির সাহায্যে। এই বইগুলিতে সর্বদাই রাগ ও তালের উল্লেখ থাকত। কিন্তু পরবর্তী যুগের গানের স্বরলিপিতে এর উল্লেখ না থাকাতে কোন্‌টি ঠুংরি তালের গান তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া, গুরুদেব যেসব গানে এই তালটি ব্যবহার করেছিলেন, তার উল্লেখ পুরাতন স্বরলিপির বইগুলিতে আমরা পাই, সেই বইগুলির এ যুগের সংস্করণে ঐসব গানের সঙ্গে জড়িত তালটির নাম সম্পূর্ণ তুলে দেওয়াতে বর্তমান কালের গায়কদের পক্ষে এ খবর জানার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁরা ঠুংরি তালের গানগুলিকে কাহারবা তালের গান বলেই জেনেছেন। তাঁদের মনে ধারণা হয়েছে যে, ঠুংরি তালের গান গুরুদেব একেবারেই রচনা করেন নি। যাই হোক, ঠুংরি তাল গুরুদেবের গানে আগেও ছিল, এবং ভালো করে বিচার করে দেখলে দেখতে পাবো যে, গুরুদেবের জীবনের শেষার্ধে রচিত এমন বহু গান আছে যা এযুগে কাহারবা তালের গান রূপে পরিচিত হলেও সেগুলি আসলে ঠুংরি তালেরই গান।

১৩১৯ সালের পরবর্তী যে গানগুলিকে ঠুংরি তালের গান বলে মনে করি তার কয়েকটির উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। এর দ্বারাই বোঝা যাবে যে, এই তালটির প্রতি গুরুদেবের আকর্ষণ ছিল বরাবরই। গান-কয়টি হল—

১ গানগুলি মোর শৈবালেরি দল
২ ওরা অকারণে চঞ্চল
৩ কেন পান্থ এ চঞ্চলতা
৪ শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান
৫ এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে
৬ ফাগুনের নবীন আনন্দে
৭ ওরে চিত্ররেখা-ডোরে বাঁধিলকে
৮ ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল

এ-কটি গান প্রকৃতপক্ষে ঠুংরি তালের ন্যায় প্রতি চার মাত্রা অথবা দুই মাত্রা অন্তর ঝোঁক দিয়ে গাইবার গান। এর লয়ও দ্রুত। কয়েকটি গানের ছন্দের ঝোঁকের সঙ্গে প্রাচীন 'তোটক' ছন্দ এবং নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্‌ -রচিত 'যব ছোড় চলি লখ্‌নৌ নগরী' গানটির মিল লক্ষণীয়।

গুরুদেবের এই গান-ক'টিকে ঠুংরি তালের দুই রকমের ভাগে সাজালে তার গীতরূপের ও রসের কোনো

পরিবর্তন হবে বলে মনে করি না। 'এসো নীপবনে' গানটিকে দু-রকমের ঠুংরি তালে সাজালে যা দাঁড়াবে, তা হল—

১	এ সো	I	+ নী ০ প ব	।	২ নে ০ ০ ০	I	

২	এ সো	I	+ নী ০	।	২ প ব	।	০ নে ০	।	৩ ০ ০	I	

১ নম্বর ভাগের প্রথম মাত্রায় সম এবং পঞ্চম মাত্রায় তালি। ২ নম্বর ভাগে, প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রায় তালি, পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক এবং সপ্তম মাত্রায় তালির চিহ্ন আছে।

ঠুংরি বিংশ শতকে উত্তরভারতে ধ্রুপদ খেয়াল ও টপ্পার মত ওস্তাদ-মহলে গান হিসেবে সম্মানজনক স্থান পেয়েছে। এই কারণে ঠুংরিকে নিয়ে অবাঙালী গায়কেরা আলোচনাও করেছেন প্রচুর। তাঁরা এই গানের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, এলাহাবাদ ইয়ুনিভার্সিটির প্রফেসর জি. ডি. কারওয়াল'এর একটি লেখা থেকে তার পরিচয় আমরা পাবো। তিনি লিখেছেন—

"This [Thumri] like tappa, also appeared in the nineteenth century. The word comes from thumak— graceful stamp of foot. This indicates its connection with dance. It originated as an accompanying song of dance which made dance movements more understandable and impressive.

"Thumri is bhao Sangit— bolpradhan— expressive of emotions contained in the song texts. It was nurtured in the courts of the Nawab of Avadh, particularly, in the regime of Nawab Wajid Ali Shah. He was a dancer and singer of high repute,· · He himself composed a number of Thumris,··· The style found congenial centres in Banaras, Allahabad, Patna, in addition to Lucknow, its place of birth. It was developed to excellence by Bhaiya Ganpat Rao and Moizuddin Khan.

"Like Kheyal, Thumri is of two types— Badi Thumri and Chhoti Thumri— and has two parts, sthai and antara. Badi Thumri is in line with Bada Kheyal and is sung in vilambat laya ; and Chhoti Thumri follows in the foot-steps of Chhota Kheyal and is sung in drut laya. Or we might say that Thumri sung in jat or deepchandi theka is Badi Thumri and that done in trital is Chhoti Thumri.

"The tans of both Kheyal and tappa are also employed, though formerly they were not used.

"It is purely romantic and is suited to the singing of songs of bhakti ras and erotic texts.

"Chhoti Thumri is either sung with dance or in Kheyal style, emphasising song texts but not bothering about bol banao and using more tanas.

"Badi is usually followed by dadra in actual performance. Dadra has generally a shorter poetic text than Thumri and is sung in dadra tala whence it derives its name. In its demonstration Hindi or Urdu couplets or quartrains are brought in for variety and extra charm. It has the same relationship with Thumri as Dhammar has with Dhrupada, both, in general essentials, being the same."

উপরোক্ত এই আলোচনাটি থেকে লক্ষ্য করার মত বিষয় হল এই যে লেখক ঠুংরি তাল ও ঠুংরি রাগের বিষয়ে কিছুই বললেন না। যেন, ভারতীয় সংগীতে এ-দুটির চলন কোনো দিনই ছিল না। এ মতবাদ উত্তর-ভারতের গবেষকদের মনে কেন স্থান পেয়েছিল তার কোনো কারণ বোঝা যায় না।

বর্তমানে বাংলাদেশে ঠুংরি গানকে যে রূপে ও যেসব তালে আমরা গাইতে শুনি, গোয়ালিয়রের ভাইয়া সাহেবই হলেন এর প্রবর্তক। তিনি ছিলেন কবি, উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল গানের গায়ক ও বীণাবাদক। হারমোনিয়মও বাজাতে পারতেন দক্ষতার সঙ্গে। কোনো কারণে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে তিনি কিছুকাল লক্ষ্মৌতে ঠুংরি গানের খ্যাতনামা শিল্পী সাদেক আলি খাঁর নিকট গান শেখেন। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কিছুকাল পাটনায় ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় আনেন তাঁর ভক্ত শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী। কলকাতাতে ভাইয়া সাহেব গণপত রাও-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন খ্যাতনামা ঠুংরি গায়ক মৈজুদ্দীন খাঁ এবং আরো অনেকে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে গণপত রাও কলকাতা ত্যাগ করে রামপুর নবাবের দরবারে যান। প্রকৃতপক্ষে, এ যুগে ঠুংরি গান যেভাবে বাংলাদেশে গাওয়া হয় ভাইয়া সাহেব গণপত রাও এবং মৈজুদ্দীন খাঁ তার প্রথম পথপ্রদর্শক।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কলাবৎরাধিকা গোস্বামীর গুণী শিষ্য গিরিজা চক্রবর্তী, ভাইসাহেব ও মৈজুদ্দিনের কাছে নূতন ঢংএর ঠুংরি গান শিখে বাংলাদেশে ঠুংরি গানের শ্রেষ্ঠ নায়ক রূপে গণ্য হন। এ বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৫৫ সালে প্রামাণ্য যে সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন, তা হল—

"সে আজ পঁয়ত্রিস বৎসরেরও আগের (ইং ১৯১২।১৩ ?) কথা।... এই সময় গণপত রাও ও মৈজুদ্দীন খাঁর এলেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ী, হারিসন রোডের উপর, দুনিচাঁদের বাগানে, ওভারটুন হলের উল্টো দিকে এদের আসর জমত। সেখানে আসতেন রাজাবাবু (বর্মন), তিনুবাবু, দুনিবাবু, গিরিজাবাবু, অমিয় সান্যাল প্রভৃতিরা।

"এই কেন্দ্র থেকে আধুনিক লচাও ঠুংরি উৎপন্ন হয়। তার ভাব-বিকাশ, তান-কর্তব, তার মেজাজ লক্ষ্মৌ ও বেনারসের পূরবী থেকে ভিন্ন। গহরজান, মালকাজন কলকাতায় এবং লক্ষ্মৌএ চৌধুরানী ভগ্নীদ্বয় এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন।"

এই 'লচাও' ঠুংরি প্রবর্তনের যুগে গুরুদেব বয়সে প্রৌঢ়। তখন কলকাতার বাস উঠিয়ে দিয়ে তিনি বেশির ভাগ সময়ে থাকতেন শান্তিনিকেতনে। বিদেশভ্রমণেও তাঁর বহু সময় যেত। এই কারণে তাঁর বাল্য কৈশোর ও প্রথমযৌবনে কলকাতায় সংগীতের যে পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন সে রকমের সাংগীতিক

পরিবেশ তাঁর এই জীবনে আর তিনি পান নি। তাই, গণপত রাও ও মৈজুদ্দীন -প্রবর্তিত ঠুংরি-অঙ্গের গান শেখা তো দূরের কথা, ভালো করে শোনবারও অবসর পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। এই কারণে 'লচাও' ঠুংরির ছাপ তাঁর গানে আর পড়ল না। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর গুরুদেব লক্ষ্ণৌ-অঞ্চলের ঠুংরি-ভাঙা 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে' 'যাওয়া-আসারই একি খেলা' এবং 'খেলার সাথী বিদায়দ্বার খোল' গান কটিই মাত্র রচনা করেছিলেন। মূল গান পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্তা সাহানা দেবীর মুখে শুনে গুরুদেব নিজের মত বাংলা কথা বসিয়েছিলেন। এঁদের দু-জনকে দিয়েই বাংলা গানগুলি তিনি প্রথম গাওয়ালেন শান্তিনিকেতনের উৎসবে বা কলকাতায় আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে। বলা বাহুল্য, মূলগানগুলি শুনে তাঁর ভালো লেগেছিল বলেই বাংলাভাষায় তাকে ধরে রাখতে উৎসাহিত হন। কিন্তু, তিনি নিজে কখনো তা গান নি। কারণ মূলসুর যথাযথ ভাবে শিখে গাইবার অবসর সে বয়সে তাঁর আর ছিল না। তিনি তা অন্যের মুখে শুনেই খুশি ছিলেন। গানটি লক্ষ্ণৌ বা পশ্চিম-ভারতীয় ঠুংরি-অঙ্গের হলেও এ যুগের তালে গানগুলি গাওয়া হল না। গাওয়া হয়েছিল ভাঙাছন্দের গান হিসেবে।

গুরুদেবের গানে ঠুংরি গানের প্রভাব বলতে যা বোঝায় তা হল গত শতাব্দীতে ঐ তালের ছন্দে যে গানগুলি রচিত হত বাংলাদেশে, তারই প্রভাব। এই তালের ছন্দেই তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর চিমালয়ের 'লচাও' ঠুংরি বা পাঞ্জাবী ঠুংরি গুরুদেবকে প্রভাবিত করবার সুযোগ পায় নি।

ঊনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা

প্রবোধচন্দ্র সেন

ঊনবিংশ শতকের বাংলা কবিতার আলোচনায় প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, ওই এক শতাব্দীব্যাপী কাব্য-সাধনায় কোনো ধারাবাহিকতা সমগ্রতা বা ঐক্য আছে কি না, অর্থাৎ তার কোনো সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা সম্ভব কি না। এই সমস্যার একটা প্রচলিত বা প্রায়-সর্বস্বীকৃত সমাধান এই যে, ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য দুটি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত— চিরাগত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ধারা এবং পাশ্চাত্য প্রভাবজাত নূতন ধারা। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) সঙ্গেসঙ্গে প্রাচীন ধারার অবসান এবং রঙ্গলাল-মধুসূদনের আবির্ভাবের সঙ্গে নূতন ধারার সূত্রপাত, এ কথা প্রায় সকলেই বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা সকলেই জানেন। তাঁর উক্তি এই—

"যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত -প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রহস্যসন্দর্ভে [বিবিধার্থ-সংগ্রহে ?] প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।

"সেই ১৮৫৯-৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়— উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯-৬০ সালের মতো দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।"

— দীনবন্ধু মিত্র : কবিত্ব (১২৮৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির দীর্ঘকাল পরে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, এ স্থলে তাও স্মরণযোগ্য।—

"বঙ্গসাহিত্য-আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত-কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাবসকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্‌ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি একস্থানে বলিয়াছেন—

যাত্যেকতোঽস্ত শিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

"বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেইপ্রকার দশা ঘটিল। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।"

— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪) নবম পরিচ্ছেদ

শিবনাথ শাস্ত্রীর এই মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতেরই ব্যাখ্যা বা ভাষ্য বলে গণ্য হতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গেসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময় রজনীর অবসান, আর মধুসূদনের ভাস্বর প্রতিভায় প্রদীপ্ত নবপ্রভাতের অভ্যাগম। বাংলা সাহিত্যের এই আকস্মিক যুগপরিবর্তনের কথা পরবর্তীকালেও স্বতঃস্বীকার্য সত্য বলে গণ্য হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও নানা স্থানেই তার সমর্থন পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে (১৯৩৮) বাংলা কাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তার একটি অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করছি।—

"যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়, তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে এসব কাব্য স্বভাবতঃই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না এর অঙ্কুর, উঠলেও শিকড়শুদ্ধ দুদিনে শুকিয়ে যেত। বলা বাহুল্য তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

— 'বাংলা কাব্যপরিচয়' (১৩৪৫), ভূমিকা

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের নূতন ধারার প্রবর্তক হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের নাম উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন দুঃসাহসিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায় মধুসূদনের রচনায়।

এই সুচিরপোষিত ধারণার সত্যতা বিচার করে দেখা দরকার। ইতিহাসে যুগপরিবর্তন কখনও আকস্মিকভাবে ঘটে না। অর্থাৎ রাতারাতি এক যুগ গিয়ে আর-এক যুগ দেখা দেয় না। পরিবর্তনের গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত বা অতিদ্রুত হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনটা আকস্মিক হয় না। এই দ্রুততা বা মন্থরতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনাপরম্পরার গুরুত্বের উপরে। বস্তুতঃ ইতিহাসের ধারা নদীর প্রবাহের মতো। ভৌগোলিক পরিবেশের অসমতা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক কারণে নদীর প্রবাহ বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা দিকে এঁকে-বেঁকে চলে, নদীপ্রবাহের এই দিক্‌পরিবর্তন কখনও কখনও তীব্রও হতে পারে। কিন্তু তার জলস্রোতের ধারাবাহিকতা বা ঐক্য অব্যাহতই থাকে, তার ধারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। ইতিহাসের ধারাও তেমনি কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে ইতিহাসের স্বরূপ ও তার কারণপরম্পরার সম্যক্ উপলব্ধির অভাবে তার দ্রুত দিক্‌পরিবর্তনকে আকস্মিক এবং তার প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হতে পারে। এই ভ্রান্তি সমকালীন লোকের পক্ষেই বেশি হবার সম্ভাবনা। কারণ কালের নৈকট্য হেতু তাদের কাছে পরিবর্তনটাই লক্ষিত হয়, তার নিগূঢ় কারণসমূহ অনেক পরিমাণেই অলক্ষিত থাকে এবং ফলে ওই পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধিও সম্ভব হয় না। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা ঘটে গিয়েছে তার স্বরূপ বিচারেও এই ভ্রান্তি ঘটেছে বলে বিশ্বাস। একমাত্র বাংলা সাহিত্যের বেলাতেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নীতিতে ব্যতিক্রম ঘটল তা মেনে নিতে স্বভাবতই দ্বিধাবোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি পূর্বে উদ্‌ধৃত হয়েছে তার শেষাংশকে এক হিসাবে প্রথমাংশের প্রতিবাদ বা খণ্ডন বলে গণ্য করা যায়। প্রথমাংশে বলা হয়েছে, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য 'দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন' এবং 'এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত'। দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে, য়ুরোপীয়

অনুপ্রেরণাজাত ধারাটিও 'বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ' নয়, সুতরাং তার প্রকৃতিবিরুদ্ধও নয়। যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ তা কখনও রুচিসম্মত হতে পারে না। বাঙালির প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয় বলেই বাংলা সাহিত্যের এই নূতন ধারাকে অ-ন্যাশন্যাল বা বিজাতীয় বলে গণ্য করা যায় না। যদি যথার্থতঃই তা বিজাতীয় বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হত তা হলে এই সাহিত্যধারা বাংলাদেশে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমবর্ধমান হতে পারত না।

নদীর সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। গঙ্গোত্রী থেকে সাগরসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত যে নদী গঙ্গা নামে পরিচিত তার জলধারার সঙ্গে নানা পর্যায়ে ছোট বড় অনেক নদী এসে মিশেছে, তাতে গঙ্গার জলধারার নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, কিন্তু, নদীর ধারাবাহিকতা বা ঐক্য নষ্ট হয় নি, কোথাও বিচ্ছিন্নতাও দেখা দেয় নি। বাংলা-সাহিত্য-প্রবাহ সম্বন্ধেও একথা সমভাবেই প্রযোজ্য। গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির হৃদয়গত ভাবধারার সঙ্গে বহিরাগত ভাবধারার সংগম ঘটেছে, তাতে তার ভাবপ্রবাহের ব্যাপ্তি গভীরতা বৈচিত্র্য ও গতিবেগ বেড়েছে, কিন্তু তাতে তার প্রকৃতিতে কোনো বিকার ঘটে নি। কেননা বাইরের সম্পদ্‌কে গ্রহণ করবার শক্তি বাঙালি জাতির ও বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত। বাঙালির প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক।—

"বাঙালীর স্বভাবে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে।"

— 'কালান্তর', দেশনায়ক (১৯৩৯)

এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙালি স্বভাবের শ্রেষ্ঠতা কোথায়। এ বিষয়ে তাঁর আর-একটি উক্তি এই।—

"পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নব নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তি কামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতিও নিরূপণ হতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না। যত দূর থেকেই আহ্বান আসুক, নবযুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হইতে জড়তা দেখায় নি— বাংলাদেশের এই গৌরব, এই তার সত্য পরিচয়।"

— 'কালান্তর', মহাজাতি সদন (১৯৩৯)

অর্থাৎ প্রতিভার নিত্য উন্মেষপরায়ণতা, প্রাণের প্রবল স্পর্শশক্তি এবং বাইরের আহ্বানে সাড়া দেবার ও বাইরের দানকে গ্রহণ করবার সহজ প্রবৃত্তি, এই হল বাঙালি প্রকৃতির সত্য পরিচয়। উনবিংশ শতকে বাঙালি প্রতিভার প্রথম প্রতিভূ রামমোহন রায়। মনে রাখতে হবে এই রামমোহনের কীর্তি ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, বরং দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন অনেকাংশে তাঁরই দূরদর্শিতার ফল। তাঁর বাঙালি প্রকৃতিই তাঁকে দিয়েছিল 'নতুনকে চিনে নেবার এই উজ্জ্বল দৃষ্টি'। ইংরেজিকে আয়ত্ত করবার বহু পূর্বেই আরবি ও ফারসি ভাষার যোগে তিনি তাঁর এই সত্য দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছিলেন। নূতনকে স্বীকার করবার এই সহজাত প্রবণতাই পরবর্তী কালে তাঁকে মূল হিব্রু ও গ্রীক বাইবেলের সত্য নিরূপণে প্রবর্তিত করেছিল। বাঙালি প্রতিভার দ্বিতীয় মুখ্য প্রতিভূ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রতিভাবিকাশও ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, রামমোহনের ন্যায় তাঁরও চিৎপ্রকর্ষের উৎসস্থল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য। অথচ তিনিও কেমন সহজেই পাশ্চাত্য ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন তা কারও অজানা নয়।

বাঙালি মনের এই যে বৈশিষ্ট্য আধুনিককালে এমন প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা পরের কাছে ধার-করা বস্তু নয়, সেটা তার সুচিরকালের ইতিহাসলব্ধ ধন। বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস আমরা শুধু যে জানি নে তা নয়, তা জানবার লেশমাত্র আগ্রহও আমাদের মনে নেই। এটাই বাঙালি চিত্তের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এইজন্যেই আধুনিককালে বাঙালি প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অজস্র উল্কাপাতের সমবেত দীপ্তির মতো আকস্মিক ও বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের চিত্তস্পর্শ বাঙালিপ্রতিভার এই আশ্চর্য স্ফুরণের উদ্দীপক হেতুমাত্র, তার প্রাণের উৎস নিহিত রয়েছে তার অতীত ইতিহাসের মধ্যে। সোনার কাঠির স্পর্শ নিদ্রিত রাজকন্যাকে তার সাতমহলা বাড়িতে জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু মৃত রাজকন্যার দেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারে না। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি প্রতিভা নিদ্রিতাবস্থায় ছিল বলা যায়, কিন্তু তার প্রাণক্রিয়া নিঃস্পন্দ ছিল না। সে প্রাণশক্তির প্রকাশ পূর্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবারই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পক্ষে সে ইতিহাস অনুসরণ অনাবশ্যক।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে বাঙালি আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেছে, সেটা সে পেয়েছে কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও বাংলার ইতিহাসের প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি কিছু দীর্ঘ হলেও এ স্থলে উদ্‌ধৃত করা সমীচীন মনে করি।—

"আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব-প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্‌ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

"তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কি না সন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত একঘরে হয়ে ছিল, তাতে করে তার একটা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল। এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তা হলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক্ থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত।"

— 'জাপানযাত্রী' (১৯১৬-১৭), পরিচ্ছেদ ১৫

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই উক্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অন্যত্র স্পষ্ট করেই বলেছেন, "বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি"— 'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৩২৪ ভাদ্র। বলা বাহুল্য, বাঙালির জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর যে অভিমত উদ্‌ধৃত করেছি, তাই এই শ্রদ্ধার হেতু।

পূর্বে বলেছি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন-বঙ্কিমের আবির্ভাবকে আকস্মিক ঘটনা বলে

স্বীকার করা যায় না। করলে ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই আর-একটি মন্তব্য উদ্‌ধৃত করা যাক।—

"প্রায়ই জাতীয়-অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎ ভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারি দিকে আয়োজন অনেক দিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোটো বড়ো অনেকের যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।"

— 'ইতিহাস', শিবাজী ও মারাঠা জাতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন-বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাবের ভূমিকাও যে দীর্ঘকাল ধরে জাতীয়-চিত্তে রচিত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা যদি না হত তা হলে আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে তাঁরা স্বজাতির দ্বারা এমনভাবে অভিনন্দিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে অসাধারণ শক্তি তাঁদের রচনায় সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তারও আয়োজন ভিতরে ভিতরে চলছিল অনেক কাল ধরেই বাঙালির ভাষাচর্চায় ও সাহিত্য-সাধনায়। একটু পরেই এ বিষয়টা বিশদ করতে চেষ্টা করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে রামমোহন রায়ের কথা একটু বলা উচিত মনে করি। আমাদের দেশে তিনিও একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ। তাঁর আবির্ভাবটা অনেকের কাছে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলে গণ্য হয়। কিন্তু বাংলার পূর্বাগত চিন্তা-ধারার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে তাঁর আপাত-আকস্মিক আবির্ভাবেরও সুনিশ্চিত ভূমিকা দেশের চিত্তে রচিত হচ্ছিল দীর্ঘকাল ধরেই।

২

'মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।'—বঙ্কিমচন্দ্র এ মন্তব্য করেন মধুসূদনের মৃত্যুর (১৮৭৩ জুন) মাত্র চার বৎসর পরে। তখনও মধুসূদনের দীপ্ত প্রতিভার তীব্র জ্যোতি সকলের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল। এই কালগত অতিসান্নিধ্যই যে ওই প্রতিভার সত্যরূপ উপলব্ধির একমাত্র অন্তরায় ছিল তা নয়। মধুসূদনের বহির্জীবন এবং তাঁর রচনাবলীর বহিরঙ্গের পাশ্চাত্য আবরণও তাঁর অন্তর্জীবন ও সাহিত্য সাধনার সত্যরূপকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', উপনিষদের এই উক্তি মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সে সম্পর্কে সত্যদৃষ্টি পেতে হলে ওই হিরণ্ময় পাত্রকে অনাবৃত করা প্রয়োজন।

মধুসূদনের অন্তর্জীবনের সত্য পরিচয় নিলে দেখা যাবে তিনি যে শুধু ডাহা ইংরেজ ছিলেন তা নয়, তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীয়। তার চেয়েও বেশি, তিনি ছিলেন যথার্থ বাঙালি। যে সংকীর্ণ অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালি ছিলেন সে অর্থে নয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি প্রকৃতির যে সত্য পরিচয়ের কথা বলেছেন সে পরিচয়ের বিচারে মধুসূদনের মধ্যে বাঙালিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল। সে বিচার আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবু তাঁর কোনো কোনো উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিদেশযাত্রার পূর্বে স্বদেশের উদ্দেশে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন (১৮৬২) তার নাম 'বঙ্গভূমির

প্রতি'। অর্থাৎ জন্মভূমি হিসাবে তাঁর অন্তরের বিশেষ টান ছিল বাংলাদেশেরই প্রতি, ভারতবর্ষের প্রতি নয়। বিদেশে গিয়েও তিনি বারবার বাংলাদেশকে স্মরণ করেছেন। কপোতাক্ষ নদকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—

এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখারীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর শেষ কবিতায় ('সমাপ্তে') তাঁর অন্তরের শেষ কামনাই প্রকাশ পেয়েছে।—

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ — ভারত-রতনে।

বাংলার গৌরবই যে তাঁর পরম কাম্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর "দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে" ইত্যাদি সমাধিলিপিতে তিনি বাঙালি বলেই পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি যে বাঙালি, এটাই তাঁর শেষ পরিচয়। তার চেয়ে বড় পরিচয় তাঁর কাছে আর-কিছু ছিল না। যদি থাকত তবে ওই সমাধিলিপিটি বাংলায় না লিখে ইংরেজিতেই লিখতেন।

তাঁর রচিত সাহিত্যও যে বাংলা সাহিত্যই, বাংলা ভাষার আবরণে পাশ্চাত্য সাহিত্য মাত্র নয়, এ বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার করতে চান নি, চেয়েছিলেন নবশক্তি সঞ্চার করতে। সে শক্তির অন্যতম মুখ্য উৎস পাশ্চাত্য সাহিত্য। প্রাণের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে। বাংলার তৎকালীন নিস্তেজ সাহিত্যকে নবতেজে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও সাধনা। বাংলা সাহিত্যের বাংলা প্রকৃতিকে অব্যাহত রেখেই তাকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার ব্রতই যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বহু চিঠিপত্রে ও রচনায়। তাঁর রচনা থেকে দু-একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯ জানুয়ারি) মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তার একটি অংশ এই—

শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়॥
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়॥

বলা বাহুল্য, এটা ডাহা ইংরেজের উক্তি নয়, যথার্থ দেশপ্রেমিক ভারতীয় তথা বাঙালিরই উক্তি। বেশভূষায় ও আচার-ব্যবহারে ইংরেজের মতো হলেও মধুসূদনের গায়ের রঙ যেমন বদলায় নি, তেমনি শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হলেও তাঁর মনের রঙও বদলায় নি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁর অন্তরের ভারতীয় ভাবধারা লুপ্ত তো হয়ই নি, বরং উজ্জ্বলতর হয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। অগ্নি-শিখার স্পর্শে যেমন সমস্ত খাদ পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা পাওয়া যায় তেমনি। দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে এই অগ্নিশিখার কাজই করেছে। আজও তার ক্রিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি।

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন ব্যাস-বাল্মীকি এবং কালিদাস-ভবভূতির নাম উল্লেখ করেছেন। তাতে বোঝা যায় এই নাটকটির বিষয়বস্তু এবং ভাবাদর্শ তিনি বিদেশ থেকে গ্রহণ করেন নি, করেছেন স্বদেশ থেকেই। তাঁর পরবর্তী সব সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, বিদেশ থেকে বহু মণিরত্ন আহরণ করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নূতন ও বিচিত্র শোভায় প্রসাধিত করেছেন, তার দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত করেছেন। কিন্তু তার প্রাণবস্তুতে অর্থাৎ ভাবাদর্শে কোনো বিকার সাধন করেন নি। মধুসূদন-কল্পিত সীতা চরিত্র কি বাল্মীকি কালিদাস বা ভবভূতির সীতা থেকে হীনপ্রভ হয়েছে? মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র দুর্বল হতে পারে, কিন্তু তাকে অভারতীয় বলা যায় না।

শুধু সংস্কৃত নয়, পূর্বতন বাংলা সাহিত্যও যে মধুসূদনের অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস এ কথা তাঁর রচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়। 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন', এ উক্তি যে কবির ভাবাবেগজাত অতিশয়োক্তি নয় তা তাঁর উক্তি ও রচনা থেকেই সপ্রমাণ হয়। কবির চিত্তে মাতৃকণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল তা এই।—

ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান, তুই, যা রে ফিরি ঘরে।

তার পরে কবির উক্তি—

পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যকে সম্পদ্‌হীন দীন মনে করতেন না। এ সাহিত্যের যে সম্পদ্‌ তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন রচনায়। 'বঙ্গভাষা' নামক বিখ্যাত চতুর্দশপদী কবিতাটির পরেই স্থান পেয়েছে 'কমলে কামিনী' 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' 'কাশীরাম দাস' ও 'কৃত্তিবাস' নামে চারটি কবিতা। তা ছাড়া 'ঈশ্বরী পাটনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর' নামে তাঁর আরও দুটি সনেট আছে। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁর মতে পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ্‌ কি এবং এ সাহিত্যে তাঁর প্রেরণালাভের উৎস কোথায়। তা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল তাও অজানা নয়। বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের

প্রতি তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন। সে সাহিত্যকে তিনি কখনও হীনপ্রভ বলেও মনে করেন নি। তাঁর মতো নানা সাহিত্যে কৃতবিদ্য ও অকপটচিত্ত লোকের এই মনোভাবকে নেহাতই দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়।

শুধু সাহিত্য নয়, বাংলা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি এই—"Believe me, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up"। বহুভাষাবিৎ মধুসূদনের এই মন্তব্য শুধু অনুরাগের প্রকাশ নয়, তিনি বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়বান ছিলেন। তাঁর উক্তির সত্যতাও ইতিহাসে সপ্রমাণ হয়েছে। তাঁর অন্তরের এই প্রত্যয় কাব্যানুভূতিরূপেও প্রকাশ পেয়েছে।—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা !···
রূপহীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?···
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নবফুল বাক্যবনে, নব মধুমতী।

— 'চতুর্দশপদী কবিতা', ভাষা

এবার নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাহিত্যিক প্রেরণালাভের জন্য মধুসূদন একান্তভাবেই পাশ্চাত্য ভাবের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন না এবং তাঁর আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতাতেও ছেদ পড়ে নি। যে যুগেই হক আর যে ক্ষেত্রেই হক, শক্তিধর পুরুষের প্রভাবে সব সময়ই মনে হয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। কিন্তু তা আপাত-প্রতীতি মাত্র, যথার্থ সত্য নয়। গতানুগতিকতার অবসান হলেও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে না।

পূর্বে বলেছি মধুসূদন প্রধানতঃ সাহিত্যের বহিরঙ্গকেই পাশ্চাত্য ভূষণে ভূষিত করেছিলেন, তার ভাবাদর্শকে যথাসম্ভব অব্যাহত রাখতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এ কথা তাঁর ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধেও খাটে। তিনি অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে নিরঙ্কুশ ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে এ অভিযোগ আছে, কিন্তু তিনি বিদেশী ইডিয়ম আমদানি করেছিলেন এ অভিযোগ শোনা যায় না। এ দিক্ থেকে আধুনিক কালের বাংলাই অনেক বেশি অপরাধী। আজকাল তো দেওয়ালের লিখন, সিংহের ভাগ, অংশ গ্রহণ, সুবর্ণ সুযোগ ইত্যাদি-জাতীয় বিদেশী ইডিয়ম বাংলা ভাষায় ছড়াছড়ি। সে হিসাবে মধুসূদন বাংলা ভাষার শুচিতা রক্ষায় অনেক বেশি নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের অভিযোগটাও আসলে ভিত্তিহীন। যাঁরা কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-কাব্য, গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী, রামপ্রসাদের রণরঙ্গিণী কালী-বর্ণনা প্রভৃতি পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের শব্দপ্রয়োগ একটু মন দিয়ে লক্ষ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, মধুসূদন এ বিষয়ে পূর্বাগত ঐতিহ্যেরই অনুবর্তী, তিনি এ বিষয়ে নূতন কিছু করেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের আড়ম্বর কিছু কম নয়। যে

ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্র 'শব্দ-ব্যবহারে অদ্বিতীয়' 'শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি' ও 'অপূর্ব শব্দকৌশলী' বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁর রচনাতেও অজস্র বিরলপ্রয়োগ সংস্কৃত শব্দের পুঞ্জীকৃত সমাবেশ দেখা যায়। সুতরাং এবিষয়ে মধুসূদনকে ভূরিপরিমাণ সংস্কৃত শব্দ চালাবার দায়ে দায়ী করা যায় না। আরও একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত। মৃত্যুঞ্জয়, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা বাংলা গদ্যকে যে শক্তি ও সৌন্দর্য দান করেছিলেন, মধুসূদন বাংলা পদ্যকেও সে সম্পদে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এটা তাঁর ভাষার গুণই, দোষ নয়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আজও স্মরণযোগ্য।—

"যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু -প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।"

—'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যে সংস্কৃতবহুল ভাষাপ্রয়োগে স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগর-ভূদেবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন, বঙ্কিমসাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই তা জানা আছে। সংস্কৃতভূয়িষ্ঠ ভাষাব্যবহারের কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের স্থানই বোধ করি সর্বোচ্চে। গদ্য বা পদ্য রচনার এই কুশলতায় আর কেউ তাঁর সমকক্ষতার অধিকারী নন। গদ্যের প্রসঙ্গ থাক, পদ্য রচনায় তিনি যে মধুসূদনের সীমাকে অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, সেটাই আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও স্মরণীয়। 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা' 'তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' 'গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে'— এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত বিকীর্ণ হয়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। শুধু কবিতায় নয়, গীতিরচনাতেও এ জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন—

ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে,
মেঘ -মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি-প্রান্তে জ্বলে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি॥

কভু লোষ্ট্রকাষ্ঠ-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতলজল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া॥

ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই দেখা যায়, উচ্চাঙ্গ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত শব্দের আভিজাত্যে সমৃদ্ধ ও তার বিচিত্র ধ্বনিসংগীত মুখরিত হয়ে উঠেছে। অক্ষর ও স্বরই গৌড়ী রীতির বিশিষ্টতা, সংস্কৃত আলংকারিকের অভিজ্ঞতালব্ধ এই অভিমতের সত্যতা বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক যুগেই সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং অক্ষর ও স্বরের অপরাধে মধুসূদনকে অভিযুক্ত করা নিরর্থক।

নিছক শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তাই মধুসূদনের রচনার এই সংস্কৃত বাহুল্যের হেতু নয়। তার একটা বিশিষ্ট

হেতু আছে। পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় যে অনেক সময় পুঞ্জীকৃত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যায় তার প্রধান হেতু ছিল ধ্বনিগত আড়ম্বরবিধান। অনুপ্রাস বা যমক -বাহুল্য এই আড়ম্বরেরই প্রকারভেদ মাত্র। তা ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল দুর্বল বাংলা ভাষায় শক্তিসঞ্চার করা এবং নিস্তরঙ্গ বাংলা ছন্দকে তরঙ্গিত করে তোলা। রবীন্দ্রনাথই বোধ করি মধুসূদনের রচনার এই বিশিষ্টতা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন এবং এবিষয়ে নিঃসংকোচে তাঁর অনুবর্তী হয়েছিলেন। মধুসূদনের রচনার এই গুণের কথা তিনি জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কিছু অংশ উদ্ধৃত করি।—

"মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন— শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।"

—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', সাধনা ১২৯৯ শ্রাবণ

"বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। এতে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে।··· মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"

—বিহারীলাল, সাধনা ১৩০১ আষাঢ়

"বাংলা শব্দগুলো বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না।···এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।···বাংলা ভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।"

—ছন্দবিচার, বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

বস্তুত: রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনের চেয়ে অধিকতর সচেতন ছিলেন এবং সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে অধিকতর কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'উর্বশী' প্রভৃতি বহু কবিতার শব্দসম্ভারের প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই তা বোঝা যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনের অনবধানতার কথা উল্লেখ করতেও ত্রুটি করেন নি।—

"মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে পদে ঝংকৃত করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। সাধারণ পয়ারে এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় সে

তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনবধানতা মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।

এতগুলি পংক্তির আরম্ভে ও শেষে দুটিমাত্র যুক্তবর্ণের ধাক্কা। এর সঙ্গে প্যারাডাইস লস্ট্-এর সূচনা মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।"

—ছন্দের প্রকৃতি, উদয়ন ১৩৪১ বৈশাখ

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, বাংলা ভাষাকে বলিষ্ঠ ও তরঙ্গিত করবার অভিপ্রায়ে মধুসূদন সংস্কৃতেরই দ্বারস্থ হয়েছিলেন, বিদেশী উৎসের কাছে অঞ্জলি পাতেন নি।

মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি মিলটনের ব্ল্যাঙ্ক ভর্সকেই বাংলায় চালিয়ে নাম দিয়েছেন অমিত্রাক্ষর। এ ধারণাটা কতখানি সত্য ভেবে দেখা দরকার। মিলটনী অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদান হচ্ছে আয়াম্বিক পেন্টামিটার ছন্দ; তার বহিরঙ্গে আছে দুটি বৈশিষ্ট্য— এক, তার যতিস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রবহমানতা; আর দুই, তার মিলনহীনতা। পক্ষান্তরে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদান বাংলার স্বকীয় পয়ার ছন্দ, ইংরেজি আয়ামবিক পেন্টামিটার চালাবার কল্পনামাত্রও তিনি করেন নি। ইংরেজি অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে বাংলা অমিত্রাক্ষরের সাদৃশ্য শুধু তার বহিরঙ্গে। অন্তরঙ্গে বাংলা অমিত্রাক্ষর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। আর মিলনহীনতাও আমাদের দেশে অভিনব নয়। সমস্ত বনেদি সংস্কৃত ছন্দই যে মিলনহীন, এ কথা মধুসূদন ভালো করেই জানতেন। তবু মিলনহীন স্বচ্ছন্দযতি প্রবহান ছন্দ রচনার আদর্শ মধুসূদন ইংরেজি থেকেই নিয়েছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু যতিস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে তাঁকে বাংলা ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং নিজের সহজাত ছন্দোবোধের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল, ইংরেজি ভাষা ও ছন্দের গতিপ্রকৃতির উপরে নয়। দুই ভাষার ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মেঘনাদবধ কাব্যে (চতুর্থ সংস্করণ) 'ভূমিকা'তে (১৮৬৭) ঠিক এ কথাই বলেন।—

"ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্যরচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে।...সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার প্রথা প্রচলিত নাই।... তিনি [মধুসূদন] কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই লিখিয়াছেন।... কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে,... মাইকেলের অমিত্রছন্দে... সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরামযতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই।"

দেখা গেল মধুসূদন ভাষা এবং ছন্দ-প্রয়োগেও পূর্বাগত ধারা রক্ষা করেই চলেছেন। যে সব ক্ষেত্রে সে ধারাকে মোড় ফিরিয়েছেন সে সব ক্ষেত্রেও তার গতিপ্রকৃতি অব্যাহত রেখেই মোড় ফিরিয়েছেন।

কোনো কোনো বিষয়ে তিনি বিদেশী ভাষা থেকে প্রেরণা পেয়েছেন বটে কিন্তু সে প্রেরণাকেও তিনি বাংলা ভাষা ও ছন্দের শক্তি ও সম্ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েই কাজে লাগিয়েছেন।

বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ভাবাদর্শ, ভাষা ও ছন্দ সব ক্ষেত্রেই মধুসূদন সিদ্ধরস ও সিদ্ধরীতিকে অব্যাহত রেখেই তাকে নূতন পথে প্রবর্তিত করেছেন। সেইজন্যেই তাঁর কবিকৃতি তাঁর স্বজাতির কাছে এত সহজ স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করতে পেরেছে। যে সব ক্ষেত্রে সিদ্ধরস ও সিদ্ধরীতি লঙ্ঘিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেই ত্রুটি ঘটেছে। আর সে ত্রুটি উপেক্ষণীয় বলেও গণ্য হয় নি।

অতএব ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক ধারার অবসান হল, আর মধুসূদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সে সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক ধারার উদ্ভব হল, এবং এই দুই ধারা পরস্পর থেকে 'সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন' বহু প্রচলিত এই অভিমতটি স্বীকার্য নয় বলেই মনে করি। নূতন ধারা যদি পূর্বতন ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হত, তা হলে এ ধারা দেশের চিত্তে এমন সহজ স্বীকৃতি পেতেই পারত না। আসল কথা এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে নবশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ অনেকগুলি প্রতিভাশালী ও শক্তিধর পুরুষ প্রায় একসঙ্গে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সহসা অভূতপূর্ব শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুললেন। গ্রীষ্মকালে নদীর ক্ষীণ ও মৃদুগতি জলধারা যেমন বর্ষাকালের অকুণ্ঠ ঔদার্যের ফলে খরগতি ও কূলপ্লাবী বিপুল স্রোতোধারায় পরিণত হয়, ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও কতকটা সেই জাতীয় পরিবর্তনই দেখা দিয়েছিল। তার ঐক্য বা ধারাবাহিকতায় এবং তার প্রকৃতিগত প্রবণতায় কোনো ছেদ ঘটে নি।

কিন্তু একটা ক্ষেত্রে কিছু আকস্মিকতা ও প্রকৃতিবিরুদ্ধতাই ঘটেছিল বলা যায়। সে হচ্ছে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত বা ইংরাজি আদর্শের মহাকাব্য রচনার রীতি কোনোকালেই প্রচলিত হয় নি। রামায়ণ-মহাভারত ও চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালি বা মঙ্গলকাব্য-জাতীয় যে সব কাহিনীকাব্য প্রচলিত ছিল সেগুলি মহাকাব্যের সগোত্র নয়। সেগুলির জাত আলাদা; সেগুলির উৎস, আদর্শ ও লক্ষ্য ভিন্ন প্রকৃতির। তা ছাড়া সে সময়ে পাঁচালি-জাতীয় কাহিনীকাব্য রচনার ধারাও ফুরিয়ে এসেছিল। অন্নদামঙ্গল রচনার পরে এক শো বছরের মধ্যে ওই জাতীয় কাব্য খুব কমই রচিত হয়েছে। যা-কিছু রচিত হয়েছে তাও বাঙালির স্মৃতিস্বীকৃত ইতিহাসে স্থান পায় নি, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উপজীব্য হয়েই বিরাজ করছে। খোদ ইংলণ্ডেও সেযুগে প্যারাডাইস লস্ট্-এর ন্যায় কাব্য প্রত্নরত্নরূপেই সম্মানিত ছিল, অনুসরণযোগ্য সচল আদর্শ বলে স্বীকৃত ছিল না। এই অবস্থায় তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ কাব্যকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালাতিক্রমণের (anachronism-এর) দুটি অতি উজ্জ্বল ও মহৎ নিদর্শন বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি।

মহাকাব্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল নয়। জীবজগতের বিবর্তনে যেমন মাঝে মাঝে প্রকৃতির খেয়ালের নিদর্শন দেখা যায়, মানুষের মনোজগতের বিবর্তনেও তেমনি মাঝে মাঝে ইতিহাসের খেয়ালের খেলা দেখা যায়। এসব খেয়াল স্থায়ী হয় না, কারণ তা স্বাভাবিক বিবর্তন-ধারার ব্যতিক্রম মাত্র। উনবিংশ শতকের বাংলা মহাকাব্যের ভাগ্যেও তাই স্থায়িত্বলাভ হয় নি। বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্য প্রকৃতিতে গীতিকবিতা, কিন্তু আকৃতিতে মহাকাব্যের ছাঁচে ঢালা, বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত। এই কৃত্রিমতার জন্য কাব্যখানিকে ইতিহাসের হাতে মার খেতে হয়েছে। সর্গবদ্ধ সমগ্রতার মুখোশ পরে থাকায় তার যথার্থ স্বরূপটি পাঠক-সমাজের চিত্তে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

সারদামঙ্গল নামটির জন্যও তাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এই নাম ও আকৃতির কৃত্রিমতা -মুক্ত হয়ে যদি কাব্যখানি বিনা দ্বিধায় স্বতন্ত্র গীতিকবিতার সংকলনরূপে প্রকাশিত হত তা হলে তার আবির্ভাবে বাংলার সাহিত্য-আকাশ অনেক বেশি উজ্জ্বল আভায় উদ্‌ভাসিত হত, বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসও অনেক বৎসর এগিয়ে যেত। কেননা, গীতিকবিতাতেই ঘটেছে বাঙালি কবিচিত্তের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এবার সে প্রসঙ্গেরই অবতারণা করা যাক।

৩

আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণ কি কি, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আধুনিক গীতিকবিতা মুখ্যতঃ আত্মগত, কবি নিজের ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকেই বিশ্বজনীন করে তোলেন, সে আনন্দ-বেদনা ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়জাত হলেও তার প্রকাশ এমন হওয়া চাই যাতে তা সর্বজনের হৃদয়েই সাড়া জাগাতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজ এই জাতীয় গীতিকবিতার প্রবর্তক এবং তাঁদের Lyrical Ballads (১৭৯৮)-নামক গ্রন্থেই এই নূতন কাব্যধারার সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশের এই জাতীয় নূতন গীতিকবিতার প্রবর্তক কে? প্রায় সকলেই একবাক্যে এই কৃতিত্বের সম্মান দিয়ে থাকেন বিহারীলালকে, আর তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যখানি (১২৭৬।১৮৭০) এই নব্য গীতিকাব্যধারার উৎসস্থল বলে স্বীকৃত। অষ্টম সর্গের প্রথম গীতিটি বাদে এই কাব্যের সবগুলি রচনাই প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৪ এবং ১২৭৬ সালের 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায়। এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'বঙ্গসুন্দরী' পাঠেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ কবিত্বের দীক্ষা লাভ করেন, এ কথা বলা অন্যায় নয়। যা হক, এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার একটি অংশ এই।—

"বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।··· সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

"ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না,— কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।···

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
    চারিদিকে ঝালাফালা,
    উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বোধহয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখন কখন প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

"বিহারীলাল··· নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।···এইজন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।···

"এইজন্য কবি যখন গাহিলেন 'সর্বদাই হু হু করে মন' তখন বালকের [অর্থাৎ বালক রবীন্দ্রনাথের] অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল।"

—'আধুনিক সাহিত্য', বিহারীলাল (সাধনা ১৩০১ আষাঢ়)

অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গসুন্দরী কাব্যের 'সর্বদাই হু হু করে মন' ইত্যাদি 'উপহার'-নামক প্রথম সর্গটিতেই (১৮৬৭) রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় 'কবির নিজের সুর' প্রথম শুনেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এটাই কি প্রথম কবির নিজের সুর? রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, 'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না।' সুতরাং এ বিষয়ের ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

অবোধবন্ধু পত্রিকায় বঙ্গসুন্দরী কাব্যের প্রথম সর্গ ('উপহার') প্রকাশের পূর্ব বৎসরেই মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয় (১৮৬৬ আগস্ট)। এই জাতীয় কবিতা রচনার কল্পনা তাঁর মনে দেখা দেয় অনেক আগেই। 'বঙ্গভাষা' নামক বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম খসড়াটি রচিত হয় ১৮৬০ সালে। এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে নানা স্থানেই কবির নিজের মনের কথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তবে চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে কবির আত্মকথা কঠিন ও সংহত হয়ে আসে, তাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস স্ফূর্তি পায় না,—রবীন্দ্রনাথের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনও তা অবশ্যই অনুভব করে থাকবেন। যথার্থ লিরিক বা গীতিকবিতার প্রকৃতি কি তাও তাঁর অজানা ছিল না। মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গ রচনার সময়ে (১৮৬১ প্রথমার্ধ) রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন— I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad.··· There is the widefield of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

এই পত্র লেখার কাছাকাছি সময়েই মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' গীতিকাব্যখানি প্রকাশ করেন (১৮৬১ জুলাই)। এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে কবির আত্মনিবেদনের বা নিজের আনন্দবেদনার কথা নেই বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই যথার্থ লিরিক্যাল সুর প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ হৃদয়ানুভূতির সংগীত গীতিকবিতা-সুলভ ভাষা ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। যেমন—

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?

—কুসুম

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কলকল,

চঞ্চল অলিদল,
উছলে স্বরবে জল,
চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজ-রমণে।...
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!
ধূপরূপে পরিমল
আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল
মঙ্গল-ধ্বনি!
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, সজনি।

—বসন্তে

এসব রচনার ভাষায় ছন্দে ও মিলে নিঃসন্দেহেই উত্তরকালীন রবীন্দ্র-রচিত গীতিকবিতার ক্ষীণ পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। গীতিকবিতার উৎস হিসাবে মধুসূদন যে বৈষ্ণব পদাবলীর শরণ নিয়েছিলেন, এটাও তাৎপর্যহীন নয়। এ ক্ষেত্রেও অগ্রগামিতার মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশের অল্পকাল পরেই মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচিত হয় (১৮৬১ সালের শেষার্ধে)। এটি ১৭৮৩ শকাব্দের (ইং ১৮৬১। বাং ১২৬৮) আশ্বিন-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই।—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধুপানে যায়,
ফিরাব কেমনে।
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না, একি দায়!

এই কবিতাটিতে কবিচিত্তের বেদনা রসধারা অবারিত স্রোতে উচ্ছলিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে কবির নিজের মনে যে সুর বেজেছে তা কি সকলেরই হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন জাগায় না? সকলের হৃদয়ে অনুরণন জাগাবার এই যে ক্ষমতা, তাই তো লিরিক কবিতার প্রাণবস্তু। মনে রাখতে হবে এই আত্মবিলাপ কবিতাটি বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী কাব্যের অন্ততঃ ছয় বৎসর আগে রচিত ও প্রকাশিত। 'সর্বদাই হুহু করে মন' ইত্যাদি রচনায় কবির যে মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' ইত্যাদি আত্মবিলাপে তো তা-ই ধ্বনিত হয়েছে অন্য রূপে ও অন্য সুরে। 'I think I have a tendency in the Lyrical way', মধুসূদনের এই উক্তি নিরর্থক নয়।

'আত্মবিলাপ' রচনার কয়েক মাস পরে এবং বিদেশ-যাত্রার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন আর-একটি

গীতিকবিতা রচনা করেন (৪ জুন ১৮৬২)। এটিও সুপরিচিত। নাম 'বঙ্গভূমির প্রতি'। তার প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করি।—

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।···
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?

অতঃপর বিদেশে গিয়ে তিনি সনেট-রচনাতে আত্মনিয়োগ করেন। গীতিকবিতা রচনার সুযোগ তাঁর জীবনে আর হল না। অথচ এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা বিকাশের প্রচুর অবকাশ ও সম্ভাবনা ছিল এবং সর্বশক্তি নিয়ে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। এই অভিপ্রায় সাধনের সুযোগ যে তার জীবনে কখনও এল না, এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও একটা পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এখানে মনে প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ যখন আত্মগত গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বঙ্গসুন্দরী কাব্যকে অগ্রণীত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং বিহারীলালকে 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি' বলে আখ্যাত করেন, তখন তিনি কি মধুসূদনের লিরিক প্রতিভা সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন ? মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় কখনও কখনও কবির আত্মনিবেদনের সুর প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু সনেটের নির্দিষ্ট বিধিবিধান ও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সে সুর গীতোচ্ছ্বাসে পরিণত হবার সুযোগ পায় নি, এ কথাও তিনি বলেছেন। পক্ষান্তরে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যদি বা কখনও কখনও বেদনার সংগীত উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকে, তবু সে বেদনা কবির নিজের হৃদয়জাত নয়। বোধ করি সেজন্যই তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। কিন্তু মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির অগ্রণীত্বের অধিকারকে তো কোনো প্রকারেই উপেক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে এই কবিতাটির কথা সে সময়ে অবগত ছিলেন না তাও নয়। কারণ ১২৯০ (ইং ১৮৮৩) সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'সিন্ধুদূত' নামে একটি কাব্যের ছন্দ-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতি থেকে ওই কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেন।[১] তা হলে বিহারীলালের আত্মগত কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি এই কবিতাটির কথা উল্লেখও করলেন না কেন ? অনবধানতাই কি তার কারণ ? আমার বিশ্বাস, তা নয়। সম্ভবতঃ 'আত্মবিলাপ'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছু ভ্রান্তি ছিল। এই ভ্রান্তি ঘটবারও একটু কারণ ছিল বলে মনে করি। সে কারণটি এই।—

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের পাঠক মাত্রই জানেন, ১২৮১ (ইং ১৮৭৪) সালের 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় যখন বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যখানি প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ওই ১২৮১ সালেরই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'আর্যদর্শনে' (পৃ ৯১) মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি' ইত্যাদি কবিতাটি মুদ্রিত হয় 'আশার ছলনা' নামে। তার পাদটীকায় ছিল এই মন্তব্যটি—

"আমরা মৃত মহাত্মা কবিবর মধুসূদন দত্তের ক্লার্ক মহাশয়ের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কবিতাগুলি

১ দ্রষ্টব্য : 'ছন্দ' (১৯৬২), বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ।

প্রাপ্ত হইয়া মৃত কবির প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সাধারণকে উপহার দিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণে অতি সমাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন।"

—আর্যদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯১ পাদটীকা

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আর্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও জানতেন না যে, এই কবিতাটি প্রায় তেরো বৎসর পূর্বেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আত্মবিলাপ' নামে। তাই একটি অপ্রকাশিত কবিতা হিসাবেই তিনি এটিকে সাধারণকে উপহার দিয়েছিলেন। এর থেকে এ ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক যে, কবিতাটি মধুসূদনের শেষ বয়সের, হয় তো মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বের রচনা। আর্যদর্শনের আগ্রহী পাঠক বালক রবীন্দ্রনাথের মনেও বোধ হয় এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কবিতাটি যে তাঁর জন্মের কয়েক মাস মাত্র পরে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথা তৎকালে তাঁর জানা থাকা প্রত্যাশিত নয়, বিশেষতঃ যে স্থলে পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় নিজেও অনবহিত ছিলেন। মনে হয় পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথের বালককালের এই ধারণা অপরিবর্তিতই ছিল। সম্ভবতঃ এজন্যই 'আশার ছলনা' কবিতাটির কথা মনে রেখেও তিনি বিনা দ্বিধায় 'সর্বদাই হু হু করে মন'-কে অগ্রগামিতার মর্যাদা দিয়েছেন।

এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন যে, লিরিকভাবের প্রতি তাঁর একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সে শক্তিও যে তাঁর ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ মহাকাব্য-রচয়িতা হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল স্বভাবতঃ লিরিকধর্মী, মহাকাব্য রচনায় তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি, এ কথা মনে করা অন্যায় নয়। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন তাঁর মহাকাব্যের ভেরীধ্বনির অন্তরালেও গীতিকবিতার কলধ্বনিই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এবং তাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেছে। অর্থাৎ মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁর প্রতিভার স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে। সমালোচকের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা উপেক্ষণীয় মনে করা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে— তাই যদি হবে তবে মধুসূদন তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রণোদনাকে না মেনে মহাকাব্য রচনার দিকে ঝুঁকলেন কেন? তার উত্তর সম্ভবতঃ এই যে, অল্পবয়সে তিনি তাঁর শিক্ষকদের কাছে যে সাহিত্যের শিক্ষা পেয়েছিলেন সে সাহিত্য ছিল মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিকাল ইংরেজি সাহিত্য, তৎকালীন সচল ইংরেজি সাহিত্য নয়। এই শিক্ষালব্ধ অনুরাগই পরবর্তীকালে তাঁকে মহাকাব্য রচনায় প্রবর্তিত করেছিল। বলতে গেলে এটা তাঁর শিক্ষাগত ত্রুটিরই ফল। বাংলা ভাষার প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির বিমুখতার প্রসঙ্গে বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক পত্রে (২৬ জানুআরি ১৮৮৫) তিনি লেখেন—"Such of us as, owing to early defective education, know little of it [Bengali Language] and have learnt to despise it, are miserably wrong"। এই যে শিক্ষার ত্রুটির কথা তিনি বললেন সে ত্রুটি শুধু বাংলা ভাষায় অজ্ঞতার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, যে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁরা দীক্ষা পেয়েছিলেন তাও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষারই পরিণাম মহাকাব্য রচনার আগ্রহ। যদি তৎকালীন সজীব ও সচল ইংরেজি লিরিক সাহিত্য তাঁর শিক্ষায় প্রাধান্য পেত তা হলে সম্ভবতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা মহাকাব্যের পর্ব কখনও দেখা দিত না, গীতিকবিতার ধারাই অব্যাহত থাকত।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"তিনি যদি···সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গলা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত।"

—ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা

বোধ করি মধুসূদন সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে বলা যায়, তিনি যদি সজীব ও সচল অর্থাৎ কালোপযোগী সাহিত্যের শিক্ষা পেতেন তা হলে তাঁর প্রতিভাবলেই বাংলা সাহিত্য আরও অনেক দূর অগ্রসর হত, বাংলা গীতিকবিতার উন্নতি ত্রিশ বৎসর এগিয়ে যেত। মধুসূদনের প্রবর্তনা না পেলে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কখনও মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হতেন কি না সন্দেহ। মহাকাব্য রচনা তাঁদের পক্ষেও কৃত্রিম প্রচেষ্টারই ফল। তাঁদের প্রতিভাও যে মহাকাব্যের চেয়ে গীতিকবিতারই বেশি অনুকূল তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের পর্বটি বাংলা কাব্যের স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম এবং বাঙালি কবিপ্রতিভার স্বধর্মচ্যুতির একটা আকস্মিক ও বিস্ময়কর নিদর্শন রূপেই ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ('ক্ষণিকা', ক্ষতিপূরণ) আছে—

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে—
ছিল মনে।
ঠেকল কখন তোমার কাঁকণ
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়॥

এক-এক সময় মনে হয় মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার কল্পনাটি যদি কোনো অভাব্য দুর্ঘটনায় ফেটে গিয়ে হাজার গীতে পরিণত হত তবে মহাকাব্য লাভের গৌরবে বঞ্চিত হয়ে আমাদের যে মর্যাদাহানি ঘটত, বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে কি তার ক্ষতিপূরণ হত না? আর কিছু না হক, তাতে বাংলা গীতিকবিতার স্রোতোধারা যে অবিচ্ছিন্ন থাকত এবং তার বিস্তার ও গভীরতা যে বহুল পরিমাণে বেড়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই।

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ইন্দ্রমিত্র। আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। ত্রিশ টাকা।

বিদ্যাসাগর। সন্তোষকুমার অধিকারী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা ১২। ছয় টাকা।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মত এত বড় একজন শিল্পী তাঁর 'লাস্ট সাপার' ছবিটি শেষ করতে পারেন নি। মিলানের ডিউক কারণ জানতে চাইলে বলেছিলেন, পৃথিবীর কোন্ প্রতিরূপে আমি তাঁদের মুখ আঁকব—সেই ভগবান খৃস্ট আর কৃতঘ্ন জুডাসকে? শেষে জুডাসের মুখ তিনি এঁকেছিলেন, কিন্তু খৃস্টের আর আঁকতে পারেন নি। বলেছিলেন, আমি কি করে তাঁকে ধারণা করব?

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

রামেন্দ্রসুন্দর তাই লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগর নামে আমাদের কোনো অধিকার নেই। কারণ 'বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।'

বাঙলাদেশে বাঙালি জুডাসের কথা লেখা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের কথা লেখা হচ্ছে। এই লেখায় সেকালের বিদ্যাসাগরচরিত-গ্রন্থগুলির সঙ্গে একালের আরও দুটি নাম যুক্ত হল—একটি শ্রীইন্দ্রমিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', অপরটি শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর'।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই বিরাট পৃথিবীর সংস্রবে এসে যতই আমরা মানুষ হয়ে উঠব ততই আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রগৌরব অনুভব করব এবং তাতেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে ও বিদ্যাসাগর-চরিত্র বাঙালির জাতীয়-জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

যতদিন তা না হয় ততদিন নিশ্চয়ই আরও বিদ্যাসাগরচরিত রচিত হবে।

বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করা, বাঙলা শিক্ষা প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, আদর্শ বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি এগুলি বিদ্যাসাগরের নিঃসন্দেহে প্রধান কীর্তি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়। তা যদি হত তা হলে এই-সমস্ত কীর্তির ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর একদিন নিঃশেষিত, নয়তো বড় জোর নতুন নতুন তথ্যের সংযোজনে বিশদ হতেন। তা যে হন নি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিদ্যাসাগর-চরিত্র সম্পর্কে আমাদের অদ্যাবধি বিস্ময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরম বিস্ময় বিদ্যাসাগর। বিস্ময়ের মত আকর্ষণ করার এত ক্ষমতা আর কিছুর নেই। তাই বিদ্যাসাগর-চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনে এই বিস্ময় যতদিন থাকবে চরিতকারেরা ততদিন তাঁর চরিত-রচনায় আকৃষ্ট হবেন।

তবু বিস্ময় যেহেতু অমূলক নয় সেইহেতু বিদ্যাসাগরের চরিত্রের উপর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও—এককথায় ইউরোপীয় নবজাগরণের পরোক্ষ প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবু বিদ্যাসাগর সেই প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে কোনো ধর্মমতে বা ইয়ং বেঙ্গলের নব্য সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি 'স্বতন্ত্র সচেতন'। ইউরোপীয় নবজাগরণের মূল ভাবটিকে বিদ্যাসাগর নিজের ও তাঁর স্বদেশের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিস্ময়ের সবচেয়ে বড় বস্তু তাঁর মুক্ত মন, যার অপর নামই ব্যক্তিত্ব। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'I··· admired his great personality,··· the breadth and liberality of his views.' জীবদ্দশাতেই তিনি 'বিদ্রোহী' আখ্যা পেয়েছিলেন। ১২৯০ সালের আষাঢ়ে 'প্রবাহ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'মহাত্মা বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বপ্রধান বিদ্রোহী।' পণ্ডিতের ঘরের ছেলে, নিজেও পণ্ডিত হয়ে যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম ব্যাপারে ড. ব্যালানটাইনের রিপোর্টের জবাবে জানান, বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতিষেধক হিসেবে মিলের লজিক পড়ানো দরকার, সেই বিদ্যাসাগরকে একদা তাঁর অশৌচ অবস্থায় ছোটলাট ডেকে পাঠালে বলেছিলেন— আপনার যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয় তা হলে এই অবস্থায় দেখা করতে পারি। ছোটলাট তাতেই রাজি। খালি পায়ে, খালি গায়ে বিদ্যাসাগর ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করতে যান।

বিদ্যাসাগরের সমস্ত কীর্তির মূলে তাঁর মুক্ত মন, প্রত্যক্ষ বা কাণ্ড জ্ঞান যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিধবাবিবাহ, বাঙলা শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা সবই তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিবেশী মানুষকে নিয়ে। যা বর্তমান মানুষের কাজে লাগে না সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহী নন। তাই নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও বুঝেছিলেন আধুনিক বাঙলার ভবিষ্যৎ সংস্কৃত শিক্ষায় নয়, বাঙলা এবং ইংরেজি শিক্ষায়। ভগবান আছে কি নেই এ নিয়েও তাঁর সেই এক মনোভাব। মানুষের দুঃখকষ্টের মত এত বড় প্রত্যক্ষ ব্যাপার এড়িয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিতর্কে যাওয়ার তাঁর অবসর ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরও ঠিক এই কথাটাই লিখেছিলেন— 'দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি, সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথ একসময়ে লিখেছিলেন, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা সংগ্রহ করতে জানেন কিন্তু আয়ত্ত করতে জানেন না। বিদ্যার সংগ্রহ মানুষের অধ্যবসায়ের কাজ, আর তাকে আয়ত্ত করা অর্থাৎ নিজের ও অপরের কাছে সহজ করা ধীশক্তির কাজ। ইন্দ্রমিত্র তাঁর 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বিপুল অধ্যবসায়ে যেমন পূর্বসূরীদের বিদ্যাসাগরচরিতের সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তেমনি নিপুণ বিচারক্ষমতার দ্বারা সেগুলির ঝাড়াই-বাছাই করে' বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে আয়ত্ত করেছেন। গ্রন্থকারের পারদর্শিতায় 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' তাই একখানি বিপুলায়তন গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে, ভারি বই হয়ে ওঠে নি। পঁচিশটি অধ্যায়ের পরতে পরতে ইন্দ্রমিত্র বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে পাঠকের কাছে মেলে ধরেছেন।

বাল্যকালে বীরসিংহ থেকে কলকাতার পথে মাইলস্টোন গুনতে গুনতে ইংরেজি সংখ্যা আয়ত্ত করা থেকে মারা যাবার দিন পর্যন্ত তাঁর হাতে-গড়া মেট্রোপলিটন কলেজের কথা বলা— বিদ্যাসাগরের জীবনের এই আরম্ভ থেকে শেষ অবধি প্রায় এমন কোনো ঘটনা নেই যা গ্রন্থকারের আলোচনার মধ্যে আসে নি। ঐতিহাসিক বিচার-বিবেচনা নিয়ে দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের দামোদর-সন্তরণ ব্যাপারটির বিশেষ প্রামাণিকতা নেই; আবার, বিদ্যাসাগর সাহেব-সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন— পূর্বসূরীর এমন মতকেও তিনি ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সামান্য ত্রুটি-

বিচ্যুতিকে তাঁর অসামান্যতার আড়ালে গোপন করেন নি। দেখিয়েছেন, বিধবাবিবাহের ব্যাপারে তাঁর মত এত বড় উদ্যোক্তাও অনুরোধে পড়ে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছেন, ছোটলাট হ্যালিডের অনুরোধে ধুতি-চাদর ছেড়ে দু-চারদিন প্যাণ্ট চোগা-চাপকান-পাগড়ি পরেছেন। সমগ্র গ্রন্থে এইভাবে বিদ্যাসাগরের বিবিধ পরিচয়ে গ্রন্থকারের প্রশংসনীয় ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি ও চরিতকারের সার্থক সৃজনক্ষমতার পরিচয় ছড়ানো। ইন্দ্রমিত্রের 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' বাঙলা চরিতসাহিত্যে নিঃসন্দেহে একখানি মূল্যবান সংযোজন।

এই বিরাট কাজে তথ্যবিন্যাসে এবং সিদ্ধান্তকরণে কোথাও যে একেবারে কোনো প্রশ্ন জাগে না তা নয়। উদাহরণ হিসাবে, মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরের জামাতা অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারীর অপসারণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দ্রমিত্র তাঁর গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে এই অপসারণের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, কলেজ-তহবিল থেকে সূর্যকুমারের দু-তিন হাজার টাকা তছরুপ করা। গ্রন্থকার তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য দুটি তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন— একটি স্বপ্নদর্শন, অপরটি পরমুখে এক গল্পশ্রবণ। প্রথমটি সূর্যকুমারের স্বপ্নদর্শন, যা তাঁর কন্যা সরযূবালা দেবী ১৩২৭ সালের ভাদ্র মাসে 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় "বিচিত্র স্বপ্নদর্শন" নামে একটি রচনায় লেখেন। দ্বিতীয়টি সূর্যকুমারের মৃত্যুর (১৯২৬) সাতাশ বছর বাদে ১৩৬০ (১৯৫৩) সালের আশ্বিন মাসে 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা'য় প্রকাশিত জনৈক যতীন্দ্রমোহন ঘোষের "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপয় অপ্রকাশিত গল্প" নামে রচনা।

"বিচিত্র স্বপ্নদর্শন" নামে লেখাটিতে সূর্যকুমারের স্বপ্ন বিবৃতি করে সরযূবালা দেবী লিখেছেন, 'অনতিবিলম্বেই যেন কোন অব্যক্ত কারণে পিতার সহিত উক্ত কলেজের সমস্ত সংশ্রব রহিত হইল'— কলেজের তহবিল তছরুপ করা বা এমন ধরণের কোনো ঘটনার কথা লেখিকা সূর্যকুমারের কাছে শুনেছিলেন বলে রচনায় উল্লেখ করেন নি। উল্লেখ করলেও অবশ্য স্বপ্ন বলেই তাকে ইতিহাসের বাস্তব বিচারে মূল্য দেওয়া যেত না।

সূর্যকুমারের তহবিল তছরুপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা'য় প্রকাশিত উপরিউক্ত লেখাটিতে। এই তথ্য অবশ্য উক্ত লেখকের জানা নয়, মাত্র অপরের মুখে শোনা। একদা মেট্রোপলিটন কলেজের এফ. এ. ক্লাশের ছাত্র, বর্তমানে পরলোকগত মুক্তিদারঞ্জন রায় নামক এক ভদ্রলোকের মুখে এই ঘটনাটি তিনি শোনেন বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই দাবি কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা সেকালের কোনো বিদ্যাসাগর-চরিতকারের উক্তির দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। ইন্দ্রমিত্র সূর্যকুমারের অপসারণ-প্রসঙ্গে শোনা-কথাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর-চরিতকারদের কারও কথা উল্লেখ করেন নি। অপসারণ-প্রসঙ্গে এঁদের বক্তব্যগুলি পাশাপাশি রাখলে দেখা যায়: চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সূর্য্যবাবু ১৩ বৎসরকাল মেট্রোপলিটানের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলেজের কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন।' শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, '১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ১লা ভাদ্র··· জ্যেষ্ঠা বধূদেবী পরলোকগমন করায়, অগ্রজ মহাশয় নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় অভিভূত হইলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ঐ বৎসর ভাদ্র মাসের ২৫শে রবিবার সূর্য্যবাবুকে পদচ্যুত করেন'। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর

মহাশয় জামাতা সূর্য্যবাবুর কোনো কার্য্যের কর্ত্তব্যত্রুটি বিবেচনায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।' বিদ্যাসাগরের কোনো চরিতকারই সূর্যকুমার অধিকারীর তহবিল তছরুপের কথা বলেন নি।

বিদ্যাসাগরের জীবন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে লেখা সন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর' সংক্ষিপ্ত হলেও একখানি সম্পূর্ণ ও সুলিখিত গ্রন্থ। শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তেরটি অধ্যায়ে তিনি একদিকে যেমন আশ্চর্য সংযমে বিদ্যাসাগরের জীবনের ইতিহাস রচনা করেছেন ও তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন, অপর দিকে নিষ্ঠাবান গবেষকের মন নিয়ে বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত রচনার সংযোজনে নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কলেজের ভাবধারা, রামমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে সনাতন ধর্মবোধ, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় ইতিহাসের ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়— এগুলি পটভূমিতে রেখে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের রহস্যকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন। আবার, বিদ্যাসাগরের মত মানবপ্রেমিকের পক্ষে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ কেন অনিবার্য হল তার সার্থক বিশ্লেষণও করেছেন তিনি। বিদ্যাসাগরের যে অপ্রকাশিত পত্রটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন সে পত্রটি রানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়কে লেখা।

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার মন্তব্য করেছেন, 'বেদান্ত ও অদ্বৈতচিন্তাধারার প্রভাব তাঁর ওপর ছিল, এ ধারণা অমূলক নাও হতে পারে।' ড. ব্যালানটাইনের রিপোর্টের জবাবের কথা বর্তমান আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে কিন্তু বিদ্যাসাগর সরাসরিভাবে বলেছেন, 'Vedanta and Sankhya are false systems'।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশবন্ধু। মণি বাগচি। মোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। পনেরো টাকা।

চরিত-কথা প্রণয়নে শ্রীযুক্ত মণি বাগচি মহাশয়কে একজন অক্লান্তকর্মীই বলা চলে। তিনি এই ধরনের রচনায় শুধু সিদ্ধহস্ত নন, এ কাজে প্রায় রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছেন। যখনই কোনো উপযুক্ত সুযোগ আসে, যেমন শতবার্ষিকী-বন্দনা বা অন্য কোনো উপলক্ষ, অমনি আমাদের অবাক করে তাঁর ঠাকুরদার ঝুলি থেকে পঞ্চ উপাদানে মিশ্রিত এক-একটি সবাক্ জলপানের মুখরোচক প্যাকেট বহির্গত হয়। আর সেইগুলি এমন-সব লোকোত্তরদের নাম ঘিরে যাঁরা সত্যিই 'রিয়াল মহাত্মা', নিজের গুণে বন্দনীয়, যাঁদের পুণ্যনাম স্মরণে মননে শ্রবণে কীর্তনে সবভাবেই সার্থকতা আছে— ভৌতিক-আধিভৌতিক, দৈবিক-আধিদৈবিক, আর্থিক-পরমার্থিক। গৌতম বুদ্ধ থেকে বার্নার্ড শ, লীলা-কঙ্ক থেকে শিশিরকুমার আর বাংলার থিয়েটার, বিশ্ববরেণ্য সাধক বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, কেমন করে স্বাধীন হলাম— সবই মণিবাবুর প্রসারিত চেতনার বিরাট পরিধিতে স্থান পেয়েছে।

১৯৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী— মণিবাবু সে কথা স্মরণ রেখে 'অরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বাংলা' সম্বন্ধেও শিলান্যাস শুরু করেছেন— বিরল জনপথের সীমিত কর্মযোগোদ্যান থেকে তাঁকে শঙ্খ-ঘণ্টামুখর রাজপথের সুউচ্চ মন্দিরে স্থাপন করবেন বলে। তাঁর উদ্যম প্রশংসনীয়, তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ

দিতেই হবে। এই শতকের প্রাণপুরুষদের কথা যত ভাবে আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। আজ তাঁদের বক্তব্যকে কর্মধারাকে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি চিন্তাসূত্রে গ্রথিত করে জাতীয়-জীবনের পুষ্টিমার্গে নিয়ে যেতে হবে, সমাজচেতনার একটি সামগ্রিক প্রখর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোনো বিশেষ রীতি-নীতির আলোকের 'প্রিজমে'র মধ্য দিয়ে নয়। তবে আলাপ যেন শুধু প্রলাপ ও বিলাপে পর্যবসিত না হয়। আজকের যুগ শুধু ক্ষুধার যুগ, ক্রুদ্ধ জনতার যুগ নয়, নিষ্করুণ কঠোর বাস্তববাদীর যুগও, স্থষ্টি-দৃষ্টির যুগ। তবে আমরা ভুলে যাই যে যা ঘটে তা নানা কারণেই ঘটে, তার সঙ্গে সুদূর বা অদূর অতীতের অচ্ছেদ্য কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। আজকের যুগের ভাবে ভাষায় বিশ্লষণে বিচিন্তায় যা অচল, একদিন তাই ছিল সচল। ঐতিহাসিকতার নিয়মকে ধারাবাহিকতার স্রোতকে তার নিজের চলমান ঘূর্ণীবেগকে জাতীয়-জীবনের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সংগত কারণ নেই। টয়েনবীর ভাষায় একে বলা যায় চ্যালেঞ্জ রেসপন্স অ্যাসিমিলেশন। তাই ইতিহাস যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁরা বীর, তাঁরা সাধক, তাঁরা সত্যের উপাসক, তাঁরা ব্রাত্যদেবতার সহচর। আজ রাষ্ট্রনীতি সমাজচেতনা বা শিক্ষার মূল্যায়ন নিয়ে নূতন ভাবধারার উদয় হওয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনি সংগত প্রাচীন বা বিগত ভাবধারার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ব্যষ্টির জীবনের মত সমষ্টির জীবনও একটি বহতা নদী। যার আছে আর যার নেই, angst, alienation, frustration অন্নহীনের জন্য অন্ন আজ আর কবিকল্পনার বা উদারচরিতদের আলাপ-আলোচনার বস্তু নয়— জীবনের দাবি। তারই নিরিখে যুগে যুগে মূল্যায়ন বদলাতে বাধ্য। Bread for one's ownself is selfishness, bread for your neighbour is socialism। বিপ্লবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে বিশেষরূপে প্লাবন। শুধু জন ও গণ নামেই বিপ্লব হয় না, আসে না, তদ্ভাবভাবিত হতে হয়, বহুর মধ্যে সে প্রাণধারা সঞ্চারিত করতে হয়, তাকে বিচার-বিশ্লেষণে পরিস্ফুট করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, প্রাণবেদীতে। যিনি যে যুগেই সেই বিশিষ্ট কাজ করুন, সে রাজনীতি-ক্ষেত্রেই হোক, সমাজচেতনার পুষ্টিতেই হোক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই হোক, শিক্ষার আদর্শের আয়োজনেই হোক সাহিত্যের ভাব-বিকাশ বা গঠনশৈলীতেই হোক, তিনিই নমস্য, তিনিই বিপ্লবী।

আলোচ্য পুস্তকটি প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠাব্যাপী, তিন খণ্ডে বিস্তৃত। সুধী লেখক তিনটি পর্বের নামকরণ করেছেন— জাগরণ (১৮৭০-১৯১৬), বিস্ফোরণ (১৯১৭-১৯২২), উদ্ভাসন (১৯২২-১৯২৫)। পঞ্চান্ন বছরের একটি ঠাস-বুনন জীবনকে এইভাবে কালবিভাগে বিচিত্রিত করা যায় কি না জানি না বিশেষ করে চিত্তরঞ্জনের জাগরণের কালসীমাকে টেনে আনা হয়েছে ১৯১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এ কথা হয়তো সত্য যে লেখক তাঁকে অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে চান অর্থাৎ যখন তিনি সর্বত্যাগী দেশবন্ধু। কিন্তু লেখক এর একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন সেটি সর্বজনগ্রাহ্য না হতে পারে— 'আমরা জানি, দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই তাঁর কাছে ছিল একমাত্র সত্য এবং এই সত্যের সাধনে তিনি তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনে যে অপূর্ব কৌশল ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত তার একটা সঠিক মূল্যায়ন হয় নি বললেই চলে— যদিও দেশবন্ধু সম্পর্কে জীবনীগ্রন্থের অভাব নেই। এই গ্রন্থে তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।' লেখকের দিক থেকে তিনি একটা বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে দেশবন্ধুকে নিবদ্ধ রেখেছেন এবং সেই বিচারবস্তুর সীমা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকায় তাঁর আলোচনায় সামগ্রিক চিত্তরঞ্জন উদ্ভাসিত নন এ কথা বললে লেখকের প্রতি অবিচার করা

হয়তো হয় না। বরং ঐ গণ্ডীর মধ্যে তাঁর আলোচনা ও বক্তব্য প্রসাদগুণসম্পন্ন। কিন্তু সামগ্রিক চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে আরো গভীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় বইটির সর্বাঙ্গীণ মূল্য বৃদ্ধি পেত। চিত্ত, দাসসাহেব, চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু তাঁরই জীবনের রূপ থেকে রূপান্তর, কিন্তু বীজে গোত্রান্তর নয়। 'দেশবন্ধু' এই অভিধাটি রবীন্দ্রনাথই বিশেষভাবে প্রথম ব্যবহার করেন 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' এই সুবিখ্যাত কবিতাটিতে। 'দেশবন্ধু' কথাটির আর-একটি নিহিতার্থ আছে, যে দেশবন্ধু হুচ্ছে সেই হরিজন যে সমাজে অনভিজাত, অস্পৃশ্য। মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহাদেবতা তারই লীলা-সহচর সে— সেই তো দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ। নিত্য দিনপঞ্জী, সাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাপুঞ্জ, তাঁর ভক্তদের আবেগপরায়ণ প্রশস্তি, তাঁর নিন্দুকদের সরব প্রত্যাখ্যান কোনো একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করে না, যদি না তার ভিতরের মনটিকে খুঁজে ধরতে পারি, আশা আবেগ আকাঙ্ক্ষার মৌল তত্ত্বটিকে (Hard Core) স্পর্শ করতে পারি। সব মিলিয়ে "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত" একটি ভাববিভূতির কল্পলোক গড়লেই একটা যুগকে একটা জাতিকে বা তার বিশিষ্ট হোতাদের বা নেতাদের বোঝা যাবে না, কারণ পলিটিক্স মানেই প্রেফারেন্স নয়, মতবাদ নয়। প্রোলেটেরিয়াট মানে শুধু শ্রেণীবিভাগ বা গোষ্ঠিসেবা নয়, কলাকৌশল মানে শুধু ছলবল বা আইনকানুন রীতিনীতির সোচ্চার ব্যাখ্যা নয়, তারও পিছনে চাই চারিত্রশক্তি ও ব্যক্তিত্ব, প্রাণসঞ্চারী মনোময় "কেবল রস নিরমাণ"। তাই অন্তরানুভূতিসম্পন্ন এক কবিমনীষীর চিত্ত মথিত করে দুটি লাইন সূত্রাকারে বেরিয়ে এসেছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকপ্রয়াণের পর তাঁর সমগ্র জীবনের একটি বিশেষ ভাষ্যরূপে

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে শুনেছি যে তিনি স্বয়ং জোড়াসাঁকোয় গিয়ে কবিকে ধরেন যে তাঁকে একটি প্রশস্তি লিখে দিতে হবে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এবং কবি তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতার সঙ্গে উত্তর দেন— এ তোমার প্রেস্‌ক্রিপশন লেখা নয় ডাক্তার, যে, রোগী দেখা মাত্রই খস্‌খস্‌ করে লেখা ছুটবে ঝরনা কলমের অগ্রভাগ দিয়ে পালতোলা নৌকার মত তরতর করে। বসে থেকে কবির কাছে লেখাটি আদায় করে আনেন ডা. রায়। অনেকেই সেদিন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে কথার-রাজা রবীন্দ্রনাথ দু ছত্রেই নমো নমো করে চিত্তরঞ্জনের মত একজন সর্বজনপ্রিয় কৃতীপুরুষের স্মৃতিতর্পণ সারলেন। কাজী নজরুলের 'চিত্তনামা'র দোহাই পাড়তেও অনেককে শুনেছি এই সেদিনও। সেকালেও অনেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন 'নারায়ণ'যুগের মানসিক বিরুদ্ধতার কথা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ৪ আষাঢ় ১৩৩২ সালের এক চিঠিতে দেখি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন— চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চলছে···বিশেষ করে চিত্তর সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল— এ কথা কেউ যেন না মনে করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে। আর কিছু নয় কলিকাতায় গিয়ে ওদের বাড়ীতে একবার দেখা করে আসা উচিত হবে বলে বোধ হচ্চে।

আলোচ্য পুস্তকটি বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি লেখা, বহু তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ আছে, তজ্জন্য লেখককে ধন্যবাদ, কিন্তু কিছু কিছু ছাড়াছাড়া (loose) সাধারণ মুখরোচক মূল্যায়ন ও মন্তব্যও করা হয়েছে যেগুলি আরো সুসংহত হতে পারত। দু-একটি উদাহরণ দিই— যেমন "ভারতে গণজাগরণের প্রথম

শঙ্খধ্বনি চিত্তরঞ্জনই করেছিলেন" (২য় খণ্ড পৃ. ৪৬) বা তাঁর কাছে "গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা সেক্সপীয়রের নাট্যপ্রতিভার তুল্যই মনে হতো" (১ম খণ্ড পৃ. ১৪২) বা "আইন তাঁর পেশা ছিল সাহিত্য ছিল প্রাণ" (১ম খণ্ড পৃ. ১০৩) বা "ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরগলায় প্রচার করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না" (৩য় খণ্ড পৃ. ১২২), বা "তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন" (৩য় খণ্ড পৃ. ১২২) বা ১৯২৭ সালে প্রদত্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে 'বাংলার কথা' নামক ভাষণে (৩য় খণ্ড পৃ. ৮) "যেন স্বদেশের দীক্ষার জীবনের সন্ধান পেলাম" বা "১৯১৭ থেকে ১৯২৫ ফরিদপুর ভাষণ পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ ভাবে বংলার কথাই ভেবেছিলেন" এ সব উক্তি একটু অত্যুক্তি। অরবিন্দ-কৃত সাগর-সঙ্গীতের প্রথম স্তবকের ইংরাজী অনুবাদ বলে যে লেখাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি খুব সম্ভব চিত্তরঞ্জনের নিজের অনুবাদ— শ্রীঅরবিন্দের শেষ version তাঁর *Collective Poems and Plays*এ আছে। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদের কয়েকটি version আছে— স্বয়ং চিত্তরঞ্জনও ঐ কবিতাগুলির অনুবাদ করেছিলেন আর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপম্যান সাহেব তাঁর *Religious Lyrics of Bengal* নামক পুস্তকে কবি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি অনুবাদ করেন নি বলেই মনে হয়।

কারাবাস অন্তে মুক্তির পর দেশবাসী তাঁকে যে মানপত্র দিয়েছিল সেটি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখা। তারই কিঞ্চিৎ উদ্‌ধৃত করলে দেশবন্ধুর আবেগপ্রধান জীবনের তিনটি বিশেষ দিক প্রতিফলিত হয়— "একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল। সেদিন সে ভুল করে নাই। আর একদিন এই বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল। সেদিনও সে ভুল করে নাই…তাহার পর আরেকদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমায় কাছে পৌঁছিল…"। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এই ত্রিধারায় অভিষিক্ত করে না দেখলে তাঁর জীবনচরিত পূর্ণাঙ্গ হয় না। Men Money এবং Munitions নিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায়, সে অহিংস হোক সহিংস হোক— তার পিছনে যে প্রস্তুতি থাকে তার ইতিহাস যেমন বীজের ইতিহাস, তেমনি তার পরে যা গড়ে ওঠে বা উঠতে পারে তার সকল প্রেরণাই সকল যুদ্ধের শেষ কথা, সকল বিরোধের তর্কের সংশয়ের অবসান। জীবন চলমান।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নিজের কথাই তাঁর নিজের সম্বন্ধে প্রযোজ্য "Long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity"।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যাঁদের দেখেছি। শ্রীপরিমল গোস্বামী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২। বারো টাকা।

ডিমাই আট ভাগ আকারের ৩০২ পৃষ্ঠার বই, পরিষ্কার কাগজে পরিচ্ছন্ন ছাপা, পরিপাটি সুন্দর বাঁধাই। পুরু মসৃণ কাগজের এক পিঠে একটি একটি করে ছাপা ২৩টি ছবি, এ ছাড়া বইটির পাঠ্যাংশের সঙ্গে ছাপা আরও ৯টি ছবি।

বইটির মলাটের পিছনে ছাপা পরিচিতিতে রয়েছে, 'এটি জীবনীগ্রন্থ নয়, চরিত্রচিত্রণের অ্যাল্‌বাম'। এই চরিত্রচিত্রণ যে স্মৃতিভিত্তিক বইটির নামের মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়েছে।

স্মৃতিকথার বইয়ে লেখকরা সাধারণত তিন রকম ভাবে উপস্থিত থাকেন। হয় তাঁরা নিজেরা এত বেশি আসর জুড়ে থাকেন যে, মনে হয় আত্মপ্রচারটাই তাঁদের আসল কাম্য। নয়ত তাঁরা বিনয়বশতঃ এতটাই নেপথ্যে থাকেন, যা প্রায় অনুপস্থিত থাকারই শামিল। খুব অল্পসংখ্যক লেখককে দেখেছি, তাঁরা নিজেরা পাঠকদের মনের অনেকটা জুড়ে থাকবারও চেষ্টা করেন না, তাদের অগোচরেও থাকেন না, থাকেন তাঁদের যথাযোগ্য স্থানে। আলোচ্য বইটির লেখক এই শেষের পর্যায়ে পড়েন।

লেখক দেখেছেন, কিন্তু অনেক নীচুতে কিংবা অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে, কিছুই প্রায় না দেখেই, আহা কি দেখলাম, ব'লে কাজ সারেন নি। দেখার মত ক'রে দেখতে হলে, উঁচু থেকেও নয়, নীচের থেকেও নয়, কতকটা সমকক্ষতার স্থান থেকে দেখতে হয়, লেখক সেটা জানেন। এবং তাঁর দেখবার ক্ষমতাতে যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সে সম্বন্ধেও তিনি অবহিত। নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক বলছেন, "আমার মনে হয়, বাইরের লোক হিসাবে আমি তাঁকে যে ভাবে বুঝতে পারি অন্য কেউ ঠিক তেমন পারেন না, যেজন্য বহু লোকেই তাঁকে ভুল বোঝেন।" এই ধরণের কথার মধ্যে আত্মম্ভরিতা নেই, যা আছে তা হল আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয়। 'আমি যাদের দেখেছি' বইয়ের যে 'আমি', তিনি এই আত্মপ্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন তাঁদের সম্বন্ধে লিখবার এই আত্মপ্রত্যয়-জাত অধিকার অর্জন ক'রে তবে তিনি কলম ধরেছেন। এই অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন উঠত না, যদি এটা জীবনীগ্রন্থ হত। সে কথায় আবার পরে আসছি।

লেখক দেখেছেন অনেক মানুষকে এবং কাকেও কেবল চোখের দেখা দেখেন নি। এক দশক আগে প্রকাশিত তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' বইটিতে ৬০০রও বেশি লোকের নামোল্লেখ আছে। উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র হলেও তাঁরা কেউ ছায়াবাজীর ছায়া নন, সকলেই রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু সে বইয়ে তাঁরা এসেছেন নানা প্রসঙ্গে, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিকবার একাধিক স্থানে, অন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে, কোনো-না-কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজনে। আলোচ্য বইটিতে তাঁদের মধ্যে ষোল জন এসেছেন ছ' জন নূতন মানুষকে সঙ্গে করে, নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা হয়ে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি সম্বন্ধে রচনাটিতে লেখক বলছেন, "আমি যে ক'জন ব্যক্তিকে একটু বেশি নিবিড়-ভাবে দেখেছি, তাঁরা সবাই আমার চোখে কোনো-না-কোনো দিকে স্বতন্ত্র। তাঁরা সাধারণের চেয়ে ভাল কি মন্দ, সে-প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগেনি, স্বতন্ত্র, এইমাত্র।"

একুশ জন মানুষ এই স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে যে পারম্পর্য অনুসারে এসেছেন বইটিতে তা অনুসরণ করেই তাঁদের নামগুলি বলছি, এঁরা হলেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিহারীলাল গোস্বামী, রাজশেখর বসু, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কাজি নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাস।

এঁদের প্রত্যেকেরই একটি করে ছবি আছে বইটিতে। 'স্মৃতিচিত্রণে'র সব ক'টি ছবিই যেমন গ্রুপ ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া তেমনি স্বভাবতঃই এই বইয়ের ছবিগুলির প্রায় সব ক'টি একক মানুষের। এটি জীবনীগ্রন্থ নয় বলেই এতে কোনো মানুষটিকেই তার পরিপূর্ণ রূপে যেমন পাওয়া যায় না, ছবিগুলিও তেমনি কোনো একজনেরও সর্বাঙ্গিক ছবি নয়। চরিত্রের দর্পণস্বরূপ যে মুখমণ্ডল তার প্রতিই আলোকচিত্র-শিল্পীর লক্ষ্য, আর এই শিল্পী লেখক নিজেই।

আলোচনাতে ছবির কথা যখন এসেই পড়েছে তখন বলেই নিচ্ছি— প্রায় প্রতিটি মানুষের এমন জ্বলজ্বলে প্রাণবান্, এবং কিছু পরিমাণে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক, ছবি আর কোথাও চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না।

যাঁদের নিয়ে বই তাঁদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিকদের সংখ্যা বেশি কি না, কিংবা কেন, এ বিচার অনাবশ্যক। নিজে কাব্যরসিক ও সাহিত্যিক ব'লে লেখক স্বভাবতঃই কবি-সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে বেশি এসেছেন এবং বইটিতে সংখ্যায় তাঁরাই সেই কারণে গরিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে কাকেও দীর্ঘকাল ধ'রে দেখেছেন, কাকেও বা দু-তিন বারের বেশি দেখেন নি, কিন্তু সে কারণে যেমন তাঁদের প্রাণবান্ ছবি তোলার ব্যাপারে ইতর-বিশেষ হয় নি, তেমনি বর্ণিত আলেখ্যগুলিকে সমান প্রাণবন্ত ক'রে তুলতেও বাধা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমি আবার বলছি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ পেলে তাঁকে কি এরকম করে পেতাম? আমার টুকরো একটুখানি দেখা আর-এক টুকরো দেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পুরো দেখা। অনেকগুলি খণ্ড দেখা ও পাওয়ার মিলনে সমগ্রের অনেকখানি বিস্তার।"

এই টুকরো একটুখানি দেখার সঙ্গে আর-এক টুকরো দেখা মিলিয়ে লেখক রবীন্দ্রচরিত্রের একটি দিকে এমন একটি আলোকপাত করেছেন যাতে চমৎকৃত হতে হয়। লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ভদ্র, তিনি সুজন, তিনি কোনো মানুষকে তুচ্ছ মনে করেন না, সবার চিঠির উত্তর নিজ হাতে দেন, এসব কথা আগে শোনা ছিল এবং বি.এ. পড়বার সময় একখানা চিঠি লিখে তৎক্ষণাৎ তার জবাবও পেয়েছিলাম তাঁর নিজের হাতের, কিন্তু সুজনতার প্রকাশ একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষের পক্ষে কতখানি সম্ভব, তার পুরো চেহারাটা নিজে দেখলাম। সত্যই খুব একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মনের শত প্রকোষ্ঠের যে-কোনো একটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে তন্মুহূর্তে আর-একটা খুলে দেওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। এই ক্ষমতার জন্য তাঁকে একই সঙ্গে একই সময়ে সমস্ত ভাবনা ভাবতে হয় নি। পূর্ব-মুহূর্তে একটা গুরুতর বেদনা পেয়েছেন, কিন্তু পর-মুহূর্তে সেটি বন্ধ করে দিয়ে কৌতুকে মাতছেন, আবার সেটিকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাজনীতি-আন্দোলনের কোনো-একটি ঘটনায় উত্তেজিত হচ্ছেন, আবার পর-মুহূর্তে সেটাকে সরিয়ে রেখে কোনো আগন্তুকের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ভাবে আলাপ করছেন— এমন অদ্ভুত ক্ষমতা সাধারণ ভাবে কার থাকতে পারে?

থাকতে পারে, মনে হয়, যিনি জীবনটাকেই একটা মস্ত বড় অভিনয় বলে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন, তাঁর।" আরও কতগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক এর পর নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করেছেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, "আমাকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাউকে আবিষ্কার করতে হয় নি। আমার কাছে যাঁরা নিজগুণে প্রকাশিত হয়েছেন শুধু তাঁদেরই আমি দেখেছি। বিচিত্র লোকের হাটে ঠেলাঠেলি ক'রে প্রবেশ করি নি, তবু যা দেখেছি তা বিচিত্র।"

চরিত্রগুলির মধ্যে এই বিচিত্রতা আছে বলেই বইটি এত উপভোগ্য হয়েছে। যে মানুষগুলিকে নিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশ একদিন ঝলমল করত তাঁদের অনেকেই উপস্থিত এই বইয়ে, কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার মত যে তাঁদের কেউ একজন আর-একজনের মত নয়। সাদৃশ্য যাঁদের মধ্যে লেখক দেখেছেন তাঁদের মধ্যেও অমিল দেখেছেন বেশি।

চরিত্রচিত্রণগুলি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত। সর্বোচ্চ সীমা ২৩ পৃষ্ঠা, সর্বনিম্ন ৭ পৃষ্ঠা। কিন্তু মনে হয়, বৃহত্তর জীবনে প্রসারিত ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে পার্থক্য অতি সামান্যই। যেখানে তারা স্বতন্ত্র, স্বভাবতঃই সে স্থানটি সংকীর্ণ, তা সে স্বাতন্ত্র্য যত অসামান্যই হোক। সেই সংকীর্ণতার মধ্যে মানুষকে দেখাই অনেকখানি দেখা। সেই দেখার জন্যে দেশকালের অনেকখানি বিস্তৃতির যেমন প্রয়োজন হয় না, দেখানোর জন্যও প্রয়োজন হয় না অনেক বেশি কথার।

বইটি জীবনীগ্রন্থ নয়, কিন্তু জীবনীকার ব্যবহার করতে পারেন এমন মালমসলা বইটিতে একেবারে যে নেই তা নয়, অবশ্য তা খুব অল্পই আছে, এবং কেবল এমন কয়েকজনের বেলাতেই আছে যাদের পরিচয় পাঠকদের খুব জানবার কথা নয়। যে স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে বইটির আসরে এসেছেন কটি মানুষ তাঁরা কলকাতায় জন্মেছিলেন না হাজারিবাগে, তুলা রাশিতে জন্মেছিলেন না কর্কটে, কবে হাতেখড়ি হয়েছিল, কবে উপনয়ন— এসব বৃত্তান্ত সেখানে অবান্তর। কিন্তু এঁরা এসেছেন যে কেবল স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে তা মনে করলেও ভুল হবে। তাঁরা স্বতন্ত্র ত বটেই তদুপরি লেখক তাঁদের ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই তাঁরা এসেছেন। বইটি পড়তে পড়তে বারংবার মনে হয়েছে, মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ। মনে হয়েছে, যেন নির্বিচার কিন্তু বিচারসহ ভালবাসা। কারণ মানুষগুলি যে সর্বতোভাবেই ভালবাসা পাবার যোগ্য এটা বোঝাতেও তাঁর কোথাও উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি।

এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে জীবনীকারের কাজ অনেক বেশি সহজ। কি রাখবেন, কতটা রাখবেন, কি ফেলবেন, কতটা ফেলবেন, এ নিয়ে যেমন তাঁকে ভাবতে হয় অনেক কম, তেমনি কারও অধিবক্তা হয়ে কিছু বলবার দায়-দায়িত্বও তাঁর বিশেষ থাকে না, যদি অবশ্য তিনি সত্যনিষ্ঠ জীবনীকার হন, যদি ঐতিহাসিকের আসনের পাশে আসন পাবার অভিলাষ তাঁর থাকে। এইজন্যেই জীবনীকারের কাজকে বলা হয়েছে "ungentle art", নির্বিচারে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করলেও কেউ তাঁদের দোষ দিতে পারে না, বরঞ্চ তাঁদের কাছে তাই সকলে চায়। কিন্তু 'আমি যাঁদের দেখেছি' বইটির লেখকের কাছ থেকে ungentle কিছু আশা করা বৃথা। মানুষকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা যত সহজ দেখানো তত সহজ নয়, 'এঁর সম্বন্ধে সব কথা ত বলা হল না' যদি এই ভাব পাঠকের মনে থাকে। তাঁর দেখা প্রতিটি মানুষকে নিয়ে লেখক সেই দুরূহ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। এটা তিনি পেরেছেন কতটা মানুষগুলির গুণে আর কতটা তাঁর নিজের গুণে, সেটা বলা সহজ নয়। ধরে নেওয়া যাক দু দিকের গুণেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

মানুষগুলি খুব বেশি স্বতন্ত্র বলেই তাঁদের পক্ষে লেখকের ব্যবহার, অর্থাৎ তাঁদের নিয়ে তাঁর আলোচনার গতিপ্রকৃতিও আলাদা ধরণের। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

কাজি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে ষোলো পৃষ্ঠার অধ্যায়টিতে কবির চরিত্রচিত্রণ এক পৃষ্ঠার অল্প একটু বেশি, জীবনকথা পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠা, বাকী প্রায় সবটাই তাঁর কবিতা ও গান, বেশির ভাগ তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কেন এলোমেলো, কেন তাতে বাড়াবাড়ি সে বিষয়ে লেখক যা বুঝেছেন খুব জোরের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র প্রথম কবিতার, যার শুরুতে আছে—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

এবং পরে এক জায়গায় আছে,

ঝড়ের মাতন! বিজয়-কেতন নেড়ে,
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা-বাছা!
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা!

এই ডাকে কবি হিসাবে সাড়া দিয়ে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিলেন কি না সেটাও বাস্তবিকই ভেবে দেখবার মত। অবশ্য 'সর্ববন্ধনমুক্ত এই আমি'র যে ধরণের প্রমত্ততা বর্তমানে বাংলাদেশে অহরহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে এই কবিতা-দুটির কোনো সম্পর্ক আছে মনে করা অত্যন্তই ভুল হবে।

অপর দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে রচনাটির প্রায় সবটাই নিছক চরিত্র-চিত্রণ। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সুসম্পূর্ণ নিটোল ও পরম উপভোগ্য রচনা আর কোথাও পড়ি নি। লেখকের লেখার গুণে বিভূতিভূষণ মানুষটি যেন বইয়ের পাতায় জীবন্ত হয়ে বিচরণ করছেন। মানুষটিকে ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা জানতেন তাঁরাই অনুভব করবেন, বইটিতে যাকে পাওয়া যাচ্ছে তিনি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না, এবং তিনি আদ্যোপান্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুই প্রান্তবর্তী দু-রকমের রচনার কথা বলা হল। এদের মধ্যবর্তী অন্য রচনাগুলিতে কম-বেশি বিভিন্ন পরিমাণে আছে ব্যক্তিগত পরিচয় -সূত্রে চরিত্র-বিশ্লেষণ, প্রতিভা-পরিচিতি, কৃতির মূল্যায়ন, কিছু কিছু উদ্‌ধৃতি ও প্রচুর প্রত্যক্ষ-করা ঘটনার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে যেগুলি রসিয়ে বলবার মত সেগুলিকে লেখক যে রকম করে বলেছেন, সে রকম করে বলবার ক্ষমতা আজকের দিনে বাংলাদেশে খুব অল্প লেখকেরই আছে।

আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার কথা বলে শেষ করি।

রাজশেখর বসু সম্বন্ধে লেখাটিতে কৌতুক/ব্যঙ্গ/স্যাটায়ারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশেখরের সাহিত্যসৃষ্টির স্বরূপ নিয়ে আলোচনাটি আমার খুব মূল্যবান্ বলে মনে হয়েছে।

শরৎ পণ্ডিত ছিলেন একজন পরম lovable 'মজার' মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে লেখাটি প্রচুর কৌতুককর

মজার মজার anecdotes সম্বলিত হয়ে যা হয়েছে তাকে আর-একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে বলতে হয় lovely !

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাংলার একজন উপেক্ষিত সাহিত্যিক। চরিত্রবৈশিষ্ট্যেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। এঁর সম্বন্ধে লেখকের রচনাটিও অসাধারণ রকমের forceful— বাঙালীজাতির হয়ে লেখক যেন তাঁদের উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

নলিনীকান্ত সরকার সম্বন্ধে লেখাটিতেও অনেক সব মজার ব্যাপারের বিবৃতি, অনেক হাস্যরসাত্মক রচনার উদ্ধৃতি, কিঞ্চিৎ সাহিত্য-মূল্যায়ন, সবই খুব উৎসাহ নিয়ে লেখা এবং সব মিলিয়ে পুরোদস্তুর উপভোগ্য।

অতিবাদের মত শোনাবে জেনেও নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে লেখক কিছু হাতে রেখে বলেন নি, ভালই করেছেন, কারণ, নীরদবাবু নিঃসন্দেহে একজন much misunderstood man এবং সমানই নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ মানুষ।

সজনীকান্ত দাসের ব্যঙ্গ/কৌতুক রচনা নিয়ে আলোচনাটিও খুব মূল্যবান্। "সরস সাহিত্য, যাকে স্যাটায়ার বলা যায় না, অথচ যা শুদ্ধ হিউমার নয়, সে রকম রচনা অনেক লিখেছেন সজনীকান্ত। তাঁর রচনার এই বিভাগের একটি উপবিভাগ আছে, সেটি, যাকে বলে দুষ্টমি বুদ্ধি, তাই থেকে সেগুলি লেখা। এই দুষ্টমি বুদ্ধিতে আক্রান্ত হলে সজনীকান্তের প্রতিভা খোলে ভাল।" সুন্দর। সজনীকান্তের চরিত্রবিশ্লেষণেও লেখক গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কবি সজনীকান্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক প্রশ্ন করেছেন, "কবিতার কথা সহজে বোঝা যায়, এটি কি কাব্যের ত্রুটি? দুর্বোধ্যতার ম্যানারিজম কাব্য-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি?" একটু পরে আবার বলছেন, "গান যেমন সুরতালে গাওয়ার শর্তে গান, কাব্যও তেমনি ছন্দের মাত্রায় দোলযুক্ত হলেই তবে তা কাব্য— মিল থাক বা না থাক। গান যেমন সুরতাল বাদ দিলে আর গান থাকে না, গদ্য-গান নামক কোনো বস্তু হয় না, কিংবা এলোমেলো ছন্দে গান হয় না, বিশিষ্ট রীতি মান্য করে গাওয়ার শর্তেই গান হয়, কাব্যের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় কি ক'রে? গানের কোনো নবযুগেও কি সুর বাদ চলে যাবে? তালমাত্রা বাদ চলে যাবে?"।

প্রশ্নগুলি করেছেন সজনীকান্তের হয়ে কিন্তু উত্তর লেখক আজও পান নি, পাবেনও না।

এবার সর্বাঙ্গিকভাবে বইটি সম্বন্ধে দুটি কথা বলে শেষ করব। প্রথম কথা, মানুষ সম্বন্ধে প্রভূত interest— যে কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ নেই, প্রখর স্মরণ-শক্তি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মন এবং ক্ষমাগুণ, যার থেকে নীর ত্যাগ ক'রে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি জন্মায়, এসব না থাকলে আলোচ্য বইটির মত বই লেখা যায় না। দ্বিতীয় কথা, সর্বদোষমুক্ত প্রাঞ্জল গদ্য-রচনায় পরিমলবাবু সিদ্ধহস্ত, এ বিষয়ে বাংলা দেশে আজকের দিনে তাঁর জুড়ি প্রায় নেই।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। আবু সয়ীদ আইয়ুব। ভারবি, কলিকাতা ১২। আট টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নয়, এ অভিযোগ কিছু নতুন নয়; এ অভিযোগ শোনা গেছে গত চল্লিশ বছর আগেই। তখন বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের উদ্যত অভিযান। এই নতুনত্ব-সৃষ্টির অভিলাষীরা রবীন্দ্রকাব্যের ধ্রুপদী আদর্শকে সাময়িকতার আঘাতে আহত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই নূতনত্ব-সৃষ্টির উন্মাদনাতেও রবীন্দ্রসাহিত্য নিষ্প্রভ হয়ে গেল না বরং তার সৌন্দর্য ও মাধুর্য আজকের নানা প্রশ্নবিদ্ধ মানুষের মনেও উপভোগ্য হয়ে রইল। আজকাল যে অর্থে 'বাস্তবতা' কথাটি চলে সেই অর্থে বাস্তবতা থাক্ আর নাই থাক্, জৈব সত্যের নির্লজ্জ ভাষণ থাক্ আর নাই থাক্— রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণশক্তি এমনই অফুরন্ত যে, সে সব রকম কাল্পনিক-অকাল্পনিক অভাব সত্ত্বেও চিত্তকে আকর্ষণ করবেই।

এই অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিতে আস্থা অটল রেখেই সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনায় এগিয়ে আসেন। শ্রীযুক্ত আইয়ুবের মতো রসিক-পণ্ডিতও নানা সংশয়দোলায় দোলায়িত হয়েছেন— সে সত্য তিনি গোপন করতে চান নি। গীতাঞ্জলির ধর্মমূলক কবিতায় মন সাড়া দেয় কেন যদিও ধর্মে তাঁর মতি নেই— এই সমস্যা দিয়ে আইয়ুব রবীন্দ্রকাব্যের রসশক্তির পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মভাবের অনুপ্রেরণা জাগায় বলে নয়, প্রেম ও প্রকৃতির রূপরসের ইঙ্গিতে হৃদয়তন্ত্রীকে বাজিয়ে তোলে বলেই গীতাঞ্জলির মাধুর্য। তিনি বলেছেন—

'গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানগুলিতে আমি একেবারে অপরিচিত অনভিজ্ঞাত অনধিগম্য ভাবের ব্যঞ্জনা পাই না; প্রিয়া ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে যা আগেই পেয়েছি তারই উন্নততর সূক্ষ্মতম পূর্ণতর এবং সর্বোপরি স্পষ্টতর (নান্দনিক অর্থে স্পষ্টতর) রূপ দেখে মুগ্ধ হই। গীতাঞ্জলি পড়বার সময়ে সবিস্ময়ে অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ধরে হাঁটছি, একটু এদিকে সরলে পা পড়ে সত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিক সরলে বাতাসে পাই অমৃতলোকের গন্ধ।'

ধর্ম বা ভক্তিভাব যথাযোগ্য ব্যক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে রসাস্বাদন করাতে পারে, কিন্তু যাঁরা সে পথের পথিক নন, তাঁরাও গীতাঞ্জলি থেকে তাঁদের স্বাদ্য বস্তু পাবেন, এটাই আইয়ুবের বক্তব্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার সর্বজনগ্রাহ্যতা এতে প্রমাণিত হল কি না বলা শক্ত। কারণ কোনো কবিতারসিক যদি তাঁর আগ্রহানুরূপ বস্তু রবীন্দ্রকাব্যে খুঁজে না পান তবে তাঁর কাছে এই কাব্য কতদূর আস্বাদ্য হবে? সৌভাগ্যক্রমে আইয়ুবের মত পিপাসু মন যাঁদের, তাঁরা প্রেম ও প্রকৃতির দানকে গীতাঞ্জলি থেকে অঞ্জলি ভরেই তুলে নিতে পেরেছেন।

যাঁরা কাব্যে পেতে চান বীভৎসকে অসুন্দরকে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সে জিনিস পাবেন না। সেইসব আধুনিকপন্থীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্য কি? এই প্রশ্নের দুটি সহজ উত্তর আছে: অসুন্দর কখনোই যথার্থ কবিতার প্রাণ হতে পারে না অতএব এ জিনিস কবিতায় যাঁরা খোঁজেন তাঁরা বস্তুতই কাব্যরস চান না। তাঁরা খোঁজেন অন্য কিছু। আর-একটি উত্তর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পূর্ণ সার্থক নয়, কারণ সে কাব্য জীবনের সব কয়টি অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করতে পারে নি। আইয়ুব এর কোনোটাই স্বীকার করেন নি। তিনি একটি দুরূহ উত্তর বেছে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের

কালজয়িতাকে অভিনবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুভ ও সুন্দরের উপাসক, তিনি সৌন্দর্যেরও কবি, শ্রেয়োবোধেরও কবি। এটা আইয়ুব খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন এবং তাঁর সঙ্গে এতাবৎ সমালোচকদের মতভেদ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ অসুন্দর এবং দুঃখকে অস্বীকার করেছেন কিংবা তার শক্তিকে তুচ্ছ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অচল শুভ প্রত্যয়বুদ্ধিতে দুঃখ এবং পাপও সৃষ্টির যাত্রাপথকে রোধ করে দাঁড়ায় না, পাপই আপনার প্রকাশলজ্জায় আত্মহনন করে— এই বিশ্বাসেই রবীন্দ্রকাব্য মহীয়ান কিন্তু যদি এটাই আইয়ুবের বক্তব্য হত তবে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' রচিত হবার সার্থকতা হারাত। শুভ এবং অশুভের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রকাব্যে গোড়া থেকেই অঙ্কুরিত-আভাসিত হয়েছে এবং শেষ পর্বের কাব্যে রবীন্দ্রকবিমানসকে সেই দ্বন্দ্ব দ্বিধান্বিত করে একটি অপরূপ কাব্যলোক রচনা করেছে, আইয়ুবের এই বক্তব্যই অভিনব, রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনায় বিশিষ্ট দান।

এখানেই সম্ভবত রবীন্দ্রকাব্যতত্ত্বের একটি মূল সূত্রের বিরোধিতা ঘটল। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আমার কাব্যসাধনার একটি মাত্র পালা— সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই সূত্রটিকে এ পর্যন্ত সমালোচকেরা বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নিয়েছেন। নানাভাবে তার যুক্তিযুক্ততাকে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে— অজিত চক্রবর্তী এবং মোহিতলাল মজুমদার উভয়েই এই তত্ত্বকে মেনেছেন। মোহিতলাল বলেছেন রিয়াল দুর্দর্ষ মানসশক্তির দ্বারা রূপান্তরিত; কিন্তু রবীন্দ্রকবিমানসের বৈশিষ্ট্য-যে বাস্তব এবং আদর্শের কমবেশি মিশ্রণ ঘটানো, এ বিষয়ে কারো সংশয় নেই। শুভবোধ এবং দুঃখচেতনার যে দ্বন্দ্ব আইয়ুব রবীন্দ্রকাব্যে কড়ি ও কোমল থেকে শেষ কাব্য পর্যন্ত দেখিয়েছেন, সেটা এই সূত্র থেকেই উপজাত; কিন্তু তাঁর আলোচ্য বিষয়ের নতুনতর গুরুত্ব আছে। 'বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে য়োরোপে এবং তৃতীয় পাদে এ দেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যমহিমা প্রতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটি ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ভাবগত— শোনা যায় জগতের অশুভ কদর্য বীভৎস রূপটা রবীন্দ্রনাথের চোখে ঠিকমত ধরা দেয়নি।' 'অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টিতে লেখক বোদলেয়ার এবং তৎপরবর্তী কাব্যসাহিত্যে অমঙ্গলবোধের উদ্‌ভবের একটি স্বচ্ছ ইতিহাস এবং সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা বিবৃত করেছেন। রচনাটি খুবই সুলিখিত। এ সম্বন্ধে আইয়ুবের নিজের ধারণা এই যে সাহিত্যে অমঙ্গলবোধকে প্রতিফলিত করা নিয়ে আধুনিকদের চেষ্টা বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি। প্রসঙ্গত বোদলেয়ার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য স্থানে স্থানে কঠোর। শুভচেতনা ও অশুভচেতনাকে আইয়ুব একটি ব্যালেন্সে নিয়ে এসেছেন।

ফলে, মনে হতেই পারে তিনি বুঝি অজিত চক্রবর্তীর দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র রচনা করছেন। কিন্তু না, উপনিষদের নিশ্চিন্ত ব্রহ্মবাদে রবীন্দ্রকাব্যের মীমাংসা নয়। 'ধ্রুবতায় আত্মনিমজ্জন নয়, ধ্রুব ও ক্ষণিকের মধ্যে রবীন্দ্রমানসের টানাপোড়েন, তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মূল্যবোধ। কখনও ধ্রুব মহাকাল পান পুষ্পার্ঘ্য, কখনো অমৃতভরা ধাবমান মুহূর্তগুলি।' অজিত চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায় এই দ্বিধার স্থান ছিল না। এমনকি মোহিতলালও বারবার দ্বিধার উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে'র ব্যাখ্যা, 'রবি-প্রদক্ষিণ' প্রবন্ধ ইত্যাদি), কিন্তু দ্বিধা জয় করে ধ্রুবচেতনাতেই (অবাস্তব হলেও) তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন— এটাই মোহিতলালের সিদ্ধান্ত। এই পরিপ্রেক্ষিকায় আইয়ুবের সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় আর-এক ধাপ এগিয়েছে। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ সীমা-পৃথিবীর অপূর্ণতার দুঃখবেদনাকে

বলেন নি অসত্য, বলেন নি অবাস্তব। এইজন্যই শুভ ও কল্যাণের কবি মাঝেমাঝেই প্রশ্নভারে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। 'কেন' শব্দটি শেষ পর্বের কাব্যে বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন এক কবি-পুরুষের পরিচয় লাভ করেছি। এই পরিবর্তনের সূচনাকাল 'বলাকা'য়। আইয়ুবের মতে কবির অটল ধর্মবিশ্বাস টলে গেল এবং ৩৭নং কবিতার 'শান্তি সত্য শিব সত্য' ইত্যাদি উক্তিতে ধরা পড়ে গেল 'মানুষের ধর্ম'-রচয়িতার মানবিক ধর্মমতের পূর্বাভাস। কবি বস্তুত কখনোই কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাস হারান নি, কিন্তু সে কল্যাণকে রচনা করে তুলবার দায়িত্ব মানুষের, ঈশ্বরের নয়। সেইজন্য উত্তরহীন প্রশ্নের সম্মুখে কল্যাণের বেদী রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্বে ধ্বনিত। বোদলেয়ার-পরবর্তী কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ এইখানেই।

এখানে আমার একটি সামান্য প্রস্তাব জুড়ে দেবার আছে। আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যে দুঃখবোধের ব্যাপকতা এবং তার থেকেই রবীন্দ্রকবিমানসের প্রকৃতি স্থির করে নিয়েছেন। অবশ্য তিনি প্রাক্-মানসী থেকে নৈবেদ্য পর্যন্ত চারটি অধ্যায়ে এই সংশয়ের উন্মেষ ও আভাস দেখিয়েছেন। নৈবেদ্যকে তিনি নিকৃষ্ট কাব্য বলেই মনে করেন। এ কথাও অস্বীকার্য নয় যে বলাকা-পরবর্তী কাব্য এবং সোনারতরী-ক্ষণিকা যুগের কাব্যের সুরও অনেকখানি আলাদা। তথাপি নৈবেদ্য-পূর্ববর্তী কাব্যে যে বিশিষ্ট রূপতন্ময়তা আমরা দেখি তাকে এককথায় অসাধারণ বললে অন্যায় হয় না। পরের কাব্যে এসেছে ভাবুকতা। এই রূপতন্ময়তা কি সৃষ্টির রূঢ় কঠোর সত্যকে অস্বীকার করেছে? গল্পগুচ্ছের অনেকগুলি গল্পেই জীবনের দুঃখসত্য পেয়েছে পূর্ণ মূল্য; তেমনি 'যেতে নাহি দিব' কিংবা 'ভৈরবী গান'এর মতো কবিতাতেও দুঃখের কাব্যমহিমা অত্যাশ্চর্য। কবিতায় অলংকরণের আতিশয্য আইয়ুবকে ক্লান্ত করে, ফলে নৈবেদ্য-পূর্ববর্তী দুঃখচেতনার কাব্যরূপায়ণও তাঁর যথোচিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে নি।

মুগ্ধ হতে হয় সমালোচনার ভাষায়। এ ভাষা পড়তে পড়তে উড়িষ্যার মন্দিরে দেখা মূর্তিকলা মনে পড়ে। কঠিন পাথরকে আশ্চর্য কোমলতার আভাসে মণ্ডিত করেছিলেন শিল্পী। আইয়ুবের অত্যন্ত পরিমিত চিন্তাগভীর বাক্যবিন্যাসে আছে তেমনি কাব্যানুভূতির কোমলতা, প্রকাশে আছে তেমনি নম্র মাধুর্য।

ভবতোষ দত্ত

স্বরলিপি

আমার যেতে সরে না মন—
তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে
অতল বিরহে নিমগন ॥
চলিতে চলিতে পথে সকলই দেখি যেন মিছে,
নিখিল ভুবন পিছে ডাকে অনুক্ষণ ॥
আমার মনে কেবলই বাজে
তোমায় কিছু দেওয়া হল না যে।
যবে চলে যাই পদে পদে বাধা পাই,
ফিরে ফিরে আসি অকারণ ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

রা রা II সন্া সা সা । রা -া -সা I রা -পা -মপা । [প]মা জ্ঞা রা I
আ মার্ যে০ তে স রে ০ ০ না ০ ০০ মন্ আ মার্

I সন্া সা সা । রা -া -সা I রা -পা -মপা । [প]মা জ্ঞা মা I
যে০ তে স রে ০ ০ না ০ ০০ মন্ তো মার্

I { মা পা -া । মপা -ধণা [ণ]ধা I পা -া -া । -া পা ধা I
দু য়া র্ পা০ ০০ রা য়ে ০ ০ ০ আ মি

I ধা -ণা ণা । ধা -পা ধা I পা -া -া । (-ধা পা মা)} I -া -া -া I
যা ই যে হা ০ রা য়ে ০ ০ ০ তো মা র্ ০ ০ ০

I পা ধা ণা । ণা র্সা -র্রা I না -র্সা -া । -ণা -া -ধপা I
অ ত ল বি র ০ হে ০ ০ ০ ০ ০০

I পধা মপা মা । -া জ্ঞা রা I সন্‌া সা সা । রা -া -সা I
নি০ ম০ গ ন্‌ আ মার্‌ যে০ তে স রে ০ ০

I রা -পা -মপা । পমা -জ্ঞা -া I জ্ঞা -ণা -া । -জ্ঞা জ্ঞা রা II
না ০ ০০ ম ০ ন্‌ না ০ ০ ০ "আ মার্‌

পমা -জ্ঞা -া II পনা না না । না না না I না র্সা -া । না র্সা র্সপা I
ম ০ ন্‌ চ লি তে চ লি তে প থে ০ স ক লি

I পা না না । র্সা র্রা -র্রর্গা I না -র্সা -া । -া -া -া I
দে খি যে ন মি ০০ ছে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্রর্সা র্রর্সা । র্সা র্সণা ণা I ধর্সা র্সা -ণা । ধা ধা -ণা I
নি খি০ ল ভু ব০ ন পি০ ছে ০ ডা কে ০

I ধা পা -ণা । ধা পা -া I পধা মপা মা । -া সা রা I
ডা কে ০ ডা কে ০ অ০ স্তু০ ক্ষ ণ্‌ আ মার্‌

I সন্‌া সা সা । রা -া -সা I রা -পা -মপা । ^পমা -জ্ঞা -া I
যে৹ তে স রে ৹ ৹ না ৹ ৹৹ ম ৹ ন্‌

I র্রা -র্রা -র্সা । -ণা -ধা -পা I -মা -জ্ঞা -া । -া -া -^জ্ঞরা II
না ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹

^পমা জ্ঞা রা II { রা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -া । রা জ্ঞা -া I
মন্ আ মার্ ম নে কে ব লি ৹ বা জে ৹ তো মা য়্

I জ্ঞপা পা মা । জ্ঞা রা জ্ঞা I রা সা -া । (সা সজ্ঞা -া) } I -া না না I
কি৹ ছু দেও য়া হ ল না যে ৹ আ মা৹ র্ ৹ য বে

I { না না -া । ^ধনা -পা -া I -না -পা -া । -না -র্সা -া I
চ লে ৹ যা ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ই ৹

I না র্সা -না । নর্রা র্সা -ণা I ধা ধা -ণা । (ধা -পা -া I
প দে ৹ প৹ দে ঃ বা ধা ৹ পা ৹ ৹

I -া -া -া । -া না না) } I ধা -পা -া I ধা ণা -া । ধা ণা ^পধা I
৹ ৹ ৹ ই য বে পা ৹ ই ফি রে ৹ ফি রে আ

I পা পধা মপা । ^প^মা জ্ঞা রা I সন্‌া সা সা । রা -া -সা I
সি অ০ কা০ রণ্ আ মার্ যে০ তে স রে ০ ০

I রা -পা -মপা । মা -জ্ঞা -া I র্রা -র্রা -র্সা । -ণা -ধা -পা I
না ০ ০০ ম ০ ন্ না ০ ০ ০ ০ ০

I -মা -জ্ঞা -া । -া -া -^জ্ঞ^রা II II
০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বীকৃতি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিত্র দেশবন্ধু জন্মশতবার্ষিক
উৎসব সমিতির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় কর্তৃক প্রকাশিত • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯
চিত্র ও মলাট মুদ্রক • রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট • ৭/১ বিধান সরণী • কলিকাতা ৬

বর্ষ ২৭ · সংখ্যা ৩

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
বাটার জুবিলি
চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া
খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে
থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ।
সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের
স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি...
আসুন না, একবার
প'রে দেখুন।
বাটা জুবিলি
জুবিলি ৬৬
১৬·৯৫
জুবিলি ২১
১৩·৯৫
জুবিলি ৫৯
১৭·৯৫
জুবিলি ৩০
১৪·৯৫
Bata
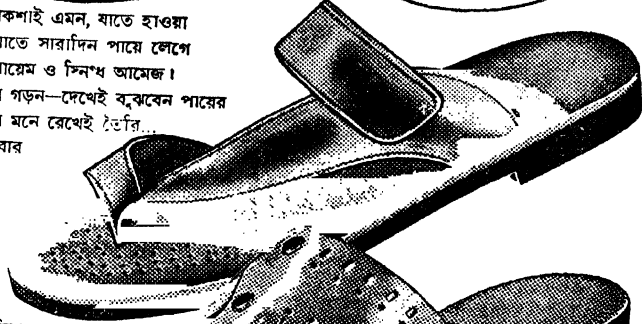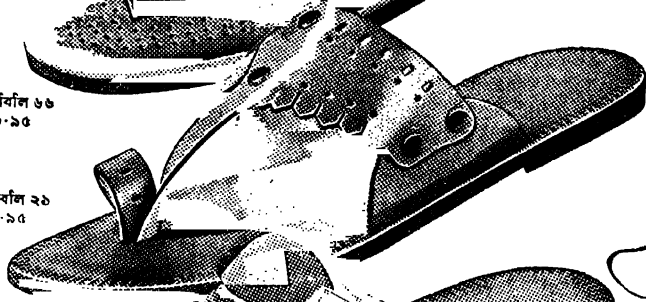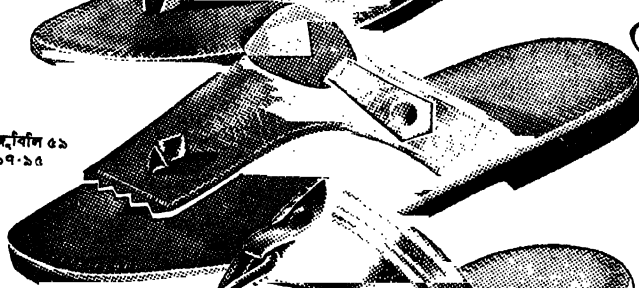
খেলা করবে
জেনে
টাকা জমাও নিয়ম মেনে!
স্বপ্না তার বন্ধুদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে, সন্দেহ নেই। খেলার সময়ে খেলার দিকে নজর তার আছে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে ব্যাঙ্কে নিয়মিত টাকা জমাতেও তার উৎসাহের কোন ঘাটতি নেই।
ইউবিআই-তে তার নিজের নামে একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাবা খুলে দিয়েছেন—নিজের ইচ্ছেমত তা চালাতে পেরে স্বপ্না বেজায় খুশি। সত্যি, বাবার তুলনা হয় না।
১৩ বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে মাত্র ৫্ টাকা দিয়ে ইউবিআই-তে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে।
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা-১

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ · ১৮৯২-৯৩ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

রবীন্দ্রনাথ

সি. এফ. এণ্ড্রুজ -অঙ্কিত

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার।

প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার,
হে বন্ধু, গ্রহণ করো, করি নমস্কার।

খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার,
হে বন্ধু, প্রবেশ করো, করি নমস্কার।

তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সি. এফ. এণ্ডরুজকে শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা উপলক্ষে রচিত। এপ্রিল ১৯১৪

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

· · তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স্‌ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ডরুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ডরুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।

· · তখন আমাদের এই দরিদ্র বিদ্যায়তনের বাহ্যরূপ ছিল যৎসামান্য এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ। সমস্ত বাহ্য দৈন্য সত্ত্বেও তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শান্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। সবল চারিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারি নি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পান নি, কিন্তু সেই ভিক্ষা উপলক্ষ্যে অসংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের আদর্শে বলে আত্মসম্মান। নিরন্তর দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি করে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

আমার সঙ্গে এণ্ডরুজের যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল সেই কথাটাই এতক্ষণ বললুম, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর এই নিষ্ঠা দেশের লোক অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করেছে কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ মূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। কী ভাষায় কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকে এঁর আজন্মকালের নাড়ীর যোগ ইংলণ্ডের সঙ্গে। তাঁর আত্মীয়মণ্ডলীর কেন্দ্র ছিল সেইখানেই। যে ভারতবর্ষকে তিনি একান্ত আত্মীয় বলে চিরদিনের মতো স্বীকার করে নিলেন, তাঁর দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাজব্যবহার-ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে। এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য। এ দেশে এসে নির্লিপ্ত সাবধানিতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ষকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন নি, অসংকোচে তিনি এখানকার সর্বসাধারণের সঙ্গে সবিনয় যোগ রক্ষা করেছেন। যারা দীন, যারা অবজ্ঞাভাজন, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদের আদর্শে মলিন শ্রীহীন, নানা উপলক্ষ্যে সহজ আত্মীয়তায় তাদের

সহবাস অনায়াসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এ দেশের শাসক সম্প্রদায় যাঁরা তাঁর এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আপনাদের রাজপ্রতিপত্তির অসম্মান অনুভব করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে ঘৃণা করেছেন তা আমরা জানি, তবু স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপমাত্র করেন নি। তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা ছিলেন তাঁকে তিনি জনসমাজের অভাজনদের বন্ধু বলে জানতেন, তাঁরই কাছ থেকে শ্রদ্ধা তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কি পরের কি আমাদের নিজের কাছে যেখানেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা অবারিত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি আপন খ্রীষ্টভক্তিকে জয়যুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হবে অনেকবার আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকেও তিনি বিরুদ্ধতা ও সন্দিগ্ধ ব্যবহার পেয়েছিলেন, সেই অন্যায় আঘাত অম্লানচিত্তে গ্রহণ করাও ছিল তাঁর পূজারই অঙ্গ।

যে সময় এণ্ডরুজ ভারতবর্ষকে আপন আমৃত্যুকালের কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে এ দেশে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। এমন অবস্থায় এ দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহৃদ্যের আসন রক্ষা করে তিষ্ঠে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দুঃসাধ্য সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তাঁর আপন স্থানে, তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল না। এই যে অবিচলিতচিত্তে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা, এতেই তাঁর আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে এণ্ডরুজকে আমি জানি, দুই দিক থেকে তাঁর পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছে। এক আমার অত্যন্ত কাছে, আমার প্রতি সুগভীর ভালোবাসায়। এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ। দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ দেশের অন্ত্যজদের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে। এই জন্যই তাঁকে স্থিরভাবে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজে বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।

এই যে তাঁর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের সীমাগত সে কথা বললে ভুল বলা হবে, তাঁর খ্রীষ্টধর্মে সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ। একদা তারই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখেছি, যখন সেখানকার ভারতীয়েরা কাফ্রিদেরকে আপনাদের থেকে স্বতন্ত্র করে হেয় করে দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং য়ুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধিকার কামনা করেছিল। এণ্ডরুজ এই অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে সহ্য করতে পারেন নি, এই সকল কারণে এক দিন এণ্ডরুজকে সেখানকার ভারতীয়েরা শত্রু বলেই কল্পনা করেছিল।

আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা। কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল এণ্ডরুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের।

সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে পদে বাধা পায়, আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দূরত্ব রক্ষা করা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উত্তুঙ্গ হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশকে এই অমর্যাদার দুঃসহ ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ইংরেজের মধ্য থেকে এণ্ড্রুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে বাস করতে এলেন এই পরাজয়-লাঞ্ছিত জাতির অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না উচ্চমঞ্চ থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মশ্লাঘা সম্ভোগ। এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি-দুর্লভ সার্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি একদিন বলেছিলেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—

প্রয়োজন হলে এই কবিবচন আমরা আউড়িয়ে থাকি কিন্তু আমরা এই সত্যবাক্যকে অবজ্ঞা করবার জন্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সম্মার্জনীকে যে রকম ব্যবহার করে থাকি এমন আর কোনো জাতি করে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে বিদ্রূপ সহ্য করেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমুদ্রপার থেকে সত্যমানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে যোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে লাভ এখনো অক্ষয় হয়ে রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে তিনি আপনার কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের দ্বারা আবিল করেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বায়ুকে। কিন্তু তার ব্যর্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, এবং রাষ্ট্রীয় মাদকতার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হতে দেন নি। কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানবের জন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন।

শান্তিনিকেতন-মন্দিরে কথিত। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক অনুলিখিত
প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ

সি. এফ. এণ্ডরুজ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কৈশোর বা যৌবনে আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা সৎকর্মে আত্মসমর্পণ করেছেন কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে পুরাতন আদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন— এ শ্রেণীর মানুষ সংসারে প্রায়ই দেখা যায়; অনেক সময়ে তাঁরাই হন চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী। কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সে দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার অগ্নিদাহে পুরাতন সংস্কার ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে জীবনে নূতন আলোক দেখতে পান— সে শ্রেণীর লোক দুর্লভ। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের জীবন সেই সাক্ষ্য বহন করছে। ইংলন্ডের অ্যাংলিকান চার্চের ৩৯ দফা বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা মন খৃষ্টানী ধর্মতত্ত্বকে বিশেষ পরকলায় দেখতে অভ্যস্ত। একেই বলেছি সংস্কার। বিশেষ পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশ-মধ্যে লালিত, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র এণ্ডরুজ। ধর্মের সংস্কার, বিদ্যার সংস্কার নিয়ে তিনি আসেন ভারতে। এ সবের পশ্চাতে মনের অবচেতনে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের অভিমান থাকা সম্ভব ছিল। কিন্তু সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে তিনি ভারতের দুই মহাপুরুষকে পেলেন তাঁর দেবতা যীশুর জীবন ও বাক্যের প্রতীক রূপে।

এণ্ডরুজ সাহিত্যের ছাত্র; দিল্লীতে তিনি এলেন সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে। তিনি যদি তাঁর প্রতিভাকে জনকল্যাণ-কর্মে উৎসর্গ না করে সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত করতেন, তবে হয়তো সেখানে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পারতেন— তাঁর রচনার মধ্যে যে কবি-দৃষ্টি দেখতে পাই, তা সত্যই বিস্ময়কর।

তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বিস্মিত হই যখন দেখি তিনি জীবনের পঁচিশটি বছর আপাতদৃষ্টিতে ভারতের দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির মহাপুরুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন— বলা যেতে পারে ইংরেজির 'হাইফেন'। কিন্তু ভাবি— কী করে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন! এণ্ডরুজের নাম C. F. Andrews অর্থাৎ সংক্ষেপে C. F. A.; কেউ বলতেন তিনি Christ's Faithful Apostle, আবার কেউ বলতেন তিনি Christ's Fearless Apostle— দুই-ই সত্য। খৃষ্টের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস হেতুই তিনি নির্ভীক। কারণ তাঁর প্রভু যীশুই তাঁর জীবনের আদর্শ। কিন্তু প্রশ্ন— কিসের জন্য তিনি জীবন দান করেন? অতি সংক্ষেপে বলতে হয়— Justice and Love— দুঃখীমানুষের প্রতি অবিচারের প্রতিকার-ভাবনার উৎস মানবপ্রেম। সেই মানবপ্রেম অহেতুকী। কিন্তু সে কোন্ মানব যার প্রতি খৃষ্টের প্রেম ধাবিত হত? সে প্রেম ইহুদীর জন্যই নয়, সে প্রেম জু জেন্‌টাইল রোমীয় হেলেনিক নরনারী সাধ্বী পতিতা ধনী-দরিদ্র সুস্থ-দুঃস্থ সকলের প্রতি ধাবিত হত। ধর্মকে তার জাতীয় বা দেশীয় পরিবৃত্তি থেকে বের করে যীশু বিশ্বমানবকে আহ্বান করলেন। কালে সেই ধর্ম বেড়াজালে ঘেরা পড়ল— বিশ্বধর্ম হল খৃষ্টানী, খৃষ্টানী হল প্রটেস্টানিজম্, সেটা হল অ্যাংলিকান। সেই পরিবেশের মূর্তি দেখতে পেলেন ভারতে এসে— দিল্লীতে সেণ্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজে অধ্যাপনা করতে যখন এলেন। খৃষ্টের আদর্শ মনে রেখে মানুষকে কাছে টানতে গিয়ে দেখেন— তিনি ইংরেজ অধ্যাপক, শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম, অ্যাংলিকান চার্চের পাদরী, ধর্মযাজক— মিশনের উদ্দেশ্য 'হীদন' বা আত্মাহীন ভারতীয়দের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। খৃষ্টভক্ত এণ্ডরুজের মনে

সংশয় দেখা দিল। এই কি খৃষ্টের জীবন ও বাণীর আদর্শ! তাঁর জীবনে সমস্যা-প্রশ্ন শুনতে পাই *The Renaissance in India* গ্রন্থে— প্রথম গ্রন্থ যাতে ভারতের সংস্কৃতির বিচার করেছেন। গ্রন্থখানি লিখিত হয় ভাবী প্রচারকদের জন্য। বইখানি একাধিকবার পড়েছি। ষাট বৎসর পূর্বে লিখিত হলেও আজও শিক্ষিত ভারতীয়রা গ্রন্থখানি পড়লে উপকৃত হবেন। কারণ সেকালের অনেক সমস্যা আংশিকভাবে নিরাকৃত হলেও সম্পূর্ণভাবে দূরীকৃত হয় নি।

দিল্লীবাসকালে এণ্ডরুজের ধর্মজীবনে সংগ্রাম তীব্রভাবে দেখা দিচ্ছে, ভারতের হিন্দুমুসলমান ও শিখদের আন্তরিকভাবে জানবার সুযোগ পাওয়ায় খৃষ্টানী-গোঁড়ামি অর্থাৎ কোন্‌টা অ্যাংলিকান মত, কোন্‌টা অখৃষ্টান মত— তা নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার করতে মন সাড়া পায় না।

এণ্ডরুজের আন্তরজীবনে যে সুপ্তকবি তথা ভাবুক মনটি ছিল, তাকে তিনি পেলেন লন্‌ডনে ১৯১২ সালের জুন মাসে রোটেনস্টাইনের গৃহে। কবির গীতাঞ্জলির ইংরেজি গদ্যকবিতা পাঠ শুনে তাঁর জীবনে এল সেই পরম লগ্ন— যখন স্থির করলেন এই বিশ্বমানবসাধনযজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন। দিল্লীতে ফিরলেন পরিপূর্ণ মন নিয়ে।

ঈশ্বরকে বিনা তকমায় সেবা করা যায়— God can be served without a livery। সন্ন্যাসী পাদরী মোল্লার পোশাক না পরে অর্থাৎ আমি ধার্মিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী— এই ঘোষণা পরিচ্ছদে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রচার না করেও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়— তারই প্রতীক ছিলেন এণ্ডরুজ। গান্ধীজী বৈরাগ্যের মূর্তি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ— 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দ আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত। এণ্ডরুজ উভয়কে নিজের মধ্যের আলোকে সামগ্রিকভাবে দেখতেন। তাঁর বৈরাগ্যের মধ্যে কোনো অদ্ভুতত্ব ছিল না, ভোগের মধ্যে ছিল না কোনো আতিশয্য।

মুক্তি সম্বন্ধে লৌকিক মত হল— সংসার থেকে কর্ম থেকে বিরতি। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী মুক্তির সাধক— একজন চেয়েছিলেন মনের মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি, অপরজন চেয়েছিলেন দেশের মুক্তি, উৎপীড়িত জনতার উৎপীড়ক-শোষকশ্রেণীর হাত থেকে মুক্তি। এণ্ডরুজ এই দুই মুক্তিরই সাধক; তিনি ভারতের বর্ণ বৈষম্য বা জাতিভেদের দৃষ্টান্ত পঞ্জাব-বাসকালে স্বচক্ষে যথেষ্ট দেখেছিলেন। খৃষ্টানসমাজে এই বর্ণ বৈষম্য তাঁকে কম পীড়া দিত না। খৃষ্টান-অখৃষ্টান ভেদবুদ্ধি পাদরীদের ধর্মবোধকে কী নিদারুণভাবে আঘাত করছে তা দেখেও তিনি মনঃকষ্ট পেতেন। সেন্ট স্টিভেন্‌স্ কলেজের তিনি অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ছিলেন জনৈক শ্বেতাঙ্গ পাদরী; সেই শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে চিরাচরিত প্রথানুসারে শ্বেতাঙ্গ বৃটনই অধ্যক্ষ হবেন। কর্তৃপক্ষ এণ্ডরুজকে মনোনীত করলেন— কিন্তু এণ্ডরুজ ঘোর প্রতিবাদ করে জানালেন, ভারতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় খৃষ্টানই অধ্যক্ষ হবেন। সুশীল রুদ্র প্রায় ২০ বৎসর ঐ কলেজে উপ-অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছেন;— এণ্ডরুজের চেষ্টায় প্রাচীন প্রথা ভাঙল, কর্তৃপক্ষ সুশীল রুদ্রকে অধ্যক্ষপদ দিতে বাধ্য হলেন। এণ্ডরুজ উপাধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে তাঁকে সহায়তা দান করে চলেন। এই একটি ঘটনা থেকেই তাঁর মনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে তা জানা যায়— Justice— ন্যায়বিচার করতেই হবে।

এই ভাবনা থেকেই তিনি একদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় 'কুলি' বলে চিহ্নিত শ্রমিকদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ-বুয়র বৃটিশদের অত্যাচার-অপমানের সরজমিনে তদন্তের জন্য তথায় যাত্রা করেন। মহামতি গোখলেই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে স্বয়ং আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, কিছুটা মীমাংসাও করে আসেন। কিন্তু

সে সব বানচাল করে দেবার বুদ্ধি ছিল ধনপতিদের। 'কুলি'ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয় শ্রমিকদের নেতা ; বে-আইনি আইন— যা মানুষের জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করে তা গান্ধীজী মানতে পারেন নি— অহিংসার পথ ধরে প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ করলেন। এসব সংবাদ ভারতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতরা জানতে পারতেন টুক্‌রো টুক্‌রো সংবাদ থেকে— আজকালকার সংবাদ পরিবেশন ও প্রচারের যন্ত্র তখন অজ্ঞাত ছিল। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন গান্ধিজীর এই ব্যাপারটি। তিনি তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ভাবীকালের নেতার চিত্র ফুটিয়ে তুললেন গান্ধীজীর চরিত্র স্মরণ করেই।

এণ্ডরুজ বিদেশে তো যাবেন, কিন্তু পাথেয় ? গোখলে কিছু কিছু দিলেন, এণ্ডরুজ তাঁর শেষ তহবিল থেকে অবশিষ্টটা পূরণ করলেন, আর খৃষ্টান বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন কিছুটা। তাঁর সঙ্গী হলেন দিল্লীর W. W. Pearson।

এণ্ডরুজের জীবনে শুরু হল পরিব্রাজন। এর পর পঁচিশ বৎসর পৃথিবীর যেখানে ব্যথা, যেখানে অন্যায় অত্যাচার, মানুষের জন্মগত অধিকারের অবমাননা— সেখানেই এণ্ডরুজকে দেখা গিয়েছিল।

১৯১৪ সালে আফ্রিকা থেকে ফিরে তিনি মুক্তি নিলেন খৃষ্টীয় সঙ্ঘ (Cambridge Brotherhood) থেকে, আর আত্মসমর্পণ করলেন রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের কর্মে। এসবের পটভূমিতে ছিল যীশুখৃষ্টের জীবন ও বাণীর প্রেরণা। তবে সে কোন্ যীশুখৃষ্ট ? ঐতিহাসিক যীশুখৃষ্টকে তো খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি Schweitzer-এর বই পড়ে উত্তর পেলেন : যীশুকে পাওয়া যাবে অন্তরে— মানবের মনোলোকে তিনি পূজিত হয়ে আসছেন যুগে যুগে। এই কথাই তো বৌদ্ধরা বলেছিলেন বুদ্ধ সম্বন্ধে— তিনি মনুষ্যদেহধারী জীব নন, দেবতা নন— তিনি বোধিচিত্তের idea, তেমনি যীশুখৃষ্ট একটি idea যাকে যুগে যুগে ভক্তেরা গড়ে আসছেন আপনার আলোকে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কয়টি পংক্তি—

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

এণ্ডরুজ তাঁর প্রেমের ঠাকুরকে খুঁজেছিলেন মানবের মাঝে— পেয়েছিলেন গান্ধীর ভারত-স্বাধীনতা-আন্দোলনের মাঝে, পেয়েছিলেন কবিগুরুর বিশ্বমানবতার আদর্শ রূপায়ণের প্রচেষ্টার মধ্যে। তাঁর জীবনের অন্যতম মন্ত্র ছিল Justice— তাই দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্‌স্ কলেজের অধ্যক্ষপদ নিতে চান নি, বলেছিলেন ভারতে ভারতীয়রাই হবেন পরিচালক। ইংরেজ হয়েও তিনি ১৯২১ সালে ঘোষণা করলেন— ভারতের স্বাধীনতা দিতে হবে। তখনও ভারতীয় রাজনীতিকরা এ কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি, তাঁরা রাজনীতিক-ব্যাসকূট সৃষ্টি করে কেবলমাত্র বাক্যজাল বুনছিলেন।

গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন ; এণ্ডরুজ গান্ধীভক্ত হয়েও বললেন— তুর্কী-সুলতানের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষা করার অর্থ কি সমস্ত আরব-দেশগুলি তার অধীন থাকবে। তিনি জানতেন ইসলাম একটা idea— সেই idea মতে মুসলমানরা সবাই এক ; কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের পৃথক সত্তা অবিসম্বাদী সত্য। তাই খিলাফতকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

আবার শান্তিনিকেতনে যখন কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক তাঁদের ধর্মস্থান প্রতিষ্ঠা করার

প্রস্তাব পাঠান, সেই সময়ে এণ্ডরুজ কবিকে লেখেন যে, শান্তিনিকেতনে বিশেষ কোনো ধর্মের আসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না— আশ্রমের মন্দিরই তার প্রতীক। তিনি লেখেন—

With regard to the building of a Zoroastrian Institute, I am perfectly happy in my mind— just as I shoud welcome with all my heart an Islamic Institute. But I feel that our simple central place of worship [Santiniketan Temple], with its white marble pavement and its absence of all imagery and symbol— except the pure white flowers the children bring at the time of religious service— is the best expression, both of our individual freedom of belief and our common worship of the one Supreme. Each of us may add what colour he likes to the pure whiteness. But if we build our separate mosques and chapels and fire-temples, we stand in danger of repeating over again the religious divisions of the world.

শান্তিনিকেতনে girl guide হবে; সমিতির নিয়মানুসারে ছাত্রীদের oath নিতে হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রাজার প্রতি আনুগত্য। এণ্ডরুজ দূরে কোথায় ছিলেন, খবর পেয়ে কবিকে পত্রে জানালেন— এটা ঠিক হবে না, oath দিয়ে কাউকে বাঁধা যায় না।

যীশু পাপকে দূরে রাখতেন, পাপীকে বুকে নিতেন; এণ্ডরুজের জীবনে একাধিকবার সেটি দেখেছি। কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, আবার অজানিতে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন— তিনি নীরব।

দীর্ঘকাল তাঁর সহকর্মীরূপে আশ্রমকর্মে যুক্ত ছিলাম; মতান্তর হয়েছে, কঠিনভাবে আশ্রমে অসহযোগ আন্দোলন প্রচারিত হবার পথে বাধা দিয়েছি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো প্রত্যাঘাত করবার ইচ্ছামাত্র দেখি নি।

একদিনকার ছোট একটি ঘটনা মনে আছে। আমি তখন অধ্যাপক-সমিতির সম্পাদক। সে-সময় প্রতিবেদনাদি সব কিছুই বাংলায় লিপিবদ্ধ হত। বিশ্বভারতী স্থাপিত হলে, সভায় কথা উঠল— প্রতিবেদনাদি ইংরেজিতে লিখিত হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবে বাধা দেন এণ্ডরুজ; তিনি বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে— রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিদ্যায়তনে— বাংলার মাধ্যমে দপ্তরের কাজকর্ম হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা তা পারি নি। যদি পারতাম তবে হয়তো বাংলাভাষার মাধ্যমে একটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার গৌরব অর্জন করতে পারতাম। ঘটনাটি ১৯২২ সালের— তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। তখন ভারতে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের কথা শোনা যায় নি। আমরা বিশ্বভারতীতে বাংলার স্থান সুনিশ্চিত করতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম বাংলাভাষার মাধ্যমে সম্পাদিত হবে সে সংকল্প গ্রহণ করতে পারি নি। একজন বিদেশী যা বলেছিলেন, তা তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে সফল করবার পুনঃপ্রচেষ্টা করতে পারা যায় কিনা— এ কথা ভাববার সময় এসেছে।

বুদ্ধ

সি. এফ. এণ্ডরুজ অঙ্কিত

খৃষ্ট-পথিক এণ্ডরুজ

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রভু, তুমি দেখা দাও!

সাধকের নিরন্তর সাধনা, ভক্তপ্রাণের চিরন্তন আকুতি।

দেখা দাও!

অন্ধকার হৃদয়-মন্দিরে বাসনার একটি মাত্র প্রদীপ জেলে রেখেছি অনির্বাণ— তুমি দেখা দেবে, এই একটি মাত্র কামনা। এ কামনা মেটাও, এই বাসনা পূর্ণ করো। আমার মরদৃষ্টির সামনে তোমার দিব্যজ্যোতি নিয়ে একবার উদ্ভাসিত হও।

একান্তে বসে তপস্বী তপস্যা করে— পরিব্রাজক পথে পথে ফেরে। কারো প্রতীক্ষা বিজন আশ্রমে— কারো অনুসন্ধান জনাকীর্ণ জীবনধারার ঘাটে ঘাটে।

যীশুখৃষ্টের চরণে সমর্পিত-প্রাণ এণ্ডরুজ। যীশু তাঁর পরম প্রভু। পরম প্রভুর দেখা তাঁকেও পেতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্তরের সিংহাসনে। তাঁকে ডাকতে হবে, পেতে হবে— কে বলে তিনি আসবেন না?

মৃত্যু তাঁকে সমাপ্ত করতে পারে নি, সমাধির ভারি পাথরে চাপা পড়ে নি তাঁর আত্মা। তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন, প্রথম ভক্তগণের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা প্রথমে তাঁকে চিনতে পারে নি, তিনিই আত্মপরিচয় দিয়ে তাদের ধন্য করেছিলেন। বলেছিলেন—

ভয় নেই, আমার যে প্রিয় ভক্ত, সে আমার পুনরাগমন পর্যন্ত থাকুক।

যীশুর সেই আশ্বাস অপরিম্লান। সন্দেহের কালো ছায়ায় সেই আশ্বাসের শাশ্বত আলোকে মুছে ফেলবার শক্তি কার? এই মরজগতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ তিনি, মানবকল্যাণে তাঁর আত্মদান ঈশ্বরের করুণতম আশীর্বাদ। সেদিন তাঁর প্রিয় ভক্তকে তিনি বলেছিলেন—

বৎস, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।

তা হলে, আমার অনুজ্ঞা, আমার মেষগুলিকে তুমি পালন করো।

সত্য, সত্য। আমি যদি তাঁর প্রিয় ভক্ত হই, যদি তাঁর মেষগুলিকে পালন করি, তাহলে তাঁর পুনরাগমনের বাধা কোথায়? তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন— আবার আসবেন, তাঁর প্রিয় ভক্ত তাঁকে দেখে ধন্য হবে।

এই একনিষ্ঠ বিশ্বাস চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর বংশ ছিল ঈস্ট অ্যাংলিক্যান পিউরিটান বংশ। তাঁর পূর্বপুরুষরা ধর্মকে নিশ্বাস-সম জ্ঞান করতেন। ঈশ্বরের বাণীকে জ্ঞান করতেন অমৃত-সম। সেই ঈশ্বরের পরমপুত্র যীশুখৃষ্ট,— মানুষের একমাত্র পরিত্রাতা।

পিতা জন এডউইন এণ্ডরুজ ছিলেন ধর্মযাজক। অনাড়ম্বর সরল জীবন, দারিদ্র্যভরা সংসার। কোনো শাসন মানেন নি কোনো দিন, কেবল বিবেকের শাসন ছাড়া। সারা জীবন ধরে অনুগামীদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন— কঠোরভাবে নিজের বিবেকের অনুশাসনকে মান্য করো, কেননা

বিবেকের বাণীই ঈশ্বরের নির্দেশ। ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করলেই ঈশ্বরপুত্রের প্রিয় ভক্ত হবে। সেইসঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন— ঈশ্বরপুত্রের প্রিয় ভক্ত তাঁর দেখা পাবেই।

এ শুধু ধর্মযাজকের ভাষণ নয়— কথার কথা নয়। আপন মনের অচঞ্চল বিশ্বাস। সেই আদি শতাব্দীর কবি-সন্ন্যাসীর মতো মন ছিল তাঁর। প্রতীক্ষা-বিহ্বল নিত্য-রোমাঞ্চিত অন্তর ছিল তাঁর। কার প্রতীক্ষা? যীশুর প্রতীক্ষা। তিনি আসবেনই, দেখা দেবেনই প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে।

তাঁর ছেলে চার্লসেরও একই কামনা, একই ব্রত। যীশুকে দেখতে হবে, পেতে হবে। তবে তিনি প্রতীক্ষা করেন নি, খুঁজে খুঁজে ফিরেছিলেন।

যীশু বলেছেন—

বৎস, অনুসরণ করো আমাকে।

যে আমাকে চায়

সে একান্তভাবে আমাকেই অনুসরণ করে।

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজও তাই করেছিলেন। কিন্তু অনুসরণের আগে অন্বেষণ। একঠাঁই তপস্যা এণ্ডরুজ করেন নি, পথে পথে অন্বেষণ করেছিলেন তাঁর পরম প্রভুকে।

দেখা পেয়েছিলেন বৈকি।

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যদি তোমাকে খুঁজি— দেখা না দিয়ে যাবে কোথায়? এই তো তোমার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব!

ও এল হামাগুড়ি দিয়ে
শিকারীর হাতে ঘা-খাওয়া
জন্তুর মতো।
কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত
রক্তঝরা হাত আর পিঠ,
চোখে ওর ভয়ার্ত দৃষ্টি।
আমার সমস্ত প্রাণ
ছুটে গেল ওর দিকে,
নয়নে এল ব্যাকুল অশ্রুজল।
আর সহসা—
এ কী আমি দেখলাম?
এ কী বিস্ময়?
ওর ক্লিষ্ট চোখের মাঝে
প্রতিভাত হল
তোমারই মুখ,—
হে আমার দুঃখ-বেদনার পরম প্রভু,
তোমার অনির্বচনীয় নিত্যরূপ!

আধুনিক সভ্যতার আলো-ঝলমল স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে নয়,— ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকায়। সেখানকার ম্লানমুখ ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে। যারা কৃষ্ণকায় পরবাসী চুক্তিদাস।

তখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় এই শ্রমিকদের মুক্তি-সংগ্রাম চলছে। মহাশক্তিধর শ্বেত প্রভুদের বিরুদ্ধে শক্তিহীন ক্রীতদাসদের মুক্তি-সংগ্রাম। অর্থ নেই, শক্তি নেই, অস্ত্র নেই। কী দিয়ে তারা লড়বে? নেতার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি এই নিরস্ত্র বিপন্নদের যোদ্ধারূপে সংগঠিত করেছেন, অভয় দিয়েছেন, আর হাতে দিয়েছেন দুই অমোঘ অস্ত্র— অহিংসা আর সত্যাগ্রহ।

এণ্ডরুজ গিয়েছেন দক্ষিণ-আফ্রিকায় এই বিচিত্র সেনাপতির পাশে দাঁড়াতে, এই আশ্চর্য যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে।

ফিনিক্স আশ্রমে প্রথম সন্ধ্যা। পশ্চিম-আকাশে ম্লানায়মান সূর্য-আভা। খোলা আকাশের নীচে গান্ধীজী বসে আছেন। কস্তুরবা আর তাঁর ছেলেদের জেলে পুরেছে শাসকরা, বন্দী করে নিয়ে গেছে সহকর্মীদের।

নিরাত্মীয় নির্বান্ধব একলা মানুষ। খালি শিশুরা এসেছে। যাদের প্রভু খৃষ্ট সবচেয়ে ভালোবেসেছেন, বলেছেন, আহা, আর কেউ নয়, ঐ শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও!

সেই প্রিয় শিশুর দল গান্ধীজীকে ঘিরে রয়েছে। ভারতীয় অচ্ছুৎদের একটি শিশুকন্যা তাঁর কোলে। একটি রুগ্ন মুসলমান ছেলে তাঁর হাঁটু চেপে ধরেছে। আর গা ঘেঁষে বসে আছে একটি জুলু খৃষ্টান মেয়ে।

শিশুরা সংকীর্তন করল। গান্ধীজী মৃদু হেসে এণ্ডরুজকে বললেন— তুমি এবার গাও!

এণ্ডরুজ গাইলেন, Lead, Kindly Light!

অন্ধকার নেমে আসছে। ঐ ফুটন্ত শিশুদেরই মতো আকাশে ফুটন্ত কটি তারা। সেই আকাশের নীচে বসে গাইতে গাইতে এণ্ডরুজ ভাবলেন—

এই তো যীশুর সংসার! এখানে প্রভুর দেখা কি পাব না?

পেলেন।

তবে রাতের অন্ধকারে নয়, পর দিন সূর্য-ওঠা প্রত্যুষে।

গান্ধীজীর সঙ্গে বেড়াতে বার হয়েছেন। হঠাৎ পাশের আখের খেতের কোণে একটা মূর্তি চোখে পড়ল। নগ্নপ্রায় নেংটিপরা একটা লোক। মসীবর্ণ দেহত্বক। পথের পাশে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে বসে ছিল। গান্ধীজীকে দেখে ছুটে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে পিঠটা ক্ষতবিক্ষত। সারা হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। গান্ধীজী ওর গায়ে হাত দিলেন, শিরশির করে উঠল ওর কাঁধ।

এণ্ডরুজের বুঝতে বাকী রইল না। ও এক ভারতীয় চুক্তিদাস, সাদা চামড়াধারী প্রভুর কাছে ওর দেহমন বিক্রীত। অত্যাচারে জর্জরিত দেহ, উৎপীড়নে আতঙ্কার্ত প্রাণ, ঘা-খাওয়া শিকলে বাঁধা মূক একটা জন্তু। আর সহ্য করতে পারে নি, তাই বাগিচা থেকে পালিয়ে এসে গান্ধীজীর কাছে আশ্রয় চাইছে।

এণ্ডরুজ তাড়াতাড়ি লোকটিকে তুলে ধরতে গেলেন। লোকটি চোখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে। কথা ফুটল না মুখে। ঠোঁট দুটো অস্ফুট আর্তনাদের বেদনায় কাঁপতে লাগল।

তুমিও সাহেব, তোমারও সাদা চামড়া! তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি, আবার তুমি আমাকে ধরবে, আবার আমাকে মারবে?

খৃষ্টানুসন্ধানী এণ্ডরুজ ঐ আর্ত নিপীড়িত ভারতীয় চুক্তিদাসের হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে এক লহমায় তাঁর পরম প্রভুর মুখ দেখলেন।

উনিশ বছর বয়সের একটি অনুভূতির স্মৃতি। তখন সবে স্কুল-জীবন শেষ হয়েছে। কেম্‌ব্রিজে ভর্তি হবেন। পিতা একদিন বললেন, আমি চাই, তুমি পড়াশুনো শেষ করে আমারই মতো ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করো— তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পিতার অনুরোধ যেন বজ্রবাণী। এই বাণীকে হৃদয়ে গ্রহণ করবার শক্তি কোথায় তাঁর? কোথায় তাঁর মনের প্রস্তুতি, কতটুকু তাঁর বিশ্বাস আর মনোবল? ঈশ্বরের কাজে জীবন ও জীবিকাকে আবদ্ধ করবার দায় কি সহজ দায়?

দিন কাটতে লাগল প্রতি মুহূর্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায়। শেষে এল এক আশ্চর্য রাত্রি, সারাজীবনের অবিস্মরণীয় নিভৃত প্রহর। এণ্ডরুজের নিজেরই ভাষায় যার বর্ণনা:

একলা ঘরের অন্ধকারে আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম। সহসা এই প্রার্থনার মধ্যে আমার বিবেকের সম্মুখীন হলাম আমি। আমার জীবনের সমস্ত পাপ সমস্ত অপবিত্রতা অচরিতার্থতা প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে আমার উপর ভেঙে পড়ল, এক লহমায় ছিন্ন করে দিল আমার মনের সমস্ত অহমিকা, সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ভান। সর্ব-আভরণহীন আমার উলঙ্গ সত্য-স্বরূপকে আমি চিনলাম।… দুই হাতে মুখ ঢেকে নতজানু হয়ে বসে রইলাম— সর্বস্বহারা হয়ে শুধু আকুল প্রার্থনা করতে লাগলাম।… শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য আর অপরিসীম শান্তিতে আমার প্রাণমন ভরে উঠল, মনে হল ঈশ্বরের করুণাধারা ধীরে ধীরে আমার চৈতন্যের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত নিষিক্ত করে দিচ্ছে।… আমার সে মুহূর্তের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটুকু শুধু বলতে পারি যে সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম যে খৃষ্টই আমার ত্রাতা, আমার অনন্ত দেবতা।…

তুমি আমাকে কেমন করে ত্রাণ করবে প্রভু, যদি কাছে না আসো? কেমন করে পরম দেবতার পূজা করব, যদি সামনে না পাই?

সেই উনিশ বছর বয়সে অন্বেষণের শুরু। তেতাল্লিশ বছর বয়সে অবসান। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ফিনিক্স আশ্রমে। এখানে তাঁর দুঃখ-বেদনার পরম প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন তিনি পেয়েছেন। ঐ কৃষ্ণকায় দাসের যন্ত্রণাকাতর মুখে তাঁরই পরম সুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি।

এণ্ডরুজ বুঝলেন,— খৃষ্ট নিত্য-আবির্ভূত। যুগে যুগে মানুষের যেখানে যন্ত্রণা, মানবাত্মার যেখানে নিপীড়ন, সেইখানেই খৃষ্টের আবির্ভাব।

মানবভাগ্যের সেই বেদনা-বঞ্চনার মধ্যেই আমার প্রভুকে বারেবারে আমি পাব। শুধু মুখের মন্ত্রে নয়, তাঁর প্রিয় কার্যের যন্ত্র হয়ে আমি তাঁর উপাসনা করব। সেই হ্রদের ধারে তাঁর প্রথম শিষ্যরা প্রভুকে যেমন দেখেছিল, যেমন তাঁর কথা শুনেছিল, আমিও তাঁকে উপলব্ধি করব তেমন করে, সেবাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে। এবার থেকে জীবনের মুহূর্তে মুহূর্তে আমি শুনতে পাব তাঁর অমোঘ অমৃতবাণী,—

বৎস, অনুসরণ করো আমাকে।

দ্বিজ— মানে যে দুবার জন্মলাভ করে। এণ্ডরুজ বলেছেন, আমি দ্বিজ, এই পৃথিবীতে আমি দুবার জন্মলাভ করেছি। আমার দ্বিতীয় জন্মদিন ঈশ্বরের এক অপূর্ব দান।

এই শুভদিনে এণ্ডরুজ প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, প্রাচ্য জগতে তাঁর নবজীবনের সূচনা হয় এই দিনে।

সত্যিই প্রাচ্য জগতে এণ্ডরুজের নবজন্ম। প্রতীচ্যের মানুষ তিনি— এই প্রাচ্যে না এলে তাঁর পরম প্রভুর সন্ধান তিনি পেতেন না। এই প্রাচ্যে এসেই তাঁকে পেয়েছেন, লাভ করেছেন তাঁর নিত্য অনুসরণের পন্থা আর পাথেয়।

যীশুখৃষ্ট এই প্রাচ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন,— প্রাচ্যের মানুষদেরই তিনি সঙ্গ দিয়েছিলেন— আর প্রাচ্য ভূমিতেই তাঁর সমাধি। যে প্রতীচ্য ভূমি তার বর্বর শক্তি দিয়ে সমস্ত প্রাচ্য জগৎকে গ্রাস করেছে, প্রতি প্রাচ্য জাতিকে শৃঙ্খলে বেঁধেছে, তেমনি এক শৃঙ্খলিত পরাজিত প্রাচ্য জাতির ক্রোড়েই যীশু জন্মেছিলেন। যে উগ্র সাম্রাজ্যবাদের শোষণে সমস্ত প্রাচ্য জগৎ নিরক্ত অসহায়, যীশুর জাতিও সেই সাম্রাজ্যবাদের কবলিত ছিল। যে ধর্মান্ধতার অনুশাসনে প্রাচ্যের মানুষরা অমানুষ বলে পরিগণিত, ধর্মান্ধতার সেই হিংস্র বিচারেই যীশুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ যারা অকুতোভয়ে চালিয়েছে, স্বাজাত্যবোধের মদগর্বে যারা মানুষকে মানুষ বলে মনে করছে না, আর ধর্মান্ধতার নগ্ন আস্ফালনে যারা ঈশ্বরের সমগ্র করুণাকে কলঙ্কিত করছে— তারা প্রতীচ্যবাসী, আর তারাই খৃষ্টান।

যীশু বলেছেন—

যতদিন না তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতো হও,
ততদিন তোমরা পাবে না
স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার।
মনে রেখো,
যে ঐ শিশুর মতো অবনত,
সেই পাবে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ আসন।

শিশু কি সম্রাট হয়? শিশু কি সংস্কারের কোনো বাধানিষেধ মানে? শিশু কি তার জাতি নিয়ে গর্ব করে?

ঈশ্বর সেই মানবশিশুকেই ভালোবাসেন।

সাধু পল বলেছেন—

যীশুর দৃষ্টিতে ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই, আর্য নেই, অনার্য নেই, প্রভু নেই, দাস নেই,— খৃষ্টই সর্বস্ব আর সকলের মধ্যেই তিনি বর্তমান।

যীশু ডেকেছেন—

এসো তোমরা,
যারা শ্রান্ত দুর্বল
যারা গুরুভার, আমার কাছে তোমরা এসো,

আমি তোমাদের দেব আশ্রয়।

যীশু ইউরোপীয়দের ডাকেন নি, খৃষ্টানদের ডাকেন নি,—ডেকেছেন সর্বজাতির সর্ব ধর্মবিশ্বাসের সকল মানুষকে— যারা দুর্বল, যারা অনুন্নত, ভাগ্য যাদের করুণ।

যে করুণ, সেই তো করুণা চায়, করুণা পায়। সেই তো সারা পৃথিবীর সকল মানুষ। প্রাচ্যে না এলে এণ্ডরুজ সেই মানুষকে চিনতে পারতেন না।

দেশে থাকতেই কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা শেষ করে এণ্ডরুজ কয়েক বছর ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে যাজকবৃত্তি করেছিলেন। যন্ত্রণাভরা যন্ত্রযুগে মালিকের মুনাফা আর শ্রমিকের শোষণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল তাঁর।

তাঁর প্রতিবেশী ছিল সেইসব শ্রমিকের দল—কারখানা আর খনিতে যারা কাজ করে। তারা মানুষ না, যেন যন্ত্রেরই অংশ। দৈনন্দিন খাটুনির অবসানে তারা টলতে-টলতে বার হয় স্বাভাবিক মানবতা আর শক্তির শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়ে। অর্থ নেই, আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই— তারা গুঁড়ি মেরে জন্তুর মতো হাঁটে, আশ্রয় নেয় ভাঁটিখানায়। মদ আর জুয়ার মধ্যে তারা দিনান্তের ব্যর্থতার ওষধি খোঁজে।

এণ্ডরুজের কাজ এই নিপীড়িত নিত্যবিড়ম্বিত শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা। কিন্তু এদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেমের বাঁধা বুলি আউড়ে কি হবে? যদি-না এদের দুঃখবেদনার সমভাগী হওয়া যায়, এদের জীবনক্ষতের যন্ত্রণাকে আপন হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়?

যীশুখৃষ্ট বলেছেন, প্রতিবেশীকে প্রেম করো।

এই শ্রমিক-সমাজকে এণ্ডরুজ ভালোবাসতে শিখেছিলেন, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন।

সেইসঙ্গে দেখেছিলেন ধনিকের বিত্তের পাহাড় আর সর্বগ্রাসী লোভ। তার শোষণ আর শাসন। তার নির্লজ্জ আত্ম-অহমিকা। ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা যত সহজ, সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের এগিয়ে যাওয়া তার থেকে সহজ। খৃষ্টের এই বাণী তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আর সেইসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

ধনতন্ত্রের স্বরূপকে আমি চিনেছি,— এই ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপস জীবনে আমার সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর মধ্যে এণ্ডরুজ তাঁর অন্তরদেবতা খৃষ্টকে চিনলেন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন খৃষ্টপ্রেরণার চরম বিকাশ, খৃষ্টোপম জীবনানুসরণের পরম প্রকাশ। ঘনিষ্ঠ হলেন আর-এক মহামানবের সঙ্গে, যিনি ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি, গীতাঞ্জলির উদ্গাতা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর কোনো দ্বিধা নেই। Christ's Faithful Apostle হয়ে সি. এফ. এণ্ডরুজ যাত্রা করলেন খৃষ্টানুসরণের পথে। একের পর এক সমস্ত বাধা অতিক্রম করে।

প্রথম বাধা খৃষ্টানত্বের বাধা।

আমি কি খৃষ্টান? এই প্রচণ্ড প্রশ্নের বাধা। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে, এই বাধা দূর করতে হবে।

আমি খৃষ্টান সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, খৃষ্টান সমাজের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বড়ো হয়েছি, খৃষ্টান গির্জায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছি,— অতএব আমি খৃষ্টান ?

দক্ষিণ-আফ্রিকায় এক খৃষ্টান গির্জায় যাজনা করবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এণ্ডরুজ। কী কথা তিনি সেই ধর্মমন্দিরে বলবেন ? একমাত্র যারা খৃষ্টান তারাই পাবে স্বর্গরাজ্যের অধিকার, আর যারা অখৃষ্টান তারা ভোগ করবে অনন্ত নরক ? গান্ধীজী এসেছিলেন এণ্ডরুজের যাজনা শুনতে। কৃষ্ণকায় অখৃষ্টান গান্ধীজীকে গির্জার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।

এণ্ডরুজের মনে হল স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে ওরা তাঁর মন্দিরদ্বার থেকে দূর করে দিয়েছে। তা তো দেবেই। ওরা যে খৃষ্টান! কিন্তু এণ্ডরুজ তো সেই খৃষ্টান হতে পারেন না! ঈশ্বরের নির্দেশকে মান্য করাই খৃষ্টানের একমাত্র পরীক্ষা। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে যে যাত্রা করে সে সমাজ-বন্ধন মানে না, জাতি-স্বার্থ মানে না। সমস্ত সংস্কারের বাধাবর্মকে বিদীর্ণ করে সে চলে ঈশ্বরের নির্দেশে।

যীশু বলেছেন—

কে আমার মাতা ?

কেই বা আমার ভ্রাতা ?

ঈশ্বরের আজ্ঞা যে পালন করে

সেই আমার ভ্রাতা,

সেই আমার ভগিনী, সেই আমার জননী।

খৃষ্টই দেখিয়েছেন ভেদবাধাবিহীন ঈশ্বরনির্দিষ্ট পথ। সমাজ যাদের ঘৃণা করে খৃষ্ট তাদেরই প্রেম করেছেন,— সমাজ যাদের পরিত্যাগ করে খৃষ্ট দেন তাদেরই আশ্রয়।

খৃষ্টই এণ্ডরুজকে বার করে আনলেন খৃষ্টান সমাজের গণ্ডী থেকে। খৃষ্টান ধর্মযাজকের বৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে সীমানাহীন বিশ্বসমাজে পরিব্রাজক করে প্রেরণ করলেন।

তাঁকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করে ছেড়ে দিলেন।

বর্ণবিদ্বেষকে ঘৃণা করতে শিখেছেন, ধর্মসংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু জাতীয়তার অভিমান ? সে অভিমানকে দূর করা যে বড় শক্ত। এণ্ডরুজ ইংরেজ— যে ইংরেজ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, যার সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না।

প্রথম-মহাযুদ্ধ এক মহান্ অগ্নিপরীক্ষা। এই যুদ্ধে লড়াই করছে স্বদেশবাসী ইংরেজ— কত উদ্দীপনা, কত বীরত্ব, কত আত্মদান! যুগসঞ্চিত কত পাপ কত অন্যায় এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে,— দাবানলের দিগন্তে আশার রক্তিম আভাস বুঝি ফুটছে।

যুদ্ধ চলল, এণ্ডরুজের আত্মপরীক্ষাও চলল। বুঝতে দেরি হল না যে এই যুদ্ধ সত্যের বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে। হিংসা আর লোভই এই যুদ্ধের বীজ, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আর পাশব বর্বরতাই এই যুদ্ধের প্রকাশ। যুদ্ধের অবসান নূতনতর ভীষণতর যুদ্ধেরই প্রস্তুতি।

যীশুখৃষ্টের সুস্পষ্ট বাণী তিনি প্রাণের মধ্যে শুনলেন—

তোমার শত্রুকে তুমি প্রেম করো,

যারা তোমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের মঙ্গল করো,
তাদের জন্যে প্রার্থনা করো,
তবেই তুমি
পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে।

এই বাণীর কোনো স্বার্থ নেই। এই যুদ্ধ ঈশ্বরের যুদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ। এ যুদ্ধের জন্য যীশু প্রাণ দেন নি, এ যুদ্ধ দেখবার জন্যে যীশু পুনরুজ্জীবিত হবেন না। এ যুদ্ধ তাঁর যুদ্ধ নয়।

কিন্তু যুদ্ধ যে করতেই হবে। সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক, এণ্ডরুজ প্রার্থনা করলেন— প্রভু, আমাকে সৈনিক হতে দাও।

যীশু বললেন—
বৎস, অনুসরণ করো আমাকে।
আমার ভ্রাতাদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা,
সে নির্মমতা আমারই প্রতি,
সেই নির্মমতার বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করো।

যুদ্ধক্ষেত্র জালিয়ানওয়ালাবাগ। সেখানে বিদেশী শাসকের পশুশক্তি উন্মত্ত হয়ে শত শত নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে, জেলে পুরেছে, চাবুকের প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করেছে। কালো মানুষ তারা, পরাধীন অহিংস ভারতবাসী।

এণ্ডরুজ স্থির থাকতে পারলেন না। প্রথম সুযোগেই ছুটে গেলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। অমৃতসর আর আশেপাশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন। ইংরেজ শাসকের চাবুকে রক্ত-ঝরা সাধারণ মানুষের সামনে নতজানু হয়ে বসলেন। ব্যাকুল দু হাতে তার পা জড়িয়ে ধরে বললেন—

গুরু নানক তাঁর গ্রন্থসাহেবে বলেছেন, ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমাকে, আমার দেশের লোক তোমার উপর যা করেছে, তা আমারই পাপ!

সমস্ত ইংরেজ জাতির হয়ে অবমানিত উৎপীড়িত মানবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এণ্ডরুজ। আর সেই সঙ্গে মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করলেন—

সাম্রাজ্যবাদ মানবতার পরমতম শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ যীশুখৃষ্টের আদর্শের পরিপন্থী— ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পেতেই হবে।

যে আমাকে চায়, সব কিছু পরিত্যাগ করে সে শুধু আমাকেই অনুসরণ করুক।

এণ্ডরুজও অনুসরণ করলেন। সমাজ গেল, ধর্মের সংস্কার গেল, শ্বেতবর্ণের আত্মাদর গেল, সাম্রাজ্যবাদী যত অহংকার আর জাত্যভিমান গেল। রইলেন শুধু পরম প্রভু যীশুখৃষ্ট— সামনে শুধু প্রভু-প্রদর্শিত অন্তহীন পথ।

সেই পথে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে অন্তহীন পরিব্রজ্যা। পদানত মানবতার দাবী নিয়ে এণ্ডরুজ সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। বর্ণবিদ্বেষ, উপনিবেশবাদ, ধনতন্ত্র আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। মানুষ যদি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করে

আর বিনিময়ে আপন আত্মাকে হারায় তাহলে কী তার লাভ? এমন কী কাঙ্ক্ষিত সম্পদ আছে যার বিনিময়ে মানুষ আপন আত্মাকে বিলিয়ে দিতে পারে?

যীশুর আশীর্বাদে সেই আত্মাকে উজ্জ্বল করো।

ধর্মান্ধকে তিনি ধিক্কার দেন নি, অনাচারীকে তিনি হেয় করেন নি, হিংস্রকে তিনি হিংসা করেন নি। তিনি তাঁর পরম প্রভুর কথা স্মরণ করেছেন, আমি জগতের বিচার করতে আসি নি, জগতের পরিত্রাণ করতে এসেছি। এণ্ডরুজ বিশ্বাস করেছেন— ধর্মে নয়, মন্দিরে নয়— ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত। মানবতার দ্বারে দ্বারে ঘুরে এণ্ডরুজ সেই অন্তরকেই স্পর্শ করে ফিরেছেন।

যীশু বলেছেন—

তাকাও দেখি, বলো দেখি—

কোনো দুঃখ কি আছে,

আমার দুঃখের তুল্য?

মানবপুত্রের বেদনার তুলনা নেই, অপরিসীম সেই দুঃখ। সেই দুঃখ সারা পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষের বুকে সঞ্চিত হয়ে আছে।

সংশয়ে আমরা তাঁকে অস্বীকার করেছি,

ক্রোধে তাঁকে আমরা হনন করেছি,

এখন প্রেমে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

প্রেমই সর্বশক্তিমান,

প্রেমের শক্তিবলেই যুগসঞ্চিত বেদনা-বঞ্চনার অবসান।

বিচার নয়, করুণা। হিংসা নয়, প্রেম। সামান্যতম প্রাণ যেখানে নির্যাতিত, এণ্ডরুজদের মমত্বভরা প্রাণ সেখানেই ছুটে গেছে। সারাজীবন অবিরাম তিনি ছুটেছেন, বিরামহীন আবেগে ছুটে ছুটে তাঁর দুঃখসন্ধানী আত্মা সেই অনির্বচনীয়কেই লাভ করেছে— যাঁর নাম পরম প্রেম, যিনি তাঁর পরম প্রভু।

এ রচনা এণ্ডরুজের জীবনচরিত নয়। তাঁর কথা লিখতে গিয়ে শুধু তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-রূপটি মনে ভাসে। রিক্ত পরিব্রাজক ছিলেন এণ্ডরুজ। খৃষ্ট বলেছেন, শৃগালদেরও মাটির নীচে গর্ত আছে, পাখিরও বাসা আছে বৃক্ষচূড়ায়, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। মানবপুত্রের চিরভক্ত এণ্ডরুজেরও ছিল না।

তাঁর প্রিয় বন্ধুজন নানা নামে তাঁকে ডাকত। একটি পরিচিত নাম দীনবন্ধু। ওয়াণ্ডারিং খৃষ্টান— এই নামটি এণ্ডরুজ সবচেয়ে ভালোবাসতেন।

এই কপর্দকহীন নিত্য-ভ্রাম্যমাণ বিশ্বপথিককে কে জোগাত পাথেয়? দীনের হাতে কতবার শেষ মুদ্রাটি তিনি তুলে দিয়েছেন। কে দিত বস্ত্র? কতবার পথের ভিখারীকে গায়ের পোশাক খুলে দিয়ে রিক্তবস্ত্র হয়ে তিনি বিচরণ করেছেন। কে মিলাত আশ্রয়? কতবার দুর্গতি আর বিপদের বন্ধুরতম পথে ক্লান্ত পায়ে তিনি চলেছেন একা।

সব পেয়েছিলেন যীশুর কাছ থেকে— যিনি শরণাগতের পরিত্রাতা।

পরিত্রাতা বলছেন—

তোমরা আমাকে আহার দিয়েছিলে,

যখন আমি ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম।

যখন পিপাসিত হয়েছিলাম,

তখন দিয়েছিলে পানীয়।

বস্ত্রহীন অবস্থায় আমাকে বস্ত্র দিয়েছিলে,

আর নিরাশ্রয় আমাকে দিয়েছিলে আশ্রয়।

তোমরা আমার আশীর্বাদ নাও!

বিস্মিত ভক্তরা শুধালো—

কবে প্রভু, আপনাকে আহার দিয়েছিলাম, পানীয় দিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে বস্ত্র দিয়েছিলাম, আশ্রয় দিয়েছিলাম?

প্রভু বললেন—

দিয়েছিলে বৈকি।

আমার এই ভ্রাতাদের মধ্যে যে তুচ্ছতম,

তার প্রতি যে করুণা করেছ,

সে করুণা করেছ আমাকেই।

সেই করুণা করেছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। তাঁর করুণাধারা বর্ষিত হয়েছিল সবার নীচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝে। বিনিময়ে জীবনের যা কিছু চরিতার্থতা তা এণ্ড্রুজ তাঁর পরম প্রভু যীশুখৃষ্টের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

আবার তাঁর জীবনই পরম প্রভুর চরণে তাঁর কৃতার্থ ঋণাঞ্জলি।

মহামতি এণ্ডরুজ

অমিয় চক্রবর্তী

অতীন্দ্রিয় বার্তা আসে, সন্ত বলেছেন সংসারীকে,
দিব্যবিভা ঐশীদান, শুভচিত্তে সে নিত্য অলোক ;
শ্রুতিসাক্ষ্য পুণ্যশ্লোক জানালো সন্ত্রস্ত ধরণীতে
মাটিতে আসেন নর-নারায়ণ যৌগিক শক্তির
যুগে যুগে অবতার,— অপরোক্ষ বুঝি না প্রাণের
অপার্থিব ধর্মোদ্দেশ।

দেখেছি ধুলোর পথে শুধু
দ্বারে এসে দাঁড়ালেন আমাদেরি আত্মীয় অজানা
জনসাধারণ কেউ অনন্য আনন্দমূর্তি নিয়ে
মুহূর্তে প্রাণের ব্রতী, লৌকিক, বরেণ্য অগণিত
তাঁরা কেউ চাষী, শিল্পী, গৃহবধূ, দেশী সর্বদেশী
সূর্যস্নাত পৃথিবীতে— এণ্ডরুজের শান্ত নীল চোখে
দেখেছি অপার দৃষ্টি, মনে পড়ে আশ্রমপল্লীর
রতনকুঠিতে তিনি কবির অতিথি দূর হতে
হঠাৎ উদিত, তীর্থ-সমুদ্র পেরিয়ে বীরভূমে
একেবারে সমাগত প্রত্যেকের হৃদয়ে, সেদিন
উৎসবের লগ্ন যেন ক্ষুদ্র-গোষ্ঠী বন্দিত বন্ধুর
একটি নির্মাল্য দান ; অতি-মানবিক দাবি-হীন
শিষ্যহীন পান্থ, তাঁকে জানালো মর্মর-শালবীথি
কাঁকর খোয়াই আর দিগ্বলয় কুঠি তালবন
অব্যক্ত স্বাগত।

এই নম্র ইংরেজের মুখে চেয়ে
প্রাণের স্বধর্ম পেল কত পূর্ব-পশ্চিম বসতি,
সহস্র শাস্ত্রের এক মণিকাগ্নি প্রজ্বলিত বাণী
ঘরে ঘরে আলো হল।

বাজে নি দামামা নির্ঘোষের
পুণ্যযুদ্ধ পাঞ্চজন্যে, সংহারী গুরুর বাক্যধ্বনি
জাগে নি মর্তের মৃত্যুস্তবে—সাম্রাজ্য বিক্রম

অতিক্রান্ত যে-মানুষ, দুর্লভ প্রেমের নিত্যশ্রমে
দশকে দশকে যাঁর ব্যক্ত হল মুক্তির অধ্যায়,
শান্ত তিনি। ভারতীর পরম-আত্মীয়-নামাঙ্কিত
— দীনবন্ধু। আত্মভোলা, পরিচয় কাহিনীর মতো;
যদিও বিদেশী রং, বেশ তাঁর ভারতে স্বদেশী
খাটো ধুতি, খাদি কুর্তা, কিম্বা কারো দেয়া পাজামায়
মলিন কালির চিহ্ন, তারি সঙ্গে নতুন কোটের
ক্বচিৎ সঙ্গৎ, তাঁর চুল-ওড়া প্রশস্ত ললাট,
দীর্ঘদেহ, যাতায়াত পোস্টাপিসে কিম্বা গ্রন্থালয়ে,
প্রত্যেক কাজেই যেন শিশুর ব্যস্ততা আনন্দিত—
যেখানেই দেখ তাঁকে, সেবাগ্রামে শান্তিনিকেতনে
সেই মিশ্র দৃঢ়শক্তি কোমল দৃষ্টির করুণায়;
অবিরত চিঠি লেখা, কঠিন চেয়ারে সারাদিন
— ছাত্রের পরীক্ষা যেন— বই রচা, রাশি প্রুফ দেখা,
তার পরে অন্তর্ধান,— কে জানে কোথায় জাঞ্জিবারে
লবঙ্গের ব্যবসায়ী হতাহত, সাদা-কালো ধনিকে-নির্ধনে
দক্ষিণ-আফ্রিকা জুড়ে বর্ণদ্বেষ, ব্রিটিশ প্রতাপ
শিথিল কিম্বা উগ্র, সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-অহংকার
তখনো প্রমত্ত, ধীর ইংলণ্ডের এই প্রতিনিধি
কোনো জাতিধর্ম নয়, সত্যের সপক্ষে গৌরবী
খুঁজেছেন বেদনায় সহজ চিত্তের অধিকার,
খৃস্ট-ক্রুশ বহনের অন্তিম প্রেরণা দাবি নিয়ে
তাঁকে পথে চলতে হল, দ্বীপ-পুঞ্জ দূরের ফিজিতে,
ত্রিনিদাদে, গিয়ানায়—আড়কাঠি দাস-ব্যবসায়ী
সামরিক অন্ধকার ছড়িয়েছে—একাকী এণ্ডরুজ
দরিদ্রের একজন, তাঁকে ভক্তি দিলেন গান্ধীজি,
তপোশক্তি; কবিগুরু স্নেহনত প্রেম-আশীর্বাদে
দ্বার খুলে দাঁড়ালেন পথে চেয়ে; বৎসরে বৎসরে
এমন পুরুষ, তাঁর অজস্র ত্যাগের আবর্তিত
বার্তা আজ কে না জানে, সার্বিক বিশ্বের ইতিহাসে
তবুও বীর্যের তথ্য অলিখিত, প্রেমের অক্ষয় শক্তিশীল
অন্তঃশীলা তাঁর দান, নদী-বাঁকে গ্রাম্য স্তরে স্তরে
যেমন অদৃশ্য পলি তুলে ধরে কচিধান, ভরে

প্রতিদিন ঘরকন্না মাতৃহৃদয়ের মাতৃভূমি,
সামান্যের দৈব সেই ; সাক্ষ্য তার কেবল প্রাণের ॥

২

বারে বারে ফিরে দেখি, তাঁরি চোখে আমাদেরি চোখে
মাঝি এল নৌকো বেয়ে, তাঁতি বোনে চিত্র সূত্রজাল,
গ্রাম্য মেয়ে চুল বাঁধে, কাঁকই বাঁ-হাতে কাছে-ধরা ;
স্মিত সুধা জীবনীর ; লণ্ডনের লাল-বাসে চড়ে
দোতলা কক্ষের যাত্রী, নিত্য কোন্ আশ্চর্যের পটে
যা-কিছু তুচ্ছ তা বড়ো ; দেশে দেশে চির ইতিহাস
অলক্ষ্য ইঁটের গাঁথা ইমারত ভাঙে গড়ে আজো,
মানুষের এ-সংসারে স্মৃতি-বিস্মৃতির যুগ্ম জলে
প্রবাহ থামে না।

তবু এরি মূল্য কিনতে হয় জেনে
দুর্গতির ইতিবৃত্ত, চাঁদপুরে চা-বাগানী যারা
ধর্মঘটে ছুটে এল অসহ বণিক-অত্যাচারে
বেয়োনেট-বিদ্ধ সেই অসহায় শ্রমিকের কাছে
দাঁড়ালে দুঃখীর বন্ধু, ছুঁড়ে ফেলে পশ্চিমী মর্যাদা,
পূর্বী-ধ্যানে তিরোভাব ; নীল চক্ষে ঘনানো বিদ্যুৎ
দেখেছি সেবার বীর্যে ; উড়িষ্যা-বন্যায় হা-ঘরে
জননীর শুশ্রূষায় ডেকে নিলে আমাদেরো, শত
ধ্যানের কঠিন সদাব্রতে, যুক্ত যেন সব চেয়ে
ভারত-মুক্তির পথে ছিলে আজীবন, দুঃখে সুখে ;
দুর্বিবহ পরীক্ষায় ডাক এল পঞ্জাবে দুর্দিনে
যখন সমস্ত দ্বার বন্ধ, স্তব্ধ, অস্তিক অশুভে
মারণিক পররাষ্ট্র পিষ্ট ক'রে নিরস্ত্র জনতা
তুলেছিল রক্তধ্বজা, সেদিন এণ্ডরুজ পদাতিক
একাকী দিলেন নাড়া দুর্গের নিশান্ত প্রহরে,
প্রতিহত, তবু ফিরে গ্রামে গ্রামে ক্ষমার ভিখারি
জানালেন জনে জনে আপন জাতির অপরাধ,
সে-পাপ সবারি আজ— লোকালয় দগ্ধ করে যারা
তাদের বিক্রম দেখ ; কোনো যুদ্ধে কোনো অনাচারে
মানুষের পক্ষ ভুলে উষ্মা তাঁর উচ্চ বাচনিক

বাঁধেন নি ঐশিতায় কোনো রাষ্ট্র-উন্মত্ত সংগ্রামে,
সাম্যের সাধক তিনি ; প্রলয়ের নবপর্বে আজ
প্রসাদ বিকীর্ণ হোক্‌ তাঁরি জীবনের আশীর্বাদে ॥

একদিন কলকাতায় ক্ষুদ্র এক শোকার্ত মিছিল
আমরা ক-জনে মিলে চলেছি সমাধি-যাত্রীদল
এণ্ডরুজের দেহ নিয়ে— ছিল না তো সে-দলে সেদিন
দেশী বা বিদেশী কোনো প্রতিনিধি রাষ্ট্রের, ধর্মের
সরকারি মহাজন সম্মানের গৌরব-প্রতীক ;
গরিবের বন্ধু যিনি তাঁর যোগ্য গরিব মর্যাদা
প্রার্থনায় পূর্ণ হল, ছায়াচ্ছন্ন সেই ছল ছল
পত্রকীর্ণ পরিধিতে শেষ হল অশেষ জীবন,
আলোকিত সেই সত্তা গাঁথা হল ; আজও মনে আছে
জেগে উঠল তাঁর ছবি, করুণায় আপ্লুত জীবন,
সেই কবেকার পুণ্য প্রত্যুষের শান্তিনিকেতনে
কবি আর এণ্ডরুজের প্রাতরাশ, বাক্যালাপধ্বনি
দুই বন্ধু ঐকান্তিক কর্মে মুগ্ধ, দূরে কতবার
দেখেছি নিবিষ্ট চিত্ত, মহাত্মা গান্ধির শেষ নতি
আরোগ্যভবনে ভোরে মহামতি চার্লির মৃত্যুর
আসন্নিক পর্বে।

কোন্‌ অসীম আশ্বাস ব্যাপ্ত হল
শতবার্ষিকীর এই প্রণম্য উৎসবে অর্ঘ আমি,
সমর্পিত চিত্তযোগ রেখে যাই ভক্তের, বন্ধুর ॥

'দেশ' ১৪ ফাল্গুন ১৩৭৭

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

SANTINIKETAN,
BENGAL,
INDIA.

প্রকাশের অন্তরে
ও বাহিরে

চার্লস ব্রুক্স্ রচিত
কবিতার অনুবাদ

গির্জাঘরের চিত্রকাচ শিল্প,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা।
রঙীন কাঁচের ভিতর দিয়ে, সেখানে প্রবাহিত রঙীন আলো।
এই মাঝে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ধ্যানাসনে,
মুখশ্রীতে নিগূঢ় দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি সমুন্নত।
তিনি যেন বলছেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্ছ পান্থ,
তোমাদের কাছে এ কি কিছুই নয়?
তাকাও, দেখ, বল দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে যা আমার দুঃখের তুল্য?"

স্বল্প দিবস শেষ হোলো।
মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাসবাণী:—
"এস, আমার কাছে যারা কর্মক্লান্ত,
এস, যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
স্বল্পকালের জন্য তাঁর সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
বল্লুম," উর্দ্ধে তোলো তোমাদের হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরছি তোমারি দিকে।"

চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে, বেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন করে চলেছে
ক্লান্ত, অশ্রান্ত গুরুভারে,
তাদের মনে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্বোধন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত, আর্ত, তারা ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।
এদিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি সমুপস্থিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, :—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে ক্ষুদ্রতমের প্রতি যে নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।"

২২।৪।৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মংপু
দার্জিলিং

এণ্ডরুজ-লিখিত In As Much কবিতার অনুবাদ

সি. এফ. এণ্ডরুজের কবিতা : অনুবাদ

জাগরণ

ওই শোনো ঈশ্বরের স্বর :
প্রাচ্যের প্রাচীন জাতি, তোমাদের সকলের কাছে
এসে গেছে অভ্রান্ত আহ্বান :
জাগো জাগো স্বপ্নাচ্ছন্ন, কে বা আছ নিদ্রায় কাতর
ওঠো ওঠো মাথা তোলো
রাত্রির হয়েছে অবসান।
তোমাদের অতীত মহিমা জেনো প্রতিষ্ঠিত হবে পুনর্বার
নিয়তির ধ্রুবতারা জ্বলিবে প্রোজ্জ্বল
এসে গেছে সেই সমাচার।

সে আগ্নেয় দীপ্ত বাণী সর্বাগ্রে সমুদ্রশীর্ষে পাঠাল জাপান,
সে প্রভা বিকীর্ণ হল উদার উৎসারে
পুঞ্জীভূত হিমাদ্রি-তুষারে,
দক্ষিণে প্রদীপ্ত হল প্রসারিত সর্ব হিন্দুস্থান
পৌরুষে উত্থিত হল প্রাণময় প্রাচীন ইরান।

দেখাও, স্থাপন করো তোমাদের ন্যায়নীতি সম-অংশভাক
এসে গেছে ঈশ্বরের ডাক।
প্রত্যেক ভ্রাতারে দাও ভ্রাতৃত্বের প্রাপ্য অধিকার,
প্রত্যেক ভগ্নীরে দাও নারীত্বের মহৎ মর্যাদা,
ন্যায়ের সংগ্রামে নামো পরাভূত করে দাও দুর্নীতির বাধা
তবেই তো মাতৃভূমি আদ্যোপান্ত শক্তির ভাণ্ডার।

প্রাচ্যের জাতির কাছে এসে গেছে ডাক সে উতল
শুধু সত্যে স্থির থাকো আর স্থির ঈশ্বর-বিশ্বাসে,
তবেই তোমার দেশ পর্বতসমান দৃঢ় দৃপ্ত নির্বিচল
ভিত্তিমূল অনাক্রমনীয়, প্রতিরোধে কঠোর-প্রবল,
মাটিতে অটল পদ শির ঊর্ধ্ব স্থাপিত আকাশে
সমস্ত লঙ্ঘিয়া
দাঁড়াবে নতুন এক বৃহত্তর অখণ্ড এশিয়া॥

The Awakening : অনুবাদক · অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

The Modern Review, December 1908

সি. এফ. এণ্ডরুজের কবিতা : অনুবাদ

আশা

নির্জন নিষ্প্রাণ এক পর্বতের ছায়া-অন্ধকারে
পাহাড়ী পথের চিহ্ন ধরে ক্লান্তদেহে ধীরে চলি।
আমাদের গতিপথে স্তরে স্তরে শুধু নগ্ন শিলা,
যৎসামান্য ঘাসটুকু তীক্ষ্ণবায়ে বিশুষ্ক ঝলসানো।
কোথাও বা উঁকি দেয় ফাটলের ছায়াশ্রয় থেকে
শিলালগ্ন কচি চারাগাছগুলি ; কোথাও বা দেখি
সূর্যালোকহীন খাদে জমে আছে শীতের তুষার।
অবশেষে খাড়া পাহাড়ের গাঢ় বিষণ্ণ ছায়াতে
ক্লান্ত দেহমনে সেই গিরিশীর্ষে উত্তীর্ণ হলাম।
অমনি সম্মুখে হলো উদ্ভাসিত মহিমা উজ্জ্বল
অপরূপ দৃশ্য এক। যেন স্বর্গ এসে স্পর্শ করে
পৃথিবীকে, মর্ত্য যেন স্বর্গ হয়ে গেছে। রৌদ্রময়
নির্ঝরের তীরে তীরে স্ফটিকের কণিকার মতো
তুষার-কণায় স্নাত অগণিত পুষ্প-সমারোহ
বহুদূর প্রসারিত হয়ে দোলে ; শিশিরের জলে ধোয়া
শুভ্র অ্যানিমোন ফুল ভোরের বাতাসে দীপ্যমান্ ;
তার সাথে গাঢ় নীল মধুগন্ধী ফরগেট্-মি-নটেরা
কী ঔজ্জ্বল্যে মিশে আছে। ঊর্ধ্বাকাশে দেখি
নিষ্কলঙ্ক সাদা মেঘ ভাসে নীল নির্মল আকাশে।

Hope : অনুবাদক · অজিত দত্ত

সি. এফ. এণ্ডরুজের কবিতা : অনুবাদ

ক্রুশ

ক্লান্ত করুণ তোমার মুখ
দুঃখ আর দৃঢ়তা যাতে মিলেছে ;
সমস্ত মানুষের পাপের বোঝা চলেছ বয়ে।
হৃদয় যখন ভেঙে পড়ে,
তোমার পায়েই এসে লুটোই,
আর ওপরে চোখ তুলে
আবার ফিরে পাই আমাদের প্রশান্তি।

আঁধার ঘনায় যখন চার দিকে
কেঁদে ফেরে বাতাস আর উথলে ওঠে সব ঢেউ,
রাত্রি যখন নামে পরম দুর্যোগের মাঝে,
তারকার মত তোমার দুনয়নের
করুণাঘন অমল দ্যুতিতে পাই
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় নব সূর্যোদয়ের ঘোষণা।

The Cross : অনুবাদক · প্রেমেন্দ্র মিত্র
The Modern Review, November 1914

বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত শিক্ষা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১

আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিচিত্রকর্মা পুরুষ অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। তিনি 'বিদ্যার সাগর', তিনি 'করুণার সিন্ধু', তিনি 'দীনের বন্ধু', তিনি নির্ভীক সমাজসংস্কারক, বাংলাদেশে নব্য-শিক্ষার প্রবর্তনে তাঁহার দানের তুলনা পাওয়া কঠিন। বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনে পরিবর্তনযুগের সূচনায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন :

> "ইঁহাদের দলের সর্বাগ্রণী, এমন কি, পরিবর্তন-সময়ের প্রধান নেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর··· ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙ্গালীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গলায় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গভর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন, ইঁহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাবনির্ভীকতা, স্বাধীনভাব দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।"[১]

বিদ্যাসাগরের যথার্থ পরিচয় এই অনন্যসাধারণ পৌরুষ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির মধ্যেই নিহিত— ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনের মধ্য দিয়া যাঁহার ছাত্রজীবনের সূচনা হইয়াছিল, দ্বাদশবর্ষেরও অধিককাল অবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃতকলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র হিসাবে যিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, আপন শিক্ষায়তনের উন্নতি ও সংস্কার কল্পে যিনি কর্মজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব অনন্যসাধারণ নিষ্ঠার সহিত উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব কতটুকু এবং কি-ধরণের, তাহা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। অথচ তাঁহার বিভিন্ন জীবনীকার 'কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর' 'বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' 'স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর' 'সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর' 'জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারে' 'পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে' 'লোকসেবায় বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব লইয়া বিস্তৃত ও

---

১ বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৭। 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী : সাহিত্য'-খণ্ড। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ. ৶৹ [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ]। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল— যিনি ১৮৫৮ খৃঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদত্যাগের পর সংস্কৃত কলেজের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন— একখানি পত্রে (April 23, 1860) স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে বাংলাদেশে তখনকার দিনে একজনও উল্লেখযোগ্য নেতৃস্থানীয় পুরুষ জীবিত ছিলেন না :

"... I was reading a very striking piece of poetry yesterday, on Bengal as a land without *Echoes* physical or moral, as there are no mountains to break the dull monotony of its endless plain level, and no high ideals among its people and no great names in their past history to rouse them to emulation. The idea struck me very much. *It is indeed sadly remarkable that Bengal with its 45 millions has hardly produced one known great man*—there is not one great living Bengali *now*. Rammohun Roy was their nearest approach to a great man, and he

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃতশিক্ষার ব্যাপকক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রতিভা কি বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনও সুসম্বদ্ধ আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

২

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃকুল এবং মাতৃকুল— উভয় বংশধারাই সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনের জন্য সবিশেষ প্রখ্যাত কিন্তু পারিবারিক নানা বাধাবিপত্তির ফলে তাঁহার পিতৃদেব পূর্বপুরুষগণের সেই পাণ্ডিত্যগৌরবের অধিকারী হইতে পারেন নাই— এইজন্য ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজীবন খেদ ছিল। তিনি জীবিকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন— তাহার জন্য তাঁহাকে কিরূপ অসীম ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল বিদ্যাসাগর-জীবনীর পাঠকগণের নিকট তাহা অজ্ঞাত নহে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবার জন্য তাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। ঠাকুরদাস যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন, তখন তাঁহার আত্মীয়গণ বালকের অসাধারণ মেধার কথা বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রথমে "কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরীতলার ঠিক পূর্বদিকে" হেয়র সাহেবের অবৈতনিক "ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে" ভর্তির পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাতে উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু কলেজে "ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত" করিয়া জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে। "আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইংরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবেক।" বাঙালী জাতির পরম সৌভাগ্য, পিতা ঠাকুরদাস তাঁহার শুভার্থী আত্মীয়বর্গের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন—

"আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী ; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই ; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমার ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।"[২]

---

certainly was in many ways a remarkable man. But greatness and baboo-hood are incompatible; and baboo-hood is the beau ideal of existence of a Bengali."—George Cowell: *Life and Letters of Edward Byles Cowell* (London/Macmillan & Co. Ltd. 1904), pp. 169-70.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম পর্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে অধ্যক্ষপদ-প্রার্থী কাউয়েল সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃঃ ৮ই অক্টোবরের এক পত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন ইতিহাসাধ্যাপক কাউয়েল লিখিতেছেন :

"I have been hard at work at Bengali, and have passed the examination. I undertook this work because I found out that the present head of the Sanskrit College, a Pandit, has resigned, and there was a vacancy and a great doubt as to who should fill it."—ঐ, পৃ. ১৬০

২ দ্র° বিদ্যাসাগর-চরিত : স্বরচিত, পৃঃ ৪৭৪-৫ [বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী : সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ]।

সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র নয় বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইলেন— ১৮২৯ খৃঃ ১লা জুন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ এবং ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সকল শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত হন—

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুতকোম্পানী-সংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে দ্বাদশ বৎসরান্ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোল্লিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান।

ব্যাকরণম্…শ্রীগঙ্গাধরশর্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্…শ্রীজয়গোপালশর্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্…শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্…শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্…শ্রীজয়নারায়ণশর্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্…শ্রীযোগধ্যানশর্মভিঃ
ধর্মশাস্ত্রঞ্চ…শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতৈস্তৈতস্তৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয়সৌরমার্গশীর্ষম্ বিংশতিদিবসীয়ম্।

(Sd.) "Rasmay Dutta, Secretary
10 Dec. 1841"[৩]

কিন্তু সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র ছয়মাসকাল ইংরেজী শ্রেণীতেও যোগদান করিয়া ইংরেজী ভাষায় মোটামুটি প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন[৪], যদিও পরবর্তীকালে নিজের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার বলে তিনি ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গুপ্ত, আনন্দচন্দ্র বসু, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুহৃদ্বর্গের সহায়তায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে রীতিমত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।[৫]

৩

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ও মনীষায় এইভাবে দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সমাবেশ ঘটিয়াছিল। একদিকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দর্শন ধর্মশাস্ত্র এবং এই সকলের বাহনস্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় যেমন অতি অল্পবয়সেই অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অপরদিকে রামমোহন রায় প্রমুখ

---

৩ দ্র° বিহারীলাল সরকার প্রণীত: 'বিদ্যাসাগর' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩০৭ সাল), পৃ. ৮৭-৮৮।

৪ ঐ. পৃ. ৫৩। হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের প্রভাব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের উপর কিভাবে পড়িত, তাহার খানিকটা আভাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের স্মৃতিচারণা হইতে আমরা পাইতে পারি:… "সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দু স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম. আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর-ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন আমাদের একটা সখ হইল—বাগবাজারে আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব।…" —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' পুস্তকের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃ. ১৩-১৫ (১৩৩৮)।

৫ বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী: বিবিধ (পরিষৎ সংস্করণ) পৃ. ৬৯৩।

নব্যচিন্তার পুরোধাগণের প্রচেষ্টায় যে ইংরেজী শিক্ষা ও তাহার মধ্য দিয়া আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা রাজধানী কলিকাতায় দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকাও বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রতিভাধর পুরুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। যদিও সম্ভবতঃ জীবিকার তাগিদেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন, তথাপি ক্রমশঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যুক্তিবাদিতা ও মানবীয় আবেদন স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের অন্তর যে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই অল্প। 'বিদ্যাসাগর'-জীবনীকার বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

> "ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত হইলেও, ইংরেজি শিক্ষার ব্যূহ-বেষ্টনে আবদ্ধ ছিলেন। একদিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা, অপরদিকে মিশনরী কলেজের মোহিনীমায়া; তদুপরি প্রবলপ্রতাপ সাহেব সিবিলিয়ানদের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা। যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহার পর বৎসরে পাদরী ডফ্ সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানী স্কুল "বিসপ্স্ কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতিহত ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়বান্, মনস্বী ও তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রও বিচলিত হইয়াছিলেন। অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, ইংরেজি না শিখিলে, বর্তমান যুগে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দুঃসাধ্য। তাই তিনি সংস্কৃত পাঠ সমাপনান্তে কার্যাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষার কুফল তাঁহাতেও অনেকটা সংক্রামিত হইয়াছিলেন। তবে সংস্কৃত শিক্ষার ফলে তিনি অনেকটা জাতীয় ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরিচয়-প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য হইবে না।"

যদি যুগসন্ধিক্ষণের এই বিজাতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার দ্বন্দ্বসঙ্কুল আবর্তের মধ্যে বিদ্যাসাগরের জীবন গড়িয়া না উঠিত, যদি সংস্কৃত কলেজে ছাত্ররূপে প্রবেশ না করিয়া কলিকাতা বা মফঃস্বলের কোনও প্রখ্যাত পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি নিছক সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিতেন, তবে হয়ত আমরা আর একজন নূতন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বা ভরতচন্দ্র শিরোমণি বা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে পাইতাম— কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনো মতেই নব্যবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও যুগপ্রবর্তক হইয়া উঠিতেন না। আমাদের সৌভাগ্য যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রামমোহন রায়ের তীব্র প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নূতন পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্দিষ্ট না হইলেও, ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন এবং ঠাকুরদাস পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি না করিয়া সংস্কৃত পাঠশালায় ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার অচিন্তিত সমাবেশেই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিধির সমন্বয়ের প্রভাবে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী হইয়া উঠিয়াছিল মোহমুক্ত, যুক্তিপ্রবণ, সর্ববিধ ভাবালুতাবর্জিত; সেই সঙ্গে মিশিয়াছিল স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উদ্ভাবনে অনলস উৎসাহ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্য সর্বস্বপণ। ইহার জন্য তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ বিসর্জন দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াও তিনি সারস্বত সাধনাকে দেশের ও জাতির হিতচিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সংস্কৃতশিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা কিছু সংস্কারের প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারের জন্য যে-সকল শ্রমসাধ্য কর্মে তিনি ব্রতী হইয়াছেন, স্বয়ং সংস্কৃতসেবী হইয়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি যে আজীবন আপনার লেখনীকে নিয়োজিত করিয়াছেন—এসকল প্রচেষ্টার উৎস অনুসন্ধান করিলে আমরা একটিমাত্র লক্ষ্যে গিয়াই পৌছিব তাহা হইতেছে বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম ও অনন্যসাধারণ স্বদেশপ্রেম, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষার অন্ধকারে মোহনিদ্রাভিভুত, যুক্তিবিহীন শাস্ত্রানুগত্যের শৃঙ্খলে নিগড়িত দেশবাসীকে আধুনিক শিক্ষার উন্মুক্ত আলোকিত জগতে জাগরিত করিয়া তোলা। বিদ্যাসাগরের জীবনের এই স্থির লক্ষ্যটিকে যদি আমরা মনে রাখি, তবে তাঁহার সমস্ত উদ্যমের ও সংস্কার-প্রচেষ্টার তাৎপর্য অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে—নতুবা তাঁহার জীবনের বিভিন্নমুখী বিচিত্র সাধনার মধ্যে বহু অসংগতি ও আপাতবিরোধ ধরা পড়িবে, যাহার ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগণের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের যথার্থ উদ্দেশ্যটুকু উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। বাংলাদেশে সংস্কৃতশিক্ষার সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার যথাযথ মূল্যনিরূপণ প্রসঙ্গে এই কয়টি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন।

৪

সংস্কৃতভাষায় বিদ্যাসাগর ছাত্রাবস্থায় কিরূপ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সংস্কৃত পাঠশালায় রচনা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।[৬] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত রচনার কিছু কিছু নমুনা তাঁহার 'সংস্কৃত রচনা' শীর্ষক পুস্তিকায় সংকলিত আছে। ঐ পুস্তিকার মুখবন্ধে তিনি বলিতেছেন:

> "যৎকালে আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিতাম, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, মধ্যে মধ্যে, গদ্যে ও পদ্যে, সংস্কৃত রচনা করিতে হইত। সংস্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমার, কোনও মতে, সাহস হইত না; এজন্য, ঐ রচনার সময় উপস্থিত হইলে, আমি পলায়ন করিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমরা সংস্কৃতভাষায় রীতিমত রচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি কেহ সংস্কৃতভাষায় কিছু লিখিতেন, ঐ লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া, আমার প্রতীতি হইত না। এজন্য, আমি সংস্কৃতভাষায় রচনা করিতে, কদাচ অগ্রসর হইতাম না।"[৭]

বিহারীলাল সরকার বলেন: "ঈশ্বরচন্দ্রের এ বিশ্বাস চিরকালই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। তাঁহার কার্য্যাবস্থায় একজন কোন বিষয়ে সংস্কৃত লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দেন। তাঁহার সংশোধন-প্রণালী দেখিয়া, রচয়িতা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—'আপনি এমন সুন্দর সংস্কৃত লেখেন তবে আপনি যে-সকল সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রিত করিতেছেন, তাহার মুখবন্ধে বা

৬ প্রথম বৎসর 'সত্যকথনের মহিমা' বিষয়ে সংস্কৃত গদ্য রচনা, দ্বিতীয় বৎসর 'বিদ্যা' বিষয়ক পদ্য রচনা এবং তৃতীয় বৎসর 'অগ্নীধ্র রাজার উপাখ্যান' বিষয়ে পদ্য রচনার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরস্কার লাভ করেন।

৭ 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ৯১। অপিচ— "সংস্কৃত রচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। আধুনিক লোকে প্রকৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা করিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। একদিন মেঘদূতের স্বরচিত টীকা দেখিয়া, তিনি স্বীয় দৌহিত্রের নিকট একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন— 'ওরে, আমি বেশ সংস্কৃত লিখেছি তো।'" ঐ. পৃ. ১৫১।

বিজ্ঞাপনে বাঙ্গলা লিখেন কেন?' এতদুত্তরে তিনি একটু হাস্য করিয়া বলেন,— 'সংস্কৃতভাষায় বুৎপত্তি থাকিলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা দুরূহ বলিয়া আমার বিশ্বাস।'[৮]

এই দুরূহ সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিবার যে শৈলী তখন সংস্কৃত পাঠশালায় তথা বঙ্গদেশের বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত ছিল, তাহাও অত্যন্ত ক্লেশকর ছিল। কোনও একটি ভাষা বিশুদ্ধরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রথমতঃ দুইটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অবশ্য অপেক্ষিত— প্রথম ব্যাকরণ এবং দ্বিতীয় কোষ বা অভিধান। তখনকার দিনে বাঙালী সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য এবং অমরকোষ কণ্ঠস্থ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত শব্দ সম্ভার ও তাহাদের প্রয়োগ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতেন। ইহাতে দীর্ঘকাল ব্যয় করিতে হইত, অথচ তদনুরূপ ফললাভ হইত না। ঈশ্বরচন্দ্রও এই প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে ঐসকল গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হন—

> "প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।"[৯]

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইবার পর শিক্ষাসমিতির (Council of Education) অভিপ্রায়ানুসারে সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন বিষয়ক যে সকল প্রস্তাব তিনি উক্ত সংস্থার সম্পাদক মৌয়েট (F. J. Mouat, M. D.) সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাতে ব্যাকরণ শ্রেণীতে মুগ্ধবোধের অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া দিবার কথাও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবেই বলেন—

> "মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ।…একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা সুরু করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না… সুকুমারমতি বালকবৃন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভকালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে। তাহারা যে পুস্তক পাঠ করে, তাহার বিন্দুবিসর্গও নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। এরূপে কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়নেই পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মায় না।…সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা ব্যয় হয়।…এই বিভাগে ধাতুপাঠ নামে যে অপর পুস্তক অধীত হয়, তাহা ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ধাতুসংগ্রহ মাত্র। অমরকোষ একখানি ছন্দোনিবদ্ধ অভিধান।…উক্ত গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার তুলনায় প্রাপ্ত উপকার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।"…

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে সংস্কৃত মহাকাব্যের উপর মল্লিনাথের "অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা"র সাহায্যেই ব্যাকরণ ও অভিধান বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করা সম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পকালের মধ্যে ব্যুৎপত্তিলাভের উদ্দেশ্যে—

---

৮ শ্লোকমঞ্জরী : বিজ্ঞাপন।

৯ সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় বিদ্যাসাগরের মূল প্রতিবেদনটি (ডিসেম্বর ১৬, ১৮৫০) ইংরেজী ভাষায় রচিত। দ্র° কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস : ১ম খণ্ড (১৮২৪-১৮৫৮) / পৃ. ৭২-৮০। উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। দ্র° ঐ. পৃ. ২০২-২১৮।

"বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্তে এ দেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়ম ও সূত্রগুলি পাঠ করিবে। তৎপরে তাহারা দুই কিম্বা তিনখানি সংস্কৃত পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। এই সকল গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী উদ্ধৃত অংশ থাকিবে।···তৎপরে তাহারা সিদ্ধান্তকৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহা ব্যাকরণ বিভাগে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।···"[১০]

শিক্ষাসমিতি কর্তৃক বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে পর বিদ্যাসাগর 'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণকৌমুদী' (৪ ভাগে সম্পূর্ণ) এবং সংস্কৃতপাঠসংকলনাত্মক 'ঋজুপাঠ' (৩ ভাগে সম্পূর্ণ) প্রণয়ন করেন। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন উদ্ধৃত সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাবের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়:

> "সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবিষ্ট ছাত্রেরা প্রথম বৎসরে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ পাঠ করিবেন। দ্বিতীয় বৎসরে, ব্যাকরণ কৌমুদী ও ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ। এইগুলি পাঠ করিয়া ব্যাকরণে একপ্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, এবং সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে সিদ্ধান্তকৌমুদী, ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ এবং রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পাঠ করিবেক। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবেক।"[১১]

পিতা ঠাকুরদাস সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শতাধিক বর্ষ পূর্বেও বিদ্যাসাগর তাঁহার সংস্কারমুক্ত চিন্তাশক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তকৌমুদীকেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। অথচ বাংলা দেশের পণ্ডিত সমাজ আজও পর্যন্ত মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার হইতে আরম্ভ করিয়া অতি স্বল্পপরিচিত আঞ্চলিক ব্যাকরণের মায়াও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না এবং ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার সহিত সর্বভারতীয় সংস্কৃত শিক্ষার সহজ আত্মীয়তা সম্বন্ধ এখনও পর্যন্ত গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক রচনার ও প্রাচীন সংস্কৃত রচনার অনায়াসলব্ধ মাধুর্য, প্রসাদ,

---

১০ 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী— শিক্ষা', পৃ. ১৯৭। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকপ্রদ কাহিনী উল্লেখযোগ্য— সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য 'উপক্রমণিকা' প্রচলনের প্রতি তখনকার পণ্ডিত সমাজের মনোভাব কতদূর বিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে: "বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল, তখন একদিন রচনা আদি বিষয়ক কাগজ দেখিতে দেখিতে তর্কবাগীশ একখানি কাগজ লইয়া অকস্মাৎ দ্রুতপদে অপর এক পণ্ডিতের ঘরে উপস্থিত হইয়া রাগভরে বলিলেন,— "এই দেখ! তোমার এমন পুত্র একেবারে মাটি! (কাশীস্থিতগবাং) লিখিয়াছে, আর যাহারা ব্যাকরণে পাকা, তাহাদের মধ্যে অনেকেই (কাশীস্থিতগবানাং) লিখিয়াছে— উপক্রমণিকায় সব মাটি হলো দেখ্‌ছি।··· উপক্রমণিকা ব্যাকরণ পাঠ করায় কাঁচা বুনিয়াদ হইতেছে। ঘরে তাহাকে কেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদি পড়ান হয় না— বলিয়া পণ্ডিতটীকে উপদেশ দিতেছেন, ইত্যবসরে বিদ্যাসাগর তথায় অকস্মাৎ উপস্থিত। তর্কবাগীশ বলিয়া উঠিলেন— "ঈশ্বর! কলেজটী মাটি করলে— ছেলেগুলির মাথা খেলে বাপু!" বিদ্যাসাগর সবিস্তর শুনিয়া বলিলেন— "না মহাশয়! আর ভয় নাই— এইবার 'ব্যাকরণ কৌমুদী' বাহির হইয়াছে, অতঃপর আপনার শ্রেণীতে ব্যাকরণে পরিপক্ব বালকেরই আমদানি দেখিতে পাইবেন।"— ৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর প্রণীত '৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত' (৫ম সংস্করণ), পৃ. ১৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

১১ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' / বিদ্যা°-গ্রন্থাবলী— বিবিধ, পৃ. ৫৯-৬০।

ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য আধুনিক সংস্কৃতরচনার মধ্যে সঞ্চারের সম্ভাব্যতা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার না করিলেও শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের গুরুত্ব বারংবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রশস্তি কীর্তন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য স্মরণীয়—

"সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অপূর্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারুরূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে গ্রন্থরচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক্ মার্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।...

"যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদসাধন ও প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃতরচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।"[১২]

সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও মহিমাকে যিনি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কেবল তাঁহার পক্ষেই এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সম্ভবপর। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা যে ব্যাবহারিক কারণেও নিতান্ত আবশ্যক ইহাও তিনি বারংবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি মোক্ষমূলর প্রভৃতি য়ুরোপীয় আচার্যগণ কর্তৃক নব উদ্ভাবিত শব্দবিদ্যার অনুশীলনে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করাইয়া দিয়াছেন; 'প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের' যে আর কোন পথ নাই, তাহা দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন; 'যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে'— ইহা নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু সর্বোপরি যে চিন্তা তাঁহাকে সমস্ত সাধনা ও কর্মে প্রেরণা জোগাইয়াছে— বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাঙালী জাতির চিত্ত আধুনিক সর্ববিধ বিদ্যার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা, স্বদেশ ও স্বজাতির সেই কল্যাণ চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

১২ ঐ পৃ ৬৪২-৪৩। ১৮৫১ খৃঃ প্রকাশিত 'বোধোদয়' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাক্যকথন-ভাষা' শীর্ষক পরিচ্ছেদের উপসংহারে বিদ্যাসাগর বলিতেছেন: "ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহ পূর্বক ইঙ্গরেজী শিখে। কিন্তু, অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।

"পূর্বকালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত নহে। কিন্তু উহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।"—ঐ. পৃ. ১৬৮। 'বোধোদয়' 'অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকা'-দের জন্য রচিত। বিদ্যাসাগর যে মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এবং তাহার উপায়স্বরূপ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের প্রসারের জন্য কি গভীরভাবে চিন্তা করিতেন, ইহা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে প্রমাণ সে-বিষয়ে আর কি হইতে পারে?

"সংস্কৃত ভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্ব্বন্ধস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, য়ুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।"[১৩]

মাতৃভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তই তিনি সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা নানা প্রসঙ্গে বারংবার প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজে অবশ্যশিক্ষণীয়রূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রবর্তনের উপর জোর দিয়া তিনি শিক্ষাসমিতির নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন—

"In conclusion, I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanskrit College will become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen."[১৪]

পুনশ্চ—

"Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of the English and you may rest assured

১৩ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যাঁহারাই পুরোধা তাঁহারা প্রায় সকলেই মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরাজী— এই উভয় ভাষায় পারদর্শিতা জন্মিতে পারে— এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত থাকাকালীন আচার্য কৃষ্ণকমলের রিপোর্টের অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য— ". . . Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanskrit, together with a critical, extensive, and profound acquaintance with English." (দ্র° 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য'; সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ২, পৃ. ১২)।

১৪ শিক্ষাসমিতির সম্পাদক ডঃময়েটের নিকট ৫ই অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্রের অংশ। দ্র° ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'Ishwarchandra Vidyasagar as an Educationist' শীর্ষক প্রবন্ধ (Modern Review, October 1927, p. 405)

that before a few years are over I shall be enabled, if supported and encouraged by the Council, to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the educated eleves of any of your colleges whether English or Oriental....”[১৫]

তিনি স্বয়ং যেমন তাঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও আপন অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অবিচলিত স্থির সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন শুধু মাতৃভাষায় সমৃদ্ধির জন্য, তেমনি সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী প্রত্যেক পণ্ডিত যাহাতে তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য ইংরেজীশিক্ষাকে সাগ্রহে বরণ করিতে পারেন, তাহার জন্যই সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষাবিধির আমূল সংস্কারে বিদ্যাসাগর ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই আদর্শ যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজ সাদরে স্বীকার করিয়া লইতেন, তবে বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্কৃতসেবী পণ্ডিতকুলের যে শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা যে বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারিত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারাই যেমন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক হইতেন, সেইরূপ স্বদেশের সর্ববিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বও সহজেই তাঁহাদের করতলায়ত্ত হইতে পারিত। সংস্কৃতের সহিত মাতৃভাষা বাঙলা এবং আধুনিক শিক্ষার বাহনস্বরূপ ইংরেজী ভাষা যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবানুযায়ী স্বাধীনতালাভের পরও আমাদের বিদ্যালয়সমূহে অবশ্যশিক্ষণীয়রূপে প্রবর্তিত হইত, তবে শুধুই যে ভাষাসমস্যার সহজ সমাধানের পথ আমরা খুঁজিয়া পাইতাম তাহাই নহে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকিত, তেমনি বিশ্বের নিয়ত উপচীয়মান জ্ঞান ও চিন্তার ঐশ্বর্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়া পরিবেশনের ফলে চিন্তার জড়ত্ব হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম, আমাদের মাতৃভাষা মাধুর্যে, গরিমায়, ওজস্বিতায় মণ্ডিত হইয়া অসামান্য ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আদর্শ আজও পর্যন্ত আমাদের নিকট স্বপ্নের ন্যায় অবাস্তব রহিয়াই গিয়াছে। বরঞ্চ আমাদের অবলম্বিত শিক্ষাবিধির সহিত ইহার ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাসংস্কারকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—

“Englishmen inspired with a sincere desire to help the cause of progress found in Vidyasagar a worthy collaborator. For Vidyasagar was versed in the learnings of his forefathers, and the traditional knowledge of the past. He had won high distinction by his Sanskrit learning and had become the Principal of the Sanskrit College. And more than this, his open mind received and assimilated all that was healthy and life-

১৫ 'Ishwarchandra Vidyasagar as an Educationist' (Modern Review, October 1927). প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ধৃত (p. 406)।

inspiring outside the range of Indian thought : and with a robust physique and a robust heart he ceaselessly endeavoured for reform."

৫

শুধুই সংস্কৃত ভাষার শিক্ষণপদ্ধতিকে সরল ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার দিকেই বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। পাঠ্যবিষয়সমূহও যাহাতে ব্যাবহারিক দিক দিয়া উপযোগী হইতে পারে, এবং সংস্কৃত কলেজে নবপ্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষার আলোকে যাহাতে তাহাদের সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব যাচাই করিয়া দেখিবার মত স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দের গড়িয়া উঠিতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সে-বিষয়েও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অধ্যক্ষপদপ্রাপ্তির পূর্বে সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনবিষয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সমিতির সম্পাদকের নিকট যে বিস্তৃত প্রতিবেদন দাখিল করেন, তাহাতে শুধুই যে ভাষাশিক্ষার অন্তরায়সমূহ দূরীকরণেরই প্রস্তাব ছিল তাহা নহে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের আলোচিত সংস্কার বিষয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনাও তাহাতে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছিল। ইহাতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য দর্শন গণিত স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীরও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যবিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট 'নৈষধ-চরিত' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য নিম্নরূপ—

"*Naisadha Charita* from the begining to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste ; there are occasional bursts, however, of five passages."

১৮৫৩ খৃঃ বীটন্ সোসাইটিতে পঠিত 'সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে'ও 'নৈষধ-চরিতে'র সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অনুরূপ ধারণাই প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধ-চরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ব, যে ইহাকে কোনক্রমেই উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দেশ, অথবা পূর্বোল্লিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের[১৬] সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।...[১৭]

---

১৬ অর্থাৎ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয় এবং শিশুপালবধ।

১৭ 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী— বিবিধ', পৃ. ৬১৭-১৮। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যগুরু সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ— যিনি নৈষধের টীকা রচনা করিয়া সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন— মহাশয়ের সহিত হেতমপুর রাজবাটীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায় উপলক্ষ্য রামসুন্দর দরবেশ শাস্ত্রী নামক এক দিগ্‌গজ দাম্ভিক পণ্ডিতের নৈষধ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিচারের বিবরণ এইস্থলে উদ্ধার করিতে পারা যায়। ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি দরবেশ শাস্ত্রীর নিকট ৺তর্কবাগীশ মহাশয়ের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেন— "অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। পূর্বনৈষধের টীকা করিয়াছেন"।... দরবেশ শাস্ত্রী প্রেমচন্দ্রের প্রতি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক বলিলেন,— 'নৈষধের টীকাকারক' এ আস্পর্ধার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনাভাব; তিনি উল্লিখিত টীকা দেখেন নাই; দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত কেহ নৈষধের টীকা করিতে পারে তাঁহার বিশ্বাস নাই এবং নৈষধের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সাহসী এরূপ কোনও পণ্ডিত বঙ্গমধ্যে আছে কিনা

"শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যধিক হইলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং অনুপ্রাসবাহুল্য দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান মহাকাব্য।..."

দেখা যাইতেছে স্বদেশীয় সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহিত্যরুচির উপর বিদ্যাসাগরের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। রঘুবংশের সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিষয়েও পণ্ডিতকুলের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল না।[১৮]

"সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ তৎসর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।... রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।"

জ্যোতিষ ও গণিত শ্রেণীতে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ভাস্করাচার্য প্রণীত 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। তৎপরিবর্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করেন হার্শেল সাহেবের ইংরেজী ভাষায় রচিত জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ এবং গণিত বিষয়ে অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ মূল ইংরেজীতেই অথবা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া গণিত শ্রেণীর পাঠ্য হওয়া উচিত। ইহাতে জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ সহজসাধ্য হইবে এবং তদনন্তর দুরূহ 'লীলাবতী ও বীজগণিত'-গ্রন্থদ্বয়ের তাৎপর্য গ্রহণ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসেই সম্ভব হইতে পারিবে। গণিত যাহাতে অবশ্য পাঠ্য বিষয়রূপেও নির্দিষ্ট হয়, তদ্বিষয়েও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছিল—

"সাহিত্য ও অলংকার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্মৃতি ও ন্যায় শ্রেণীর ছাত্রদিগেরও গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত।..."[১৯]

স্মৃতিশ্রেণীর পাঠ্যসংস্কারের প্রস্তাবসমূহ আলোচনা করিলেও সংস্কৃতশাস্ত্রের বর্তমানকালীন উপযোগিতা

জানেন না। এই বলিয়া রামদুলাল নৈষধের কয়েক স্থান আবৃত্তি করিয়া প্রেমচন্দ্রকে অর্থ করিতে বলেন। কবিতামধ্যে পূর্বনৈষধের তৃতীয় সর্গের ৭৮ সংখ্যক—

"মদ্‌বিপ্রলভ্যং পুনরাহ যস্তাং তর্কঃ স কিং তৎফলবাচি মূকঃ।
অশক্যশঙ্কব্যভিচারহেতু-র্বাণী ন বেদা যদি সন্ত কে তু।"

শ্লোকটির ব্যাখ্যা কালে বিচার করিতে করিতে ২/৩ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।... এই সময় রামসুন্দর অকস্মাৎ উঠিয়া বলা নাই কহা নাই আপন দক্ষিণ চরণ উত্তোলনপূর্বক প্রেমচন্দ্রের মস্তকে বুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "অনেক ব্যাটাকে দেখিলাম, তোর ব্যাকরণ ও দর্শন আদিতে জ্ঞান ও কাব্যব্যাখ্যা নিয়ে প্রবীণতা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম, দীর্ঘজীবী হও।" প্রেমচন্দ্র রামসুন্দরের অদম্য দাম্ভিকভাব এবং অদ্ভুত অশিষ্টাচার দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইলেন, তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়া নিস্তার পাইলেন বলিয়া মনে-মনে তেমনি প্রীতিলাভ করিলেন। মস্তকে পদাঘাত বিনীতভাবে সহ্য করিলেন।"
— প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত, পৃ. ১২৫-২৬

১৮ ঐ. পৃ. ৬০৯-১০। তুলনীয় : রঘুবংশ সম্পর্কে বাংলাদেশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত উক্তি—

"রঘুরপি কাব্যং তদাপি চ পাঠ্যং
তস্য চ টীকা সাপি চ পাঠ্যা।"

১৯ এইস্থলে 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের সটীক ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ডঃ ই. বি. কাউয়েলের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য তুলনীয় :

" . . . The *Kusumáñjali* is as much inferior to the tenth book of Plato's *Laws* or the twelfth

সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। রঘুনন্দন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন—

> "দায়তত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ক ছাব্বিশখানি গ্রন্থ লইয়া 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'। ইহা রঘুনন্দন প্রণীত। প্রথমোক্তখানি দায় সম্বন্ধে। দ্বিতীয়খানি আদালতের কার্যবিধি সম্বন্ধে। অন্য ছাব্বিশখানি ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত। এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে"র অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী। ওরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী।"

কিন্তু মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা প্রভৃতি অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাব ঈদৃশ বিরূপ ছিল না; কেননা, ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যবহারিক দিক্ দিয়া উপযোগী ছিল—

> "অপর পুস্তকগুলি পাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও প্রচলিত থাকিতে পারে। উক্ত গ্রন্থাদির অনুশীলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের হিন্দু-আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে।"

দেশ রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তির জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করিয়া তুলিবার জন্যই শাস্ত্র রচনা। যদি শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ঐ সকল বিষয় উন্নতির কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তবে শাস্ত্রের শৃঙ্খল বন্ধনস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়—ইহাই ছিল বিদ্যাসাগরের বদ্ধমূল ধারণা। 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ' সম্বন্ধীয় নিবন্ধাবলী বিদ্যাসাগরের প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় যেমন বহন করে, অনুরূপভাবে শাস্ত্রকে সমাজব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য যে প্রখর ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষিত তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ সকল রচনা চিরদিন বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত কলেজের ন্যায়-শ্রেণীর পাঠ্যক্রম সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবসমূহ তাঁহার এই ব্যাবহারিক দৃষ্টির সহিত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তার সমন্বয় প্রয়াসের সার্থক নিদর্শন। আচার্য উদয়নের 'কুসুমাঞ্জলি' সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—

> "কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকসংক্রান্ত বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহাতে যে তর্কপ্রণালীর অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক ইউরোপীয়গণের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে অবলম্বিত তর্কপ্রণালীর তুল্য।"[২০]

---

of Aristotle's *Metaphysics* as Hindu Philosophy itself is to that of Greece; but nothing can rob India of the merit of an original system of logic and metaphysics, unborrowed from any other land. . ."—E. B. Cowell: The *Kusumáñjali or Hindu Proof of the Existence of a Supreme Being* (Calcutta, 1864), Preface, p. V.

২০ বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন্ (১৫৬১-১৬২৬ খৃঃ) প্লেটো, আরিস্তত্‌ল্ প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণের বস্তুশূন্য যুক্তিজাল উদ্‌ভাবনের শক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন:

"This kind of degenerate learning did chiefly reign among the schoolmen: who having sharp and strong wits, and abundance of leisure and small variety of reading (but their wits being shut up in the cells of a few authors, chiefly Aristotle their dictator, as their persons were shut up in the cells of monasteries and colleges), and knowing little history, either of Nature or Time, did out of no great quantity of matter, and infinite agitation of wit, spin out unto us those laborious webs of learning, which are extant in their books. For the wit and mind of man, if it work upon matter, which is the contemplation of the creatures of God, worketh

অপরপক্ষে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত 'অনুমানচিন্তামণি' সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য নিম্নরূপ—

"অনুমানচিন্তামণি বর্তমান ন্যায়শাস্ত্র সম্প্রদায়সম্মত একখানি উপপত্তি (Deduction) বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকর্তার নাম গঙ্গেশ উপাধ্যায়। ইউরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিতদের অবলম্বিত বিচার-প্রণালী সদৃশ গ্রন্থকর্তার বিচারপ্রণালী। যাহাকে বেকন 'বিদ্যার উর্ণনাভ জাল' বলিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থ সেইরূপ।"[২১]

শ্রীহর্ষ প্রণীত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' এবং উদয়নাচার্য প্রণীত অপর গ্রন্থ 'আত্মতত্ত্ববিবেক' সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগরের মনোভাব আদৌ অনুকূল ছিল না। তিনি অনুমানচিন্তামণি, দীধিতি, খণ্ডন (-খণ্ডখাদ্য) এবং (আত্ম-) তত্ত্ববিবেকের পরিবর্তে সাংখ্যপ্রবচন, পাতঞ্জলসূত্র, পঞ্চদশী ও সর্বসারসংগ্রহ এই কয়খানিগ্রন্থ পাঠ্যরূপে প্রবর্তনের এবং 'ন্যায়-শ্রেণী'-কে 'দর্শন-শ্রেণী' রূপে অভিহিত করা হউক বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিয়া লেখেন—

"শ্রীহর্ষ প্রণীত গ্রন্থের নাম খণ্ডনা। গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য সমুদয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতগুলি খণ্ডন করিয়া নিজের প্রিয় বৈদান্তিক মতের প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকর্তা বর্ণিত বিষয় অতি দুর্বোধ ভাষায় অবতারণা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য প্রণীত তত্ত্ববিবেকে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তর্ক সকল উত্থাপিত ও ব্রহ্মাণ্ডের একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা যেরূপ দুরূহ, তেমনই অসংলগ্ন।

"এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত শ্রেণীকে ন্যায়-শ্রেণী নামে অভিহিত না করিয়া শ্রেণী নামে দর্শন-শ্রেণী নামে অভিহিত করা উচিত। অনুমানচিন্তামণি, দীধিতি, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেকের অধ্যাপনা বন্ধ হউক ও তাহার পরিবর্তে মীমাংসা ও ধর্মানুষ্ঠান-সম্বলিত নিম্নলিখিত দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি অধীত হউক।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও বস্তুশূন্য দার্শনিকতার প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতিশীল ছিলেন না, তবুও তিনি ইহা অকপটচিত্তে বিশ্বাস করিতেন যে সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পূর্ণতাসাধন ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থান-সমূহের সিদ্ধান্তের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যতিরেকে কোনও ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা অনুভব করেন নাই—

"ইহা অতি সত্য কথা যে, হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সৌসাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়।"

এই ন্যূনতা পূরণের জন্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনসমূহের অনুশীলনের সাহায্যে যাহাতে সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থিগণ উভয়বিধ দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনামূলক অনুশীলনে অধিকার লাভ করিয়া স্বাধীন-ভাবে দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতিবেদনে শিক্ষা-সমিতির নিকট প্রস্তাব করেন—

---

according to the stuff, and is limited thereby; but if it work upon itself, as the spider worketh his web, then it is endless and brings forth indeed *cobwebs of learning*, admirable for the fineness of thread and work, but of no substance or profit."—*The Advancement of Learning.*
বেকনের এই মন্তব্য মনে রাখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত 'অনুমানচিন্তামণি'র উক্তরূপ সমালোচনা করিয়াছেন।

২১ 'Ishwar Chandra Vidyasagar as an Educationist' প্রবন্ধে উদ্ধৃত (Modern Review October 1927).

"ইংরেজী বিভাগ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি রিপোর্টের স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। যদি কৌন্সিল্ অব্ এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন-শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের শিক্ষিত ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অনায়াসেই তাহাদিগকে ইউরোপখণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারগ হইবে। যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত হইলে, সহজেই প্রাচীন হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান ইউরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত সুবিধা তাহাদিগের তখনই ঘটিয়া উঠিবে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রসম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ পরস্পরের ভ্রম প্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার ক্রটী করেন নাই। ছাত্রের পক্ষে এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া তথ্যনির্ণয় করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। তাহার ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র-জ্ঞান, বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের দোষগুণ বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক হইবে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিধি সংস্কারের সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রতিবেদন পাঠ করিয়া শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। এবং তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নূতন সৃষ্ট অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-সমিতির সম্মতিক্রমে সংস্কৃত কলেজের সংস্কারবিষয়ক তাঁহার প্রস্তাবাবলী পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী কার্যকরী করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত সংস্কারসমূহ সময়োপযোগী এবং পরিণামে সংস্কৃতশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে প্রকৃতপক্ষে সমর্থ হইবে কিনা, তাহা নিপুণভাবে সমীক্ষা করিবার জন্য বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, খ্যাতনামা সংস্কৃতবিদ্ ডঃ ব্যালান্টাইন্ (J. R. Ballantyne) শিক্ষাসমিতি কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এই প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের তৎকালীন মুখ্য সচিব সিসিল্ বীডন (Cecil Beadon)-এর নিকট লিখিত এক পত্রে (২১শে মে, ১৮৫৩) শিক্ষাসমিতির সচিব ডঃ মৌয়েট প্রস্তাব করেন—

"The Government is aware that great and important changes have been introduced into this institution, since the appointment of its presentable and energetic Principal. Those measures have apparently already began to bear good fruit and as the institution is likely to become extremely useful under its present management, the Council are anxious to have the opinion of *the most able Sankrit scholar in India* regarding the measures now in progress and those contemplated hereafter."[২২]

২২ ডঃ ব্যালান্টাইন্ ১৮৫২ খৃঃ বারাণসীস্থ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের পুনর্মুদ্রণ পরিকল্পনার সূচনা করেন। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী *Metaphysics and Mental Philosophy* শীর্ষক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বিশপ বার্কলির *Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের সারসংকলন প্রকাশিত হয় এবং ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও পরিভাষাসমূহের তুলনামূলক আলোচনাও উহার অন্তর্গত হয়। 'Berkeley's Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge—with a commentary

তদনুসারে ডঃ ব্যালান্টাইন্ ১৮৫৩ খৃঃ জুলাই-আগস্ট মাসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিয়া যে বিস্তৃত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন—তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মকুশলতার যেমন প্রশস্তি ছিল, সেইরূপ কতকগুলি অভিনব সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবও ছিল, এবং তাহা লইয়াই বিদ্যাসাগরের সহিত ব্যালান্টাইনের ঐতিহাসিক বাদানুবাদের সূচনা। সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃতশিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশীয় এই বরেণ্য মনীষিদ্বয়ের মতবিনিময়ের আলোচনা না করিলে সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগিতা ও ইহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃঢ়মূল ধারণার যথার্থ পরিচয় আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে না। বিদ্যাসাগরের ন্যায় ডঃ ব্যালান্টাইন্ও চাহিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিধি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি—এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান যাহাতে ক্রমশঃ যত দ্রুত সম্ভব সঙ্কুচিত হইয়া যায়। প্রতিবেদনের উপসংহারে সেইজন্য ডঃ ব্যালান্টাইন্ বলেন—

> "In offering these remarks and suggestions I have had in view almost exclusively the desirableness of bridging the chasm between the Sanskrit and the English—between the learning of India and the science of England...."[২৩]

কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডঃ ব্যালান্টাইন্ সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমের যে সংস্কার প্রস্তাব করেন, তাহার প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদৌ সহানুভূতি ছিল না। ডঃ ব্যালান্টাইন্ প্রস্তাব করেন যে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের জন্য রচিত (ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই) *Synopsis of Sciences* কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজেও পাঠ্যরূপে প্রবর্তিত হইতে পারে—ইহার দ্বারা ন্যায় প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানের সহিত প্রতীচ্য দর্শনের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা সহজসাধ্য হইবে বলিয়াই বিশ্বাস। মিল্ প্রণীত মূল *Logic*'এর পরিবর্তে ব্যালান্টাইন্ উক্ত গ্রন্থের স্বকৃত সারসংগ্রহ পাঠ্যরূপে প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের পাঠ্যরূপে ডঃ ব্যালান্টাইন্ উক্ত প্রস্থানদ্বয়ের কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ—যাহা স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ ও তুলনামূলক টিপ্পনীসহ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের সৌকর্যার্থে মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলিও কলিকাতাতে পাঠ্যরূপে যাহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার জন্য বিশেষভাবে অভিমত প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি প্রস্তাব

---

tracing the relation between the sentiments and terminology of Berkeley and those of Hindu thinkers' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এই খণ্ডের ভূমিকা স্বরূপতঃ ব্যালান্টাইনের মন্তব্য বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

"A variety of reasons concur to render the treatise here reprinted a suitable work to be presented to the Pandits. Agreeing to a noticeable extent with the most famous among the Hindu philosophical systems, it parts from it just where that system, in our opinion, has gone most dangerously astray. The points at which any system of truth begins to branch out into error are the critical points which it is of all things important to determine and to deal with. Such a point, for example, in the *Vedánta* system, seem to be the question as to the reality of the phenomenal, to which attention is called in the course of the following pages:—*Reprints for the Pandits*, No. 4 (Allahabal, 1852).

ডঃ ব্যালান্টাইন তাঁহার *Christianity contrasted with the Hindu Philosophy.* নামক অপর এক গ্রন্থেও বেদান্ত ও বার্ক্লীয় দর্শনের সাদৃশ্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করেন। নেহেমিয়া নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী গোরে প্রণীত হিন্দী নিবন্ধের ডঃ ফিৎস্-এডোয়ার্ড হল্ কৃত ইংরেজী অনুবাদের তৃতীয় খণ্ডের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ডঃ ব্যালান্টাইনের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। দ্র° রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার *Dialogues on the Hindu Philosophy* শীর্ষক গ্রন্থের সপ্তম সংলাপে বেদান্ত ও বার্ক্লীয় দর্শনের সাদৃশ্য কল্পনা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করেন।

২৩ ডঃ ব্যালান্টাইন্ বেকন্ প্রণীত Novum Organum গ্রন্থখানির লাতিন মূল ও সটীক ইংরেজী অনুবাদসহ একখানি

করেন যে, যেহেতু সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের সহিত বিশপ বার্ক্‌লি প্রণীত *Inquiry*-গ্রন্থের সিদ্ধান্তগত বহু সাদৃশ্য বর্তমান, সেইহেতু তিনি উক্ত গ্রন্থের একটি বিশেষ সংস্করণ দুই দেশের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তুলনামূলক টীকা সংযোজন করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইলে পশ্চাদ্‌বর্তী অনুন্নত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে উন্নত পুরোগামী প্রতীচ্যদেশের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন সহজসাধ্য হইবে—এবং পরিণামে উভয় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিবে—

> "Besides the *Nyaya* system, there are two other systems taught in the College, viz., *Sankhya* and the *Vedanta.*…As there is much in the two systems last-named that finds its counterpart in the speculations of Bishop Berkeley, I have reprinted Berkeley's *Inquiry*, with a commentary indicative of these correspondences. I should like that the acuteness of the Calcutta Sanskrit College should be brought to bear upon this exposition also. Where speculation, in countries so widely separated as India and Europe, has arrived at similar or identical conclusions, the conviction of the fact should naturally tend to beget mutual respect, and mutual respect must naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of the science and philosophy of the more advanced one."[২৪]

বিদ্যাসাগর মহাশয় ডঃ ব্যালান্টাইনের প্রস্তাবসমূহের যৌক্তিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া শিক্ষাসমিতির সচিবের নিকট আপন সংস্কার-পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রার্থনা করিলেন। যদিও হিন্দু শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তথাপি দেশের

অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন—প্রধানতঃ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই। ইহার বিজ্ঞাপনে ডঃ ব্যালান্টাইন্ বলেন:

"To the European reader this commentary on the *Novum Organum* may perhaps seem whimsically diffuse, and its phraseology sometimes whimsically formal. In explanation therefore it may be not improper to advertise the reader that the version and the commentary were made for the especial use of a class of men—the Pandits of the Sanskrit College, Benares,—whose taste and whose requirements it was the compiler's business to consult. Each sentence has been written with the view of being hereafter rendered into Sanskrit, in order to its eventual reproduction in all the derivative modern languages of India. As remarked by Schlegel, the Latin, in its structure, comes nearer the Sanskrit than any modern European language does; hence it follows, conversely, that a version of the *Novum Organum*, designed as the scaffolding for a Sanskrit version, ought to keep as close to the original Latin as possible. This consideration may suffice to account for the departure in the present version, from the phraseology of previous versions. Another reason for keeping as close as possible to the Latin is this, that some of the Pandits, of their own accord, have betaken themselves zealously to the study of the Latin language, in which they can apply themselves to nothing more valuable than the work which this version may aid them in reading. For the convenience of those students the Latin original is appended. . ."—*An Explanatory Version of Lord Bacon's Novum Organum* (Mirzapore, 1852/ *Reprints for the Pandits*, No. V).

২৪ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, হিন্দুকলেজের প্রথম যুগে ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে বেকন্, লক্ এবং হিউম্ প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকগণের মতবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য, আচার্য কৃষ্ণকমলের অগ্রজ তীক্ষ্ণধী রামকমল বেকনের রচনার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। রামকমল প্রণীত 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ',

বর্তমান উন্নতিই ছিল তাঁহার অন্তরের একমাত্র কামনা—এবং যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের প্রতি গোঁড়া আনুগত্যের দ্বারা এই উন্নতি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনাই ছিল সমধিক, সেইহেতু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন তাঁহার নিকট অপরিহার্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন বিষয়ে তাঁহার প্রতিকূল মনোভাবও সেই একই কারণ-প্রসূত। তিনি ডঃ ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে বলেন—

"With regard to Bishop Berkeley's ***Inquiry***, I beg to remark that the introduction of it as a class-book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to cotinue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's ***Inquiry*** which has arrived at similar or identical conclusion with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of philosophy, will not serve that perpose...."[২৫]

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে সাংখ্য ও বেদান্তের প্রতি বিদ্যাসাগরের যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও রামমোহনই বাংলাদেশে বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার ঐহিক উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বরাবরই সন্দেহ পোষণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮২৩ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার প্রতিবাদে তিনি লর্ড আমহার্স্টের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহার কিয়দংশ প্রাসঙ্গিক বোধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Neither can much improvement arise from such speculation as the following, which are themes suggested by the Vedant :—In what manner is

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামকমলের মৃত্যুর পর আচার্য কৃষ্ণকমল এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৬৯ খৃঃ)। অগ্রজ সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়: "পূর্বদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় এই উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্র আর কখন এরূপ পরিপাটীরূপে একাধারে বর্তে নাই, অতএব তাদৃশ লোকের চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্র যে কিরূপ মূর্তি ধারণ করে, লোকের এই কৌতূহল এখন কিছুকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত রাখিতে হইল। সেই অমূল্য চমৎকার সুযোগ রামকমলের চিতার উপরেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।"—দ্র° সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তার এতাদৃশ সমন্বয়ই ছিল বিদ্যাসাগরের পরম অভীপ্সিত লক্ষ্য। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবের উত্তরে তাই দেখি বিদ্যাসাগর শিক্ষাসমিতির নিকট রামকমলের কৃতিত্বের কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: ". . . As a specimen of what may be expected from the Sanskrit College here, I beg leave to enclose herein an English translation of a Bengali essay of the past session by a senior student (Ramkamal Sharma—student of the philosophy class) of this institution who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature."

২৫ দ্র° *Modern Review*, October 1927, p. 405.

the soul absorbed into the deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrine, which teach them to believe that all visible things have no real existence; that as father, brother, etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the word the better.…"

অপর পক্ষে, যে জাতীয় দর্শন-শাস্ত্র অনুশীলন করিলে ঐহিক জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণা করিবার মত মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, সেই সকল দার্শনিক গ্রন্থের অধ্যাপনাই ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত। সুতরাং যদিও তিনি বার্কলি'র দর্শনের চর্চা আদৌ অনুমোদন করেন নাই, তথাপি বেকনের বিখ্যাত দার্শনিক নিবন্ধ *Novum Organum*'এর পাঠ্যরূপে অন্তর্ভুক্তি তিনি সাগ্রহে প্রস্তাব করেন—

> "So far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises—such for instance as his excellent edition of the *Novum Organum* in English, I will avail myself of them most readily and cheerfully.…"[২৬]

এখানেও রামমোহনের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্চর্য অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য না করিলে পারা যায় না। লর্ড আমহার্স্টের নিকট লিখিত পত্রে রামমোহন সুস্পষ্টভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারে বেকনীয় দর্শনের ভূমিকার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া মন্তব্য করেন—

> "In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterised, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon, with the progress of knowledge made since he wrote.
>
> "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowldge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance.…"[২৭]

বিস্ময়ের কথা এই যে, বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে কৃতবিদ্য হইয়াও ভারতীয় দার্শনিক মনীষার সর্বোত্তম প্রকাশরূপে পরিগণিত বেদান্ত-দর্শনকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে 'ভ্রান্ত-দর্শন'-রূপে চিহ্নিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই। অথচ দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের সমসাময়িক আচার্যবৃন্দ বেদান্ত-চর্চার ব্যাপক প্রসারের সাহায্যেই দেশের ঐক্যস্থাপন, এমনকি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের স্বপ্নও

২৬ *Three Lectures on Vedanta Philosophy* (Delivered at the Royal Institution in March 1894)/ Indian Reprint/Susil Gupta (India) Ltd./ Calcutta, 1950/ pp. 49-50.

২৭ ঐ পৃ. ৭০-৭১

দেখিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকগোষ্ঠীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকার ফলে বেদান্ত সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনুকূল মনোভাব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে অবশ্যই সচেতন ছিলেন—এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ খুবই কম। তৎসত্ত্বেও যে বিদ্যাসাগর বেদান্তদর্শনকে ভ্রান্ত বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার স্বদেশের অধিবাসিগণের ঐহিক সকল বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যই যে তাহাদের বৈষয়িক অবসাদের অন্যতম প্রধান কারণ—উহা তিনি সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন ও বার্কলির দর্শন উভয়ই জগৎকে স্বপ্নোপম, মায়িক, নিঃসার বলিয়া মনে করিয়া থাকে; সুতরাং, এই দুই দর্শনের চর্চার দ্বারা ভারতীয়গণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের, ব্যাবহারিক বিষয়ে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবারই সম্ভাবনা প্রবল—সেইজন্য বিদ্যাসাগর বেদান্তদর্শন ও বার্কলীয় দর্শনের চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করিতে চাহেন নাই। বিদ্যাসাগরের প্রখর ব্যাবহারিক বুদ্ধিই—ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত নহে, কিন্তু দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থসংরক্ষণের উদার বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ—তাঁহাকে আধুনিক সমাজব্যবস্থার সহিত অসংলগ্ন স্মৃতি ও পৌরোহিত্যশাস্ত্র এবং ইহজীবনের প্রতি বৈরাগ্যবুদ্ধির উদ্রেকের সহায়ক বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনকে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকায় অপেক্ষাকৃত গৌণস্থান নির্ণয়ে প্রেরণা জোগাইয়াছিল—এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না—ব্যালান্টাইনের সহিত বিদ্যাসাগরের এই ঐতিহাসিক বাদানুবাদ হইতে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির মোহহীন বাস্তবাভিমুখিতা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির হিত-সম্পাদনের প্রতি তাঁহার অতন্দ্র আগ্রহ ও অভিনিবেশ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিক্ দিয়া বিদ্যাসাগর ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য নব্যবঙ্গের বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক-গণের সগোত্রীয়। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই বিশেষ প্রকাশটিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন—

> "In spite of his orthodox training and heritage, Vidyasagar's outlook was remarkably similar to that of a modern European. In everything he undertook, he took up an essentially practical standpoint and showed the pertinacity and indomitable energy of John Bull."[২৮]

এই স্থলে বার্কলির মতবাদ ও বেদান্তদর্শনের যুক্তিমূলকতা সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অভিমতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (Max-Müller) তাঁর বেদান্তদর্শন-বিষয়ক বক্তৃতামালায় বেদান্ত ও বার্ক্লির বিজ্ঞানবাদ বিষয়ে তুলনা প্রসঙ্গে বলেন—

> "...The universal simile that the world is a dream turns up frequently in the Vedanta.
>
> "That what we call our real world is a world of our own making,

---

২৮ দ্র° স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ / উদ্বোধন কার্যালয়), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২১-২২ ('পত্রাবলী', পত্রসংখ্যা ২৫০)। মিঃ স্টার্ডি'কে লিখিত স্বামীজীর আর একটি পত্রাংশ: "প্রিয় বন্ধু, এইমাত্র দুইজন যুবক ভদ্রলোক, মিঃ সিলভারলক এবং তাঁহার বন্ধু চলে গেলেন।... এঁদের একজন ইঞ্জিনিয়র, আর একজন শস্যের ব্যবসা করেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ এঁরা পড়েছেন এবং উভয় শাস্ত্রের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে হিন্দুদিগের চিন্তাধারার অপূর্ব মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন।..."—ঐ, পৃ. ১৭১ (পত্রসংখ্যা ২২০)

that nothing can be long or short, black or white, bitter or sweet, apart from us, that our experience does not in fact differ from a dream, was boldly enunciated by Bishop Berkeley, of whom John Stuart Mill, no idealist by profession, declares that he was the greatest philosophical genius of all who, from the earliest times, have applied the powers of their minds to metaphysical inquiries. This is a strong testimony from such a man. 'The physical universe', Bishop Berkeley writes, 'which I see and feel and infer, is just my dream and nothing else ; that which you see, is your dream ; only it so happens that our dreams agree in many respects.' "[২৯]

স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স্, কোল্‌ব্রুক্, অধ্যাপক ডয়সেন্, শোপেনহয়ার প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত মনীষী ও দার্শনিক বেদান্তদর্শনকে সাতিশয় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডঃ ডয়্সেনের মত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকও শুধু বেদান্তদর্শনের অনুশীলনের তাগিদেই সংস্কৃতভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"This translation made by a well-schooled philosopher, will show at all events that a man deeply versed in Plato, Aristotle, Spinoza and Kant, did not think it a waste of time to devote some of the best years of his life to the Vedanta, nay to make a journey to India, in order to come into personal contact with the still living representatives of the Vedanta philosophy.··· Still··· there have not been wanting others who look upon the Vedanta philosophy as mere twaddle, and as utterly unworthy of the attention of serious students of philosophy.··· In the eyes of some people all philosophy is twaddle, or even madness, while others call it a divine madness.' "[৩০]

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অসংখ্য বক্তৃতামালায় পাশ্চাত্ত্য সমাজের সম্মুখে শুধুই যে

---

২৯ Ernst Cassirer—প্রণীত '*Roussean Kant Goethe*—শীর্ষক নিবন্ধে উদ্ধৃত, [Pricecton/ Priceton University Press/ 1970], পৃ. ২

৩০ দ্র° রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত '৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী' (৫ম সংস্করণ/ ইং ১৯২৪ সাল), পৃ. ৯৪-৯৫। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে মল্লিনাথের টীকার প্রচলন হয় নাই এবং নাথুরাম প্রভৃতি তিনজন পণ্ডিতবিরচিত রঘুবংশের টীকাই তাঁহারা পাঠ করিতেন। দ্র° "সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত একজন না একজন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ বাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র।··· যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও Manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম।"—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যায়।

বেদান্তের উদারতা ও মহিমার কথাই উদ্‌ঘোষিত করেন তাহাই নয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্যরাজির সহিত যে বেদান্ত-সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই, তাহাও নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন—

"মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্‌ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি মন, বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

"তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি ; তাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি। উহার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে সৃষ্টিতত্ত্ব,— তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখানো হবে।"[৩১]

বাংলার নবযুগের দুই প্রধান পুরুষ— বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ। দুইজনেই চাহিয়াছিলেন দেশের কল্যাণ। অথচ সংস্কৃতসেবী বিদ্যাসাগর বেদান্তদর্শনকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া প্রচার করিলেন, আর ইংরেজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য নরেন্দ্রনাথ বেদান্তদর্শনকে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহার সাহায্যেই স্বদেশের, এমন কি বিশ্বের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিলেন। জার্মান দার্শনিক ফিশ্‌তে-'র (Fichte) একটি স্মরণীয় উক্তি এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে উদিত হয়—

"The kind of philosophy a man chooses depends upon the kind of man he is. For a philosophic system is no piece of dead furniture one can acquire and discard at will. It is animated with the spirit of the man who possesses it."[৩২]

৬

বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল নিশ্ছিদ্র কর্মসঙ্কুল। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবিধির সংস্কার ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী ডঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত বিবাদ— এ সমস্তই বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের একটি

৩১ তু° "উক্ত পদ (অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ) গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে অতি আবশ্যকীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তকগুলির কলেবর পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের আমলের হস্তলিখিত পলিত-গলিত পুঁথিগুলি প্রায় দেহত্যাগ করিতেছিল, তিনি সর্বাগ্রে তাহার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করাইয়া শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ও অধ্যয়নকারী সমভাবে তাঁহার এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এতদ্‌ভিন্ন তিনি দর্শনশাস্ত্রের পুঁথিগুলিও পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন।"— চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর' (পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৩), পৃ. ৮৫।

৩২ হরিশ্চন্দ্র ছিলেন একজন হিন্দী কবি। কলিকাতা মুাজিয়ম দর্শন উপলক্ষ্যে যে 'পাদুকা-বিভ্রাট' ঘটে, সে সময়ে হরিশ্চন্দ্র ছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গী। দ্র° বিহারীলাল সরকার : 'বিদ্যাসাগর', অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

বিশেষ অধ্যায় মাত্র। এই নিরন্তর কর্মধারা তাঁহার সারস্বত সাধনাকে যে বিঘ্নিত করিবে— ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব দানের কথা বিস্মৃত হইলেও চলিবে না। সংস্কৃত কলেজে যে সময়ে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী কাব্য নাটক প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্করণ প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে রঘুবংশ, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশাকুন্তল, উত্তররামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের একাধিক প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ টীকা আমাদের অনায়াসলভ্য। কিন্তু সেই যুগে এই সকল অতি প্রসিদ্ধ দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের কোনও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি রঘুবংশের উপর মল্লিনাথের 'সঞ্জীবনী' ব্যাখ্যাও তখনও পর্যন্ত বাংলা দেশে অপ্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যগুরু ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিত হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা তদানীন্তন বঙ্গদেশীয় বিদ্যার্থীর পক্ষে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল—

"তৎকালে রঘুবংশ প্রভৃতি কয়েকখানি মহাকাব্যের মল্লিনাথকৃত টীকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। এই নিমিত্ত মিস্টর উইলসন্ সাহেব নিয়ত-পাঠ্য রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে প্রথমে রামগোবিন্দ পণ্ডিত পরে নাথুরাম শাস্ত্রী রঘুবংশের কয়েক সর্গের টীকা করিয়া লোকান্তরিত হয়েন। পরে প্রেমচন্দ্র অবশিষ্ট কয়েক সর্গের টীকা রচনা করেন। টীকাসহ সমগ্র কাব্যখানি বিদ্যালয়ে পঠনের নিমিত্ত মুদ্রিত হয়। সংস্কৃত রচনায় প্রেমচন্দ্রের এই প্রথম উদ্যম। কিন্তু তিনি এই টীকাতে তাঁহার অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী প্রভৃতির অবলম্বিত মার্গ পরিত্যাগপূর্বক নূতন পন্থা অবলম্বন করেন, এবং এই পন্থাই যে কাব্যের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যার বিষয়ে সমীচীন ছিল, তাহা সর্ববাদিসম্মত।···

"কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। সমুদায় গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। পরে কাপ্তেন মার্শেল সাহেব ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে অষ্টমাদি সর্গ-সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; এই টীকাসহ অষ্টম সর্গ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আদর্শখানি অপরিশুদ্ধ এবং নবম আদি সর্গের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাসপ্রণীত কি না সন্দেহ করিয়া অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পণ করেন নাই।···"[৩৩]

ছাত্রদের উপযোগী সংস্কৃত গ্রন্থরাজির সুলভ মূল্যে প্রকাশ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাতিশয় যত্নশীল ছিলেন।[৩৪] গ্রন্থের তাৎপর্য যাহাতে অতি সহজে স্বল্পকথায় বুঝিতে পারা যায় সেই দিকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকিত— অযথা পল্লবন তিনি বিষবৎ বর্জন করিয়া চলিতেন। তিনি

৩৩ তু° "The above considerations make it abundantly clear that Ramachandrabudhendra could not have been the author of the commentary printed in Īśvaracandra Vidyāsāgara's edition of the *Uttara-rāmacarita, that Vidyāsāgara* himself composed the commentary and that he fully availed himself of the works of two of his predecessors viz. Premacānd Tarkavāgīśa and Nārāyana Dīkṣita. . ."—Kshitis Chandra Chatterji: *Commentaries on the Uttararāmacarita* (*Indian Historical Quarterly*, Vol. IX, No. 2) অপিচ—
"The charge of plagiarism brought against Īśvaracandra Vidyāsāgara, one of the greatest scholars Bengal has ever produced, has, infact, no basis. . ."—ঐ

৩৪ "কলিকাতা। ১লা অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৩৯।" অর্থাৎ ইং ১৮৮৩ খৃঃ।

'মেঘদূত' 'অভিজ্ঞান-শাকুন্তল' এবং 'উত্তররামচরিত'— এই গ্রন্থত্রয়ের যে সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কাব্যের ব্যাখ্যা ও সম্পাদনের নীতি ও কৌশল সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়। 'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা'— এই মহাকবি-বাক্যের যাথার্থ্য অতি সুন্দরভাবে উহার মধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'অভিজ্ঞানশাকুন্তল' ও 'উত্তর-রামচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যের এই অতিপ্রসিদ্ধ রূপকদ্বয়ের সম্পাদনে বিদ্যাসাগরের বিশুদ্ধপাঠ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'শকুন্তলা'র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রণীত ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননরচিত ব্যাখ্যাসহিত সংস্করণদ্বয় গৌড়দেশ প্রচলিত পাঠের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণ 'উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রচলিত' পাঠ অবলম্বনে সম্পাদিত। বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের জন্য তিনি সেই যুগেও বারাণসীনিবাসী সুহৃদ্বর শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রের[৩৫] পুস্তকালয় হইতে এবং বারাণসী সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগার হইতে 'পাঁচখানি মূল', একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিবৃতি অবলম্বন পূর্বক, 'অভিজ্ঞানশাকুন্তলের' সংস্করণকার্য সম্পাদন করেন। 'উত্তরচরিত' সম্পাদনকালেও তিনি পূর্বপ্রকাশিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রণীত সটীক সংস্করণ ও 'রাজকীয় শিক্ষা সমাজের আদেশে' মুদ্রিত সংস্করণ ও দুইখানি হস্ত-লিখিত পুঁথির তুলনার সাহায্যে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। 'উত্তরচরিতে'র টীকা বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ মহামহোপাধ্যায় ডঃ পি. ভি. কাণে তৎসম্পাদিত 'উত্তরচরিত' নাটকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত সটীক সংস্করণের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন এবং উহা যে রামচন্দ্রবুধেন্দ্র প্রণীত টীকারই অবিকল প্রতিলিপিমাত্র তাহা উল্লেখ করতঃ বলেন—

> "· ·the absence of introductory verses and the omission to say definitely that the commentary is his, make it highly probable, if not certain, that the commentary is not his and that he simply included it in his edition without acknowledging his debt to Rāmachandrabudhendra. We advance this view with great diffidence."

বালমনোরমা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'উত্তরামচরিতে'র সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাম শাস্ত্রী মহাশয়ও অধ্যাপক কাণের মতেরই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু স্বর্গত অধ্যাপক ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অপবাদ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উল্লিখিত পণ্ডিতগণের অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।[৩৬]

৩৫ ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' পুস্তকের ভূমিকা হইতে (পৃ. ৮)।

৩৬ *Sarvadarśana Saṅgraha* or An Epitome of the Different Systems of Indian Philosophy/*Bibliotheca Indica*/ 1858/ Preface [Sanskrit College, the 20th January, 1858]. সংবৎ ১৯২১ বর্ষে সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক তদীয় ছাত্র পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সাহায্যে 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে'র একটি মর্মানুবাদ বাংলাভাষায় প্রকাশ করেন। এই বঙ্গানুবাদের মূল প্রেরণা যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতেই লাভ করেন, তাহা ভূমিকাতেই স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দ্র° "সর্বদর্শনসংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং উহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মহোপকারক। এই গ্রন্থের আলোচনায় পঞ্চদশ দর্শনের মর্মগ্রহ হওয়াতে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা জন্মে। বিশ্ববিখ্যাত, অসামান্য ধীসম্পন্ন, বিবিধবিদ্যাসমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকালে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালে তিনি আমাকে ঐ পঞ্চদশ দর্শন ও শঙ্করদর্শনের স্থূল মর্মসকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন। তিনি যৎকালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তৎকালে আমার নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ আছে। তাঁহার প্রবর্তনানুসারে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই।..."— ঐ. পৃ. ।/০।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম মহৎ কৃতিত্ব যে, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বাণভট্ট প্রণীত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজে ইহার প্রচারের পথ সুগম করেন। তাঁহার 'হর্ষচরিতে'র সংস্করণের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় কিভাবে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁহার হস্তগত হয়, তাহা বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন :

> "বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরম বন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে একখানি পুস্তক দেখাইয়া কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রী নামে একটি পণ্ডিত পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায়, আমার নিকট পুস্তকখানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্ট প্রণীত।... কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইলাম।...কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।"[৩৭]

যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে 'হর্ষচরিত' 'কাদম্বরী' অপেক্ষা "অনেক অংশে নিকৃষ্ট", তাহা হইলেও, "উহা যে এক প্রশংসনীয় গ্রন্থ, সে বিষয়ে সংশয় নাই।" হর্ষচরিতের রচনাশৈলী সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ধারণা যে বেশ উচ্চ ছিল, তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিচারণা হইতেও জানিতে পারা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমযৌবনে লক্ষ্ণৌ-এ অধ্যাপকরূপে যোগদান করিবার প্রাক্কালে কার্মাটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ের স্মৃতি নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে বিবৃত আছে—

> "আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি— এম্. এ. ক্লাসেও পড়াইতে হইবে— বিশেষ হর্ষচরিতখানা পূরা পড়াইতে হইবে শুনিয়া একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন বইটা বড়ই কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন— বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম— রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় বলেন— ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন— তাই ত', রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচা-পাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?— যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত এবং অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল।..."[৩৮]

মাধবাচার্য প্রণীত সুবিখ্যাত নিবন্ধ 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' প্রথম সম্পাদনার কৃতিত্বও বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'Bibliotheca Indica' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত উক্ত নিবন্ধের সংস্করণের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় কিরূপ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে এই বহুমূল্য গ্রন্থটিকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ, এসিয়াটিক্ সোসাইটি এবং বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থভাণ্ডারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সন্দেহস্থলে মূলের বিশুদ্ধ পাঠসমূহ নির্ণয়ে ব্রতী হন। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত যথার্থই বলিয়াছেন—

> "But it is somewhat singular that Mss. of the work are very rare, and that the great majority of the learned of this country are probably

৩৭ 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ১৫৯।

৩৮ 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', পৃ. ১৯৭।

not even aware of its existence. If not printed now, the *Sarvadarsana-Samgraha* would, in all probability, share the common fate of any other valuable relics of Sanskrit learning."[৩৮]

দেখা যাইতেছে, প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উহাদের তুলনাত্মক বিচারের সাহায্যে মূলগ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের যে পদ্ধতি আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট সুপরিচিত, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গবেষণার সেই বিশেষ ক্ষেত্রেও অন্যতম বিশিষ্ট পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য। বিদ্যাসাগরের গ্রন্থসংগ্রহের পরিধি ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর— 'Vidyasagar Collection'-রূপে পরিচিত তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, যাহার কিয়দংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সম্পদ্‌বিশেষ, আজও তাহা গ্রন্থরসিক মনীষিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই বহুমূল্য গ্রন্থশালায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের দুর্লভ পুঁথিও সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছিল। ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষ্য এ বিষয়ে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়—

"…তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকালয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দী পুস্তকে সে পুস্তকাগার পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চেষ্টায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, যে সকল পুস্তক ভিন্ন অসংখ্য সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে যেরূপ সংগৃহীত ও যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।…"[৩৯]

৭

বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক্ লইয়া আমরা এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। সংস্কৃত ভাষা, শাস্ত্র ও সাহিত্যের একান্ত অনুরক্ত সেবকরূপে তিনি কি অতুলনীয় নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ও সর্ববিধ সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত উদার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন— তাহার কিছু বিবরণ একত্র সংগৃহীত হইল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগরের অনলস প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। তিনি উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদী ও ঋজুপাঠ রচনার দ্বারা বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার যে রাজমার্গ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ৺পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন—

"এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর— সর্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ— সকলেই যে কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকা দ্বারা ব্যাকরণের দুর্গমপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার

---

৩৯ দ্র° "But I would beg to submit, that the qualifications of the students of the Sanskrit College are at least equal to those of the students of the Madras. . . The Sanskrit College has, however, one important advantage over every other collegiate establishment. The course of study here adopted enables its students to acquire a thorough knowledge and a complete mastery of the Bengali language in which the business of the mofussil is transacted. . . The principles of equal and impartial but discriminating encouragement to the several government colleges being once admitted it would not be difficult to select a few well-educated past students of the Sanskrit College who would be found in every way qualified to enter the service as Deputy Magistrates."—ডঃ এফ্. জে. ময়েটের নিকট বিদ্যাসাগরের পত্র, ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৫২ [Ishwarchandra Vidyasagar as an Educationist]-শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত (*Modern Review*, September 1927, p. 260).

মূল কারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে এক্ষণকার সংস্কৃতানুশীলন-কারীদিগের মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে সংস্কৃতশিক্ষা করা ঘটিয়া উঠিত? ফলতঃ বিদ্যাসাগরের যদি আর কোনো কার্য না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃত ভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এই একমাত্র কার্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেন সন্দেহ নাই।"[৩৯]

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষিতসাধারণের অনুরাগ ও জিজ্ঞাসা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁহার 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতশাস্ত্রসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' বীটন সোসাইটির অধিবেশনে বাংলা ভাষায় পাঠ করেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়ও বিদ্যাসাগর পথিকৃৎ।

কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃতশিক্ষার প্রসারের জন্যই শুধু যত্নশীল ছিলেন না। সংস্কৃতশিক্ষা যাহাতে পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিক 'প্রয়োজনীয়' (ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি) বিভিন্ন বিদ্যার চর্চার সহিত সংযুক্ত হইয়া যুগোপযোগী ও ব্যাবহারিক জীবনের সহিত ওতপ্রোভাবে সমন্বিত হইয়া উঠিতে পারে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে ইহাই ছিল তাঁহার সর্ববিধ উদ্যমের প্রধানতম লক্ষ্য। সেইজন্যই তিনি টোলের বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যক্রমের সংস্কার প্রস্তাব করেন, সংস্কৃতবিদ্যার্থিগণের পক্ষে ইংরাজী অবশ্য পাঠ্যরূপে প্রবর্তন করেন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ইংরাজী ভাষা ও নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হইয়া মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করেন এবং স্বয়ং সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের বাংলাভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যকে শাশ্বতগৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র-সমূহকে সমাজসংস্কারের উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদের যুগোপযোগী উদার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিদ্যাসাগরের যে মনীষা, দূরদর্শিতা ও চারিত্রিক মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তুলনারহিত। শুধু তাহাই নয়, সংস্কৃত বিদ্যা যাহাতে ঐহিক অভ্যুদয়েরও সাধন হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের সংগ্রামও স্মরণীয়। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থিগণেরও তৎকালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়।[৪০]

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজের অভ্যুন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের এই সকল সংস্কার প্রয়াস তাঁহারা কেহই ইহার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থিগণের ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে প্রবর্তনের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন; বাংলা ভাষার অভ্যুন্নতির জন্য সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বৎসমাজের প্রয়াস নিতান্তই সীমাবদ্ধ; পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও যুগোপযোগী বিবর্তনের প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য আজও পূর্বের ন্যায় অবিচলিত। ফলে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায়

---

৪০ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা অবশ্য পাঠ্যরূপে প্রবর্তন বিষয়ে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের মনোভাবের কিছু পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে— "...ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সংস্কৃত শিক্ষাস্রোত অনেকটা তেজোহীন হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে আপত্তি তুলিয়া যিনি ইহাকে ইংরেজি স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন [অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় তাঁহার প্রেতাত্মার অর্ধাধিক তৃপ্তি হইয়াছিল; অধুনা প্রায় পূর্ণ।"— অপিচ— "সংস্কৃত কলেজের পরিণাম স্মরণে দুঃখ করিয়া একদিন ভূতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বলিয়াছিলেন— "হায়! সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সেই যুগের সময় এবং বর্তমান পরিবর্তন স্মরণ করিলে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। কি শোচনীয় পরিণাম!"— বিহারীলাল সরকার: 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ২৬০ ও তত্রস্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের ক্ষমতা অবক্ষয়ের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। দেশের ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ আমরা কতটুকু গ্রহণ করিয়াছি, বা তদ্বিষয়ে কতটুকু অনুকূল মনোভাবই বা পোষণ করিয়া থাকি ? ইহার পরিণামও তাই অত্যন্ত দুঃখাবহ— বাংলার নবজাগরণের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ পুরুষসিংহগণের আদর্শ আজ আমাদের নিকট বিস্মৃতপ্রায়, আমরা সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সংস্কৃতি ও অতীত মহিমা সম্বন্ধে বীতরাগ এবং তাহা হইতে কোনও প্রেরণা লাভ করিয়া যথার্থ ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার দিকে আমাদের ইচ্ছার একান্তই অভাব ; যাবতীয় বৈদেশিক প্রভাবের তাড়না আমাদিগকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে তুচ্ছ উড়ুপের ন্যায় ইতস্ততঃ আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত করিতেছে। ইহা কি আমাদের স্বকৃত কর্মেরই ফল, না দুর্জ্ঞেয় বিধিলিপি ?

কবি ও কাব্য, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূরবী কাব্যে কবি বলেছিলেন— 'বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষরাগিণীর বীন'। আপাত শ্রবণে মনে হতে পারে রবীন্দ্রকাব্যের অন্ত্য পর্ব এখানেই শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শেষরাগিণী বাজতে তখনো বাকি ছিল; শেষ পর্যায়ের কাব্যে যে সুর বেজেছে সে সুর তখনো ফুটে ওঠে নি। কাব্যরসিক মাত্রই লক্ষ্য করবেন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রকাশভঙ্গিতে, সুরে ছন্দে পূর্ববর্তী কাব্যের সঙ্গে যতখানি এর আত্মীয়তা পরবর্তী কাব্যের সঙ্গে ততখানি নয়। অস্তসূর্যের আভা মিলিয়ে যাবার আগে যেমন সব-কিছুকে একবার রাঙিয়ে দিয়ে যায়, পূরবী এবং তার পরবর্তী কাব্য মহুয়ার বহু কবিতাও তেমনি অপস্রিয়মান যৌবনের রঙে রঞ্জিত। রবীন্দ্রকাব্য তখনো যৌবনবেদনারসে সিক্ত। অবশ্য খুব প্রচণ্ড রকমের পরিবর্তন— যাকে আমূল পরিবর্তন বলা যেতে পারে— তেমন কখনোই হয় নি। লক্ষ্য করবার মতো পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে তা সত্তরের কোঠায় পা দিয়ে। শেষ দশকের কাব্যকেই প্রকৃত পক্ষে বলা চলে শেষরাগিণীর বীন। কাব্যে পালা-বদলের কথা তিনি অনেক সময় বলেছেন। কাব্যালোচনার আগে কাব্যের ঐ পালা-বদল সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

জীবন সরলরেখায় চলে না, ক্রমাগত বাঁক ঘুরে ঘুরে চলে। বিশেষ করে যে জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ, যে মানুষের আত্মীয়তার সীমানা দেশ-জাতির সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে সে মানুষের দৃষ্টির দিগন্ত যেমন প্রসারিত হতে থাকবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির তেমনি রূপান্তর ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তাই ঘটেছে। আপাত দর্শনে পরস্পরবিরোধী বহু ধ্যানধারণার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান তাঁর জীবনের অন্যতম সাধনা। স্বদেশ বিদেশ জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যে মূলে এক, এ বোধটিকে তিনি একটি রেডি-মেড্ থিয়োরী হিসাবে গ্রহণ করেন নি; বিশ্বপরিক্রমা করে, অজানা-অচেনাকে দেখে-শুনে জেনে-চিনে তবে তাকে গ্রহণ করেছেন। মানুষকে তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্যুত করে বৃহত্তর ভূমিকায় দেখবার চেষ্টা করেছেন। পারিবারিক শিক্ষাগুণে যেসব ধ্যানধারণাকে তিনি বাল্যাবধি লালন করে এসেছেন জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষাগারে তাদের যাচাই করে নিয়েছেন। কখনো কখনো পৃথিবীর ঘটনাবর্তে বহুদিন-লালিত বিশ্বাসে আঘাত লেগেছে, কোনো কোনো বিষয়ে মনে সংশয় জেগেছে। সে সংশয়ের ছাপ পড়েছে তাঁর কাব্যে।

কিন্তু এখানে বিশেষ করে মনে রাখবার কথা যে যদিচ তিনি তাঁর কাব্যে পালা-বদলের কথা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ এই নয় যে তাঁর জীবনের কোনো পর্বে তাঁর ধ্যানধারণার কোনো আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান প্রত্যয়গুলি অতিশয় দৃঢ়মূল। কোনো প্রবল উত্তেজনায় বা কোনো সাময়িক ঘটনায়— তা সে যত বড়ই হোক্— তাঁর গভীরতর বিশ্বাসকে উৎপাটিত করতে পারে নি। জীবন থেকেই কাব্য উৎসারিত, কাজেই কাব্যে পালা-বদল বললে মনে হতে পারে যে কবির জীবনেই কোনো প্রকার গভীর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে অঘটন অনেক

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুক্রম

ঘটেছে, তাঁর জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে সারা দুনিয়ার মানবসমাজে প্রচণ্ড পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে যার ফলে তাঁর মননে চিন্তনে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তাঁর মূল জীবনদর্শনে কোনোপ্রকার আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় নি। তাঁর মূল প্রত্যয় এবং ধ্যানধারণায় এসব কোনো পরিবর্তন ঘটে নি যাকে বিপ্লবাত্মক বলা যেতে পারে। যাকে এককালে মূল্য দিয়েছেন পরবর্তী কালে তা মূল্যহীন হয়ে যায় নি। মূল্যবোধে বড় জোর ইতরবিশেষ হয়েছে, কোনো কোনো বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। তাহলেও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভঙ্গির বদল যতখানি, দৃষ্টির বদল ততখানি নয়। ইয়েট্‌সএর প্রথম যুগের কাব্যে এবং শেষ যুগের কাব্যে যেমন মেরু-ব্যবধান, রবীন্দ্রকাব্যে সে রকম কোনো চমকপ্রদ বিবর্তন দেখা যায় না। রবীন্দ্রকাব্যে প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত ভাবের দিক থেকে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। কাজেই পালা-বদল কথাটি খুব সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

২

বলাকার দশ বৎসর পরে পূরবী কাব্য। মাঝের দশ বৎসর প্রধানতঃ গদ্য রচনায় কেটেছে। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থের মধ্যে পলাতকা এবং শিশু ভোলানাথ। এ ছাড়া লিপিকার কথিকা-সংগ্রহকেও কাব্যসংসারের অন্তর্গত ধরা যেতে পারে। বলাকার পরে পূরবী নিঃসন্দেহে একটু নতুন ঠেকবে। প্রকাশভঙ্গিতে দু-এর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান। বলাকার মতো জোর গলায় আর কথা বলছেন না, কণ্ঠস্বর মৃদু। কোনো রকম ঘোষণা নেই। বলাকায় তিনি শুধু কবি নন, উদ্বোধক। পরবর্তী কাব্যে তিনি সে ভূমিকা যথাসাধ্য ত্যাগ করেছেন। কবি বিনা প্রয়াসেই মানুষের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেন। বিশুদ্ধ কাব্য স্বগত উক্তির ন্যায়। কবি আপন মনে কথা বলেন, কিন্তু বহু মনে তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। বলতে বাধা নেই যে বাণীপ্রচারের চেষ্টায় রবীন্দ্রকাব্য স্থানে স্থানে পীড়িত এবং বিড়ম্বিত। সুখের বিষয় সে জাতীয় কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ যৌবনের কবি। তাঁর কাব্য আদ্যন্ত যৌবনরসে অভিষিক্ত। কবি এবং শিল্পী মানুষের যৌবন-বয়সের সীমারেখা মেনে চলে না। পঞ্চাশ পার করে দিয়েও সবুজপত্র বা বলাকার যুগে যৌবনের জয়গান তাঁর মুখে যে ভাবে উচ্চারিত হয়েছে জীবনের আর কোনো পর্বে এমন নয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে ফাল্গুনীও এ সময়কার রচনা। সেখানেও যৌবনের জয়যাত্রা। বলাকায় যে যৌবন-বন্দনা তার স্থানে স্থানে একটু উত্তেজনার মদিরা -মিশ্রণ আছে। সত্যেনাথ দত্তের প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে যে প্রশস্তি বচন উচ্চারণ করেছিলেন— বঙ্গদেশে যে তরুণ যাত্রীদল নবজীবনের অভিযানে নব নব সংকটের পথে যাত্রা করবে

তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি—

এ প্রশস্তি সর্বতোভাবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বেলাতেই প্রযোজ্য। কবিতাটি যদিচ পূরবী কাব্যের অন্তর্গত তাহলেও যে রবীন্দ্রনাথের কথা এখানে বলেছি তিনি প্রাক্‌-পূরবী কাব্যের রবীন্দ্রনাথ। তবে

এ কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ পাঠকসমাজে যে আধিপত্য বিস্তার করেছেন তা অনাবশ্যক উত্তেজনার মদিরা -মিশ্রণে নয়, যথার্থ কবিসুলভ সহৃদয় হৃদয়-সংবেদনের গুণে— যে সহৃদয়তা বুদ্ধির নির্মমতার সঙ্গে হৃদয়ের দরদ মেশাতে পারে।

পূরবী কাব্যে যাকে শেষরাগিণীর বীন বলেছেন তাতে পালা-বদলের ইঙ্গিত ততখানি নেই যতখানি আছে বয়োবৃদ্ধি-জনিত জীবনাবসানের ইঙ্গিত। এখন থেকে অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থেই এই রাগিণীটি ঘুরে ঘুরে দেখা দিচ্ছে। বয়স ষাট পার করে দিয়েছেন। ইংরেজিতে যাকে বলে grand climacteric, এখন তার আওতায়। এ পর্বের কাব্যে সে কথা বারম্বার স্মরণ করেছেন। পূবরী, পরিশেষ, শেষ সপ্তক ইত্যাদি নামের মধ্যেই এর ইঙ্গিত আছে। পূরবী প্রকাশের অত্যল্পকাল পরে পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, আমার বুকের মধ্যে যমদূতের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যু একটি মস্ত বড় theme। গোড়ার দিকে যেখানে মৃত্যুর কথা বলেছেন সেটা রোম্যানটিক কবিসুলভ মৃত্যুবিলাস, তার মূল্য খুব বেশি নয়। ইতিমধ্যে বহু প্রিয়জন বিয়োগে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় গভীরতর হয়েছে। একের পর এক মৃত্যুর আঘাতকে তিনি ভাবে গ্রহণ করেছেন। শোক তাপ দুঃখ ভোগই শেষ কথা নয়— শোক-দুঃখকে জীবনের লভ্যাংশ বলে গ্রহণ করবার দুঃসাধ্য সাধনা গীতাঞ্জলি পর্বেই দেখা গিয়েছে। সে সাধনা এখনও অব্যাহত— 'তবু শূন্য শূন্য নয় / ব্যথাময় / অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন / একা একা সে অগ্নিতে / দীপ্ত গীতে / সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন'— পূর্ণতা, পূরবী। তথাপি মৃত্যুবিচ্ছেদ যে কতখানি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে তারও আভাস রয়েছে অনেক কবিতায়। পূরবীর প্রথম কবিতাটিতেই কবি বলে নিয়েছেন, আপনজনরা একে একে 'সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে' অন্তর্হিত এবং এরই ফলে 'রিক্ত শীর্ণ জীবন মম / শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীসম।' পূরবীর অপর এক কবিতায় বলেছেন— 'মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি'— যাত্রা। এখন নিজে সেই মৃত্যুদূতের অপেক্ষায় আছেন। 'সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা ইঙ্গিত করেছে মোরে।'

ষাট-অতিক্রান্ত জীবন এমন একটা সময় যখন মানুষ স্বভাবতই জীবনটাকে একবার পিছন ফিরে দেখতে চায়। জানে সুমুখের পথ নিঃশেষিত-প্রায়। পিছনে-ফেলে-আসা জীবনটার কথাই ঘুরে ঘুরে মনে আসে। পিছনে তাকালে অনেক অপূর্ণ আশা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা স্বভাবতই মনে পড়বে, অনেক কবিতায় এ বেদনার আভাস আছে— 'শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি' 'শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে' 'দলে দলে যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা / মন্দির-অঙ্গন-দ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা' ইত্যাদি।

প্রিয়জনরা একে একে চলে যাচ্ছেন, জীবনের নিঃসঙ্গতা ক্রমেই বাড়ছে। যাঁদের নিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন একে একে তাঁরা অন্তর্হিত। স্নেহ-ভালোবাসার দাবিদাওয়া কমে এসেছে। বন্ধু নেই বললেই চলে, আছে ভক্ত-সম্প্রদায়। ভক্তিতে মন ওঠে না, মানুষ আত্মীয়তা চায়। সে আত্মীয়তা তাঁর জীবনে কমই জুটেছে। সমকর্মী সহকর্মী মনের সান্নিধ্য সারা জীবনে কমই পেয়েছেন। প্রতিভার এটি একটি অভিশাপ, সেখানে অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্র অপরিসর। প্রতিভাবান মানুষের ধ্যানধারণা এতই নিজস্ব যে তার অংশীদার খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। সে মানুষের নীরব নির্জন অন্তঃপুরের বর্ণনা আছে পূরবীর 'চাবি' নামক কবিতায়—

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্মের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামত অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।

সে নির্জন অন্তঃপুরে কেউ প্রবেশ করতে পারে নি। 'অন্তরের জনহীন পথে' নিঃসঙ্গ পরিক্রমাই তাঁর শেষ পর্বের কাব্য।

পূরবীর পরে মহুয়া কাব্যগ্রন্থে খুব নতুন কিছু একটা চোখে পড়ে না। ভাবে না হলেও ভাষায় ছন্দে অনেকটা এক জাতীয় বলা যেতে পারে। মহুয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে— তাকে পূরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বলা চলবে না।' বলাকার সঙ্গে ভাবে ভাষায় এর মিল নেই সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন কিন্তু পূরবীর সঙ্গে মিল নেই এমন কথা মেনে নেওয়া কঠিন। ভাষা এবং ছন্দের ব্যবহারে অর্থাৎ বাহ্যিক প্রসাধনের দিক থেকে তো বটেই আন্তরিক উপলব্ধির দিক থেকেও এই দুই কাব্যের মধ্যে খানিকটা মিল অবশ্যই আছে। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির পরে বলাকায় যেমন চমকপ্রদ পরিবর্তন, বলাকার পরে পূরবীতে তেমনি নতুনত্বের স্বাদ। কিন্তু পূরবীর পরে মহুয়ায় তেমন কোনো নতুনত্বের ছাপ নেই। আগে ছিল না, এই প্রথম হল এমন কোনো অ-পূর্বতার নিদর্শন চোখে পড়ে না।

সব সময়ে নতুন কথাই বলতে হবে এমনও কোনো নিয়ম নেই। পুরাতনই বারে বারে নতুন হয়ে দেখা দেয়। সৃষ্টির নিয়মই এই। জীর্ণ পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতার দ্বারে ডাক দিয়ে যায়। শীতের সাজ খসাবার পালা বসন্তের অঙ্গরাগের সূচনা। এই কথাটি বলেছেন মহুয়ার 'বোধন' নামক কবিতায়— নিঃসন্দেহে মহুয়া কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা ; সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা যেতে পারে। কারণ এর বক্তব্য বিষয়টি রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের একটি central theme। বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং মানব-প্রকৃতিতে একটি মিল আছে। প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত বলেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে একটি বৈরাগ্যের ভাব আছে, সঞ্চয়ে তার মোহ নেই। পূর্ণের দান স্মরণ করে ভরা পাত্রটি সে শূন্য করে দেয়। মানুষের যৌবনও ঠিক এমনি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির 'পরে বিশ্বাস আছে বলেই জরামৃত্যুকে সে অনায়াসে অবহেলা করতে পারে। ফাল্গুনী নাটকে কবি একেই বলেছেন যৌবনের বৈরাগ্য-সাধন। গানে কবিতায় নাটকে এ তত্ত্বটি বারম্বার ফিরে ফিরে এসেছে। ঋতুরঙ্গ পর্যায়ের আরো কিছু কবিতা মহুয়া কাব্যে স্থান পেয়েছে। তবে ঐ বোধন কবিতাটি সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকে বিশেষ একটি উজ্জ্বলতা দিয়েছে। অপরাপর কবিতার সঙ্গে তেমন সংযোগ না থাকলেও 'সাগরিকা' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত-ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায় অতি সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বনবাণীর প্রকাশভঙ্গিতেও উল্লেখযোগ্য কোনো নতুনত্ব নেই। পূরবী মহুয়াতে যে ভাষায় যে ভঙ্গিতে

কথা বলেছেন, এখানেও সেই ভঙ্গিতে। এ কথা সচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে মহুয়া এবং বনবাণীতে শেষরাগিণীর আভাস মাত্র নেই। তথাপি রবীন্দ্রকাব্যে এর বিশেষ একটি স্থান আছে। সৃষ্টির আদিরহস্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান জিজ্ঞাসা, এ কথার উল্লেখ আগেও করেছি। পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের আবির্ভাবকে তিনি কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন এবং তার রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন। বনবাণীতে তিনি যে বৃক্ষের বন্দনাগান করেছেন তাতে সেই প্রথম প্রাণের প্রকাশকে অভিনন্দিত করেছেন। কোথা থেকে এই প্রাণের আবির্ভাব— এই প্রশ্ন তাঁকে নিত্য আন্দোলিত করেছে— 'কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতিযুক্তঃ'— প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? তাঁর কাছে এটিই বিশ্বরূপ দর্শনের মূল প্রশ্ন। সৃষ্টিলীলার অপেক্ষাকৃত এক পরিণত প্রহরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব। প্রাণস্পন্দিত পৃথিবীর আদিম রূপকে দেখতে হলে তারও আগে 'বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে' গিয়ে তাকে দেখতে হবে। রবীন্দ্রকাব্যের আদ্য মধ্য অন্ত সকল পর্বেই এই প্রশ্নটি নিরন্তর জাগরূক। তাঁর চিত্রকলার মধ্যেও এ জিজ্ঞাসাটি বর্তমান। ইংরেজ কবিদের মধ্যে একমাত্র কোলরিজ সাহিত্যদর্শনের আলোচনায় বিশ্বের এই প্রাণলীলার কথাটি গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে বিচার করেছেন।

৩

পরিশেষ এবং পুনশ্চ'র রচনা সত্তরের কোঠায় পদার্পণ করে ক্ষণিকায় যেমন যৌবনের কাছে বিদায় নিয়েছিলেন এখন তেমনি জীবনের কাছ থেকে বিদায়ের পালা। 'সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে' কিম্বা 'যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিমপথ শেষে। ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।' মৃত্যুচিন্তা বহু কবিতার মধ্যেই স্বগত উক্তির মতো প্রকাশ পেয়েছে। বিদায়ের বেদনাবোধ আছে কিন্তু আগেও যেমন বলেছেন— 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নেই'— এখনও জীবনের দিগন্তসীমায় পৌঁছেও বলেছেন— 'জীবনে হেরিনু মহিমা'। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত এ কথার কোনো ব্যত্যয় হয় নি। তথাপি কোনো কোনো কবিতায় অশ্রুবাষ্পের আভাস আছে— 'কত কি গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি। নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।' কিম্বা 'কতদিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা।' খুবই সহজ স্বাভাবিক মনের প্রকাশ, নিঃসঙ্গ জীবনের ভার কখনো কখনো দুর্বহ মনে হয়েছে।

এখানে আর-একটি কথারও প্রয়োজন। জীবনে নিন্দা-অপযশ জুটেছে প্রচুর। নতুন সুরে কথা বলতে গেলে গতানুগতিক মনের কাছে তা বেসুরো শোনায়। প্রথমাবধিই (বিশেষ করে মানসী সোনার তরীর যুগ থেকে তো বটেই) রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি এতই অভিনব মনে হয়েছে যে পাঠকসমাজের খুব বড় একটা অংশ এর মর্ম গ্রহণ করতে পারে নি। রসগ্রহণে অক্ষমতা ক্রমে বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে। এক শ্রেণীর রুচিবাগীশ পাঠক আবার এর মধ্যে দেহবাদের গন্ধ পেয়ে নিন্দায় মুখর হয়েছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক হয়েও স্বাদেশিকতার মধ্যে যে একটা স্থূলতা এবং বৈরী মনোভাব আছে রবীন্দ্রনাথ সেটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারেন নি। এজন্য রাজনীতি থেকে তাঁকে দূরে সরে আসতে হয়েছে, কোনো কোনো মতবাদ এবং কার্যক্রমকে কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করেছেন। এরও ফলে যথেষ্ট বিরূপতা এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনীতি সর্বক্ষণ জনপ্রিতার মুখাপেক্ষী। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। জনপ্রিয়তার খাতিরে নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে

তিনি কখনো বিচ্যুত হন নি। বারে বারে এর মূল্য দিতে হয়েছে অযথা নিন্দা অপবাদে। বোধ করি অযথা নয়, 'পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা' আদর্শবাদী মানুষের ন্যায্য পাওনা। সে মানুষকে উদ্দেশ করে নিজেই বলেছেন— 'নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ / ওই তোর রুদ্রের প্রসাদ।' শেষ জীবনে নিজের অভিজ্ঞতার কথা আরেকবার স্মরণ করেছেন, 'নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে।' সাহিত্যক্ষেত্রে জীবনের আদ্য এবং মধ্য পর্বে যে বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন নোবেল প্রাইজের জয়নিনাদে সে বিরুদ্ধ কণ্ঠ নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষাটের কোঠার মাঝামাঝিতে এসে আর-একবার বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। এবারকার আক্রমণ নব্য লেখক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। যৌবনগর্বে গর্বিত নবীনের দল রবীন্দ্রনাথকে প্রবীণ আখ্যা দিয়ে জাতে ঠেলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি এখন আর কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছেন না, তিনি সেকেলে, এই ছিল তাঁদের অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথের আর যে দোষই থাক্, তিনি কালের সঙ্গে চলতে অক্ষম এমন আকাল তাঁর কাব্যে সাহিত্যে কোনো কালেই দেখা দেয় নি। সাহিত্যে মাঝে মাঝে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার কিছু বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কিছু বা প্রকাশভঙ্গির। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আপন যুগকে অতিক্রম করে যুগান্তরে প্রসারিত ছিল। তিনি কালের সঙ্গে চলতে অক্ষম ছিলেন এমন কথা কেউ সজ্ঞানে বিশ্বাস করবে না। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে প্রকাশভঙ্গিতে কোনো চমকপ্রদ পরিবর্তন তাঁর কাব্যে সাহিত্যে দেখা যায় না। ভাবে এবং ভঙ্গিতে তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তনই দেখা গিয়াছে তা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়েছে। অকস্মাৎ বাঁক ঘুরে কোনো বিপ্লবাত্মক পথ তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রকাশভঙ্গি জিনিসটা কাব্যসাহিত্যের প্রসাধনের অঙ্গ। সেখানে পটুত্ব বা কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু ইদানীংকালে একে যতখানি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে ততখানি এর প্রাপ্য কিনা সে কথাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে। বলা বাহুল্য এ আলোচনার প্রশস্ত স্থান এখানে নেই। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যাঁদের মুখে সেদিন রবীন্দ্রবিরোধী উক্তি উচ্চারিত হয়েছিল তাঁরাও তখন ঠিক মোহমুক্ত ছিলেন না। স্কাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যিকরা তৎকালে তাঁদের গুরুপদে আসীন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, এখন কোথায় সেই স্কাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যসম্রাটের দল। প্রায় সকলেই সিংহাসনচ্যুত। একান্তভাবে সমকালের নৈবেদ্য সাজাতে গেলে নগদ পাওনাটা জোটে আশাতিরিক্ত, কিন্তু আখেরে ঠকতে হয়। নিজ কালের নানা সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতখানি ভেবেছেন এবং লিখেছেন এখন এ কালের আর কোনো লেখক নন, অথচ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি একান্তভাবে বর্তমানের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল এমন কথা কেউ বলবে না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান— তিনের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, মোহ ছিল না। বর্তমানকে দেখেছেন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, সমসাময়িক জীবনের নানা বিকৃতি সত্ত্বেও খুব একটা বিচলিত হন নি—

> অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
> দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
> চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
> উপহাস করি নাই কভু।

'সভ্যতার সংকট'এ যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে সেটা সাময়িক। মানুষের শুভবুদ্ধির উপরে আস্থা রেখে নিরুদ্বিগ্ন মনে অনাগত ভবিষ্যৎকে স্বাগত জানিয়েছেন। কতকটা পরিহাসের সুরে হলেও অমিট্ রায়ের

মুখ দিয়ে বলেছিলেন, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ— এঁরা স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা আর শিব হলেন একেবারে ওরিজিন্যাল। কথাটা ফ্যালনা নয়। দেবাদিদেব মহাদেব মহাকালের দেবতা। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কোনো সীমাবদ্ধ কালের দ্বারা তিনি বিচলিত নন। যা ওরিজিন্যাল তা শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের। ভবিষ্যতেও তার কিছু relevance থাকে। মহাকবিরা মহাদেবের মতোই ওরিজিন্যাল— এই অর্থে যে সাময়িকতার দ্বারা তাঁদের সীমা নির্দিষ্ট নয়।

নোবেল প্রাইজের পরে মোটামুটি ধরা যেতে পারে পনেরো বৎসর কাল দেশেবিদেশে তিনি খ্যাতির চরম শিখরে পৌছে ছিলেন। সে খ্যাতি এতই বড় যে পৃথিবীর যে কোনো শক্তিমান পুরুষেরও তিনি ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিদেশে ক্রমে তাঁর কবিখ্যাতিকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর বিশ্ব-শান্তি সংস্থাপকের ভূমিকা। বিশ্বনাগরিকের ভূমিকায় বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। ইয়ুরোপের যুদ্ধপ্রস্তুতিকে, শক্তিমত্ত জাতিসমূহের উগ্র জাতীয়তাবাদকে ধিক্কার দিয়েছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে যে, গণজাগরণ দেখা দিয়েছে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আবার কোনো কোনো বিষয়ে গান্ধীজীর কর্মপন্থার বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। এই নিয়ে ঘরে-বাইরে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম দেশেরও মন পান নি, নিজ দেশেরও নয়। পশ্চিম বরাবরই তাঁকে নিরাশ করেছে। ভারতবর্ষও একদিক থেকে জড়ভরত কিন্তু এখনও কিছু কিছু মূল্যবোধ সে বজায় রেখেছে। এজন্যে ভারতবর্ষের প্রতি তিনি তাঁর আস্থা বজায় রেখেছেন। বরাবর বলেছেন, আজকের পৃথিবীতে ভারতবর্ষের অনেক-কিছু দেবার আছে। অবশ্য সব চাইতে বেশি আস্থা রেখেছেন নিজ দৃঢ় প্রত্যয়ের উপরে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও সর্বমানবের ঐক্যসাধনচেষ্টায় নিবৃত্ত হন নি। এ যুগের মূল ব্যাধিটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। জাতীয়তাবোধ মানবপরিবারের আত্মীয়তা-বোধকে বিনষ্ট করেছে। স্বদেশপ্রেমের গর্বে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে।

রাজনীতি ব্যাপারটা যদিচ বিজ্ঞানের অন্তর্গত তথাপি দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে খুব একটা মিল হয় নি। এ যুগের রাজনীতি অনেকাংশে অবৈজ্ঞানিক। আধুনিক বিজ্ঞান এক দেশকে অন্য দেশের কাছে এনে দিয়েছিল, রাজনীতি নিকটকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান যে মৈত্রীসূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিল রাজনীতির ভেদবুদ্ধি সেই ঐক্যসূত্রটিকে ছিন্ন করেছে। প্রথম-মহাযুদ্ধের পরে ইয়ুরোপের বহু দেশে তিনি রাজসরকারের আমন্ত্রণে ভ্রমণে গিয়েছেন কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা তাঁকে নিরাশ করেছেন। এমন প্রলয়কাণ্ডের পরেও রাষ্ট্রপ্রধানদের চিন্তায় এবং কার্যে তিনি কোনো প্রকার বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করেন নি। শান্তি পর্বেও তাঁরা শক্তি-চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শক্তি-সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে এঁদের ঔদাসীন্য তাঁর কাছে আসন্ন দুর্যোগের নিশ্চিত লক্ষণ বলে মনে হয়েছে। আর-একটি মহাযুদ্ধ যে অনিবার্য সে সত্য তাঁর কাছে জাজ্বল্যমান হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অভীষ্ট থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন নি। শক্তি জুগিয়েছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়। দেশে ফিরে এসে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য নিজ মুখেই বর্ণনা করেছেন— 'পশ্চিম ভূভাগ কামান-বন্দুকের আয়োজন করুক— যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা।...অন্ততঃ একটি জায়গা থেকে ভূগোল

বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণরূপে মুছে যাক্‌— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক। আমাদের জন্যে একটি মাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে সে হচ্ছে মানুষ।'

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন— Wars are born in the minds of men— রাষ্ট্রসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষার নবায়নে মানুষের মনকে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে গড়তে পারলে তবেই জাতিবিদ্বেষ এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত হবে। কেউ ভেবে দেখেছেন কি না জানি না বিশ্বশান্তি-কামনায় তাঁর ঐ একক প্রয়াসের মধ্যে একটি epic grandeur আছে। বলেছিলেন, 'মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই যে খর্বতা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই যে পূজা, এই যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও কি একে নিরস্ত করবার প্রয়াস সম্ভব নয়?' মৃত্যুর অনতিপূর্বে যে বলেছিলেন, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন রেখে গেলেন বিশ্বভারতীর মধ্যে অঙ্গীভূত করে। এ কথা সাধে বলেন নি।

পশ্চিম দেশের রাজনৈতিক মহলে যেমন বিরূপতা অর্জন করেছিলেন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির বছর পনেরো পরে দেখা গেল ও দেশের সাহিত্যরসিক মহলে তাঁর কবিখ্যাতিও রাহুগ্রস্ত হয়েছে। এটাও কিছুই অস্বাভাবিক নয়। মহাযুদ্ধের পরের অধ্যায় মহাপ্রস্থান। বহু ধ্যানধারণার অবসান ঘটেছে, বহু প্রত্যয় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই একমাত্র casualty নন। সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগ এবং তারও পরবর্তী বহু সাহিত্যরথী মহাপ্রস্থানের পথে ভূপাতিত হয়েছেন; যুদ্ধ-পরবর্তী জেনেরেশনের কাছে এঁদের কণ্ঠস্বর এক বহু দূর জগতের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধের পরে কবিকণ্ঠে শান্তির ললিতবাণী শুনতে তারা প্রস্তুত ছিল না, কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক শুশ্রূষারও প্রয়োজন বোধ করে নি।

অনেক রবীন্দ্রভক্তকে এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি, যদিচ ক্ষোভের কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর কাব্যে পালা বা ঋতু-বদলের কথা বলেছেন পাঠক-সমাজের রুচিতেও তেমনি ঋতুবদল ঘটে থাকে। এক যুগের পছন্দ অন্য যুগে টেকে না। কোনো দেশেরই কোনো কবি সর্ব যুগে সমভাবে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভোগ করেন নি। তবে প্রকৃতির রাজ্যে ঋতু যেমন ঘুরে ঘুরে আসে, সাহিত্যসংসারেও পছন্দ অপছন্দ শীত গ্রীষ্মের মতই ঘুরে ঘুরে আসে। মহৎ কবি শিল্পী কোনো কালেই সম্পূর্ণরূপে বর্জিত বা পরিত্যক্ত হন না। সাহিত্যে রুচিপরিবর্তন ঋতু-পরিবর্তনের সামিল। শুধু বিদেশে কেন স্বদেশেও রবীন্দ্রনাথ এখন পূর্বগৌরবে অধিষ্ঠিত নন। ইদানীং দেখেছি দু-একজন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথ যে সেকেলে নন, এ কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কবিকে সর্বাগ্রে স্বধর্মনিষ্ঠ হতে হয়। শেষ পর্বের কাব্যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে যদি আধুনিকতার চর্চা করে থাকেন তাহলে বলতে হবে সে কাব্য কতক পরিমাণে অরাবীন্দ্রিক। তেমন দুর্দৈব ঘটেছে বলে আমি মনে করি না। আজন্মলালিত ধ্যানধারণার ব্যাপারে emphasis-এর ইতরবিশেষ হয়েছে, এইটুকুই আধুনিকতা। প্রকাশভঙ্গিতেও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় নি। আধুনিক কাব্যের ফ্যাশন-দুরস্ত ward-robe (word-robeও বলা যেতে পারে) তিনি ব্যবহার করেন নি।

৪

আধুনিক সাহিত্যের প্রধান যেসব লক্ষণ— প্রচলিত ধ্যানধারণার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, জীবন অর্থহীন— পদে পদে অসংগতি এবং অনিশ্চয়তার দ্বারা বিড়ম্বিত— নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণ এবং অশুভের অস্তিত্ব, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস— original sin থেকে উদ্ভূত ধারণা— মানুষ মূলতঃ পাপবিদ্ধ এবং স্বভাবতঃ পাপবুদ্ধি— এসব উদ্বেগ, আশঙ্কা থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য একপ্রকার মুক্তই বলা যেতে পারে। উক্ত লক্ষণাদিজনিত কোনো প্রকার মর্মান্তিক যন্ত্রণাবোধ তাঁর কাব্যকে বিরক্ত বিষাক্ত বিক্ষুব্ধ করে নি। আজন্ম যেসব আদর্শকে লালন করে এসেছেন, যে মূল্যবোধের উপরে তাঁর জীবন-দর্শন গঠিত, যেসব বিশ্বাসকে জীবনের প্রধান আশ্বাস বলে জেনেছেন আজ যে তা অবহেলিত এবং প্রত্যাখ্যাত স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। মনে ক্লেশ পেয়েছেন, মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে, নানা সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে। কাব্যে সে সংশয়ের ছায়া পড়েছে কিন্তু সে ছায়ামাত্র, কায়া লাভ করে নি। তাঁর জীবনদর্শনে বড় রকমের কোনো ভাঙচুর ঘটে নি। জীবনে অসংগতি আছে, অপূর্ণতা আছে, নানা রকমের বিকৃতি আছে ; কিন্তু ঐ সমস্ত নিয়েই জীবনের পূর্ণ পরিচয় নয়। অসংগতির মধ্যে সংগতি, অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ইঙ্গিত যিনি পেয়েছেন তিনি সহজে বিচলিত হন না। রবীন্দ্রনাথের মূল প্রত্যয়ের মধ্যে সেই অবিচল দৃঢ়তা ছিল। অশান্তি উদ্বেগের সামান্যতম আঘাতে আমরা বিচলিত হই, কবি তত সহজে বিচলিত হন না। উদ্বেলিত জীবনপ্রবাহের তলায় যে প্রশান্তি বিরাজমান কবির মন তার সন্ধান রাখে। সমাজ-জীবন অনেকটা যেন একটা বৃহৎ ব্যাপারের আন্দোলনে ব্যস্ত সমস্ত গৃহস্থ বাড়ি। মনে করা যেতে পারে বিয়েবাড়িতে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি ভিড়, তারই মধ্যে যখন সানাই বেজে ওঠে—

> সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
> সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
> কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান—

সানাই কাব্যে 'সানাই' নামক কবিতা দ্রষ্টব্য। মর্তলোকের ছন্দভাঙা অসংগতির মধ্যেও যে একটি ঐক্যের সুর আছে, ছন্দ আছে— এ কথা রবীন্দ্রনাথ কোনো কালে অস্বীকার করেন নি। মৃত্যুর মাত্র দেড় বৎসর পূর্বে এ কবিতা রচিত। এ জাতীয় কবিতার সংখ্যা কিছু কম নয়। জীবনের আদ্য মধ্য পর্বে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশা পোষণ করেছেন অন্য পর্বেও সে আশা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

এর মানে এই নয় যে জীবনভর এক কথাই বলেছেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই পরিবর্তন হয় নি। অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু তাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা চলে না। তাঁর মূল প্রত্যয়ের কোনোটিই সমূলে উৎপাটিত হয় নি। আগেই বলেছি emphasis-এর ইতরবিশেষ হয়েছে। শেষ পর্বের কাব্যে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়— মনে একটি দুঃখের দাহ বর্তমান, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে মোহ-ভঙ্গের দুঃখ। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মানুষের অবমাননা, শক্তির আস্ফালন, পশুশক্তির জয়, মানবিক ধর্মের ক্ষয় আজন্মলালিত বিশ্বাসের ভিত বেশ খানিকটা নেড়ে দিয়েছে। বারম্বার বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাব না, কিন্তু সে বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠছিল। এটিই দুঃখের প্রধান কারণ। আবার, মানুষের উপরে যেমন বিশ্বাস বিধাতার উপরেও তেমনি আজন্ম বিশ্বাস। বহুকাল মনে

এই আশ্বাস পোষণ করে এসেছিলেন যে মানুষের শুভবুদ্ধিই তাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে : মঙ্গলময় বিধাতার প্রতি আস্থা সে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছিল। সে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে— 'ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস'— এটা হতাশার কথা নয়, বেদনার কথা। মানুষ সম্বন্ধে কোনোকালেই পুরোপুরি হাল ছাড়েন নি। অপর পক্ষে বিধাতা সম্পর্কে উচ্চবাচ্য ক্রমেই কমে এসেছে। মধ্য পর্বের তুলনায় লক্ষণীয় ভাবে কম বলতে হবে। তাই বলে বিধাতার প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল এমন মনে করবার কোনোই কারণ নেই। কোনো কোনো মহলে এরূপ একটা ধারণা প্রসার লাভ করছে বলেই এ কথার উল্লেখ করতে হল। মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণাগুলি এত দৃঢ়মূল যে কোনো প্রকার আকস্মিকতার আঘাতে তা বিনষ্ট হতে পারে কিম্বা সাময়িকতার ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যেতে পারে এরূপ ভাবা খুব স্বাভাবিক নয়। ধর্মে অরুচি এবং ভগবানে অনাস্থা আধুনিকতার একটা লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার জন্যে কোনো কোনো রবীন্দ্রভক্ত ঐ অবস্থা তাঁর উপর আরোপ করবার চেষ্টা করছেন। এমনও বলবার চেষ্টা হয়েছে যে শেষ পর্বে এসে জীবন সম্বন্ধে তিনি এরূপ নির্মোহ হয়েছিলেন যে existentialistদের মতো তিনিও জীবনকে সম্পূর্ণ সংগতিহীন এবং অর্থহীন জ্ঞান করেছেন। Encounter with nothingness ইত্যাদি বাঁধা বুলিও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। নিজস্ব কোনো pet theoryর সাহায্যে কোনো মহৎ সৃষ্টিকে যাচাই করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ হিসাবেই দেখতে হবে। কিন্তু ওসব কথা মেনে নিলে রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ থাকেন না। এর মধ্যে সত্যের অংশ এইটুকু যে, শেষ পর্বে জীবন সম্বন্ধে যতখানি জেনেছেন বলেছেন জীবনবিধাতা সম্পর্কে ততখানি বলেন নি। তাতে প্রমাণিত হয় না যে তিনি বিধাতাকে বর্জন করেছেন। ভগবৎবিশ্বাসে খুব যে একটা ভাঙচুর ঘটে নি তার প্রমাণ 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি মৃত্যুর মাত্র দু বৎসর পূর্বে (৩.১২.৩৯) লেখা। 'ভাষাও তরণী হে কর্ণধার' ব'লে যাঁর হাতে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করেছেন তিনি কে? এরও পরে ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে লেখা —'আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে' 'নিরাশার নিশা' যাদের ঘিরে রেখেছে, আঁধারের আবরণে যারা ধ্রুবতারাকে খুঁজছে তাদের আলোকের পথ দেখাবার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন কোন্ 'প্রভু'র কাছে? এইটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে রাজনৈতিক জীবনে যেমন দেশবাসীকে আবেদন-নিবেদনের পালা চুকিয়ে দিয়ে স্ব-নির্ভর হতে বলেছিলেন ধর্মজীবনেও শেষটায় বিধাতার কাছে আবেদন-নিবেদনের প্রয়োজন, তেমন আর বোধ করেন নি। তাঁর ভগবানকে তিনি কখনোই ত্যাগ করেন নি, তবে তাঁকে আর আলাদা করে খুঁজতে যান নি। মানুষের মধ্যেই তাঁকে পেয়েছেন। মানুষের মধ্যেই ভগবানের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন। 'আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন।"

কবিমানুষের কাছে কবিধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। তাঁর জীবনে অধ্যাত্মচেতনা কতখানি, প্রচলিত কোনো ধর্মমতে কতখানি তাঁর বিশ্বাস— এসব প্রশ্ন খুব জরুরি নয়। এ কথা সত্য যে জীবনের বিশেষ এক পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে ভক্তিরসাপ্লুত ভাবের যে প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল ক্রমে সেটি কমে এসেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি কোনো কালেই কোনো প্রকার ritualistic ধর্মমতের অনুবর্তী ছিলেন না। শান্তিনিকেতন-জীবনে তিনি যেসব ritual বা অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন সেসব

কোনো বিশেষ ধর্মের অঙ্গ নয়, বলা যেতে পারে তাঁর শিল্পজীবনের অঙ্গ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে কবিমানুষের পক্ষে পূজার্চনা-অনুষ্ঠানাদির জন্য দেবমন্দিরের প্রয়োজন হয় না। সৌন্দর্যসাধনা তাঁর ধর্মসাধনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ তাঁর মননধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। তাকে আলাদা করে দেখবার প্রয়োজনেই হয় না। কবি জীবনের প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত তিনি অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে একই ধর্ম পালন করে এসেছেন। সে ধর্মের সার কথাটি বলেছেন 'পত্রপুট'-এর পনেরো সংখ্যক কবিতাটিতে— 'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে / সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ / আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।' বারম্বার বলেছেন, 'আমার সে ভালোবাসা সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে।' কবিধর্মই শেষ পর্যন্ত মানুষের ধর্মে পরিণত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষ আর মর্তলোকের সাধারণ মানুষ এক হয়ে গিয়েছে।

মোটামুটি এ কথা অবশ্যই বলা চলে যে, জীবনে ষাটের কোঠা অবধি একটি মরমিয়া সাধনার ধারা তাঁর কাব্যে প্রায় অব্যাহত ভাবেই চলেছে। সে সাধনার কেন্দ্রে আছেন এক মঙ্গলময় বিধাতা। অবশ্য মঙ্গলময়ের রুদ্ররূপও তাঁর অজানা ছিল না। বহু দুঃখ-আঘাতের মধ্য দিয়ে রুদ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎপরিচয় ঘটেছে, কিন্তু তাঁরও দক্ষিণ মুখের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি। তাঁকে নিষ্ঠুর বলে সম্বোধন করেছেন কিন্তু তাও বলেছেন প্রেমিকের কণ্ঠে— 'এই করেছ ভালো নিঠুর'। আবার রুদ্রকেও দেখেছেন প্রেমিক রূপে— 'ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে / তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা।'

অন্ত্যপর্বে মঙ্গলময় বিধাতা অন্তর্ধান করেছেন এমন নয়; তবে তিনি ধ্যানলোকে যতখানি কাব্যলোকে ততখানি নেই। বিধাতা সম্পর্কে পৌনঃপুনিকতার অবসান ঘটেছে, এ কথা মানতেই হবে। বিশ্ববিধাতার চাইতে বিশ্বমানব এবং বিশ্বপ্রকৃতি বৃহত্তর স্থান অধিকার করেছে। পার্থিব জীবনে যে অসংগতি অসম্পূর্ণতা আছে তা দূর করবার ভার কোনো সর্বশক্তিমান কিম্বা কোনো পরমকারুণিক বিধাতার হাতে নয়, মানুষেরই হাতে, এ বিশ্বাস এবং আশ্বাস বারম্বার প্রকাশ করেছেন।

৫

অন্ত্যপর্বের কাব্য যাকে বলছি তা মোটামুটি জীবনের শেষ দশকের কাব্য। 'পরিশেষ' কাব্য থেকে তার শুরু বলা যেতে পারে। গীতাঞ্জলি পর্বের পরে বলাকায় নতুন সুর বেজেছিল। 'পূরবী' 'মহুয়া'র পরে 'পরিশেষ'এ এসে আবার নতুনের সূচনা হয়েছে। এটিকে ঐ নবজাতকের জন্মপত্রিকা বলা যেতে পারে; কারণ অন্ত্যকাব্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনেকখানি এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন 'এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মনন-জাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' — নবজাতক-এর ভূমিকা। এটা ঠিক যে, পরিণত মনে সহজ প্রাপ্যের নেশা কেটে যায়, সমস্যাসরলীকরণের প্রয়াস দূর হয়। এখন দেখতে হবে মনন-জাত অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না কিম্বা প্রকাশভঙ্গির।

ধ্যানধারণার পরিবর্তন কতটা কি হয়েছে না-হয়েছে তার আগে দেখে নেওয়া যাক ধরণধারণের

পরিবর্তন কিছু হয়েছে কি না। এ দিক থেকে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য গদ্যছন্দের ব্যবহার। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদে যখন গদ্যরীতির ব্যবহার করেছিলেন তখনই দেখেছেন যে ছন্দের বাঁধন আলগা করে দিলেও খাঁটি কবিতা তার কবিত্ব হারায় না। কুড়ি বছর পরে বাংলা কাব্যে সে পরীক্ষায় হাত দিলেন। এর আগে 'লিপিকা'য় (১৯২২-২৩) এর প্রথম পরীক্ষা। তখন সাহস করে একে কবিতা বলেন নি; বললে কিছু দোষের হত না। কবিতা জিনিসটার একমাত্র পরিচয় তার কাব্যগুণ— পদ্যে লেখা কি গদ্যে লেখা সে প্রশ্ন অবান্তর। কাব্যগুণে গুণান্বিত যে কোনো রচনাই কাব্য। পুনশ্চ কাব্যের বাঁশি শেষচিঠি সাধারণ মেয়ে প্রভৃতি রচনা যদি কবিতা না হয় তাহলে কবিতা কাকে বলে জানি না। শেষ পর্বের অন্যান্য গ্রন্থেও এমন আরো অনেক কবিতা আছে। এ জাতীয় কবিতাকে যে পদ্য-কবিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটাও এর প্রতি একটা অবিচার। কবিতা শুধু কবিতাই, আর কিছু নয়। যে জিনিস নিজগুণে বিশিষ্ট তার সম্পর্কে যে-কোনো বিশেষণ প্রয়োগই অপপ্রয়োগ।

লিপিকার পরে গদ্যছন্দের প্রথম ব্যবহার পরিশেষ কাব্যে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূরবীর দীর্ঘায়িত ছত্রে লেখা প্রথম কবিতাটিতে মনে হয় একটু যেন গদ্যের ঝোঁক এসে গিয়েছে— 'যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো' ইত্যাদি। পরিশেষ কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতাই ছন্দোবদ্ধ পদ্যে লেখা, কিন্তু কিছু-কিছু কবিতা আছে মিল-দেওয়া পদ্য হলেও যেখানে ছন্দকে এমন আলগোছে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাতে ছন্দের চাইতে সাচ্ছন্দ্য অধিকতর লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত—

আমি তো সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি।

কিম্বা—

আমরা খেলা খেলেছিলেম
আমরাও গান গেয়েছি।
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
আমরা তরী বেয়েছি।

একে বলি বাক্যালাপের ছন্দ। এর থেকেই ক্রমে গদ্যিকা রীতিতে সম্পূর্ণ মুক্তছন্দের উদ্ভব হয়েছে। পরিশেষ কাব্যে গদ্যছন্দে লেখা কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। একটি কবিতার নাম 'আগন্তুক'। বিগত যুগের কবি হিসাবে আধুনিকের আসরে কবি নিজেকে আগন্তুক আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষ করবার বিষয় যে কবিতার গদ্যছন্দটিও আগন্তুকের মতো সসংকোচে সেখানে প্রবেশ করেছে। পুনশ্চ কাব্যে এর অকুণ্ঠ প্রকাশ। গদ্যছন্দ জিনিসটা কি সেটা কবির ভাষাতে বলাই ভালো। পুনশ্চ'র প্রথম কবিতাটিতে শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশী কোপাই নদীর কথা। বলেছেন— 'জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে / রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।' এই যে স্থলে জলে মেশামেশি—এরই নাম গদ্যছন্দ। 'ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে / যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।'

গদ্যরীতির ব্যবহারের সঙ্গে স্বভাবতই কাব্যালংকার খানিকটা কমে এসেছে। পদ্যের নিজস্ব একটা ভড়ং আছে, ঠাটঠমকের দিকে তার অতিরিক্ত নজর। গদ্যের সে বালাই নেই, ওর স্বভাবটা সহজ

সরল। দোষের মধ্যে ও লঘুপদে চলতে জানে না, চালটা একটু ভারিক্কী গোছের। তার উপরে নিত্যদিনের কাজকর্মের ধাঁধায় থাকে বলে স্বভাবটা একটু কাঠখোট্টাও বটে। কাব্যের প্রয়োজনে তাকে বাগ মানাতে যথেষ্ট কৌশলের প্রয়োজন। কবি সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। ভয় ছিল, 'প্রকাশের ব্যগ্রতায় পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে। সাজগোজটা একটু যেখানে বেশি হয়েছে সেখানে কাব্য বিড়ম্বিত হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

গদ্যিকা রীতির ব্যবহারে খানিকটা নতুনত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে খুব একটা নতুনত্ব নেই। 'তরে' 'সনে' 'মোর' ইত্যাদি প্রচলিত poetic diction-এর বর্জন ছাড়া ভাষারীতির খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। ভাষার লালিত্য এবং মসৃণতা পূর্ববৎ। আধুনিক কাব্যের সঙ্গে বৈলক্ষণ্য সহজেই লক্ষণীয়। আধুনিক কাব্য পায়ে পায়ে এগোয় না, চলে উল্লম্ফনে। কথার মাঝখানে ফাঁক থেকে যায়, পাঠক নিজের মনে পাদপূরণ করে নেয়। ইংরেজিতে যাকে বলে reading between the lines, আধুনিক কাব্যের স্বাদ পেতে হলে তার প্রয়োজন আছে। আবার কথার ঝোঁকটা এক ধারা নাক-বরাবর চলে না। সিনেমায় যেমন flash back থাকে তেমনি মনটাকে হঠাৎ ঘুরিয়ে অতীতের কোনো ঘটনা কিম্বা কোনো মহাজনের সুপরিচিত উক্তির সঙ্গে যুক্ত করে বক্তব্যের ব্যঞ্জনাকে স্ফুটতর করবার চেষ্টা করা হয়। প্রকাশভঙ্গিতে প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষের প্রাধান্য। এই কারণে অনেক সময় প্রতীকের সাহায্যে অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ। নৃত্যশিল্পে যেমন বিবিধ মুদ্রার ব্যবহার তেমনি আধুনিক কাব্যের এসব হল মুদ্রা। সুষ্ঠু প্রয়োগ হল উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যের পরিপোষক, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হলে মুদ্রাও মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। ইংরেজিতে একে বলে stylization। এ জিনিস অল্পদিনেই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। এই কারণে পশ্চিম দেশে ইতিমধ্যেই এলিয়ট-বিমুখতা দেখা দিয়েছে। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রকাব্যে এসব মুদ্রার প্রয়োগ নেই। অপ্রত্যাশিত চমকের অভাবে আধুনিক কাব্য পাঠে অভ্যস্ত একেলে পাঠকের কাছে রবীন্দ্রকাব্য অতিমাত্রায় সুবোধ এবং সুশীল বলে মনে হয়। Image-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। অবশ্য কবি মাত্রেই ভাষার চিত্রকর, এইজন্যে সকল কবিই অল্পাধিক পরিমাণে ঐ গুণের অধিকারী। কিন্তু ইদানীংকালের বহু বিজ্ঞাপিত symbolএর ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ বড়-একটা করেন নি। প্রতীক জিনিসটাতে তাঁর খুব একটা আস্থা ছিল না। 'প্রতীক বলে, পাঁচ সিকের পুজো দিয়েই ফল পাওয়া যায়।' স্পন্দন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও প্রতীকের প্রতি তাঁর মনোভাব এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যরীতিতেও প্রতীকের ব্যবহার পাঁচ সিকের পুজোর মতো সস্তায় ফল লাভের চেষ্টা।

এমন কবিতা কিছু-কিছু আছে যেখানে কাব্যধর্মের সঙ্গে গদ্যরীতি ঠিক খাপ খায় নি। অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ হলেই অধিকতর মানানসই হত। আবার কিছু কবিতা আছে, গদ্যছন্দে লেখা হলেও ভাষাটা অতিমাত্রায় গদগদ। গদ্যের স্বভাবের মধ্যে একটি কঠোরের সাধনা আছে। শীতের বর্ণনায় যে কথাটি বলেছেন— 'সইবে না সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা— তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুমকো লতা— গদ্যিকা রীতির কাব্যে সেই কথাটি মনে রাখলে ভালো হত বিশেষ করে কাব্যে ঋতু-পরিবর্তনের কথা যখন তিনি নিজেই বলেছেন। তবে এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে বহুতর কবিতার মধ্যেই তিনি সহজের সঙ্গে কঠিনকে এবং গভীরকে মিলাতে পেরেছেন। গদ্যের সংগতি রেখে কাব্যের প্রসাদগুণ ফুটিয়ে তুলেছেন।

এর ফলে যে কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে 'চিরকালের স্তব্ধতা আছে আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।'

এই স্তব্ধতা কথাটি প্রণিধানযোগ্য। নিস্তব্ধ নিঝুম দ্বিপ্রহরে একলা বসে থাকলে যেমন একটা মন-কেমন-করা ভাব মনে আসে এইসব কবিতায়, বিশেষ করে 'পুনশ্চ' এবং 'শেষ সপ্তক'এর কবিতায়, সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের একটি ভাব আছে। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে কবি নিঝুম দুপুর বেলায় বসে এসব কবিতা লিখেছেন। যে মনটা এখানে কাজ করছে তার পরিচয় আছে 'পুনশ্চ'র 'ফাঁক' নামক কবিতায়। বয়স কালে জীবনটা থাকে ঠাসবুনানি, সেটা নিশ্ছিদ্র, তাতে কোথাও কোনো ফাঁক নেই। এখন যে বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে খানিকটা অবকাশভূমি রচিত হয়েছে; তারই ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছে, চোখে পড়ছে, মনে ধরছে ভেসে-আসা অতীত দিনের কোনো স্মৃতি কিম্বা চলতি মুহূর্তের কোনো টুকরো ছবি। 'জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে / পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।' কিম্বা 'মন বলে এই আমার যত দেখার টুকরো / চাই নে হারাতে।' কোথাও-বা অতীতের স্মৃতি বিজড়নে কোনো বর্তমান আর্দ্র মুহূর্তের চিত্র— 'জানি নে কেন মনে হয় / এই দিন দূরকালের আর কোন-একটা দিনের মতো।' পুনশ্চ কাব্যের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস হল এর কয়েকটি narrative poems। প্রত্যেকটি একটি নিটোল গল্প এবং অধিকাংশই খাঁটি ট্র্যাজেডি। ভাষার স্তব্ধতার কথা আগে বলেছি। শুধু ভাষায় নয়, এসব কাহিনীর মধ্যে একটি কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। স্বল্পতম কথায় গভীরতম ট্র্যাজেডির প্রকাশ হিসাবে এ কবিতাগুচ্ছ অনন্য।

'পুনশ্চ'র মতো 'শ্যামলী'রও প্রধান সম্পদ তার narrative কবিতাগুচ্ছ। এ কবিতাগুলিতেও একটি ট্র্যাজেডির সুর অনতিপ্রচ্ছন্ন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত অর্থে কোনো ট্র্যাজেডি লেখেন নি। কিন্তু তাঁর শেষ পর্বের কাব্যে মানব-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বেদনাটি একটি চলন্ত ছবির মতো তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই বেদনার ইতিহাস আর-একবার ধরা পড়েছিল গল্পগুচ্ছের গল্পে। পাশ্চাত্য ইস্কুলে শিক্ষিত আমাদের মন ঘটনাচক্রে সংঘটিত কোনো বিষম বিপর্যয়কেই ট্র্যাজেডি বলে অভিহিত করতে শিখেছে। দশচক্রে কিম্বা ঘটনাচক্রে মানুষ যখন ভূত বনে যায় তখনই আমরা তাকে বলি ট্র্যাজেডি। সে ব্যাপারটা ঘটে একটা আকস্মিক explosionএর মতো। খুব ভয়ংকর রকমের কিছু না ঘটলে আমরা তাকে ট্র্যাজেডি বলে চিনতে পারি নে। কিন্তু যে দুঃখ জীবধর্মের, বলা যেতে পারে জন্মগত inheritance— শোক তাপ মৃত্যু বিচ্ছেদ যা অবশ্যম্ভাবী এবং তারও চাইতে বড় জীবনের নিত্য ছলনা— আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, স্নেহের অধিকারে বঞ্চনা, প্রেমের অবমাননা, বন্ধুত্বের অমর্যাদা, আদর্শের অপমৃত্যু— মনুষ্যজীবনের একেই বলা যেতে পারে সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি। গল্পগুচ্ছের ছোটগল্প, শেষদিকের বড়গল্প মালঞ্চ, চার অধ্যায় (যোগাযোগ উপন্যাসটিও ট্র্যাজেডির অন্তর্গত) এবং অন্ত্য পর্বের কিছু কবিতা মিলিয়ে দেখলে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডির চিত্র পাওয়া যাবে।

ট্র্যাজেডিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি ভাবে দেখেছেন সে সম্পর্কে আরো দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। ট্র্যাজেডি খণ্ডিত কালের সৃষ্টি। অখণ্ড অনন্ত কাল— আমরা যাকে বলি মহাকাল— তার দৃষ্টিতে ট্র্যাজেডি নেই। সেখানে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ শোকতাপ উত্থানপতন সমস্ত মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সেখানে একটি সামগ্রিক চিত্র।

সেখানে কোনোপ্রকার অঘটন ঘটে না, সমস্তই স্বাভাবিক ঘটনা। কাল যেখানে সীমাবদ্ধ দুঃখের সেখানে সীমা নেই। কাল যেখানে অনন্ত সেখানে শোকদুঃখ সব কিছুরই অন্ত আছে। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে অগণিত মৃত্যু এবং অপরিমেয় দুঃখের তুলনায় ব্যক্তিগত দুঃখের তীব্রতা আপনি কমে আসে। মানুষের দুঃখকে সুদূরপ্রসারী সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত দুঃখে যেমন অবিচলিত থাকতে পেরেছিলেন সমকালীন মানব-ইতিহাসের দুঃখকেও তেমনি কালস্রোতের ক্ষণকালীন বিক্ষোভ হিসাবে দেখেছেন। শেষ পর্বের কাব্যে তিনি যে মননজাত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এটি তারই চূড়ান্ত কথা। এই দুঃখের অনুদ্বিগ্ন মনকে তিনি বলেছেন 'সহমরণের বধূ'—

সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

—শেষ সপ্তক, ২৩নং কবিতা

ট্র্যাজেডির যে শোধনক্রিয়া বা নির্মলীকরণের ক্ষমতা তা এই মননজাত অভিজ্ঞতারই ফল বলতে হবে।

'শেষ সপ্তক'ও গদ্যিকা রীতিতে লেখা কিন্তু 'সপ্তক' কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে গদ্যরীতি হলেও এর মিউজিক সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সজ্ঞান। কবি-বাক্য কখনো unmusical হয় না। পদ্যেই হোক আর গদ্যেই হোক কিছু সুর থাকবেই। শেষ কথাটিও লক্ষণীয়। জীবন শেষ হয়ে এসেছে, এটিই জীবনের শেষ রাগিণী সে ভাবটি সর্বব্যাপী। অন্যান্য কাব্যে বিভিন্ন মুডে বিভিন্ন কবিতা। এর বেশির ভাগ কবিতাই এক সুরে বাঁধা। অধিকাংশ কবিতাই স্বগত উক্তির মতো, যেন আপন মনে কথা বলে যাচ্ছেন। কোনো অতীত মুহূর্তের কিম্বা কোনো বর্তমান মুহূর্তের ফ্রেম্‌এ আঁটা নিজের মনের একটি ছবি। আবার কখনো—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায় সুদূরে ;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।

সীমাহীন অনন্তকালের মধ্যে নিজের সীমাবদ্ধ জীবনের relevance কোথায় সেটির সন্ধান করছেন। জীবদ্দশায় আমরা সীমাবদ্ধ কালকে দেখি বিক্ষুব্ধ, অশান্ত। তারই নিস্তব্ধ কেন্দ্রে মহাকাল বসে আছেন অবিচলিত আনন্দে। মহাকালকে বলেছেন সন্ন্যাসী, বলেছেন,

দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

মনের মধ্যে এই বৈরাগ্যের সাধনাটি ছিল বলে কোনো সাময়িক দুর্বিপাকেই কখনো আত্মহারা হন নি।

কবির মধ্যে সব সময়েই আত্মোপলব্ধির একটি প্রয়াস প্রচ্ছন্ন থাকে। শেষ পর্বের কাব্যে সে প্রয়াস প্রচ্ছন্ন বা গৌণ নয়, মুখ্য এবং সজ্ঞান প্রয়াস এবং এর আরম্ভ 'শেষ সপ্তক'এ নয়, আরম্ভ হয়েছে 'পরিশেষ' কাব্য থেকেই। বিশ্বব্যাপী যে জীবনধারা অবিরাম প্রবাহিত তার সঙ্গে বিশেষ একটি জীবনের কি সম্পর্ক সেই প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায় যতক্ষণ না এই উপলব্ধি জাগে যে প্রত্যেক মানুষই জীবৎকালে দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ আপন সম্পূর্ণ সত্তার একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র। এর আগেও আমি ছিলাম, পরেও থাকব। দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে 'আমার অতীতে সে আমিরে' চিনতে হবে তবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব।

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমি রে,
সর্বত্রগামীরে।

—আমি, পরিশেষ

এই পর্বে এটি তাঁর একটি নিরন্তর জিজ্ঞাসা।

সব মিলিয়ে পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, শ্যামলীতে নিঃসন্দেহে একটি বেদনার সুর বেজেছে। কিন্তু অনতিবিলম্বে আপন স্থৈর্য তিনি ফিরে পেয়েছেন। শেষ সপ্তক-এর পঁয়তাল্লিশ নম্বর কবিতায় বলেছেন—

শেষ কথা বলে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।

এ'ই আসল রবীন্দ্রনাথ— ইংরেজিতে যাকে বলা যায় the essential Rabindranath।

রবীন্দ্রনাথের মনে শক্তির সঞ্চয় ছিল অপরিমেয়। যতক্ষণ নিজের বাইরে কোনো সর্বশক্তিমান বিধাতা-

পুরুষের উপর নির্ভর ততক্ষণই মানুষ দুর্বল। কবি-মানুষের শক্তি নিজের মধ্যেই নিহিত। কবিমনের সহজাত আনন্দবোধ এবং সৌন্দর্যবোধের মধ্যেই ঐ শক্তির উৎস। যে মানুষ জীবনের গভীরে একবার সুন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছে, দৈনন্দিনের দীনতা তাকে খুব একটা বিচলিত করতে পারে না। তা ছাড়া কবির আস্থা বিশ্ববিধাতার উপরে ততখানি নয় যতখানি বিশ্ববিধানের উপরে। সেখানে যে প্রাণলীলা চলছে সেটা সকল সংশয়ের অতীত। শ্যামলীর 'প্রাণের রস' কবিতাটিতে বলেছেন, তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে, আমার মনে দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই। বলেছেন—

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্য দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও,
আমি চোখ মেলে থাকি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিকে প্রাণশক্তির আধাররূপে দেখেছিলেন। যতদিন প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবন্ত ছিল ততদিন তাঁর কাব্য সেখান থেকেই রস সংগ্রহ করেছে, কিন্তু ক্রমে প্রকৃতিকে তিনি একটি তত্ত্বে পরিণত করলেন। তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে রসজ্ঞানের সম্পর্কটা বড় মধুর নয়। তত্ত্বের জালে জড়িয়ে তাঁর কবিতার মাধুর্য ক্রমে কমে এল। রবীন্দ্রনাথের বেলায় সে বিপত্তি ঘটে নি। প্রকৃতির কাছে প্রথম দিনে যা পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত কিছুই তার খোয়া যায় নি। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে'— সে প্রার্থনা মিথ্যা হয় নি। তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে তিনি শেষ পর্যন্ত সজাগ এবং সতেজ রেখেছিলেন। প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শ এমনকি মৃদুতম স্পন্দনটিও তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছে।

৬

পূর্বেই বলেছি যে শেষ পর্বের কাব্যে একটি দুঃখের দাহ বর্তমান। আপাতবিরোধী মনে হলেও বলা প্রয়োজন যে, যে মানুষের প্রতি অশেষ আস্থা স্থাপন করেছেন সে মানুষের অধঃপতনই এই দুঃখের প্রধান কারণ। মানুষ তার প্রধানতম আশ্রয়স্থল; সেই মানবসন্তান মানবতার মর্যাদা রাখছে না, এর চাইতে বড় দুঃখ আর কী হতে পারে। মানুষের হাতে মানুষের অসম্মান 'দুর্বিষহ দুঃখে উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে।' মানুষের নিষ্ঠুরতা নৃশংসতার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় পাতায়, তথাপি মানুষের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু নৃশংসতার চাইতেও ভয়ংকর জিনিস নীচতা ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা। কবির স্পর্শকাতর মনে ক্ষুদ্রতার কদর্যতাই অসহনীয় মনে হয়েছে। 'কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে / দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।' মানুষের অপকর্মের জন্যে বিধাতাকে দায়ী করেন নি। প্রতিকারের জন্যে বিধাতার করুণা ভিক্ষাও করেন নি। মানুষের অপমান মানুষকেই রোধ করতে হবে। মানুষের শুভবুদ্ধির উপরেই শেষ আস্থা রেখেছেন। বিধাতার কাছে সান্ত্বনা ভিক্ষাও করেন নি, শুশ্রূষা লাভ করেছেন প্রকৃতির কাছে। গাছপালা, লতাপাতা, ফুলের রং, ফুলের গন্ধ তাঁর মনের ক্ষতে প্রলেপের কাজ করেছে। মনকে এত সহজে প্রবোধ মানাবার প্রয়াস রোম্যান্টিক মনের facile optimism বলে অনেকে উপহাস করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে সত্যিকারের প্রবোধ

বা সান্ত্বনা লাভ একমাত্র প্রবুদ্ধ চেতনার পক্ষেই সম্ভব। 'অতি বৃহৎ বিশ্ব / অম্লান তার মহিমা / অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি।' সৃষ্টির মূল সূত্রটি প্রকৃতির মধ্যে যখন অবিকৃত—আকাশের নীলে, বাতাসের গতিতে, ফুলের গন্ধে, পাখির গানে লক্ষ কোটি বছরেও কোনো বিকার দেখা দেয় নি—তখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেছেন যে মানুষের এই বিকারও সাময়িক, সেও সেই সূত্রটিকে আবার খুঁজে পাবে। মানুষ নিজে যে জট পাকিয়েছে নিজেই আবার সে জট ছাড়াবে। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের ব্যাপারে এককালে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাকে তিনি নতশিরে মেনে নিয়েছেন। শোক-দুঃখকে ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করতে গেলে সে দুঃখের আর সীমা থাকে না। এখন থেকে নিজের শোক-দুঃখকে তিনি দেখেছেন বিশ্বের সীমাহীন দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ্বের পুঞ্জীভূত দুঃখের তুলনায় তাঁর নিজস্ব শোক-দুঃখ তুচ্ছ —'তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না / আমার ক্ষতি আমার ব্যথা / তার সমুখে কণার কণা।'—বিশ্বশোক, পুনশ্চ।

এখানে বলা প্রয়োজন যে আধুনিক কাব্যের মর্মমূলেও বর্তমান হৃতশ্রী জীবনের মর্মবেদনা। মানুষের এত আয়োজন সমস্তই যেন একটি শর্ট সার্কিটের ফলে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে। জীবনের ঐ ভগ্ন-দশাটাকে অতিমাত্রায় বড় করে দেখছে বলে আধুনিক কাব্যের মধ্যেও শর্ট সার্কিটের ক্রিয়া প্রতিফলিত। বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র হিসাবে চমৎকার, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। বর্তমান অসার, ভবিষ্যৎ অন্ধকার—সমুখে মহাশূন্য। এটাকেই শেষ কথা বললে অ-শেষের অবমাননা করা হয়। কবি শুধু স্রষ্টা নন, দ্রষ্টাও বটেন। আধুনিক কাব্যে সৃষ্টির চাতুর্য যতখানি দৃষ্টির প্রাখর্য ততখানি নয়। এ কাব্য চতুরানন অর্থাৎ বাক্‌চাতুর্য অত্যাশ্চর্য, কিন্তু তৃতীয় নয়নের অভাব অর্থাৎ দৃষ্টির প্রসার নেই। চাতুর্য কাব্যের অলংকার, প্রাণ নয়। এ যেন filtered waterএর বন্যা, এর মধ্যে পলি নেই। মনকে স্বল্প কালের জন্যে অভিভূত করে কিন্তু থিতিয়ে থাকবার মতো কিছু রেখে যায় না।

সকল ব্যাপারে অবিশ্বাস এবং অনাস্থা প্রকাশ কিম্বা কেবলমাত্র আজকের দিনে প্রচলিত অভ্যাস-বিশ্বাসকেই মানসিক অঙ্গরাগ হিসাবে গ্রহণ যদি আধুনিকতার সংজ্ঞা হয় তাহলে বলব সেটা খুব একটা বড় জিনিস নয়। সে আধুনিকতা এক জাতীয় সাময়িকতা মাত্র, তার মূল্য খুব বেশি নয়। আধুনিক মন বলতে আমি বুঝি সজীব-সচেতন মন, কল্পনাপ্রবণ গতিশীল মন। সে মন বর্তমান সম্পর্কে যতখানি সজাগ সতর্ক, অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ততখানি উন্মুখ। আবার, অতীতের যা ভালো তার প্রতি কখনো বিমুখ নয়। এরূপ সর্বতোমুখী মনই আধুনিক মন। এই মানদণ্ডে বিচার করলে যে কোনো যুগের পনেরো-আনা মানুষই অনাধুনিক বলে বিবেচিত হবে। অপর পক্ষে ঐ ত্রিবিধ গুণের সমন্বয় রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে যেমন হয়েছিল এমন সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর জীবদ্দশায় দেশে-বিদেশে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি যা তাঁর চিত্তকে ব্যথিত বা উল্লসিত করে নি। সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের ন্যায় অতিশয় স্পর্শকাতর তাঁর মন। পৃথিবীর যেখানে যা ঘটেছে তারই কম্পন বা স্পন্দন তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা চলে—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

—ঐকতান, জন্মদিনে

কতখানি সফলকাম হয়েছেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হতেই পারে। এ যুগের বেদনাটি হয়তো ঠিক তিনি ধরতে পারেন নি কিম্বা ধরে থাকলেও তাকে যথাযোগ্য ভাষা দিতে পারেন নি। ভাষায় কোথাও যন্ত্রণাসূচক কাতরোক্তি— ইংরেজিতে যাকে বলে whine বা whimper, সাধারণ কথায় আমরা যাকে বলি কাতরানি, সে জিনিস কোথাও নেই। অন্যথা এরূপ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরা এটির ব্যবহারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু অন্তিম পর্বে রবীন্দ্রনাথ এই অস্ত্রটিও তেমন ব্যবহার করেন নি। কোনো কোনো কবিতায় indignationএর প্রকাশ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পরিশেষ' কাব্যের 'প্রশ্ন' কবিতাটির— 'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে' উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যেও বিপ্লবাত্মক কিছু নেই; শুধু মানুষ যে মহতের মহিমা বুঝতে পারে নি, তার মর্যাদা রাখে নি তার জন্যে গভীর দুঃখ এবং লজ্জা প্রকাশ করেছেন। বিধাতার রুদ্র রোষ যে দুষ্টের দমনে বর্ষিত হচ্ছে না, এটিই তাঁর indginationএর কারণ। এখানেও বিধাতার প্রতি অনাস্থার কোনো প্রকাশ নেই।

আজকের কাব্যবিচারে রবীন্দ্রকাব্যে কিছু কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছে সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসায় কাব্যের আনুগত্য কোনো জীবনাদর্শের প্রতি ততখানি নয় যতখানি কাব্যাদর্শের প্রতি। এলিয়টের মতে— Honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry— অর্থাৎ কবিতাকে কবির থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। কবির একান্ত নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা থেকেই কবিতার জন্ম, কিন্তু কবিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া পর্যায়ে সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাটি নির্বিশেষ হয়ে যাবে, কবির নিজস্বতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই কথাটি এলিয়ট অতি সুন্দর একটি analogyর সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। বেশির ভাগ পাঠকেরই তা জানা আছে। তাহলেও বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করছি— When Oxygen and Sulphur dioxide are mixed in the presence of filament of platinum, they form sulphurous acid. This combination takes place only if the platinum is present nevertheless the newly formed acid contains no trace of platinum, and the platinum itself is apparently unaffected। আশ্চর্যের বিষয় যে রবীন্দ্রনাথও ঐ একই কথা বলেছেন, তবে অনেক সহজ ভাষায় এবং সকলের পরিচিত analogyর সাহায্যে। বলেছেন, বাড়ি তৈরি করতে মিস্ত্রীরা ভারা বেঁধে নেয়, ওটি না হলে তৈরির কাজ চলে না। কিন্তু বাড়ি তৈরির কাজ যেই শেষ হল অমনি ভারাটা নেয় খুলে। বাড়ির সঙ্গে ওর আর কোনো সংযোগ রইল না। কবিতা-সৃষ্টিতেও ঐ একই ব্যাপার। কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতা কবিতাটি নির্মাণের অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্তু নির্মাণকার্য যখন সমাধা হল তখন কবিতাটি নিজের কথা নিজেই বলবে। কবিসত্তাকে ছাড়িয়ে তার নিজস্ব একটি সত্তা আছে, সেখানে সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। কবিতার ঐ স্বাতন্ত্র্য বা অটোনমির অধিকার আছে বলেই কবির মনোগত অর্থ এবং পাঠকের অধিগত অর্থ সব সময়ে এক নাও হতে পারে। কাব্যের তত্ত্ব হিসাবে এর মধ্যে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু কবিতাকে depersonalize করা কার্যতঃ কতখানি সম্ভব সেটাই বিবেচ্য। এলিয়ট-এর মতে depersonalizationএর উদ্দেশ্য

হল আর্টকে যথাসম্ভব সায়েন্সের কাছে নিয়ে আসা। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে আর্ট এবং সায়েন্স দুই ভিন্নধর্মী জিনিস—তাদের এক করবার প্রয়োজনটা কি? খুব ন্যায্য মতেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে আমাদের বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানজিজ্ঞাসায় যদি আর্টের রীতি অনুসৃত হয় সেটা কি বিজ্ঞানের পক্ষে খুব অনুকূল হবে? আমার তো মনে হয় একদিকে শ্রীবৃদ্ধি যতটুকু হবে অপরদিকে চরিত্রহানি ঘটবে ততোধিক। তেমনি আর্ট যদি সায়েন্সের চরিত্রনীতি অনুসরণ করে, সেটাও খুব সুফলপ্রদ হবে এমন মনে করবার কারণ দেখি না।

সকল কবির মনের গড়ন এক নয়। তাই যদি হত তবে সকল কবিতাই এক ছাঁচে গড়া হত। কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ কিছু-না-কিছু তাঁর কাব্যে পড়বেই। ফুলের থেকে যেমন গন্ধকে আলাদা করা যায় না তেমনি কবি থেকে কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর কাব্যকে আচ্ছন্ন করেছে, এটি আর্টের পরিপন্থী। রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথকে সুস্পষ্টভাবে চেনা যায়, এটাকে আমি মস্ত বড় একটা অপরাধ বলে মনে করি না। আমি গোড়াতেই বলে নিয়েছি যে কবির ব্যক্তিত্বটিই কাব্য হয়ে ফুটে ওঠে। যেখানে ঐ ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে নি সে কাব্য কেবলমাত্র কলাকৌশলের জোরে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তবে এ কথা মানতে হবে যে এই যন্ত্র-কুশল শিল্পসমৃদ্ধির যুগে কাব্যে-সাহিত্যেও কলাকৌশলের উৎকর্ষ যথেষ্ট বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে পিছিয়ে ছিলেন। কাব্যসাহিত্যকে যুগের মতিগতি বুঝে চলতে হয়। এ যুগের মতি তাঁর অজানা ছিল না কিন্তু তার গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে তিনি চলতে পারেন নি। আজকের জীবন ক্ষিপ্রগতি, সে তুলনায় রবীন্দ্রকাব্যের গতি মন্থর। জীবনের পথ দুর্গম, সে তুলনায় রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা এবং ছন্দ অতিমাত্রায় মসৃণ। নানা কারণে আজকের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত যে মানুষ ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নেই, কথাবার্তা ক্রিয়াকলাপ অসংলগ্ন। এরও ছাপ পড়েছে আজকের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ এত বেশি স্থিতপ্রজ্ঞ যে, যে-কোনো অবস্থায় তাঁর মন অবিচল। এজন্যে তাঁর কাব্যে কোথাও অসম্বদ্ধ অসংলগ্নের স্থান নেই, এ যুগের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় থেকে তাঁকে বলা যেতে পারে ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ ভাবটি তাকে এক ধরণের immunity দান করেছে। আধুনিকের দৃষ্টিতে ঐ immunityই তাঁর কাব্যের দুর্বলতা। আধুনিক মন total involvementএর পক্ষপাতী। ভালোমন্দ সব মিলিয়ে জীবনের ষোল-আনা অংশীদার হওয়া আজকের সাহিত্যধর্মের অনুশাসন। একে সাহিত্যের আদর্শ হিসাবে খুবই সংগত বলতে হবে। কিন্তু কোনো আদর্শই সম্পূর্ণরূপে কারও আয়ত্তাধীন নয়। কার্যতঃ দেখা যায় প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বলে সকল সাহিত্যকর্মই কতক পরিমাণে একপেশে। রবীন্দ্রনাথ যদি একপেশে, এঁরাও তার ব্যতিক্রম নন। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে আজকের লেখকেরা যে পরিমাণে সমকালীন রবীন্দ্রনাথ সে পরিমাণে সমকালীন নন। নিজ কাল এবং নিজ সমাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ থেকেও নিজেকে তিনি সাময়িকতার ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন। জীবনের উপরিস্তরে যে বিক্ষোভ দৃষ্টিগোচর তা কোনোদিনই তাঁকে খুব একটা বিচলিত করে নি। এর তলায় একটি অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ জীবনধারা প্রবাহিত। সেখানে জীবনের গভীরতর পরিচয়। উপরিস্তরে সাময়িকতার সীমানায় সে পরিচয় খণ্ডিত। মনে রাখতে হবে যে মানুষের ইতিহাস আর জনতার ইতিহাস এক নয়। এ ছাড়া আজকের জীবনে যে আমূল পরিবর্তনের কথা আমরা সর্বদা বলে থাকি তাও অনেকাংশে অতিরঞ্জিত।

পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে কিন্তু সে পরিবর্তন বহিরঙ্গে। মূলতঃ মানুষ খুব একটা বদলে যায় নি। ভাষার যেমন ব্যাকরণ আর ইডিয়ম, জীবনেও তেমনি। একটা নিত্য দিনের আর-একটা নিত্যকালের। ব্যাকরণ বদলায় না কারণ ইডিয়ম জাতির জীবনের গভীরতর স্তর থেকে উদ্ভূত। আজকে জীবনের যে পরিবর্তনের কথা বলছি সেটা নিত্যদিনের ব্যবহারিক জীবনের পরিচয় অর্থাৎ জীবনের ঐ grammarএর পরিবর্তন, ইডিয়মের পরিবর্তন নয়।

৭

অন্ত্যপর্বের কাব্যে অপরাপর উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে আর-একটি হল স্মৃতিচারণের প্রবণতা। নিজের অতীতে অবগাহন এ বয়সের স্বভাব-ধর্ম, যেখানে জীবন শুরু সেখানে ফিরে আসবার একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। তবে এখানেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ। সুমুখে সমস্তই শূন্য— কিছু দেখবার নেই, চাইবার নেই, ভাববার নেই— কাজেই মুখ ফিরিয়ে পিছন পানে তাকানো— রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ সেই মামুলি স্মৃতিরোমন্থন নয়। শৈশবে কৈশোরে এবং প্রথম-যৌবনে যে সৌন্দর্যলোকে বাস করেছেন স্মৃতিচারণের দ্বারা সেই জীবনকে ফিরে ফিরে উজ্জীবিত করেছেন। সামনে পিছনে দুদিকেই দেখেছেন— 'সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে / অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে / তেমনি আবার বালক দিনের মতো / চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।' বালক-বয়সে জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরেটাকে যেমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতেন এখন মনের জানলা খুলে অনাগত ভবিষ্যৎকেও সেই কৌতূহল নিয়েই দেখছেন। তাঁর মন কখনোই এমন চলৎশক্তিহীন হয় নি যে দূরদৃষ্টিতে বাধা পড়েছে। তবে এই বয়সে যা খুব স্বাভাবিক, মনটা ফিরে ফিরে বিগত দিনের আঙিনায় ঘুর ঘুর করেছে। জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত বালক-বয়সের কোনো কোনো স্মৃতি, ছিন্নপত্রের টুকরো টুকরো দৃশ্য বা ঘটনা বহুকালের সঞ্চিত মদিরার মতো স্বাদে গন্ধে মধুময় হয়ে কাব্যের ছন্দে ধরা দিয়েছে। 'পরিশেষ' থেকে শুরু করে শেষ পর্বের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থেই এর নিদর্শন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটিও নিঃসন্দেহে ঐ স্মৃতিচারণের আনন্দজাত। এই পর্বে ছড়ার যে অত ছড়াছড়ি (ছড়া, ছড়ার ছবি, খাপছাড়া)— তাও ছেলে-বয়সের আনন্দে মনটাকে দোলা দেবার চেষ্টা। গদ্যিকা রীতির দুরূহ নিয়মনিষ্ঠায় পরে মনটাকে আবার ছন্দের দোলায় দুলিয়ে নিয়েছেন। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে।'— এসব তারই নিদর্শন। এ ছাড়া সমসাময়িক নানা ঘটনায় ক্লিষ্ট পীড়িত মন এর মধ্যে খানিকটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। 'নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথ্বী-ব্যাপী মানব বিভীষিকা / জ্বালায় মানব-লোকালয়ে প্রলয় বহ্নিশিখা'— চিরন্তন, পরিশেষ তারই মধ্যে হঠাৎ কোনো পাখির গান কিম্বা ছড়ার ছন্দে শিশুর কাকলি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সংসারের চিরন্তন সুরটি এখনও বজায় আছে। বলা বাহুল্য এই জাতীয় কবিতাকেই পূর্বোল্লিখিত facile optimismএর পংক্তিভুক্ত করা হয়েছে। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে এ optimism ব্রাউনিংএর Good's in His Heaven, All's right with the world -জাতীয় optimism নয়। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির ক্রিয়া, মানবপ্রকৃতির মধ্যেও সেই অফুরন্ত জীবনীশক্তি বিদ্যমান। প্রকৃতির মধ্যে কত কি মরে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, তথাপি সে চিরনবীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যেও এ নবীনতা অক্ষয়। ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে অক্ষয়কে

জানতে হয়, রবীন্দ্রজীবনদর্শনে এটি একটি কেন্দ্রীয় সূত্র। যা হোক, কথা হচ্ছিল স্মৃতিচারণ সম্পর্কে। যথার্থ স্মৃতিচারণ নয় অথচ nostalgiaর ছোঁয়াচে আর্দ্র এমন অনেক কবিতা আছে কাব্যগুণের বিচারে যার স্থান অতি উচ্চে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পরিশেষ' কাব্যের 'আরেক দিন' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষ দিকের কাব্যে এমন কবিতার সংখ্যা কিছু কম নয়।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। এ যুগের বিস্ময়কর বিজ্ঞানের উন্নতি সে কৌতূহলকে আরোই উদ্দীপিত করেছিল। সমকালীন বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে যথাসাধ্য যোগ রক্ষার চেষ্টা করেছেন। শেষ দশকের কাব্যে খানিকটা যে সংশয়সঙ্কুল মনের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে নবলব্ধ বিজ্ঞানচিন্তার ছাপ পড়েছে। বিশ্ববিধানের মধ্যে যে বিপুল অপচয়— ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে ভরিতে নূতন করি—প্রকৃতির যে অফুরন্ত ভাণ্ডার একদিন তাঁকে মুগ্ধ করেছে— আজকের বিজ্ঞান বলছে সে ভাণ্ডার একদিন সত্যই নিঃশেষে শূন্য হয়ে যেতে পারে। সমস্ত সৌরজগৎ একদিন আপন শৈত্যে বিনষ্ট হয়ে যাবে— যে বিশ্বরহস্য একদা তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে আজ সেই রহস্য তাঁকে শঙ্কাবিষ্ট করে তুলেছে। মানুষ মানুষের বিনাশ সাধন করছে সেই দৃশ্য তাঁকে যে বেদনা দিয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতি দূর ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্বের অপঘাত মৃত্যুর বেদনা। বিশ্ববিধানের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত লজিক আছে, এই বিশ্বাস তাঁর মনে ছিল। নানা কারণে, বিশেষ করে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের উক্তিতে, ঐ বিশ্বাসের মূলে আঘাত লেগেছে। এর কোনো কূলকিনারা তিনি করতে পারেন নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সার্ জেমস্ জীনস্‌এর মতবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে প্রকৃতির মধ্যে ক্ষয় আছে কিন্তু পূরণ নেই এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে এখন দেখা যাচ্ছে জীনস্‌এর মতবাদ সম্পর্কে আজকের বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ একমত নন। সূর্যদেহে ক্ষয় যেমন চলছে নতুন করে তেমনি আবার তেজ উৎপন্ন হচ্ছে।

সৃষ্টির অন্তহীন রহস্য কবিমনের এক নিরন্তর জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানীর সতর্ক জিজ্ঞাসা নয়, দার্শনিকের তত্ত্বানুসন্ধানী জিজ্ঞাসাও নয়। তাঁরা নিজ নিজ পথে রহস্যের সমাধান খোঁজেন। কবি কোনো জিনিসেরই সমাধান সন্ধানে ব্যস্ত নন। তিনি শুধু এর বিস্ময়টুকু মনে-প্রাণে অনুভব করেন। আদ্য মধ্য পর্বের তুলনায় এ জিজ্ঞাসা এখন নানা ভাবে নানা আকারে এক নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহলে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড যে কী প্রকাণ্ড, কী অন্তহীন এর ব্যাপ্তি, নক্ষত্রে নক্ষত্রে গ্রহে গ্রহে কী দুস্তর ব্যবধান— সেই ব্যবধান নিজ অনুভবের মধ্যে পেতে চেয়েছেন—

> যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থান
> তারি আজ দেখিনু প্রতিমা—
> দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
>
> —জন্মদিনে, ১নং কবিতা

এরই সঙ্গে আর-এক দূরত্বের— কালের দূরত্বের— উপলব্ধি এসেছে মনে— কত কল্প যুগ আগে পৃথিবীতে প্রাণপঙ্কের আবির্ভাব, কত রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে একদিন সে মানুষের মূর্তি ধারণ করেছে—কী নিগূঢ় সংকল্প বহন করে চলেছে সেই মানুষ যুগ হতে যুগান্তর পানে! প্রত্যেকটি মানুষ একদিকে যেমন সুদূর অতীতের তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের মানবসন্তানের সঙ্গে কী এক রহস্যসূত্রে গাঁথা।

রহস্যের অন্ত নেই, বিস্ময়ের শেষ নেই। মানুষের ভাষা কোত্থেকে এল? আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অরণ্য প্রান্তরে প্রকৃতির মুখে কত রকমের শব্দ—

মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়ম-সূত্রজালে
বার্তা বহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে

বুনো ঘোড়ার মতো পোষ মানিয়ে ব্যবহার করেছে। দীর্ঘকাল ব্যাকরণ-দুর্গে বন্দী থেকে মানুষের ভাষা যদি অকস্মাৎ 'ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ / সাধু সাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গ-হাস্যে হানে পরিহাস'— তাহলে ভাষার সেই আদিম রূপ আবার প্রকাশ পাবে। সব কিছুর মধ্যেই আদিম রূপটি দেখবার বাসনা। সকল কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃত স্বরূপটি দেখতে চেয়েছেন। মানুষের পরিচয়ের মধ্যে আছে তার বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য কীর্তি যশ বংশগৌরব, আরও কত কী। ঐসমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে গভীরে প্রবেশ করে মানুষের সত্য পরিচয়টি পাবার উপায় কি? এই কথাটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন 'আরোগ্য' কাব্যের ১৪ সংখ্যক কবিতাটিতে, যেখানে বলেছেন তাঁর ভক্ত কুকুরের কথা—

বাক্যহীন প্রাণীলোক -মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে…
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না—
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

নিরবধি কাল এবং বিরাট বিশ্বের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সচেতন বলেই কবির মনে প্রতিটি ক্ষণ-মুহূর্তের এবং ক্ষুদ্রতম স্থানটিরও একটি বিশেষ মূল্য আছে। নিকটতম আত্মীয়জনের মধ্যেও মানুষে মানুষে অসীম দূরত্ব। সকল প্রকার দূরত্বকে ভেদ করে যিনি সৃষ্টির মধ্যে একটি সংগতির সন্ধান পেয়েছেন স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অন্যবিধ হতে বাধ্য। তিনি এর মধ্যে একটি 'সহজ'এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন।

আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ—
সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান।

—স্কুল-পালানে, আকাশপ্রদীপ

সে বয়স বলতে এখানে তাঁর বালক-বয়স, যে বয়সে তাঁর মন ছিল সহজ। শেষবয়সে আবার ঐ সহজ মনেরই সাধনা করেছেন। এই সহজের উপলব্ধি নেই বলে অর্থাৎ একান্ত নিজ প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি বলে স্থান কাল পাত্রের অসংগতি প্রতি পদে আমাদের পীড়িত করে।

যিনি দুরতম অতীতে এবং সুদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারেন তিনিই প্রত্যেক চলন্ত মুহূর্তে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন। এই মুহূর্তে চোখের সুমুখে প্রসারিত দৃশ্যটি— নদীর ঘাটে গ্রাম বধূদের জটলা, মাঝিবালকের গান, কোনো অকিঞ্চিৎকর ঘটনার টুকরোটিও যে কত মূল্যবান ছিন্নপত্রের পাতায় একদিন তা প্রমাণিত হয়েছিল। সেই মনটিই আবার ফিরে এসেছে শেষ দিকের কবিতায়। রোগশয্যা এবং আরোগ্যর অনেক কবিতাকে এক ধরণের দিনলিপি বলা যেতে পারে। আকাশপ্রদীপএর 'পাখির ভোজ' 'ময়ূরের দৃষ্টি' প্রভৃতি কবিতা ছিন্নপত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ পর্বের অনেক কবিতাই কোনো চলন্ত মুহূর্তের ফ্রেমে আঁটা একটি ছবি কিম্বা কোনো অলস মন্থর মুহূর্তে মনে আসা কোনো ভাবের গুনগুনানি— চলতি মুহূর্তের খসে-পড়া উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।' ক্ষণ-মুহূর্তের অক্ষয় মূল্যটির কথা অতি সুন্দর করে বলেছেন সানাই কাব্যের 'ক্ষণিক' নামক কবিতাটিতে। বলেছেন, 'ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান।' এর আগে সেঁজুতির 'পলায়নী' নামক কবিতায় বলেছিলেন— 'অন্তকাল অচির কালেরই মেলা।' তারও আগে শেষ সপ্তক, এ বলেছেন— 'আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃত ভরা / মুহূর্তগুলিকে··· / তার অপরিচয়ের সত্য / অযুত নিযুত বৎসরের / নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে / ধরে না।'— ২১নং কবিতা। ক্ষণ মুহূর্তের 'চিকণ লাবণ্য'টুকু অন্ত্য পর্বের কাব্যকে বিশেষ ভাবে লাবণ্য-মণ্ডিত করেছে।

এর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, যে মন নিয়ে কাব্যজীবন শুরু করেছিলেন সে মনের কচি লাবণ্যটিকে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। শেষ সপ্তক' এর একচল্লিশ সংখ্যক কবিতাটি এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৌতুকে রসোল্লাসে সৃষ্টিকর্তা পিতামহের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিয়েছেন যিনি 'অর্বাচীন নবীনদের কাছে প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে ভুলেই গেছেন।'

৮

সৃষ্টিকর্তা নিজে কৌতুকবিলাসী। এজন্যে সমস্ত সৃষ্টির মূলে কোথাও একটি কৌতুক আছে। বিরাট বিশ্বের এক কোণে অনন্তকালের মধ্যে ক্ষণিকের কোলে তুলে দিয়েছেন মানুষকে। এটিই একটি বিশেষ কৌতুক। এর মধ্যে একদিকে যেমন আছে নির্মমতা, অপর দিকে তেমনি আবার মাধুর্যেরও অন্ত নেই। 'এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।' দুর্ভেদ্য তার রহস্য, কিন্তু ললিতে কঠোরে মিলিয়ে অপূর্ব এর সুষমা—

> ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
> নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
> আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
> গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে,
> গলায় পরিয়া হার
> বুদ্‌বুদ্ মণিকার। —জন্মদিনে, ১১ সংখ্যক কবিতা

'শেষ-বিনাশের হেলা' তো বটেই, এ ছাড়াও জীবনের অনেক আছে হেলাফেলা, ছলাকলা। নির্মমতা অনস্বীকার্য, কিন্তু মমতাও আছে। সমস্তটা মিলিয়ে এক অপরূপ কৌতুক। সে কৌতুকের

কথাই বলেছেন জীবনের শেষ বাক্যে, 'শেষ লেখা'র শেষ লিখনে— 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী।' জীবনকে বলেছেন ছলনাময়ী। এ কথা নতুন নয়। কৌতুকময়ী আখ্যা আগেও দিয়েছিলেন। জীবনের কৌতুক এবং ছলনা তো আর কিছু নয়, জীবনের বহুবিধ পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের মনুষ্যত্বের যাচাই। 'এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করে চিহ্নিত।' জীবন মানুষকে নিয়ে এক মনোহরণের খেলা খেলছে। সে খেলার মধ্যে অনেকখানি ছলনা আছে। ছলনাময়ী নারীর মতোই জীবন মনোহারিণী। এক-আধটু ছলনা না থাকলে রমণীর রমণীয়তা থাকে না, জীবনের মধ্যেও কিছু মাত্রায় ছলনা না থাকলে সে আমাদের মন পেত না। বহুকাল পূর্বে যৌবন-বয়সে যখন জীবনের সঙ্গে পরিচয় এতখানি ঘনিষ্ঠ হয়নি তখন একেই আরেকটু পোশাকী নাম দিয়েছিলেন— বলেছিলেন জীবনদেবতা। জীবনদেবতা জীবনের মূল্য আদায় করে নেন; এক হাতে যতখানি দেন, আরেক হাতে ততখানি কেড়ে নেন। তখনই বলেছেন, 'দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় / পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায় / নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।' মমতায় আর নির্মমতায় মিশিয়ে এই জীবন। এজন্যে ছলনাময়ী আখ্যাটিই এর যথার্থ পরিচয়। জীবনদেবতা বললে অনেকটা ব্যবধান থেকে যায়। ছলনাময়ী আখ্যার মধ্যে জীবনের সঙ্গে নিকটতর এবং নিবিড়তর পরিচয়ের আভাস আছে। এর চাইতে সত্যতর পরিচয় আর কিছু হতে পারে না। 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে' সেই মানুষই জীবনযুদ্ধে নিঃসংশয়রূপে জয়ী হয়েছে। জীবনের শেষ লিখনে জীবনের গভীরতম সত্যটিকে উদ্ঘাটিত করে গিয়েছেন। অপূর্ব কবিতা। সত্যের মহিমায়, প্রকাশের ভঙ্গিমায় অতুলনীয়। এইটুকু শুধু বলব যে এর প্রথম সাত লাইন—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি…তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি' এবং শেষ ন' লাইন—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত…শান্তির অক্ষয় অধিকার।'—এ দুটি স্তবক থাকলেই বক্তব্যটি সুসম্পূর্ণ এবং এর রূপটি বেশি সংহত হত। প্রথম স্তবকটি সত্যই অতুলনীয়। মনে হয় জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হবার আগে কবিপ্রতিভা শেষ বারের মতো প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠেছে।

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : 'সাহিত্য' : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। নন্দরানী চৌধুরী -সংকলিত ও সম্পাদিত। টেগোর রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট, কলকাতা ২০। মূল্য ৮·০০ টাকা

উদীয়মান এবং সমুদিত রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যরশ্মি সমসাময়িকদের চোখে কিরকম প্রতিভাত হয়েছিল, আজ তার পরিচয় কেবল কৌতূহলোদ্দীপকই নয়, শিক্ষণীয়ও বটে। বিশেষতঃ যেসব সমীক্ষায় কবিকৃতির যথাযথ মূল্যায়নের আন্তরিক প্রয়াস ছিল, সাময়িকতার পটভূমিতে সেগুলির মূল্য আপেক্ষিক হলেও তা থেকে আজকের রসগ্রাহীর স্থানে স্থানে লাভবান হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। সেকালকার রবীন্দ্র-সমালোচনকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখা যায়। এক, অভিভূতের উচ্ছ্বাস, যা কখনো-কখনো সীমাতিশায়ী হয়ে পড়ত; দুই, অসহানুভবজন্য এবং অসূয়াজন্য রবীন্দ্র-বিরোধিতা; তিন, তটস্থদৃষ্টিতে সাহিত্যিক বিচারের প্রয়াস। বর্তমান রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আলোচিত সমাজপতি যদিচ মূলতঃ এই তৃতীয় শ্রেণীরই, তবু তিনি প্রথাসিদ্ধ পুরাতন রীতির, কিছুটা ক্ষমাহীন মানদণ্ডের বিচারক এবং কদাচিৎ সহানুভবহীন রবীন্দ্র-বিদ্বিষ্টদের দলভুক্ত। মনে রাখতে হবে, সমাজপতি সাময়িকপত্রের সম্পাদক ছিলেন, স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় সাময়িক উদ্দীপনা তাঁকে জাগিয়ে রাখতেই হত, সামগ্রিক রবীন্দ্র-বিচার তাঁর অভিপ্রেত ছিল না এবং স্বকীয় শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেশের সীমা থেকে তিনি বহুদূর অগ্রবর্তীও হতে পারতেন না। চারিত্রের দিক দিয়ে তিনি স্ব-ভাবে আদর্শপ্রবণ ছিলেন, আবার সমস্ত কিছুর উপরে সাহিত্যিক বিশুদ্ধতাকে তুলে ধরবার আগ্রহও তাঁর কম ছিল না। তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনের যা-কিছু ভালোমন্দ ঐ বহিরঙ্গ প্রয়োজন এবং অন্তরঙ্গ প্রবর্তনার প্রবলতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদিকার আলোচ্য রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ-সংকলন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সম্পাদক-সমালোচক সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধের সূত্রপাত হয় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এবং ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত দু-একটি আলোচনা নিয়ে। কিছু পরে আর-এক দফা নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা এবং 'চোখের বালি' উপন্যাস নিয়ে। কিন্তু এই মতবিরোধ সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্র-সমালোচনকে যে প্রভাবিত করে নি তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্রনাথের বহু উল্লেখ্য কবিতা ছোটগল্প ও প্রবন্ধের প্রশংসায়। সুদীর্ঘ আলোচনা অবশ্য তিনি করেন নি, কোথাও কোথাও তাঁর সপ্রশংস অভিমত হয়তো একটিমাত্র বাক্যেই সীমিত, তবু রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে তাঁর বোধমত অনেকক্ষেত্রেই সমাদর করেছেন। যেখানে তা করতে পারেন নি, সেখানে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নূতন কাব্যরীতির সঙ্গে তাঁর সহানুভবের অভাবই বোধ হয় দায়ী। যার জন্য কবির বহু ভালো রচনাও তাঁর মর্ম স্পর্শ করে নি। কবির রচনার স্বল্প ত্রুটিকে অতিকৃত ক'রে দেখার প্রবণতা এবং সাহিত্যরস-প্রমাতা হিসেবে নিজ অহমিকা এবং শিক্ষকম্মন্যতাও এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছুটা কাজ করেছে। এবং এও সত্য যে সতর্ক এবং নিরপেক্ষ সমালোচন লঙ্ঘন ক'রে তিনি সংকীর্ণ রবীন্দ্র-বিদ্বেষও পুষ্ট করেছিলেন। তাঁর মন্তব্য যুক্তিতর্কের সীমা অতিক্রম ক'রে কটুভাষণে পৌঁছেছিল। অবশ্য এজন্য তৎকালীন রবীন্দ্র-অনুভবীদের তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম -প্রবণতাকে কিছু পরিমাণ দায়ী ব'লে মনে করা যেতে পারে।

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের সমাহরণকারিণী ও সম্পাদিকা শ্রীমতী চৌধুরী উল্লিখিত বিষয়গুলি তাঁর

অতিশয় সুলিখিত ভূমিকার মধ্যস্থতায় সুচারুভাবে আমাদের গোচরে এনেছেন। রবীন্দ্রচর্চায় তিনি একটি মৌলিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে বর্তমান অংশ শেষ করেছেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট্‌এর সহায়তায় প্রকাশিত লেখিকার এই পুস্তক রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু সমাজে নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে। এই প্রসঙ্গের বিস্তাররূপে সমকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-স্বীকৃতি এবং রবীন্দ্র-বিরোধের স্বরূপ পর্যালোচনার জন্য আমরা উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করছি।

ক্ষুদিরাম দাশ

লৌকিক শব্দকোষ। কামিনীকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশার্স, কলিকাতা ১। মূল্য ১২·৫০ টাকা
লোকায়ত বাংলা। সুনীল চক্রবর্তী। কল্যাণী প্রকাশন, কলিকাতা ১। মূল্য ৮·০০ টাকা

বাংলা ভাষার অভিধান রচনা অষ্টাদশ শতাব্দ থেকেই শুরু হয়েছিল। এ কাজে বিদেশি পণ্ডিতবর্গ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মনোএল দ্য আসুম্পসাঁও থেকে কেরী বাংলা বিদ্যার এই শাখাটিকে সযত্নে লালন করেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগও স্মরণীয়। বাংলাভাষার অভিধান-রচনার যে নীতি উনবিংশ শতাব্দে গৃহীত হয়েছিল একালে তার পরিবর্তন ঘটেছে। তৎসম শব্দের সংগ্রহের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহে অনেক সময় বাংলা ভাষার অনেক শব্দ অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। তবে পাদ্রীরা যেসমস্ত অভিধান রচনা করেছেন, তার মধ্যে ক্বচিৎ দেশি অথবা কথ্য শব্দ পাই। একালে ভাষাচর্চার প্রতি যখন আমাদের আগ্রহ আরও প্রবল তখন অভিধানেরও বিভিন্ন রূপও একান্তই অপেক্ষিত। যেমন কথ্যভাষার অভিধান। এ ব্যাপারে রাজশেখর বসুর চলন্তিকার উল্লেখ প্রয়োজন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন বাংলা ভাষার চলিত রূপের আরও বিস্তৃত অভিধান রচনার প্রয়োজন। সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় এ শতকের গোড়ায় কতকগুলি মূল্যবান গ্রাম্য বাংলা শব্দ সংকলন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছড়া-সংগ্রহের কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে পড়ে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য গ্রাম্যশব্দের সংকলন গ্রন্থাকারে বার হয় নি। এ বিষয়ে গ্রীয়ারসনের *Bihar Peasant Life* একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা।

কামিনীবাবু সেই গ্রন্থ আদর্শ করে গ্রাম্য শব্দ সংকলনে ব্রতী হয়েছেন। এ গ্রন্থ, মনে হয়, একটি বৃহৎ প্রয়াসের আংশিক প্রকাশ। বোধ করি কামিনীবাবু একটি বড় অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছেন। ইতিমধ্যে তিনি লৌকিক শব্দের সংগ্রহের একটা নমুনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। লেখকের উদ্দেশ্য ব্যাপক। তিনি অবিভক্ত বাংলার লৌকিক শব্দ সন্ধানে ব্রতী। এ গ্রন্থেও সে পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। মোট সাতটি অধ্যায়ে কামিনীবাবু ঘর-বাড়ী, গৃহ-সামগ্রী, চাষ-আবাদ, উদ্ভিদ্‌, জীবজন্তু, আচার-অনুষ্ঠান, নামাবলী বিষয়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত লৌকিক শব্দের সংকলন করেছেন। এ সংকলন-কার্য অত্যন্ত দুরূহ। কেননা এসব শব্দ গ্রন্থভুক্ত নয়। লোকের মুখের ঐসব শব্দ সংগ্রহের জন্য সংগ্রাহককে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে হয়েছে। ‘পথে চলিতে, হাটে-বাজারে, খেতে-খামারে, হেঁশেলে-দরবারে, কোথাও বেড়াইতে, যখনই যেখানে কোনও নূতন শব্দ শুনিয়াছি, কোনও নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, টুকিয়া লইয়াছি’ (পৃ ২৫)। লেখকের শ্রমের পরিচয় গ্রন্থেই মিলবে। তিনি অবশ্য কোনো কোনো অঞ্চলের

বৃদ্ধদের সাহায্যে লৌকিক শব্দের মূল রূপটিকে উদ্ধার করবার চেষ্টাও করেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেছেন। মুদ্রিত গ্রন্থে নূতন শব্দ পেলে তাকেও গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, লৌকিক শব্দকোষের প্রয়োজনীয়তা বাংলাবিদ্যার অনুরাগী মাত্রেই স্বীকার করবেন। সাহিত্যে আঞ্চলিকতা এখন গবেষণার বিষয়। সাহিত্যে 'লোক'-রূপ (কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি) এখন জাগ্রত এবং সর্বগ্রাসী। সেদিক থেকে লৌকিক শব্দকোষের মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের দিশা এই শব্দকোষের সাহায্যে নির্ণীত হতে পারে। অনেক হেঁয়ালির দুর্বোধ্যতা শব্দের অর্থবোধে দূর হয়ে যায়।

ভূমিকায় কামিনীবাবু বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ নিয়েও আলোচনা করেছেন। রোমান-অক্ষরে ছাপা হলে উচ্চারণ-সমস্যা মিটত। কিন্তু বাংলায় সে-সুযোগ নেই বলে লেখক উচ্চারণ-পদ্ধতি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো শব্দের 'তত্ত্ব'-নির্ধারণে কামিনীবাবু সামাজিক ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের ব্যাখ্যার সঙ্গে সবক্ষেত্রে একমত হওয়া সম্ভব না হলেও তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

'লোকায়ত বাংলা' গ্রন্থে সুনীলবাবু লোকসংস্কৃতির কতগুলি সমস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর আলোচনা তত্ত্বমূলক। তিনি লোকসংস্কৃতির চিরাচরিত বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার সদুত্তর দানে প্রয়াসী হয়েছেন। সুনীলবাবুর জিজ্ঞাসায় আন্তরিকতার অভাব নেই। যেখানে তিনি তর্কে নেমেছেন সেখানে যুক্তি দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। ভাবাবেগের দ্বারা বিষয়টিকে তিনি আচ্ছন্ন করেন নি। প্রথম প্রবন্ধে 'ফোকলোর' কথাটির তাৎপর্য আবিষ্কারে লেখকের পূর্বসূরী এবং সমসাময়িক লোকসংস্কৃতির পর্যালোচকদের পরিক্রমা কৌতূহলোদ্দীপক, সুনীলবাবু লোকসংস্কৃতির বিচারে অ্যাকাডেমিক পথ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি লোকসংস্কৃতির সৃষ্টির দিকটিকে লক্ষ্য করেছেন এবং এ সংস্কৃতিকে গতিমান, চলিষ্ণু মনে করেছেন। লোকসংস্কৃতি কেবলমাত্র অতীতের বস্তু নয়, এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। সুনীলবাবু বলেছেন, 'অন্যান্য শিল্পসাহিত্যধারার মত লোকসংগীতও শোষিত জনগণের বৈপ্লবিক অগ্রগতির, শ্রেণীহীন সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।' সুনীলবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমন আশা করা যায় না। সুনীলবাবু সমসাময়িক কালের লোকসংগীত লোককথা উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর রচনায় দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে লোকসংস্কৃতির বিচারমূলক গ্রন্থ ইতিপূর্বে চোখে পড়ে নি। সেদিক থেকে সুনীলবাবুর পদক্ষেপ নূতন এবং অভিনব। গ্রন্থে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র আছে, সেগুলির আকর্ষণ রসিকের কাছে কম নয়।

বিজিতকুমার দত্ত

BENGALI LITERATURE IN ENGLISH : A Bibliography : Jagomohon Mukherji, M. C. Sarkar & Sons Private Ltd, Calcutta 12, Price Rupees Eight only.

এই বিবলিওগ্রাফি-খানি উপস্থিতকালের প্রয়োজনে আসবে আবার আগামী কালের পূর্ণতর ও ব্যাপক একটি বিবলিওগ্রাফি-রচনার জন্যও এর প্রয়োজন হবে।

গ্রন্থনামেই সংকলয়িতার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি ইংরেজিতে অনূদিত বাঙ্‌লা গ্রন্থসমূহের বিবলিওগ্রাফি প্রস্তুত করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও সংকলনে বিকীর্ণ তথ্যাদির ব্যবহার এই গ্রন্থে সম্ভব হয় নি। এ কাজ ভবিষ্যতের জন্য তুলে না রেখে বর্তমান ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হলে গ্রন্থটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য হত। তা ছাড়া ইংরেজিতে অনূদিত বাঙলা গ্রন্থের বিবরণ হাতে পেয়ে অন্যান্য ভারতীয় ও অ-ভারতীয় ভাষায় অনূদিত বাঙলা গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য লোভ হয়।

জুন ১৯৬৭ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ইংরেজিতে অনূদিত বাঙলা-গ্রন্থাবলীর বিবরণ সংগ্রহের উল্লেখ আছে ভূমিকায়। কিন্তু গ্রন্থশেষে জুলাই ১৯৬৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থসমূহের বিবরণও যুক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রেরই এবং বিশেষভাবে গবেষণারত ছাত্র-শিক্ষক ও ইংরেজি-ভাষাভাষী ভারতীয় এবং অভারতীয়দের বাঙলাসাহিত্য-পরিচিতির ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে, সন্দেহ নেই। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Edward C. Dimock, Jr. তাঁর লিখিত Introductionএ গ্রন্থখানির পরিচয়প্রদান ও গুরুত্বনির্ধারণসূত্রে বহু মূল্যবান কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে যাঁদের জন্য এই কাজ, তাঁরা যে বিশেষভাবেই উপকৃত হবেন, ডিমকের লেখা থেকে সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেল। সংকলয়িতা শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর কাজে অন্যান্য গ্রন্থ-সূত্র ছাড়াও দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ সুকুমার সেন রচিত গ্রন্থাদি ব্যবহার করেছেন, আর শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশুভ ঠাকুর, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীলীলা রায়— স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এইসব যোগ্য ব্যক্তির সহায়তা ও পরামর্শলাভের সুযোগও পেয়েছেন। সমস্ত তথ্য মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় নি। কিছু কিছু মিলিয়ে দেখেছি, তার মধ্যে কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে নি। গ্রন্থখানির প্রকাশনা-বিষয়ে সুরুচির পরিচয় পেয়েছি।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

ছোটগল্পের সীমারেখা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা। মূল্য ৫·০০ টাকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৫৫-৫৭ সালের বাংলা পাঠ্যক্রমে বিশেষ পত্র রূপে ‘ছোটগল্প ও উপন্যাস’ পাঠ্যসূচীভুক্ত হবার পর থেকেই সম্ভবত স্নাতকোত্তর বিভাগে ছোটগল্পের আলোচনায় নতুন করে উৎসাহ দেখা যায়। এবং আমরা জানি, অধ্যাপক-লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই বিশেষ শাখায় অধ্যাপনার জন্যই সেদিন বাংলা বিভাগে যোগ দেন। সেদিন আমরা যারা তাঁর কাছে এই বিশেষ-পত্রটি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম, তারা জানি— অব্যবহিত পরেই তাঁর ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’ প্রকাশিত হয়, তবে তা ছিল মূলত ছোটগল্পের বিবর্তন ও রূপকলার আলোচনা। তার পরে লিখলেন ‘বাংলা গল্প-বিচিত্রা’।

বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারদের উপর তা আর-এক নতুন আলোকপাত। অতঃপর ছোটগল্পের আলোচনায়, আলোচনার গভীরে আরো-এক ধাপ এগিয়ে তিনি লিখেছেন আলোচ্য 'ছোটগল্পের সীমারেখা' (প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন, ১৩৭৬)। আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থটি এদিক থেকে তাঁর পরিণত গবেষণার, গবেষণার তো বটেই, ও অনুভবের ফসল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-বক্তৃতার জন্য প্রদত্ত লিখিত-বক্তৃতাই কিছু সংশোধন ও সংযোজন ক'রে আলোচ্য গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত।

ছোটগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের টুকরো-টুকরো মন্তব্য (সম্ভবত 'ছোটগল্প'/১৮৯৪ নামটি তিনিই সচেতনভাবে প্রথম ব্যবহার করেন। তাছাড়া 'শেষ কথা' গল্পের পাঠান্তর 'ছোটো গল্প' নামটিও স্মরণযোগ্য), প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যের কথা স্মরণ রেখেও বলতে পারি, বাংলা ছোটগল্প পরিমাণ ও রূপ-বৈচিত্র্যে যতটা সমৃদ্ধ এ বিষয়ে আলোচনা ঠিক সেই পরিমাণেই সীমিত। যদিচ বিশেষ বিশেষ গল্পকারের 'শ্রেষ্ঠগল্পে'র ভূমিকা হিসেবে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে বাংলা ছোটগল্পের উপর উল্লেখযোগ্য দু-একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি ছোটগল্পের বিবর্তন ও তত্ত্বগত দিক থেকে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার কৃতিত্ব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই প্রাপ্য। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য অবিস্মরণীয় সংযোজন।

শুরুতেই লেখক গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখকের মন্তব্য: "বর্তমান মুহূর্তে ছোটগল্প কোন মৃত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসশেষ নয়, গাঁইতির মুখে উঠে-আসা ফসিলও নয়— বরং পূর্ণ-যৌবনে সে সঞ্জীবিত।" বস্তুত, এই 'পূর্ণযৌবন' ছোটগল্পের প্রকৃতিগত তিনটি প্রসঙ্গের আলোচনা করাই তাঁর লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়ে 'ছোটগল্পের মনোভূমি' পর্যায়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক ছোটগল্প-রচনার মূল প্রশ্নটি তুলে বলেছেন: "একজন লেখক কেন ছোটগল্প-রচনায় উৎসাহী হন, কেউ কেউ কেনই-বা ছোটগল্পকে তাঁর শৈল্পিক আত্মমুক্তির প্রধান মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেন, ছোটগল্প-রচনার নেপথ্যে কোন্ বিশেষ মানসিকতা সক্রিয় থাকে, 'ছোটগল্পের মনোভূমি' বলতে ঠিক তাই-ই আমরা বুঝব।" দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'কবিতা ও ছোটগল্প' পর্যায়ে আলোচনার সূত্র: "কবিতায় কাহিনীধর্ম থাকতে পারে, গল্পে কাব্যরস থাকতেও বাধা নেই— কিন্তু আমি সেইসব রচনার কথাই ভাবছি যারা অনায়াসেই রীতিবদল ক'রে রূপান্তরিত হতে পারে, কবিতা হতে পারে ছোটগল্প; ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারে কবিতা।" এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 'ছোটগল্প এবং একাঙ্ক নাটক' শীর্ষক আলোচনার উপজীব্য: "ছোটগল্প এবং একাঙ্ক নাটকের সম্পর্ক সাধর্ম্য ও স্বাতন্ত্র্য আলোচনা"।

প্রথম অধ্যায়ে 'ছোটগল্পের মনোভূমি'র আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, ছোটগল্প প্রধানত দুটি উপাদানে গড়ে ওঠে। এক, লেখকের একটি 'জগৎ-জীবন মানববোধ'; দুই, বাইরের জীবন, যেখান থেকে তিনি 'নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী' উপকরণ সংগ্রহ করেন। তার পরের অধ্যায়ে ছোটগল্পের সঙ্গে এক শ্রেণীর কাহিনীমূলক কবিতার সমধর্মিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রূপের দিক থেকে কবিতা হওয়া সত্ত্বেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'The Last of the Flock'এর মতো কবিতা "আসলে কিন্তু গল্পলেখকের অধিকারের মধ্যেই পড়ে।" তেমনি, তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ছোটগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের সম্পর্ক যে কী নিবিড়, তা দেখিয়েছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, গ্রন্থটি মূলত তত্ত্বমূলক। এবং তত্ত্বটি উপযুক্ত পরিমিত তথ্য বা দৃষ্টান্ত সহযোগে উপস্থাপিত। আবার, প্রয়োজনবোধে, নিজের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেছেন। বক্তব্য বা আলোচ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য লেখক য়ুরোপীয় ও বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারদের যেসব দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করেছেন, তাতে একটা কথাই বারবার মনে হয় যে, লেখক নিজে যেমন ছোটগল্পকার, এই শিল্পে যেমন তাঁর গভীর অধিকার, তেমনি য়ুরোপীয় ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তিনি স্বচ্ছন্দ বিবরণকারী পথিক। তাই এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, এমন একটি গ্রন্থ সাধারণভাবে ছোটগল্পের তত্ত্বের উপরে নতুন আলোকপাত। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হয়, পাণ্ডিত্য মননশীলতা ও আত্ম-অভিজ্ঞতার সমবায়ে আলোচনাটি কত গভীর অথচ কত সাবলীল। এখনো অনেকেরই ধারণা, দুর্বোধ্য ও পাদটীকা-কণ্টকিত না হলে বুঝি পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেল না। গ্রন্থটি তার ব্যতিক্রম।

গ্রন্থটি পড়তে পড়তে শুধু একটি কথা মনে হয়। সৌভাগ্যবশত, কথাটা লেখকের নিজের মুখ থেকেই শুনেছিলুম। আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলুম, আপনি য়ুরোপীয় গল্প ও গল্পকারদের দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, সেই অনুপাতে যদি বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারদের স্থান থাকত, তাহলে বোধহয় আলোচনাটি আরো মনোজ্ঞ বা উপভোগ্য হত।

তবু, আমাদের ধারণা, ছোটগল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ এক নতুন পথ-নির্দেশ করছে এবং সেই সূত্র ধ'রে আরো ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

স্বরলিপি

আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে॥
সে কি মূক বিরহস্মৃতিগুঞ্জরণে তন্দ্রাহারা ঝিল্লিরবে।
সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে॥
সে কি অবগুণ্ঠিত প্রেমের কুণ্ঠিত বেদনায় সম্বৃত দীর্ঘশ্বাসে।
সে কি উদ্ধত অভিমানে উত্তপ্ত উপেক্ষায় গর্বিত মঞ্জীরঝঙ্কারে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

[পা -া -না না । ধা -া]
সা সা II সা -া -পা পা । পা -া পা -হ্মা I গা -মা গা -া । -া -া -া -া I
আ জি কো ॰ ন্ সু রে ॰ বাঁ ॰ ধি ॰ ব ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I গা গপা পা পা । পা -া পা পা I পহ্মা -ধা পা -া । -া -হ্মা গা হ্মা I
দি ন॰ অ ব সা ॰ ন বে লা॰ ॰ রে ॰ ॰ ॰ আ জি

I পা -া -না না । ধা -া পা -হ্মা I গা -মা গা -া । -া -া -া -া I
কো ॰ ন্ সু রে ॰ বাঁ ॰ ধি ॰ ব ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I গা -পা পা পা । পা পা পা পা I পহ্মা -ধা পা -া । -া -া -া -া I
দী র্ ঘ ধূ স র অ ব কা॰ ॰ শে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পহ্মা -ধা ধা ধা । ধা ধা ধা ধা I ধা -পা -না না । না না ধা -পা II
স॰ ঙ্ গী জ ন বি হী ন শূ ॰ ॰ ন্য ভ ব নে ॰

পা পা II পা -গা গা গা । পা হ্মা ধা পা I ধা -র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া I
সে কি মূ ॰ ক বি র হ স্মৃ তি গু ন্ জ র ণে ॰ ত ন্

I র্সা -া -া র্সা । র্সা -া র্সা -না I ধা -না -র্সা র্সনা । ধপা -া র্সা র্সা I
দ্রা ০ ০ হা রা ০ ঝি ল্ লি ০ ০ র বে০ ০ সে কি

I র্গা -া র্গা র্গা । র্রা র্রা র্সা র্সা I র্সনা -র্রা র্সা র্সা । না -া না না I
বি ০ চ্ছে দ র জ নী র যা০ ০ ত্রী বি হ ঙ্ গে র

I ধা -া ধা -া । পা হ্মা গা -হ্মা I [ ] I
প ০ ক্ষ ০ ধ্ব নি তে ০

[সা রা গা]
-া -া II { গা পা পা পা । পা -া পা পা I হ্মা -ধা পা পা । পা -া হ্মা গা I
০ ০ সে কি অ ব গু ন্ ঠি ত প্রে ০ মে র কু ন্ ঠি ত

I গা -হ্মা পা -হ্মা । গা -া -া -া I গা -ধা পা পা । গা -া গা -রা I
বে ০ দ ০ না ০ ০ য্ স ম্ বৃ ত দী র্ ঘ ০

I গা -রা সা -া । -া -া (-া -া) } I র্সা র্সা I র্সর্গা -া র্গা র্গা । র্রর্গা র্গা র্রা -া I
শ্বা ০ সে ০ ০ ০ ০ ০ সে কি উ০ দ্ ধ ত অ ভি মা ০

I র্সা -া -া -া । না -া র্রা র্রা I র্সা -া র্সা -া । না -া -ধা -া I
নে ০ ০ ০ উ ০ দ্ধ ত উ ০ পে ০ ক্ষা ০ ০ য্

I ধা -া র্সা র্সা । না -া না নধা I ধা -া ধা -া । পা -হ্মা গা হ্মা II [ ] II
গ র্ বি ত ম ন্ জী র০ ঝ ঙ্ কা ০ রে ০ "আ জি"

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক
৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৫. সম্পাদক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পো : শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১ মার্চ ১৯৭১

স্বা: সুশীল রায়

JANUARY - MARCH 1971 Regd. No. R. N. 2700/57 Registered with the Registrar of Newspapers

এবছর
পঁচিশে বৈশাখে
এইচ এম ভির
শ্রদ্ধাঞ্জলি—
এপার বাংলার
নবীন ও প্রবীন
শিল্পীদের নতুন
রেকর্ড সংকলনের সংগে
ওপার বাংলার
শিল্পীদের গাওয়া
রবীন্দ্র সংগীতের
নতুন নতুন রেকর্ড :

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড

শ্যামল মিত্র
অক্রমবীর হৃদয় পারে ; সে কি ভাবে
গোপন রবে ; ওগো শান্ত পাষাণমুরতি ;
তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ঝরাপাতা গো, আমি তোমারি দলে ;
দিন যদি হল অবসান ;
আমি কান পেতে রই ; যদি তারে নাই চিনি গো

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে ;
উদাসিনীবেশে বিদেশিনী কে সে ;
বাধী মোর নাহি ; যদি প্রেম দিলে না প্রাণে

জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমার পরান যাহা চায় ; আজি মর্মরধ্বনি কেন ;
আমার মাথা নত করে ; আমার মিলন লাগি তুমি

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে ; সকলি ফুরালো স্বপন-প্রায়;
মাটির প্রদীপখানি ; তুমি কিছু দিয়ে যাও

সুচিত্রা মিত্র
মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে ; তব প্রেম সুধারসে
মেতেছি ; চোখের জলে লাগল জোয়ার ;
আয় আয়রে পাগল

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
মায়াবনবিহারিণী হরিণী ; শুভ্র নন্দিনী,
খোলো খো আঁখি ; চিনিলে না আমারে কি ;
সবার সাথে চলতেছিল

নীলিমা সেন
আজি ঝরঝর মুখর বাদর-দিনে ; বিদায় যখন
চাইবে তুমি ; আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে ;
আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

অপম গুপ্ত
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী ;
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে

বাঁশরি বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার মন বলে, চাই, চাই গো ;
কোথা হতে শুনতে যেন পাই

আরতি মুখোপাধ্যায়
সহে না যাতনা ; মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
হাওয়া লাগে গানের পালে ;
এ পরবাসে রবে কে হায়

সুশীল মল্লিক
মধুর মিলন ; তবে শেষ করে দাও শেষ গান

লং প্লেয়িং রেকর্ড

সঙস্ অব রবীন্দ্রনাথ—২য় খণ্ড
ওকে কেন কাঁদালি (সাগর সেন)
সতিমির রজনী, সচকিত সজনী (সুমিত্রা সেন)
এই উদাসি হাওয়ার পথে পথে (অর্ঘ্য সেন)
ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে (ঋতু গুহ)
ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না (সাগর সেন)
তোমারি ঝরণাতলার নির্জনে (সুমিত্রা সেন)
একী করুণা, করুণাময় (ঋতু গুহ)
এমনি ক'রেই যায় যদি দিন (অর্ঘ্য সেন)
কদম্বেরি কানন ঘেরি (সুমিত্রা সেন)
হে নিরুপমা (সাগর সেন)
দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে (ঋতু গুহ)
জাগরণে যায় বিভাবরী (অর্ঘ্য সেন)

"বাংলাদেশ"এর শিল্পীদের কণ্ঠে :

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড

সন্জীদা খাতুন/ফাহ্‌মিদা খাতুন
আসা যাওয়ার পথের ধারে (সন্জীদা খাতুন)
কাছে থেকে দূর রচিল (সন্জীদা খাতুন)
এখনো তারে চোখে দেখি নি (ফাহ্‌মিদা খাতুন)
ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় (ফাহ্‌মিদা খাতুন)

রাখী চক্রবর্তী/কলিম শরাফী
সখী, ভাবনা কাহারে বলে (রাখী চক্রবর্তী)
আহা আজি এ বসন্তে (রাখী চক্রবর্তী)
দিন পরে যায় দিন (কলিম শরাফী)
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (কলিম শরাফী)

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

ইফ্‌ফৎ আরা দেওয়ান
আমি রূপে তোমায় ; প্রভু বলো বলো

দি গ্রামোফোন কোম্পানী
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ইলেকট্রনিক, রেকর্ড ও জনরঞ্জনে
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী
ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)

GC 6466

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় কর্তৃক প্রকাশিত • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯
চিত্র ও মলাট মুদ্রক • রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট • ৭/১ বিধান সরণী • কলিকাতা ৬

বর্ষ ২৭ · সংখ্যা ৪

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮

সম্পাদক

শ্রীসুশীল রায়

এই চা-ই
চায়ের ব্যাপারে, যাই ... আমি একটু খুঁতখুঁতে। চা হবে রীতিমত ভালো এবং কড়া ···যেমন রিচব্রু।
স্বাদেও সেরা, গন্ধেও সেরা। রিচব্রুর প্রতি প্যাকেটে চা হবে কাপের পর কাপ, কাপের পর কাপ।
বাড়িতে বাড়িতে এখন দেখবেন হালফ্যাশানের হাওয়া এনেছে রিচব্রু।
দিবি
মেজে ভরা
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA
RICHBRU TEA
রিচব্রু
একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদে গন্ধে ভরপুর
লিপটন ... ভালো চা

প্রতিটি পদক্ষেপ
আনন্দের...
বাটা সিতারা
হালকা আর হাওয়া
খেলানো...বাটার এই স্যান্ডাল
পায়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
এক আশ্চর্য পরিতৃপ্তি
বাটা সিতারার ছিমছাম ও
কোমল গড়ন দেখে বোঝা
যায়, এদের নির্মাণ ও
নকশার প্রধান লক্ষ্য :
সারাদিনের স্নিগ্ধ আরাম।
লাবণ্যময় সিতারা সব
সাজেই মানানসই। এখানে
তারই কয়েকটি নকশা
যেগুলি এখন বাটার দোকানে
পাওয়া যাচ্ছে। আজই
আসুন পছন্দমতো
একজোড়া বেছে নিন।
সিতারা
সাইজ ২-৭
৮.৯৫, ৯.৯৫,
১২.৯৫

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮ · ১৮৯৩ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

বীরা দেবী

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণ পাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্তদ্বারে॥

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধা-ঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো;
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো॥

দিন পরে গেছে দিন মাস পরে মাস,
তোমা হ'তে দূরে ছিল আমার আবাস।
"হবে হবে দেখা হবে"
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে॥

আমারো যাবার কাল এলো শেষে তাকি
"হবে হবে দেখা হবে" মনে ওরে রাখি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নব জ্যোতি-দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে মনে জাগে॥

এখানে লোকের ভোর ভীর দুলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি'
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি॥

তাই বলি দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়
তাহেও করি নে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি
তার বেশি যেন নাহি থাকি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ ভাদ্র
১৩৪১
শান্তিনিকেতন

এই বৎসর অতুলপ্রসাদ সেনের (১৮৭১ - ১৯৩৪) জন্মশতবর্ষপূর্তি। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে কবিতা রচনা করেন এই উপলক্ষে আমরা এই সংখ্যার আরম্ভে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে কবিতাটি মুদ্রণ করে অতুলপ্রসাদের স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভগবৎভক্তিমূলক সংগীত, প্রেমসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করে অতুলপ্রসাদ গীতিকাররূপে সম্মানিত ও স্মরণীয় হয়েছেন। তাঁর রচিত গান 'গীতিগুঞ্জ' গ্রন্থে সংকলিত আছে। লখনউ'তে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি সেখানকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে বঙ্গভাষার সেবা করে গিয়েছেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর নামে একটি 'হল' প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন, এ ছাড়া তাঁর জীবিতকালেই লখনউ'তে তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অন্তরঙ্গ। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের যে রচনা এখানে মুদ্রিত হল তার থেকে এই অন্তরঙ্গতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের কথা মনে পড়ছে। ২৫শে বৈশাখে জন্মোৎসব যথারীতি হয়ে গেছে, শান্তিনিকেতন আশ্রম ছেড়ে অধ্যাপক-ছাত্র সকলে যে যার বাড়ি চলে গেছেন। ছুটির মধ্যে গরমের কষ্টভোগ না করে বাবা স্থির করলেন রামগড় পাহাড়ে গিয়ে থাকবেন। দার্জিলিং নৈনিতাল আলমোড়া সিমলা প্রভৃতি এত খ্যাতনামা শৈলবাস থাকা সত্ত্বেও আমরা রামগড়ের মতো অচেনা-অজানা পাহাড়ে যেতে গেলুম কেন তার কৈফিয়ত বোধ করি দেওয়া দরকার।

বছরখানেক আগে একদিন খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়ল। নৈনিতালের কাছে রামগড় নামে এক পাহাড়ের উপর একটি বাগানবাড়ি বিক্রি আছে। বাড়িটার নাম স্নো-ভিউ। বাগান বস্ত বড়ো, তিন শো বিঘা জমি নিয়ে আপেল পেয়ারা পীচ খোবানি আখরোট প্রভৃতি ভালো ভালো ফলের গাছ লাগানো। একেবারে তৈরি বাগান, ভারি লোভ হল কিনতে। সেইদিনই সন্ধের ট্রেনে ছুটলুম সেই বাগিচার সন্ধানে। রামগড় কোথায় জানা ছিল, কেদারবদরীর হাঁটাপথে যেতে ওখানকার একটি ছোটোখাটো হোটেলে বহুপূর্বে একবার রাত্রিবাস করেছিলুম; জায়গাটি কাঠগুদাম থেকে আলমোড়া যাবার পুরানো পথের ধারে একটি চটি মাত্র। সাহেবরা তখন ঐ অঞ্চলে শিকার করতে প্রায়ই যেত বলে সাহেবদেরই কোনো পেন্সনভোগী বাবুর্চি সেখানে হোটেল খুলেছিল। কিন্তু বিজ্ঞাপনের স্নো-ভিউ জানবার কোনো উপায় তাড়াহুড়োর মধ্যে আবিষ্কার করতে পারি নি। একরকম করে খুঁজে বের করতে পারব ভরসা নিয়ে কাঠগুদামে ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার পিঠে চড়ে রামগড়ের উদ্দেশে

সকালবেলায় বেরিয়ে পড়লুম। রামগড় কাঠগুদাম থেকে ১৬ মাইল, সবটাই চড়াই, ঘুরে ঘুরে রাস্তা উঠেছে সাত হাজার ফুট উপরে। পাহাড়ি ঘোড়া অক্লেশে এই চড়াই ভেঙে আমাকে নিয়ে চলল। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে সহিসকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সদর রাস্তা ছেড়ে শীঘ্র পৌঁছানো যায় এমন পাকদণ্ডী আছে কি?' সে ঘোড়ার মুখ ধরে পাইন বনের ভিতর দিয়ে একটা চলাপথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আমাকে ভরসা দিল, 'ঘোড়া এখন ঠিক নিয়ে যাবে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এই চড়াই ঘোড়ার সঙ্গে সমানে আমি উঠতে পারব না।' বনের মধ্য দিয়ে অজানা পথে একাই চললুম। পথ আর ফুরোয় না, উঠছি তো উঠছি। বেলা বাড়তে লাগল, বারোটা বাজল, একটা বেজে গেল, ঘোড়া তবু চলছে। পথ হারিয়ে ফেলেছে মনে করে যখন হতাশ হয়ে পড়েছি তখন হঠাৎ দেখি পাহাড়ের শিখর ডিঙিয়ে অপর দিকে এসে পড়েছি— সামনে বরফের পাহাড়শ্রেণী চোখের সামনে ঝকঝক করছে। ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসের উপর বসে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলুম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অনতিদূরে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ি যখন আছে, এখানে লোকজনেরও সন্ধান মিলবে মনে করে এগিয়ে গেলুম। বাড়ি বন্ধ, তবে বাগানে দু-একজন মালি কাজ করছিল। তারা বলে দিল এইটাই স্নো-ভিউ। ঘোড়া তাহলে আমাকে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে। ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাগান সব দেখলুম। ভারি ভালো লাগল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ করল।

আহারের সন্ধানে গেলুম হোটেলে। সেখানে রাত কাটিয়ে তার পরদিন বিল দিতে গিয়ে দেখি পকেটে যা টাকা আছে হোটেলের খরচ দিয়ে যা বাঁচবে তাতে কলকাতায় ফেরবার ট্রেনভাড়া কুলোবে না। তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, যথেষ্ট টাকা আনা হয় নি। সোনার আংটি ও হাতের ঘড়ি বাঁধা রেখে হোটেলের মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে কোনো রকমে কলকাতায় ফিরে আসি। বাবাকে জায়গাটার বর্ণনা দিতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। স্নো-ভিউ কেনা হয়ে গেল। নামটা বাবার পছন্দ হল না। বদলে তিনি নতুন নাম দিলেন 'হৈমন্তী'।

পরের বছর গ্রীষ্মাবকাশে সকলে মিলে সেই প্রথম যাওয়া হল 'হৈমন্তী'তে। দিনেন্দ্র ও মুকুল দে-কে নিয়ে আমি কিছুদিন আগেই বেরিয়ে পড়েছিলুম হিমালয়ভ্রমণে। বদরিকাশ্রম তীর্থদর্শন করে যখন রামগড়ে এলুম তখন দেখি 'হৈমন্তী' বাড়ি ভর্তি। বাবার সঙ্গে অনেক লোকজন। আমাদের পরিবারের সকলে তো আছেই, তা ছাড়া লখনৌ থেকে এসেছেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও পরে এলেন সি. এফ. অ্যান্‌ড্রুজ। বাড়ি জমজমাট, দিনেন্দ্রের আগমনে আরো জমে উঠল। গল্পগুজব, হাসি ও গানের বিরাম রইল না। আহারাদির প্রাচুর্যের অভাব হয় নি। নিজেদের বাগান থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সবজি ও নানাবিধ ফল যথেষ্ট আমদানি হতে লাগল। এত স্ট্রবেরি কখনো খাই নি, খেয়ে শেষ করতে পারা যেত না বলে স্ট্রবেরির টক, স্ট্রবেরি দিয়ে মুগের ডাল— নানান উপায় আবিষ্কার করতে হত ফলগুলি সদ্‌ব্যবহার করার জন্য।

সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ— এক জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ। 'হৈমন্তী'তে গানের ফোয়ারা ছুটল। বাবা অন্য কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন— বাবা নির্ভয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাকে একবার নতুন সুর শোনালেই সে মনে রাখবে। তাই মনের আনন্দে বাবা গান বাঁধতে লাগলেন।

অতুলপ্রসাদ সেন

বাগানের এক কোণে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মতো ছিল। সকালবেলায় সেখানে আমাদের আড্ডা বসত। স্থানটি অতি সুন্দর, সকলের ভারি পছন্দ। পিছনে পাহাড় খাড়া উঠে গেছে, চুড়ো পর্যন্ত গভীর বনের আচ্ছাদন। তাতে বড়ো বড়ো পুরানো ওক গাছ, তার ডালপালা মস্‌-এ ঢাকা, আর তারই মাঝে কত রকমের অর্কিড ফুল ফুটে থাকে। আমরা বসতুম উত্তর-মুখ করে। সেদিকটা খোলা। বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সামনের পাহাড়গুলি যেন ঢেউয়ের মতো এগিয়ে চলেছে তিব্বতের দিকে। ঢেউগুলি যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সেখান থেকে আকাশ ভেদ করে উঠেছে তুষারাবৃত পর্বতমালা প্রাচীরের মতো দিগন্ত ব্যেপে। কেদারনাথ বদরীনাথ নন্দগিরি পঞ্চচুলি— আরো কত হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গশ্রেণী তাদের দুরারোহ অঙ্গ বিস্তার করে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে, তাদের অলৌকিক সৌন্দর্যে আমাদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে। যে-পাহাড়ের গায়ে আমরা বসে থাকতুম, তার ঢাল দ্রুত নেমে গেছে বহু নীচে নদী পর্যন্ত। নদীর জল দেখা যায় না— কেবল কানে এসে পৌছায় তার ক্ষীণ ঝিরঝির শব্দ।

নতুন গান কি বাঁধা হয়েছে শোনবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে বসে থাকি। অতুলবাবুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে বাবা দিনেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোকে কাল যেটা শেখালুম, তুই-ই গেয়ে দে-না, আমার কি ছাই এখন মনে আছে।' দিনেন্দ্র গান ধরেন, একটা শেষ হলে আর-একটা, অতুলপ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে পুরানো গান থেকে গাইতে বলেন তাঁর যেগুলি বিশেষ ভালো লাগে। বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে বলেন, 'তোমার আশ তো মিটল, এখন আমাদের আশ মেটাও, আমরা এবার তোমার গান শুনি।' অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর মিষ্টি গলায় গানের পর গান গেয়ে যান। বনমালী যতক্ষণ না 'খেতে যে হবে' বলে সভা ভেঙে দেয় ততক্ষণ গান আর বন্ধ হয় না।

মনে পড়ে অতুলপ্রসাদ একদিন বাবাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি কাল যে সুরটি গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড়ো ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ঐ গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন।' বাবা বললেন, 'সেটা যে দিনুকে এখনো শেখানো হয় নি, তা হলে আমাকেই গাইতে হয়।' বাবা গাইলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর॥
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর॥

সকালবেলায় ঘাসের উপর তখনো শিশির লেগে আছে। পুব দিকের পাহাড়ের উপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলছে পাতায় পাতায়। প্রকৃতির সেই প্রফুল্লতা, গানের কথা, গানের সুর— সব মিলে একটি অপরূপ রস সৃষ্টি করল। শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে গানটি বারবার গাইতে বললেন। যতবার গাওয়া হয়, তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর-একবার শোনবার জন্যে আকুল হয়ে পড়েন।

বাবা প্রতিদিন নতুন গান রচনা করতে লাগলেন আর আমরা বাগানের এক প্রান্তে গুহার সামনে আখরোট গাছতলায় বসে সেই গান শুনতে লাগলুম। বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে গাইতেন, তাঁর গানে গাছপালা পাহাড় যেন কেঁপে উঠত। অতুলপ্রসাদের গলা যেমন মিষ্টি, গাইবার ধরণও ভারি সুন্দর। সবচেয়ে ভালো লাগত তিনি যে-আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবে বিভোর হয়ে গান করতেন। বাবা ও অতুলপ্রসাদ দু-জনেই যখন শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন দিনেন্দ্রনাথের পালা শুরু হত। দিনের পর দিন এইরকম গানের উৎসব চলত সারা সকালবেলা।

জিজ্ঞাসা -কর্তৃক প্রকাশিত রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে প্রকাশকের সৌজন্যে মুদ্রিত।

অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতা

কেতকী কুশারী ডাইসন

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দী থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় আদি-ইংরেজী বা অ্যাংলোস্যাক্সন পর্যায় হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আধুনিক ইংরেজীর জননী অ্যাংলোস্যাক্সন ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা, টিউটনিক বা জার্মানিক গোষ্ঠীর অন্যতম। অন্যান্য সাহিত্যে যেমন, তেমন অ্যাংলোস্যাক্সনেও কবিতা গদ্যের পূর্ববর্তী। ব্রিটেনের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন অ্যাঙ্গল্, স্যাক্সন এবং জুট আগন্তুকদের সামাজিক জীবন ছিল গোষ্ঠীপ্রধান। গোষ্ঠীকে বলা হত cyn (আধুনিক kin); বিপদে-আপদে গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে যিনি নেতৃত্ব করতেন, গোষ্ঠীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন, তাঁকে বলা হত cyning (অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি, এই শব্দটিই পরে kingএ রূপান্তরিত হয়েছে)। এই সমাজে গোষ্ঠীপতির প্রতি গোষ্ঠীর মানুষদের প্রেম এবং আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি ছিল; এবং বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল কবির, যিনি ছিলেন গোষ্ঠীর প্রবক্তা, তার ইতিহাসরচয়িতা, তার ঐতিহ্যের সংরক্ষক, তার মন্ত্রের উদ্‌গাতা। গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে অ্যাংলোস্যাক্সন কবির কথা ভাবা যায় না। গোষ্ঠীপতি যদি গোষ্ঠীর দয়িত প্রভু, কবি তবে গোষ্ঠীর প্রাণের স্পন্দন। সান্ধ্য ভোজনের জন্য সবাই মিলিত হতেন বিরাট কক্ষে; পানপাত্রে ঢালা হত মাধ্বী; হার্পে ঝংকার দিয়ে কবি গান বাঁধতেন, মুখে মুখে রচনা ক'রে সবাইকে শোনাতেন অতীতের উদ্দীপক কীর্তিকলাপের কথা; বীরত্বের বা বিষাদের, বিচ্ছেদের বা বিজয়ের গাথা; লৌকিক উল্লাস বা তার চেয়েও বড় অলৌকিক দুঃখের স্মৃতিকাহিনী; বিবাদের বা সংগ্রামের অর্থগর্ভ ইতিহাস।

অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতা মৌখিক রীতির। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে অনেক আদৃত রত্ন কালের গর্ভে লুপ্ত হয়েছে। যেটুকু জ্ঞাত সেটুকু সর্বসমেত চারটি পুঁথিতে বেঁচে আছে। বর্তমান পুঁথিগুলিতে আশ্রয় পাবার আগে কবিতাগুলি কতবার এক পুঁথি থেকে অন্য পুঁথিতে প্রতিলিপিবদ্ধ হয়েছে, লিখিত রূপের আর মূল মৌখিক রূপের তারতম্য কতটা হতে পারে, এসব অনিশ্চিত। পুঁথিগুলি অ্যাংলোস্যাক্সন সমাজের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পরেকার মঠ-নির্ভর সংস্কৃতির অবদান। সেগুলিতে যাঁদের হস্তলিপি দেখতে পাই তাঁরা খুব সম্ভব সন্ন্যাসী লিপিকর ছিলেন। কিছু রচনা তাঁরা মূল রচয়িতাদের কাছ থেকে শুনে লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু নিশ্চয় অনেক রচনাকেই তাঁরা পেয়েছিলেন লোকপরম্পরায় আগত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত আকারে। "অনেক দিন আগে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, এখনও তার কাহিনী মানুষের মনে আছে"— অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতাতে এ কথাটা বারে বারে শোনা যায়। অ্যাংলোস্যাক্সন জাতির ব্রিটেনে আসার আগেকার ইয়োরোপবাস এবং যাযাবরত্বের স্মৃতি স্বভাবত কবিতায় বিধৃত রয়েছে।

যেহেতু মৌখিক ঐতিহ্যের কবিতা, তাই অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতায় ফরমুলাধর্মী বাক্যাংশ, পুনরুক্তি বা প্রায়-পুনরুক্তি, একই উক্তির ঈষৎ পরিবর্তিত আকারের সাহায্যে একটি ভাবের সম্প্রসারণ, ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। স্বতঃস্ফূর্ত রীতির শিল্পে শিল্পীকে সব সময় কিছু হাতে রাখতে হয়। বর্তমানকে

পরিবেশন করতে করতে একই সঙ্গে চট্ ক'রে পরবর্তীকে ভেবে নিতে হয়— একটু এগিয়ে, আবার একটু পিছিয়ে, একটু ফিরে তাকিয়ে, বার বার সমে এসে তাঁকে যাত্রা করতে হয়, যেমন আমাদের রাগসংগীতে। অ্যাংলোস্যাক্সন কবির শব্দবয়নের ক্ষুদ্রতম নকশা একটি অর্ধ-পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক অর্ধ-পঙ্‌ক্তিতে দু'টি প্রধান ঝোঁক; প্রত্যেক অর্ধ-পঙ্‌ক্তির পর যতিপাত। মাত্রাগণনা নয়, ঝোঁকই অ্যাংলোস্যাক্সন কাব্যছন্দের ধর্ম। মাত্রার সংখ্যার কোনো স্থিরতা নেই— পঙ্‌ক্তি খুব ছোট অথবা বেশ বড় হতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণ পঙ্‌ক্তিতে চারবার ঝোঁক, এবং সাধারণত ঝোঁকের সঙ্গেসঙ্গে শব্দের আদিতে অনুপ্রাস (সাধারণত তিনবার, প্রথম অর্ধ-পঙ্‌ক্তিতে দুবার, দ্বিতীয় অর্ধ-পঙ্‌ক্তিতে একবার) এই কবিতাকে শক্তিশালী ছন্দ দেয়। জার্মানের মতো অ্যাংলোস্যাক্সন সমাসবদ্ধ শব্দ গড়া পছন্দ করে; এবং এর কবিদের বিশেষ প্রিয় এক ধরণের সংহত রূপকধর্মী সমস্তপদ, যেমন 'সমুদ্র' অর্থে 'তিমিপথ', 'শরীর' অর্থে 'অস্থিগৃহ'।

পৃথিবীতে কবিতার অনুবাদ যত, কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে মতামতও বোধ হয় তত। তাঁর 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদিও বলেছিলেন যে তিনি যখন বিদেশী কবিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর মনে কোনও মতের বালাই ছিল না, কর্মপ্রবর্তনা পেয়েছিলেন সাময়িক ভালো লাগা থেকে, তবুও কাব্যানুবাদের নীতি নিয়ে তিনিও যে মাথা ঘামিয়েছিলেন তার প্রমাণ তো ভূমিকাটিই; না ঘামিয়ে উপায় কী যখন "যে-উদ্যমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে"।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এ কাজের আনন্দ এক দেশের চারাকে অন্য দেশের মাটিতে রোপণের আনন্দ; এবং ঠিক যেমন বিলেতে বসে লঙ্কা ফলাতে পারলে বাঙালীর বিমল আনন্দ হয়, ঠিক তেমন বিদেশী ভাবনা-চিত্রকল্পকে বাংলা শব্দের গ্রন্থিতে আটকাতে পারলে বিশেষ তৃপ্তি হয়। 'আটকানো' কথাটার উপর জোর দিতে চাই— বাংলা হবে, কিন্তু বিদেশী একটা ছোঁয়াও থাকবে, নইলে আর অনুবাদ ক'রে লাভ কী। ঐ বিলেতে লঙ্কা যেমন— যেন চেনা যায় ভিন্‌দেশী চারা, তার জন্য অতিরিক্ত যত্ন-আত্তি চাই, শীতের করাল স্পর্শ থেকে সরিয়ে টবশুদ্ধ ঘরে আনা চাই।

এক এক ভাষার পিছনে থাকে এক এক গোটা সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনার ধ্যানধারণার জীবনবীক্ষার জটিল বুনট। 'বৃষ্টি' আর 'rain' যদিও অভিধানের বিচারে সমার্থক, ঐ দুই ভাষার অনুষঙ্গে তারা এক ব্যঞ্জনা বহন করে না। ভাবনাজগতে-ভাবনাজগতে যত ব্যবধান, দুই জগতের মধ্যে অনুবাদের চ্যালেঞ্জও তত বড়। যখন অনূদিত সাহিত্য পড়ি তখন তার মধ্যে যা খুঁজে থাকি, স্বভাবতই আমার চেষ্টা হবে নিজের অনুবাদকর্মে তা যোগান দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন ইংরেজীর মাধ্যমে পৃথিবীর অপর কোনো সাহিত্যের অনুবাদ পড়ি, তখন অনুবাদকের কাছ থেকে আগাগোড়া অনাড়ষ্ট স্বচ্ছন্দ ইংরেজী আমি মোটেও প্রত্যাশা করি না— বরং বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দেখলে মূলের রস কতটা পাচ্ছি সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ি। কারণ আমার আগ্রহ যতটা সম্ভব মূলকে জানবার, অনুবাদ সেক্ষেত্রে আমাদের মিলনঘটকমাত্র, এবং ঠিক যেখানে দুই ভাবনাজগতের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর, যেখানে অনুবাদ কঠিনতম, সেখানে আমি প্রত্যাশা করি যে আছাড় না খেলেও অন্তত একটু হোঁচট খাব, অর্থাৎ অনুবাদের মধ্যে এমন কোনো চেষ্টা থাকবে যার দ্বারা আমি ভিন্ন জগৎটির ইঙ্গিত পাব, যেন হঠাৎ বুঝতে পারব

ঘোমটায় শান্তিপুরী পাড় হলে হবে কি, তার আড়ালে চুলের রঙ কালো নয়, সোনালী— এই ভিন্‌দেশী ভাবনার খাঁটি স্পর্শটুকু না থাকলে অনুবাদ পড়াই বৃথা মনে হয়। সে মুহূর্তে অনুবাদক যদি তাঁর দ্বন্দ্বকে উদ্‌ঘাটন না ক'রে বরং এড়িয়ে যান, বন্ধুরতাকে মসৃণ ক'রে দেন, বিদেশীকে একেবারে দেশী বানিয়ে ফেলেন, তাহলে যে উদ্দেশ্যে অনূদিত সাহিত্য পড়ি— অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ— তা-ই হয় না।

অনুবাদককে যুগপৎ মূলের সত্যরক্ষা এবং অনুবাদের ভাষার ধর্মরক্ষা করতে হয়, এবং দুটির প্রতি সমদর্শী হওয়া যে কত দুরূহ তা যিনি সেক্ষেত্রে প্রযত্ন করেছেন শুধু তিনিই জানেন; কিন্তু যখন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয় এবং একটি সামগ্রিক বিচার ক'রে অনুবাদককে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, তখন আমি প্রত্যাশা করি যে অনুবাদক মনে রাখবেন তিনি অনুবাদ করছেন, অর্থাৎ অচেনাকে চিনিয়ে দেবার ভার স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিয়েছেন, এবং এইরকম দ্বন্দ্ব-উত্তরণের নিকষেই তাঁর মূলানুবর্তিতা বা চিনিয়ে দেবার ক্ষমতা যাচাই হবে। পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়: অনুবাদের ভাষাটি তো আমার জানা, তাতে কিছুটা আকস্মিকতা এলে কিছু আসে যায় না, কিন্তু মূলকে যে আমার যথাসম্ভব জানতেই হবে। তাই অনুবাদককে আমি যদিও অবশ্যই তাঁর ভাষার ধর্মনাশ করতে বলি না, তবুও সে ধর্মের সম্প্রসারণ করতে বলি, এমন সম্প্রসারণ যার ফলে ভিন্‌দেশী ভাবনাকে তার ব্যঞ্জনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জীবিত ভাষা আর যা-ই হোক অনমনীয় নয়, বরং নমনীয়তার কারণেই সে জীবিত, এবং প্রয়োজন হলে অনুবাদকের উচিত ভাষাকে ঠিক তেমন সযত্নে, ভালোবেসে, বাঁকানোর চেষ্টা করা, যেমন স্বর্ণকার বাঁকান সোনাকে, বস্তুত যেমন শিল্পীমাত্রেই বাঁকান তাঁর মাধ্যম বা উপকরণকে।

প্রায়ই যখন শুনি: "দেখতে হবে জিনিসটা বাংলা হচ্ছে কি না, বাংলায় কবিতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না," তখন মনে হয়, একটি অনূদিত কবিতা আগাগোড়া প্রচলিত অর্থে বাংলা হবে, বাংলা কবিতা হবে, এ অবাস্তব আবদার। বাংলা কবিতা পড়ার উদ্দেশ্যেই কেউ কি অনূদিত কবিতা পড়েন, না, বিদেশী চিন্তার ভাবানুষঙ্গের চিত্রকল্পের স্বাদ পেতে? অনুবাদের বাংলা সর্বত্র আমাদের পরিচিত বাংলা হতে পারে না, কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে বাংলা হতে পারে, যাতে নূতন দ্যোতনা সংযোজন করার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা না ক'রে পারলাম না এই কারণে যে যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায় লেখেন: "বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ অকাট্য", তখন বাক্যটির মধ্যে যে সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ্য সত্যটুকু আছে সেটুকু মেনে নেবার পর সংশয় জাগে: বস্তুত এখানে 'অকাট্য' শব্দটির অর্থ কি এবং 'বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধ' বলতেই বা তিনি কি বুঝেছিলেন। শিল্পকর্মে তথা জীবনে এমন ক'টি নিয়ম আছে যা সব পরিস্থিতিতেই অকাট্য? অচিন্তিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হলে— যা বিরল নয়— নিয়মরক্ষাই কি কর্তব্য, না, নিয়মের পরিবর্তন, নিদেনপক্ষে তার নবব্যাখ্যা? অর্থাৎ নিয়মপালনের মত নিয়মখণ্ডন এবং নূতন নিয়মের উদ্ভাবনও যে মানুষের ধর্ম তা যেন বিস্মৃত না হই; এবং বঙ্গীয় আদর্শের বিধিনিষেধও যেহেতু কোনো তালিকাভুক্ত সমষ্টি নয়, বঙ্গীয় লেখক এবং পাঠকেরা সে সম্পর্কে একমত নন, মতভেদ রীতিমত সোচ্চার, তখন অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় যে আদর্শ একটি নয়, অনেক।

অনুবাদকের পক্ষে আগে-থাকতে নির্দিষ্ট স্বদেশীয় আদর্শ সর্বদা সামনে খাড়া রাখার মুশকিল এই যে, ঠিক যেখানে তাঁকে এমন রাজ্যের পরিচয় দিতে হবে যেমনটি তাঁর স্বদেশীয় পাঠকদের কাছে অজানা বা অল্প-

জানা, ঠিক সেখানেই নির্দিষ্ট আদর্শের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে অনুবাদক হিসাবে তিনি মার্গভ্রষ্ট হতে পারেন ; ঠিক সেখানেই হয়তো তাঁর কর্তব্য আপন আদর্শের সঙ্গে নতুন ক'রে বোঝাপড়া করা, যাতে আপাতত আদর্শবহির্ভূত মনে হলেও তাঁর ক্রিয়া পরিবর্ধিত আদর্শের অন্তর্গত ব'লে বিবেচিত হতে পারে। স্বদেশীয় আদর্শের বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ অনুসরণ করার এবং স্বদেশীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ সুখপাঠ্য হওয়ার পরেও কোনো অনুবাদ মূলের পরিচয় কতখানি বহন করছে সে সম্পর্কে তর্ক নিশ্চয়ই উঠতে পারে। সম্প্রতি ব্রিটেনে এই তর্কই উঠেছে Fitz Gerald-এর জনপ্রিয় এবং বহুপঠিত ওমর খৈয়ামের অনুবাদ সম্পর্কে।

সুতরাং, যদিও আমি অবশ্যই মধ্যে মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করেছি : "এটা কি বাংলায় চলবে ?" তবুও এই ভাবনা আমাকে সাংঘাতিকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা পীড়িত করে নি, বরং বলা চলে "আচ্ছা, এ কথা বাংলায় বললে কেমন শোনাবে ?" এই কৌতূহলই আমাকে বর্তমান অনুবাদে প্ররোচিত করেছে। কোনো কোনো বিদেশী চিন্তা বাংলায় অদ্ভুত ঠেকতে তো পারেই, এবং সে-ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য : পাঠক জানুন বিদেশীরা এইরকম বিদ্‌ঘুটে চিন্তা ক'রে থাকেন। অদ্ভুতত্বের আকর্ষণেই তো আমাদের বিদেশ-যাত্রা ; বিদেশেও যাব অথচ কখনোই অবাক হব না, তা কি হয় ?

সৌভাগ্যবশত, অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতার ছন্দে যেহেতু মাত্রাগণনার বালাই নেই, সেহেতু আমাকেও মাত্রা গুণতে হয় নি এবং নিছক পাদপূরণের খাতিরে কোনো গোঁজামিল দিতে হয় নি। বাংলা ঝোঁকপ্রধান ভাষা নয়, কিন্তু বাঙালীদের স্বভাবগুণেই হোক, কীর্তনে কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত রচনার রীতি বেশি দিন আগেকার ইতিহাস নয় ব'লেই হোক, মিনমিন ক'রে কবিতা পড়া বাঙালী সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি ; কবিতা চেঁচিয়ে পড়তে আমরা ভালোবাসি, এবং যেখানে জোর দেওয়া দরকার সেখানে জোর দিতে লজ্জা পাই না। বাংলায় 'কবিতা আবৃত্তি করা'র এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে অ্যাংলোস্যাক্সনের ঝোঁকপ্রীতির কাছাকাছি এফেক্ট আনতে চেষ্টা করেছি।

অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতার ধ্বনিপৌরুষ এবং অনুপ্রাসধর্মিতার আভাস দিতে সংস্কৃত শব্দ পরম সহায়ক। কৌতুকের বিষয় এই যে কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির মূল ধ্বনির অনুপ্রাস বজায় রেখে বরং বাংলায় অনুবাদ করা সহজ আধুনিক ইংরেজীর চাইতে। উদাহরণস্বরূপ :

hreran mid hondum　　hrimcealde sæ

আধুনিক ইংরেজীতে আক্ষরিক অনুবাদ :

stir with hands　　the rime-cold sea

একজন আধুনিক অনুবাদক অনুবাদ করেছেন :

trouble with oars　　ice-cold waters

এখানে অনুপ্রাস মারা গেল এবং হাতের বদলে দাঁড়ের কথা তোলাতে কবিতার জোর কমে গেল। আমি কিন্তু অনায়াসেই অনুবাদ করতে পেরেছি :

হাত দিয়ে হাতড়াতে হবে　　হিমশীতল সমুদ্র

'হ'-এর উপর অনুপ্রাস বজায় রইল, তর্জমাও যথাযথ হল। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, এরকম দৃষ্টান্ত খুব বেশি নয়। মূলে ঠিক যে ধ্বনির উপর অনুপ্রাস আছে তর্জমাতেও ঠিক সেই ধ্বনির উপর অনুপ্রাস

খুব কম ক্ষেত্রেই রক্ষা করা যায়। অর্থহানি না ক'রে পূর্ণপঙ্‌ক্তিতে বার তিনেক অনুপ্রাস দেওয়া যায় কি না, সাধারণত এটাই অনুবাদককে ব্যস্ত রাখে। তাই কদাচিৎ কোনো পঙ্‌ক্তিতে অনুপ্রাসের মূল ধ্বনিকে বাংলায় টেনে আনতে পারলে অতিরিক্ত আনন্দ পাওয়া যায়।

অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতার আধুনিক ইংরেজী অনুবাদের কাজে অনুপ্রাস দেবার সুবিধা-অসুবিধা সম্ভবত সমান ওজনের। একদিকে অ্যাংলোস্যাক্সন-জাত অনেক শব্দ বর্তমান ইংরেজীতে চালু বলে সহজেই তাদের ব্যবহার করা চলে; আবার, অন্যদিকে অনেক অ্যাংলোস্যাক্সন শব্দ বর্তমান ইংরেজীতে জীবিত নয় ব'লে এবং বর্তমান ইংরেজী প্রতিশব্দবিরল ভাষা ব'লে অনুপ্রাস যোগানো বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম সুবিধাটি স্বভাবত পাওয়া যায় না, কিন্তু বাংলার সংস্কৃতাশ্রয়ী প্রতিশব্দবহুলতা সে অসুবিধা পুষিয়ে দেয়। অবশ্যই মধ্যে মধ্যে বাংলা এবং অ্যাংলোস্যাক্সন উভয় ভাষায় বর্তমান সাধারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় শব্দ পাওয়া যায় এবং অনুবাদে তাদের সদ্ব্যবহার করা যায়: treow (আধুনিক tree), তরু; medo (আধুনিক mead), মধু (বিশেষত 'মধুজাত মদ্য' অর্থাৎ 'মাধ্বী' অর্থে প্রযুক্ত); nihtscua, নক্তচ্ছায়া। swefna cyst বর্তমান ইংরেজীতে the best of dreams কিন্তু বাংলায় অনায়াসে 'স্বপ্নশ্রেষ্ঠ'; up-rodor বর্তমান ইংরেজীতে upper sky (বা firmament), বাংলায় 'ঊর্ধ্ব-রোদসী'। তেমনি উল্লেখযোগ্য soth-gied—সত্য-গীত বা সত্য-গাথা।

একটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ না ক'রে পারছি না যার অনুবাদ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে রীতিমত উপভোগ্য:

nearo nihtwaco æt nacan stefnan
narrow ('কঠিন' অর্থে) night-watch at the boat's prow

আধুনিক ইংরেজীতে প্রথম অর্ধ-পঙ্‌ক্তিটি প্রায় অবিকল পাওয়া গেল; কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধ-পঙ্‌ক্তিতে এসে অনুপ্রাস রক্ষা করা গেল না। এদিকে, যদিও nearo বা waco-কে বাংলায় পাই না, তবু niht এবং naca-কে পাই, এবং nearo-র আত্মীয় না হয়েও 'নিদারুণ' অর্থের দিক থেকে একেবারে তার কাছাকাছি। তাই লেখা গেল:

নিদারুণ নক্তজাগরণ নৌকার কণ্ঠদেশে

মূলের 'ন' ধ্বনির অনুপ্রাস তিনবারই বজায় রইলো!

তবুও, অ্যাংলোস্যাক্সন কবিতায় অনুপ্রাসের চেয়েও ছন্দের সামগ্রিক উদাত্ত রূপটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই অনুপ্রাস যেখানে সম্ভব হয়েছে দিয়েছি, কিন্তু অনুপ্রাস দেবার খাতিরে ভাব বা চিত্রকল্পের মৌলিক পরিবর্তন করি নি।

পরবর্তী রচনাটি দীর্ঘকাব্য 'বেওউল্‌ফ্‌'এর অংশ। কাব্যটি বেওউল্‌ফ্‌ নামক বীরের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে; কাব্যে বিবৃত কাহিনীর ঘটনাস্থল ডেনমার্ক-স্কাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চল। অনূদিত অংশটি অনুসরণ করার পক্ষে এটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে গেয়াট্‌ দেশের বীর বেওউল্‌ফ্‌, যিনি হিগেলাচের ভাগিনেয়, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিনেমার দেশের রাজা হ্রথগারকে সাহায্য করতে এসেছেন; উদ্দেশ্য গ্রেণ্ডেল নামে এক রাক্ষসের বিনাশ, যার অত্যাচারে হ্রথগারের রাজ্য ছারেখারে যাবার জোগাড়।

বেওউল্ফ (BEOWULF) : ৭০২-৭৯০ পঙ্‌ক্তি

সর্পী ছায়াচর।
সেই শৃঙ্গশোভিত সভাগৃহ
একজন ছাড়া আর সকলে।
যে স্রষ্টার ইচ্ছা ব্যতীত
সাধ্য নেই তাদের টেনে
এদিকে তিনি রিক্তনিদ্র
স্ফারিতচিত্ত প্রতীক্ষা করলেন

তখন উঠে এল কচ্ছ থেকে
রাক্ষস গ্রেণ্ডেল
সেই মহাপাষণ্ডের মনের ইচ্ছা
প্রতারণায় প্রাণনাশ করে
মেঘপুঞ্জের নিচে মষ্টে এলো
সুবর্ণস্তবকে সজ্জিত
পরিষ্কার দেখতে পেলো।
হ্রথগারের
কিন্তু তার গোটা জীবনে
দুর্গরক্ষীদের সঙ্গে মোলাকাৎ
এলো পদবিক্ষেপে
হর্ষবিরহিত যে-জন।
মুহূর্তেই খ'সে গেল দ্বার
ক্রূরকর্মা ক্রোধস্ফীত
প্রাসাদের তোরণ।
বিচিত্র হর্ম্যতলে
দুর্দান্ত তার দ্বেষ,
উল্কার মতো উজ্জ্বল
দেখলো সে কক্ষকুট্টিমে
একসঙ্গে শুয়ে আছে
অল্পবয়স্ক যোধযূথ।
মনে ভাবলো পৃথক করবে
প্রত্যেকটি মানুষের
রুদ্র রিষ্টকর্মা,

এলো কৃষ্ণ রাত্রে
সুপ্ত সৈনিকগণ—
যাদের সংরক্ষণীয়—
এ কথা সর্ববিদিত ছিলো
সে শয়তানতুল্য শত্রুর
ছায়ার নিচে সাপটিয়ে আনে।
রিপুর প্রতি রুদ্ররোষে
সংগ্রামের নিষ্পত্তির।

কুয়াশার কম্বলের নিচে
বিধাতার রোষ যার উপরে ;
যে মানবজাতির কোনো একজনের
সেই উচ্চ প্রাসাদকক্ষে।
যতক্ষণ না মদ্যভবন,
বীরদের হেমসৌধ
এ নয় তার প্রথম বার
হর্ম্যে আসা।
এ ঘটনার আগে বা পরে
দারুণতর দুর্ভাগ্যের হয় নি।
সে প্রাণী প্রাসাদসমীপে,
হাপরে-তৈরী-হুড়কায় শক্ত
তার হাতের ঈষৎ মর্দনে ;
এক ধাক্কায় কাৎ করলো
তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে
হিংসারু হেঁটে এলো ;
দু' চোখে ধ্বক ধ্বক করছে
ভয়ংকর উগ্র আলো।
বিরাট এক কুটুম্বগোষ্ঠী,
সুপ্ত সৈনিকবৃন্দ,
আত্মা তার অট্ট হাসলো,
প্রভাত হবার পূর্বে
প্রাণ আর দেহ
কারণ তার রক্তে জেগেছে

ভূরিভোজনের দুরাশা।
যে সে-রাত্রি উৎক্রান্ত হ'লে
মানবসন্তানে।
হিগেলাচের ভাগিনেয়
আকস্মিক আক্রমণ
দৈত্যেরও আর
শুরু করলো তাড়াতাড়ি,
ঘুমন্ত এক ছোকরাকে,
শরীরাস্থিসন্ধি চিবিয়ে ফেললো,
গোগ্রাসে গিললো,
মৃতের সবই সে
পা এবং হাত পর্যন্ত।
ধরলো হাত দিয়ে
শায়িত সেনানীকে,
গুণ্ডা তার থাবায়।
বৈরপ্রতিকারে
অচিরাৎ বুঝতে পারলো
যে পৃথিবীর পিঠের উপরে
মধ্যভুবনের
মহত্তর মুষ্টিবল ;
সাংঘাতিক সন্ত্রাস,
চঞ্চল হোলো তার চিন্তা,
শয়তানদের আস্তানার আশ্রয়ে ;
তেমন সে কখনো জানে নি
তখন স্মরণ করলেন সেই ভদ্র,
গত সন্ধ্যার অঙ্গীকার,
এবং ভীম বিক্রমে তাকে ধ'রে রইলেন—
রাক্ষস পালাতে আকুল,
সেই মহাপাপিষ্ঠের মনের ইচ্ছা
দূরে কোথাও ছিটকে পড়ে,
পালায় তার জলাভূমির ডেরায়,
বৈরীর মুষ্টিতে বদ্ধ।
সেই হীনবৃত্তি হন্তা

কিন্তু সে ভাগ্য তার নয়
সে আর পারবে উদর পুরাতে
মহাপরাক্রান্ত লক্ষ্য করছেন
কিভাবে সেই ভীম আততায়ী
আরম্ভ করবে।
দেরী সইলো না,
প্রথমে তুলে নিলো
লোভীর মত ছিঁড়লো,
শিরার শোণিত পান করলো,
শীঘ্রই দেখা গেল
আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছে,
সম্মুখে পদক্ষেপ করলো,
সেই ধুরন্ধরকে,
সাপটে মারলো
তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করলেন
এবং বাহুতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।
অন্যায়ের অধিনায়ক
সে কখনো প্রত্যক্ষ করে নি
অন্য কোনো মানুষের মধ্যে
তার মনে জাগলো
কিন্তু পালায় সে-সাধ্য নেই।
চাইলো অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে,
তার তখন যে আর্তি
তার প্রাক্তন জীবনে।
হিগেলাচের ভাগিনেয়,
অবিচলিত দাঁড়িয়ে রইলেন
আঙুল ভেঙে যেতে চাইলো ;
রণবীরও তার সঙ্গে খানিক এগোলেন।
কোনো মতে সেখান থেকে
এবং সেখান থেকে আবার ছুটে
জানে তার আঙুলের জোর
সে এক বিষাদের যাত্রায়
হেওরট-পুরীতে এসেছিলো।

শব্দিত হোলো সৈনিকভবন ;
দুর্গবাসীদের,
আতঙ্ক উত্থিত হোলো।
ক্ষিপ্ত কক্ষনায়কদ্বয়।
সে এক মহাবিস্ময়
দ্বন্দ্বের দাপট সহ্য করলো,
সুন্দর পার্থিব সৌধ।
অন্দরে এবং বাহিরে
কামার কৌশলে আটকেছিলো।
সুবর্ণে শোভিত
যেখানে শত্রুদ্বয় সংঘর্ষে লিপ্ত—
আগে বিশ্বাস করেন নি
যে কখনো কোনো উপায়ে
সেই সুদৃশ্য শৃঙ্গশোভিত সৌধের
কায়দায় কিছু আলগা করা—
শিখায় তাকে শোষণ করে।
উৎকট ঘন ঘন উদ্গীত :
প্রত্যেকের প্রাণে
যারা ভিত্তিগাত্র থেকে
বিধাতার বৈরীর
হার মানার হাহাকাররাগিণী
কৃতান্তের কয়েদীর।
যিনি মানবসমাজে
এই জীবনের
দিনেমারদের সকলের মনে,
প্রত্যেক দুর্ধর্ষ বীরের—
এদিকে উন্মত্ত উভয়ে—
নিনাদিত হোলো নিকেতন।
যে সেই মদ্যভবন
ধরিত্রীতে ধ্ব'সে পড়লো না,
কারণ তাকে শক্ত ক'রে
লৌহবন্ধনীতে
সেখানে কুট্টিম থেকে শিথিল হয়েছিলো
বহু সুরাপানবেঞ্চি
আমি যতদূর শুনেছি।
শিল্ডিংদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা
কোনো মানুষের পক্ষে
অঙ্গহানি করা সম্ভব—
যদি না আগুনের আলিঙ্গন
স্বর উর্ধ্বে উঠলো
উত্তর-দিনেমারদের
প্রচণ্ড ত্রাস জন্মালো,
সেই ভগ্ননাদ শুনলো,
ভয়ংকরী বিষাদগাথা,
ক্ষতপ্রদাহে হু হু কান্না
কঠিন মুষ্টিতে তাকে ধ'রে রইলেন
শক্তিতে মহত্তম ছিলেন
দিনগুলিতে।

পরবর্তী প্রথম দু'টি বিলাপধর্মী লিরিকে টিউটনিক মানুষদের গৃহসন্ধানে যাযাবরবৃত্তি, সমুদ্রের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এবং সঙ্গেসঙ্গে সমুদ্র-উৎক্রমণ-সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা, উত্তরলঘিমার কঠোর শীতঋতু যাপনের কষ্ট, পার্থিব অনিত্যতা, এই ভাববস্তুগুলি লক্ষণীয়। গোষ্ঠীপতির প্রতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আনুগত্য প্রায় রোম্যান্টিক প্রেমের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গোষ্ঠীপতিকে আশ্রয়দাতা, প্রিয় প্রতিপালক, সুবর্ণ-দাতা এবং তদনুসারে সুবর্ণ-সখা ইত্যাদি নামে ডাকা হয়েছে।

তৃতীয় কবিতাটিতে মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টধর্মের মরমীয়া দিক বিধৃত। ক্রুশ-প্রতীককে আশ্রয় ক'রে এ জাতীয় রচনা মধ্যযুগীয় লাতিন সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়।

তিনটি কবিতাতেই প্রাক্-খ্রীষ্টীয় এবং খ্রীষ্টীয় ভাবধারার আশ্চর্য সঙ্কর বিশিষ্ট স্বাদের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, দ্বিতীয় কবিতাটির কবির মনে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক বীরের পক্ষে বাগ্মী

উত্তরসূরীদের, জীবিতদের প্রশস্তিই প্রসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা (স্বভাবতই, স্তুতিরচয়িতা হিসাবে কবিও এখানে গৌরবে চিহ্নিত)— যে-কথা পরবর্তীকালের গোঁড়া খ্রীষ্টীয় কবিরা কখনোই জোর ক'রে বলতে সাহস পান নি। একই সঙ্গে, দেবদূতদের সঙ্গে অনন্তকাল আনন্দ উপভোগ করতেও এই কবিতাটির কবির আপত্তি নেই, কারণ 'পেগান' ঐতিহ্যের স্বর্গগত বীরবৃন্দ এবং খ্রীষ্টীয় স্বর্গের দেবদূতগোষ্ঠীর মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রথম ভাবধারা আগন্তুক ভাবধারাকে অনায়াসে নিকট-আত্মীয়ে পরিণত করেছে।

প্রবাসীর বিলাপ (ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে সাধারণত THE WANDERER নামে পরিচিত)

প্রায়শ একাকী জন   করুণা প্রার্থনা করে,
বিধাতার বর যাচে,   যদিও বিষণ্ণ তাকে
বিস্তীর্ণ জলপথে   বহুকাল কাটাতে হবে,
হাত দিয়ে হাতড়াতে হবে   হিমশীতল সমুদ্র,
নির্বাসনে যেতে হবে,   নিয়তি যে নির্বিকার !
এই কথা বলেছিলো পরিব্রাজক   মনে রেখে যত প্রাণান্তকর ক্লেশের কথা,
যত বীভৎস হত্যাকাণ্ড   আর বান্ধবদের বিনাশ :

"প্রতি প্রত্যূষে   প্রায়শ আমাকে
নিঃসঙ্গ বিলাপ করতে হয়,   নেই নেই কেউ তো নেই
জীবিত জন এমন কোনো   যার কাছে মনের কথা
নিরাবরণ করতে পারি।   এ কথা নিশ্চিত জানি
বীরের পক্ষে মহনীয়   এই মান্য আচরণ
যে তিনি তাঁর চিন্তারাশি   চাবিবদ্ধ ক'রে রাখবেন,
সিন্দুকে সংরক্ষণ করবেন,   সংগোপনে যা-ই ভাবুন।
অবসন্নচিত্ত পারে না   অদৃষ্টকে অবদমন করতে,
উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠায়   উপকার হয় না,
তাই যাঁরা খ্যাতিপ্রার্থী   তাঁরা তাঁদের খেদকে
প্রায়ই বুকের বাক্সে   বন্দী ক'রে রাখেন।
আমারও   আপন মনকে
স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন,   স্বজনবিরহে কাতর হ'য়ে
প্রায়ই নিতান্ত দুঃখে   নিগড়ে বাঁধতে হয়েছে,
অতীতের সেই দিনটি থেকে   যে-দিন আমার স্বর্ণসখাকে
ঐহিক আঁধার আচ্ছন্ন করলো   আর আশারিক্ত আমি
শীতার্ত তরণ করলাম   তরঙ্গরাশির বন্ধন,
বিষণ্ণ অন্বেষণ করলাম   বিভবদাতার সভাগৃহ,
যদি দূরে বা কাছে   এমন কারও খোঁজ পাই

মধুপানকক্ষে যে আমার
অথবা বন্ধুবঞ্চিত আমাকে
প্রমোদে প্রীত করবে।
দুঃখকে সহচর পাওয়া
তার পক্ষে, যার নেই বেশি
নিত্য তার নির্বাসন,
শীতস্পৃষ্ট সংবিৎ,
তার স্মরণে আসে
সে যখন যুবক ছিলো,
উৎসবে কত সদয় ছিলো :
এ কথা সে জানতে বাধ্য
মন্ত্রণাবাক্য থেকে
যখন শোক এবং সুপ্তি
পীড়িত নিঃসঙ্গকে
স্বপ্নে তার মনে হয়
জড়িয়ে ধরছে, চুমো দিচ্ছে,
দুই হাত আর মাথা,
যখন দাতৃ-সিংহাসনের
আবার বিগতনিদ্র
দ্যাখে সম্মুখে
সিন্ধুসারসরা স্নান করে,
সম্মিলিত শিলাবৃষ্টি,
তখন অসহতর হয়
ব্যাকুল হয় বাঞ্ছিতের জন্য,
যখন মন সঞ্চরণ করে
সানন্দে স্বাগত জানায়,
মানুষের সঙ্গীরা
ভাসমান জলচরেরা
পরিচিত বোধ্য ধ্বনি :
তার বক্ষে, যাকে বারংবার
পরিশ্রান্ত চৈতন্যকে
তাই ভেবে পাই না
কেন আমার মন

মনের কথা বুঝতে পারবে,
বরাভয় দান করবে,
সে জানে যে পরখ করেছে
কী দুঃসহ
প্রিয় আশ্রয়দাতা :
নয় বাঁকানো সোনা,
পৃথিবীর সম্পদ নয় ;
সঙ্গীরা আর দানগ্রহণ,
তার স্বর্ণসখা
সে উল্লাস আজ উন্মূলিত।
যে প্রিয় প্রতিপালকের
বহুদিন বঞ্চিত,
একত্র সহযোগী
প্রায়ই পিনদ্ধ করে :
সে তার সুহৃদকে
তার জানুতে ঠেকাচ্ছে
যেমন অতীত দিনে
দাক্ষিণ্য ভোগ করেছে ,
বন্ধুবঞ্চিত জন
তমিস্র তরঙ্গোচ্চয়,
পাথার সাপট মারে,
শিশিরকাঠিন্য, তুষারপাত।
অন্তরের ক্ষতগুলি,
বিষাদ হয় নবীভূত,
স্বজনদের স্মৃতিতে,
সতৃষ্ণ ফিরে তাকায়।
সাঁতরিয়ে দূরে চ'লে যায়,
আনে না ভাষাশ্রিত
বেদনা পুনরুত্থিত হয়
তরঙ্গরাশির বন্ধনের উপরে
প্রেরণ করতেই হয়।
এই ভুবনে
মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে না,

যখন বীরদের জীবন
কিভাবে সহসা তাঁরা
সাহসী সৈনিকবৃন্দ।
বৎসরের প্রতিটি দিন

অতএব এ ধরাতলে
বর্ষীয়ান না হ'লে।
হৃদয়কে বেশি উদ্দাম হ'তে দেবেন না,
যুদ্ধে দুর্বল হবেন না,
অতি-উৎকণ্ঠিত বা অতি-উল্লসিত
বড়াই করতে ব্যগ্র হবেন না,
তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে
যতক্ষণ না দর্পিত চিত্তে
মানসের চিন্তাপ্রবাহ
প্রাজ্ঞ জন ভেবে দেখবেন
যখন এই ধরিত্রীর যাবতীয় ধন
যেমন মাঝে মাঝে এখনই দেখা যায়
হাওয়ায় আহত
প্রাকারগুলি বিরাজমান,
ধূলিসাৎ সুরাকক্ষ,
নির্বাপিত যাঁদের নন্দন,
প্রাকারমূলে গর্বোদ্ধত ;
গ্রাস করেছে দূরের পথ,
শ্বসিত মহাসিন্ধুর উপর,
বণ্টন করেছে মৃত্যু,
গুহাভ্যন্তরে
এইভাবে মানুষের স্রষ্টা
অবশেষে পুরবাসীদের
অসুরদের অতীত কীর্তি
যিনি এই পৃথিবীর ভিত্তির কথা
এবং এই গহন জীবন সম্বন্ধে
অন্তরে অভিজ্ঞ তিনি
বিগত বহু হত্যাকাণ্ড,

সমগ্রত বিবেচনা করি,
সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন,
সেভাবে এই মধ্যসংসার
বিনাশ পায়, পতিত হয়।"

ধীমান হওয়া সম্ভব নয়
বিজ্ঞজন ধৈর্য ধরবেন,
হড়বড় ক'রে কথা বলবেন না,
অত্যধিক দুঃসাহস দেখাবেন না,
বা লাভের জন্য অতি-উদ্‌গ্রীব হবেন না,
যতক্ষণ না সমস্ত বুঝেছেন।
অহংকার করার আগে
সম্পূর্ণ জেনেছেন
কোন দিকে মোড় নেবে।
সে কী ভয়াল হবে
মরুর মত ধূ ধূ করবে,
এই মধ্যলোকের অনেক জায়গায়,
হিমকণায় আচ্ছাদিত
প্রাসাদগুলি বিধ্বস্ত।
শায়িত শাসকবর্গ,
নিপাতিত বীরবৃন্দ
কাউকে যুদ্ধ গ্রহণ করেছে,
কাউকে গৃধ্র টেনে নিয়েছে
কাউকে ধূসর শ্বাপদ
কাউকে বিষণ্ণমুখ বন্ধু
গোপন করেছে :
সংসার বিনষ্ট করেছেন,
প্রীতিকোলাহল-বর্জিত
অন্তঃশূন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।
ভালো ক'রে ভেবে দেখেছেন,
গভীরভাবে ধ্যান করেছেন,
অনেকশ স্মরণে আনেন
এবং এইভাবে বিলাপ করেন :

"কোথায় গেল অশ্ব ? কোথায় গেল আরোহী ?
কোথায় গেল প্রীতিভোজের আসনগুলি ?
হায় প্রোজ্জ্বল পেয়ালা !
হায় শাসকের শক্তি !
মহানিশার নিচে নিভে গিয়েছে,
দাঁড়িয়ে আছে এখন শুধু
আশ্চর্য স্পর্ধী প্রাকার
বীরদের গ্রহণ করেছে
শবলোভী শস্ত্র—
আর এই প্রস্তরস্তূপকে
ঝুঁকে-পড়া ঝঞ্ঝা
শীতকালীন আতঙ্ক,
উদ্‌গাঢ় হয় রাত্রিচ্ছায়া,
হিংস্র হিমশিলাবৃষ্টি
সমস্তই পরিতাপে পূর্ণ
গগনতলে ভাগ্যের বিধান
এখানে সম্পদ ক্ষণিক,
এখানে মানুষ ক্ষণিক,
গোটা দুনিয়ার বনিয়াদ

কোথায় গেল ঐশ্বর্যের বিতরণ ?
কোথায় গেল প্রাসাদের কলরব ?
হায় বর্মপরিহিত যোদ্ধা !
সে সময় কী ভাবে চ'লে গিয়েছে,
যেন সে কখনোই ছিলো না !
সেই দয়িত গোষ্ঠীর স্মারক
সর্পচিহ্নে চিত্রীকৃত :
বল্লমের বিক্রম—
নিয়তি কি শক্তিমান !
বাত্যা তাড়না করে,
পৃথিবীকে জাপ্‌টে ধরে,
যখন আসে আঁধারের পুঞ্জ,
উত্তর দিক থেকে পাঠায়
মানুষের প্রতি হিংসায় ।
এই পৃথিবীর রাজ্যে,
বিশ্বকে বিবর্তিত করে ।
এখানে সুহৃদ ক্ষণিক,
এখানে মানুষী ক্ষণিক,
ব্যর্থতায় পরিণত হয় ।"

এই কথা মনে মনে ব'লে ধীমান
সাধু তিনি যিনি আপন সত্যকে রক্ষা করেন,
প্রকাশ করবেন না বুক থেকে,
কার্যে রূপ দেবার ক্ষমতা রাখেন ।
স্বর্গলোকের পিতার সান্ত্বনা,

ধ্যানে তন্ময় আলাদা বসে রইলেন ।
সহসা কখনো তিনি ক্ষোভকে
যদি না আগেই তার প্রতিকার জেনে থাকেন,
কল্যাণ হয় তাঁর যিনি করুণা খোঁজেন,
যেখানে আমাদের সকলের শান্তি প্রতিষ্ঠিত।

নাবিকের স্বীকারোক্তি (সাধারণত THE SEAFARER নামে পরিচিত)

নিজের সম্বন্ধে পারি
পর্যটনবৃত্তান্ত,
দীর্ঘ সংকটসময়
বিষম বুকের জ্বালা
জেনেছি জাহাজে জাহাজে
ঢেউদের ভয়ংকর ভেঙে-পড়া ।

একটি সত্যগাথা গাইতে,
কিভাবে পরিশ্রমের দিন,
সহ্য করেছি,
বহন করেছি,
যন্ত্রণার অনেক ঘর,
সেখানে আমাকে ব্যস্ত রাখতো

নিদারুণ নক্তজাগরণ
যখন সে শিলায় আছড়াতো।
পা দুটি হয়েছিলো
শীতস্পর্শ শৃঙ্খলে।
খরতাপে হৃদয় ঘিরে;
সমুদ্রক্লান্তের সংবিৎকে।
যে এই পৃথিবীতে
কিভাবে শোকতপ্ত আমি
পার করেছি শীতঋতু
বান্ধববিরহিত,
হিমশলাকা-ঝোলানো:
সেখানে আর কিছু শুনি নি—
তুষারশীতল তরঙ্গোচ্ছ্বাস,
আমার চিত্তবিনোদন করতো
ক্রৌঞ্চদের ক্রেঙ্কার,
গীতময় সিন্ধুপক্ষী
ঝঞ্ঝারা সেখানে শিলাশিখরকে ঝাপ্‌টা মারতো,
তুষারাবৃত ডানায়;
শিশিরাবৃত পালকে।
যিনি সন্তপ্ত সংবিৎকে
তাই যিনি নগরীতে
কখনো বেশি ব্যথা পান নি,
যিনি স্পর্ধিত ও সুরামত্ত,
প্রায়ই জলপথে
নিবিড় হোতো নক্তচ্ছায়া,
হিম পৃথিবীকে বেঁধে ফেলতো,
শীতলতম বীজদানা।
প্রাণের ভাবনাগুলো,
লবণলহরীর লীলাকে,
মত্ত করে মনের বাসনা
অধীর করে অন্তরকে,
এখান থেকে বহু দূরে
তাই দুনিয়ায় এমন মানুষ নেই,

নৌকার কণ্ঠদেশে,
শীতে ক্লিষ্ট
হিমবন্ধনে আবদ্ধ,
সেখানে বেদনারা শ্বসিত হোতো
ক্ষুধা অভ্যন্তরে ছিঁড়তো
সে জন জানে না
প্রতিপত্তিতে বাস করে
তুষারশীতল সমুদ্রে
প্রবাসের পথে পথে

ঝাঁকে ঝাঁকে হিমশিলা ঝরতো।
শুধু সমুদ্রের গর্জন,
কদাচিৎ কলহংসধ্বনি;
গাঙচিলদের চীৎকার,
মানুষের কলহাস্য নয়,
সুরাপানের পরিবর্তে।
কুররী তার জবাব দিতো
বার বার ডাকতো ঈগল
ছিলেন না কোনো প্রতিপালক
সান্ত্বনা দিতে পারতেন।
জীবনের নন্দনকে জেনেছেন,
তিনি বিশ্বাস করতে চান না
কিভাবে শ্রান্ত আমাকে
কালযাপন করতে হয়েছে।
উত্তর দিক থেকে নীহার ঝরতো,
মাটিতে করকা পড়তো—
তাই এখন বিক্ষুব্ধ হয়
যেন নিজে পরখ করতে পারি
লোল মাঝদরিয়াকে।
প্রত্যেকটি মুহূর্তেই,
যেন অন্বেষণ করি
বিদেশীদের দেশকে।
যতই সে দর্পিত হোক,

বা দানে যতই দক্ষিণহস্ত,
বা প্রতাপে যতই পরাক্রান্ত,
যার সমুদ্র-উত্তরণ সম্বন্ধে
ভগবান তাকে কী জোটাবেন
মন বসে না তার বীণাবাদন শোনায়,
নারীর নর্মক্রীড়ায়,
বা ত্রিভুবনে কোনো কিছুতেই,
ঊর্মি-পথে যে-ই যায়
কাননেরা কুসুম ধারণ করে,
প্রান্তরেরা পূর্ণশ্রী হয়,
মন যার ব্যগ্র হয়ে আছে
চালায় তার চিত্তকে
উত্তাল তরঙ্গপথে
কোকিলও উতলা করে
গীতমুখর গ্রীষ্মের দূত
বিষম বুকের কষ্টকে।
বিলাসে যে বাস করে,
প্রবাসের বিস্তীর্ণ পথে
তাই এখন চঞ্চল হয় আমার চিন্তা
বাহির হয় আমার মন
তিমিমাছের দেশ পেরিয়ে
পৃথিবীর পিঠের উপরে,
ব্যাকুল এবং বুভুক্ষু;
পাগলের মত ঠেলে পাঠায়
জলরাশির পরিসরের উপরে।

ঈশ্বরের আনন্দস্রোত
যা স্থলচর ও ক্ষণস্থায়ী।
যে পৃথিবীর সম্পদরাজীর
তিনটি জিনিস আছে
লগ্ন অন্তিকে না এলে
ব্যাধি বা বার্ধক্য

বা যৌবনে যতই দুঃসাহসী,
বা প্রভুভাগ্যে যতই ভাগ্যবান,
চির-উদ্বেগ থাকবে না,
সেই ভাবনা ভেবে।
অথবা বলয়-গ্রহণে,
বা ঐহিক নন্দনে,
শুধু ঢেউদের ভেঙে-পড়ায়।
তারই চির-উৎকণ্ঠা থাকে।
নগরেরা কান্তিমান হয়,
পৃথিবী চঞ্চল হয়।
সবই তাকে ব্যাকুল করে,
যে চায় এই ভাবে
বহু দূর উৎক্রমণ করতে।
করুণ কণ্ঠস্বরে,
দুঃখকে ঘোষণা করে,
সে ব্যক্তি জানে না
তাদের কাউকে কাউকে কী সইতে হয়
যারা পর্যটন করে।
চিত্তসিন্দুকের ভিতরে,
মহাসাগরের সঙ্গে,
দিকে দিকে ঘোরে ফেরে
ফিরে আসে আমার কাছে
চেঁচায় বিরহী পাখী,
তিমিপথে হৃদয়কে

তাই আমার কাছে প্রিয়তর
এই মৃত অস্তিত্বের চেয়ে,
সে ভরসা আমি করি না
শাশ্বত স্থিতি হবে।
যাদের প্রত্যেকটি
সর্বদাই অনিশ্চিত:
অথবা হিংসাবিষ

প্রাপ্তদণ্ড প্রস্থানোদ্যতের
তাই প্রত্যেক বীরের পক্ষে
জীবিতদের প্রশস্তিই
তিনি যেন চেষ্টা করেন
এ সংসারে রেখে যেতে
সাহসিক ক্রিয়াকলাপ
যাতে মানুষের সন্তানেরা
এবং তাঁর কীর্তি অক্ষয় থাকে
অনন্তকাল চিরকাল,
দেবদূতদের সঙ্গে আনন্দ।

পৃথিবীর রাজ্যের
এখন নেই তেমন রাজা
অথবা স্বর্ণদাতা
যখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে মহত্তম
এবং বিপুলতম
বিনষ্ট সে বীরবৃন্দ,
দুর্বলেরা দেহধারণ করে,
কষ্টেস্থষ্টে ভোগ করে।
বসুধার আভিজাত্য
যেমন এখন প্রত্যেক মানুষ
জরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
শুভ্রকেশ শোক করে,
রাজন্যবর্গের সন্তানেরা
প্রাণটি তার যখন হারাবে
না পারবে মিষ্টান্ন গিলতে,
না হাত চালাতে,
যদিও সমাধির উপরে
ভাই তার মৃত সহোদরের সঙ্গে
বিবিধ বিত্তসম্ভার,
তবুও সেই আত্মার পক্ষে
স্বর্ণ সহায় হবে না

প্রাণ হরণ করে।
বাগ্মী উত্তরসূরীদের,
প্রসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা,
চ'লে যাবার আগে
শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রামের ফল,
শয়তানের বিরুদ্ধে,
পরে তাঁর স্তুতি করে,
অমরবৃন্দের মধ্যে,
চিরন্তন জীবনের গৌরব,

সে সব দিবস গত,
যাবতীয় রূপসজ্জা ;
কিংবা মহারাজা
অতীতে যেমন ছিলেন,
মাননীয় কীর্তিগুলি সম্পাদন করেছিলেন,
বৈভবে বাস করেছিলেন :
বিগত সে হর্ষরাশি ;
এই দুনিয়া শাসন করে,
গৌরব আজ ভূপাতিত ;
বৃদ্ধ হয়, ঝ'রে পড়ে,
সারা মধ্যসংসারে :
মুখ ম্লান হয়ে আসে,
জানে তার প্রাক্তন সখারা,
মাটিতে সমর্পিত।
তখন সেই পেশীময় শরীর
না ক্লেশ অনুভব করতে,
না মাথায় চিন্তা করতে।
স্বর্ণ ছড়াতে পারে,
সমাধিস্থ করতে পারে
সে সব সঙ্গে যাবে এই বুদ্ধিতে,
যে পাপে পূর্ণ
ঈশ্বরের রোষের সম্মুখে,

যে পুঁজি সে এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলো   যতদিন এখানে প্রাণে বেঁচেছিলো।
ভয়ংকর ভগবানের রোষ,   সে ভয়েই পৃথিবী ঘোরে,
তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন   বিস্তীর্ণ প্রান্তরগুলি,
ধরিত্রীর পৃষ্ঠভাগ   এবং উর্ধ্ব-রোদসী।
মূঢ় সে যে ভগবানকে ভয় করে না :   তার কাছে মৃত্যু আসে অভাবিত।
পুণ্য সে যে বিনয়ে বাস করে :   সে পায় স্বর্গের প্রসাদ,
ভগবান তার মধ্যে সে চিত্তবৃত্তি সুদৃঢ় করেন,   কারণ সে তাঁর শক্তিতে ভরসা রেখেছিলো।

ক্রুশদর্শনস্বপ্ন (THE DREAM OF THE ROOD নামে পরিচিত)

অহো! আমি স্বপ্নশ্রেষ্ঠের   সংবাদ দিতে উদ্যত,
যে স্বপ্ন এলো সম্মুখে   শর্বরীর মধ্যভাগে,
যখন মুখর মানুষেরা   শয্যায় মাথা এলিয়েছে।
মনে হোলো আমি দেখতে পেলাম   দুর্লভ এক তরু,
আশ্লিষ্ট আলোকরশ্মিতে,   সমুন্নত আকাশপথে,
তরু উজ্জ্বলতম :   এবং তার সর্বতনু
মণ্ডিত তপ্তকাঞ্চনে ;   পদনিম্নে মণিপুঞ্জ
প্রভা দেয় পৃথিবীবক্ষে,   অতিরিক্ত পাঁচটি রত্ন
উর্ধ্বে ঐ ক্রুশদ্রুমে।   দ্রষ্টা সেখানে দেবদূতের দল,
সৌন্দর্য যাঁদের শাশ্বত ;   নয় সে নয় দুরাচারের ক্রুশকাষ্ঠ,
বরং তার প্রতি প্রেরিতদৃষ্টি   পুণ্যাত্মা অমরবৃন্দ,
মৃত্তিকার মানুষেরা   এবং সমগ্র এই মহান সংসার।
দিব্য সেই বিজয়-দ্রুম   আর আমি পাপদষ্ট,
কলঙ্কের শায়কে ক্লিষ্ট।   দেখলাম সেই গরীয়ান ক্রুশ
বহুমূল্য বসনভূষণে   ভাস্বর সৌন্দর্যে জ্বলছে,
সুবর্ণে সজ্জিত দেহ,   সর্বত্র রত্নাভরণ
জ্যোতিতে জড়িয়ে রেখেছে   জগদীশ্বরের তরু।
তবুও সেই সোনার আড়ালে   আমার দৃষ্টি এড়ালো না
আর্তদের আদিক্লেশ,   আদিতে যে ঝরেছিলো
রক্ত তার দক্ষিণ দিকে।   হলাম প্রবল দুঃখে দীর্ণ,
ভীত হলাম সে দিব্য দৃশ্যে,   দেখলাম সেই দীপ্ত প্রতীক
বস্ত্রে-বর্ণে রূপ বদলাচ্ছে :   কখনো আর্দ্র হচ্ছে বাষ্পে
কখনো ধৌত রক্তধারায়,   কখনো ধারণ করছে রত্ন।

তবুও শয়ান সেখানে
দেখলাম বিষণ্ন চিত্তে
অবশেষে কানে এলো
এইভাবে শুরু করলো

"যদিও অনেক আগে
অপহৃত হয়েছিলাম
শিকড় থেকে উৎপাটিত।
তৈরী করলো আমাকে তামাশার জন্য,
শেষে আমাকেই কাঁধে নিয়ে
অনেক গুণ্ডায় মিলে বাঁধলো শক্ত ক'রে।
আসছেন অধীর আগ্রহে
তখন তো পারি নি আমি
নুয়ে পড়তে বা ভেঙে যেতে,
থরথর ক'রে কাঁপছে :
গুণ্ডাগুলোকে সাবাড় করতে,
বসন ত্যাগ করলেন বীর যুবা,
দৃপ্ত দৃঢ়চেতা
সাহসিক বহুর সম্মুখে
আমি বেপথুমান বীরের আলিঙ্গনে :
পারলাম না প'ড়ে যেতে পৃথিবীপৃষ্ঠে,
ক্রুশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম,
যিনি স্বর্গলোকের স্বামী,
বিদীর্ণ করলো তারা আমাকে বিকট পেরেকে,
হিংসার হাঁ-করা ক্ষত,
তারা রঙ্গতামাশা করলো
আমাদের দুজনকে নিয়ে ;
বীরের দেহ থেকে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হ'লে

"সে শৈলদেশে আমি
অনেক নিষ্ঠুর নিয়তি,
আর্তিতে আতত হ'তে :
মেঘপুঞ্জে ঢেকেছিলো

আমি দীর্ঘ সময়
বিশ্বত্রাতার বৃক্ষকে,
সে ক'য়ে উঠলো কথা,
সেই সর্বদারুশ্রেষ্ঠ :

তবু আজ মনে পড়ে
অরণ্যের প্রান্ত থেকে,
হিঁচড়ে নিলো শক্ত গুণ্ডারা,
আদেশ দিলো তামস অপরাধীদের বইতে,
নামালো পাহাড়ের উপরে,
তখন দেখি মানবজাতির স্বামী
আমার উপরে আরোহণ করবেন !
প্রভুর আজ্ঞা অমান্য ক'রে
যখন দেখলাম ভূপৃষ্ঠ
আমি সব ক'টাকে পারতাম
তবু তো স্থাণু ছিলাম।
বিশ্বের যিনি ঈশ্বর,
দীর্ঘ কাষ্ঠে আরোহণ করলেন,
কৃতসংকল্প মানুষের মুক্তিতে।
তবুও বেঁকে পড়ার সাহস হোলো না,
প্রাণপণ খাড়া থাকতে হোলো।
গরীয়ান রাজাকে উর্ধ্বে তুলেছিলাম,
সাধ্য কি নোয়াই নিজেকে !
সে বেদনার চিহ্ন আজও প্রকট,
তবু কারও ক্ষতি করি উপায় ছিলো না।

আমার সর্বাঙ্গ রক্তে নিষিক্ত,
যে রক্ত দুর্নিবার নির্গত হয়েছিলো।

সহ্য করেছি
দেখেছি সর্বলোকের নাথকে
আঁধারের রাশি এসে
ঈশ্বরের মৃতদেহ,

উজ্জ্বল আলোককে
রাক্ষসী মেঘের রাত্রি—
শোক করলো সম্রাটের পতনে :
তবু অনেক দূর থেকে
এলো সে একাকী বীরের কাছে ;
নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত আমি,
অনেক আগ্রহে বিনীতচিত্ত।
পরিত্রাণ করলো তাঁকে
বিষমভার পীড়া থেকে
দরদর ঘর্মস্রোতে দাঁড়িয়ে রইলাম
শ্রান্তদেহ তাঁকে শুইয়ে দিলো,
অবলোকন করলো অমরলোকের
অধিপতিকে,
কঠোর সেই সংগ্রামে ক্লান্ত।
হায় হন্তারূপী আমারই সম্মুখে
বিন্যস্ত করলো সেখানে বিজয়ী প্রভুকে ;
সন্তপ্ত হৃদয়ে সন্ধ্যায়,
শ্লাঘ্য সম্রাটকে ছেড়ে যাবার :
বাষ্পাকুল আমরা কয়জন
দৃঢ়ভিত্তি দাঁড়িয়ে রইলাম ;
সৈনিকদের কণ্ঠস্বর ;
প্রিয়দর্শন প্রাণদেউল।
ভূমিতলে সবাইকে :
গভীর গর্তে আমাদের পুঁতে দিলো,
খবর পেয়ে আমাকে
সোনায় আর রুপায়

“এখন তো বুঝতে পেরেছো,
শত্রুদের হিংস্র কর্ম
কঠোরতম ক্লেশ—
আমাকে বন্দনা করে
মৃত্তিকার মানুষেরা
এই প্রতীকের নিকট প্রার্থনা করে।

ছায়া উৎপীড়ন করলো—
রোরুদ্যমানা রোদসী
খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ!
অধীর কয়েকজন
এ সমস্তই দেখলাম।
তবু নত হলাম যাতে তারা নাগাল পায়,
গ্রহণ করলো তারা গরীয়ান ভগবানকে,

পরিত্যাগ করলো আমাকে যোদ্ধারা,
শায়কে দীর্ণ-বিদীর্ণ।
শিয়রে সারি বেঁধে দাঁড়ালো তারা ;

অল্প সময় তিনি বিশ্রাম নিলেন
উদ্যোগী হোলো তারা কবরনির্মাণে
হিরণ্যদ্যুতি শিলার ছেদনে,
তারপর শুরু করলো বিষাদের গাথা গাইতে
কারণ শ্রান্ত তাদের সময় হয়েছে
সঙ্গীহীন তিনি শায়িত রইলেন।
বহুক্ষণ তবুও সেখানে
দূরে মিলালো ঊর্ধ্বে উঠলো
শব হিম হয়ে এলো,
তখন একজন আমাদের পাতিত করলো
সে কী ভয়াবহ ভাগ্য!
তবুও গুরুর অনুগত ভক্তেরা
খুঁড়ে বার করলো,
সজ্জিত করলো।

হে বন্ধুতুল্য বীর,
আমি কতদূর সহ্য করেছি—
অধুনা আগত কাল
দেশে এবং বিদেশে
এবং সমগ্র এই মহান সংসার :
ঈশ্বরপ্রসূত আমার উপরে

কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়েছিলেন ;
স্বর্গতলে উন্নতশির,
আমার পরাক্রম যাদের বিদিত
একদা আমাকে হ'তে হয়েছিলো
জনগণের জুগুপ্সিততম,
মুক্ত ক'রে দিয়েছিলাম
অহো! আমাকে দ্যুতিময় দেবতা
অন্যান্য অরণ্যতরুদের উপরে,
যেমনটি তাঁর মাতাকে
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
শ্লাঘনীয়া করেছিলেন

"এখন তোমাকে আজ্ঞা করি,
তুমি এই স্বপ্নসমাচার
বাক্‌বন্ধে প্রকাশ করো
যার উপরে সর্ববলীয়ান ভগবান
নরজাতির
আর আদমের
এখানে তিনি জেনেছিলেন মৃত্যুর স্বাদ,
তাঁর মহান শক্তি দিয়ে
তারপর ঊর্ধ্ব-লোকে আরোহণ করেছিলেন;
এই মধ্যলোকে,
শেষ বিচারের দিনে,
সর্বশক্তিমান দেবতা,
বিচারের অধিকর্তা,
বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক মানুষ
এই ক্ষণিক জীবনে
সেখানে বিধাতা
তাতে পারবে না কেউ
শুধাবেন তিনি অনেকের সমক্ষে,
যে তার প্রভুর জন্য
তিক্ত মৃত্যুরস,
তখন তারা ভীত হবে

তাই এখন আমি কীর্তিমান
এবং পারি সাহায্য করতে
তাদের প্রত্যেককে।
হীনতম অত্যাচারের অস্ত্র,
আমিই তার পরে জীবনের সঠিক পথ
মুখর মানুষদের জন্য।
আদরে স্থান দিয়েছিলেন
অমৃতরাজ্যের অধিপুরুষ,
স্বয়ং মারিয়াকে
সকলের দৃষ্টিপথে
সমগ্র নারীজাতির উপরে।

হে আমার আদৃত বীর,
মানবসমাজে প্রচার করো,
যে এই সেই পুণ্য বৃক্ষ,
বেদনা ভোগ করেছিলেন
অনেক নষ্টামি
আদিম আচরণের জন্য।
তবু আবার জেগে উঠেছিলেন,
মানুষকে সাহায্য করতে;
আবার এখানেই ফিরে আসবেন
মানবজাতির সন্ধানে,
স্বয়ং ভগবান,
তাঁর দেবদূতদের সমভিব্যাহারে,
যাতে তিনি বিচার করতে পারেন,
মৃত্যুর পূর্বে এইখানে
কি কর্মফল অর্জন করেছে।
যে বাক্য উচ্চারণ করবেন
নিঃশঙ্ক থাকতে;
সে মানুষ কোথায় আছে
জানতে প্রস্তুত
যেমন পূর্বে তিনি এই তরুতে জেনেছিলেন।
এবং অল্প একটু ভাববে

খ্রীষ্টের কাছে কী কথা
কিন্তু সেখানে কারো শঙ্কিত হবার
যদি সে আগেই প্রাণে ধারণ ক'রে থাকে
এ ক্রুশের সাহায্যেই
পৃথিবীর পথ ছাড়িয়ে
প্রভুর সঙ্গে একত্রে বাস
তারা জ্ঞাপন করতে পারে।
কারণ থাকবে না,
প্রতীকোত্তমকে।
সে রাজ্যের সন্ধান করতে হবে,
প্রত্যেক আত্মাকে,
যার প্রার্থনীয়।"

বন্দনা করলাম তখন সেই বৃক্ষকে
একান্ত একাগ্রতায়
সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন ;
ব্যাকুল হোলো বক্ষ ;
উৎকণ্ঠার লগ্ন।
যে একাকী আমি
সেই বিজয়বৃক্ষের
সম্যক সাধনা করতে পারি,
আবিষ্ট আমার মন,
প্রেরিত সেই ক্রুশের প্রতি।
বেশি বন্ধু পৃথিবীতে,
জগতের রঙ্গ ছেড়ে
অধিবাস করে অমৃতলোকে
মাননার অংশভাক্ ;
প্রতিদিন প্রতীক্ষা করি
যাকে এই ধরাতলেই
এই মর্ত্য জন্ম থেকে
এবং আনবে সেখানে
দ্যুলোকের উল্লাস,
প্রভুর প্রজাপুঞ্জ সম্মিলিত ;
এবং আমাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবে
মাননার অংশ পেতে,
হর্ষের ভাগ নিতে পারি।
যিনি একদা এই পৃথিবীতে
ক্রুশক্রমে পিনদ্ধ হ'য়ে
তিনি আমাদের ত্রাণ করেছিলেন,
আনন্দে বিহ্বল,
একাকী সেখানে আমি,
সুদূর পথের জন্য
যাপন করলাম বহু
এখন আমার জীবনের উল্লাস
অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকবার
বন্দনা করতে পারি,
সেই সংকল্পে
এবং আমার আশ্রয়ের আশা
নেই আমার প্রতাপশালী
তারা পার হ'য়ে গেছে
জ্যোতির্ময় রাজার কাছে,
অধিনায়ক পিতার সঙ্গে,
আর আমি মনে মনে
কবে যে প্রভুর ক্রুশ,
একদা দেখেছিলাম,
আমাকে মুক্তি দেবে,
যেখানে আনন্দ অপার
যেখানে উৎসবভোজে
ছেদহীন আনন্দপ্রবাহ :
যাতে আমিও পারি
সমানে সেই মান্যদের সঙ্গে
হোন ভগবান আমার বন্ধু,
প্রাণান্তিক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন,
মানবজাতির পাপের কারণে ;
নূতন জীবনে তীর্ণ করিয়েছিলেন,

স্বর্গরাজ্যের স্বত্বাধিকারে।
তাঁদের শুভ সুখবাসরে,
ঈশ্বরজাত সেই যাত্রায়
পরাক্রান্ত পূর্ণমনোরথ।
আত্মাদের এক বাহিনীর সঙ্গে
সর্ববলীয়ান দেবতা
এবং সেই সব সন্তদের আহ্লাদে,
মাননায় বাস করছিলেন,
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

আশা সঞ্জাত হয়েছিলো
যাঁরা এত দিন দাহ সহ্য করেছিলেন।
জয়যুক্ত হয়েছিলেন,
প্রত্যাগমন করেছিলেন অনেককে নিয়ে
বিধাতার রাজত্বে,
দেবদূতদের হর্ষকলরবে,
যাঁরা আগে থেকেই স্বর্গে
যখন তাঁদের মাননীয় জন ফিরে এসেছিলেন,
তাঁরই স্বদেশে।

সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্য-বিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।"

'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থ প্রকাশের তিন বৎসর পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবন্ধ পুস্তক', ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম ভাগ, এবং ১৮৯২এ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনো পুস্তকেই 'আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার' অংশ সংকলিত হয় নি। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সম্পূর্ণ রচনাবলী বা গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এইসকল রচনা সংযোজিত হয় নি। অদ্যাবধি অনাহৃত এই দুষ্প্রাপ্য রচনাগুলির মধ্য থেকে সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নূতনতর দিক উদ্ঘাটিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'গীতিকাব্য' 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শীর্ষক তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ তিনটি যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সুদীর্ঘ সমালোচনার অংশ মাত্র, এবং অবশিষ্ট রচনাও যে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্লভ রচনা হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ভাবে উদ্ধারযোগ্য— এ বিষয়ে আমরা অবহিত হই নি।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধ নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনার অংশ, 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' গ্রন্থের সমালোচনার অংশ এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ দীনেশচরণ বসুর লেখা 'মানসবিকাশ' নামক কাব্যের সমালোচনার অংশ। বঙ্গদর্শনে তিনটি সমালোচনাই যথাক্রমে 'অবকাশরঞ্জিনী' 'দানবদলন কাব্য' ও 'মানসবিকাশ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বঙ্গদর্শনে আরও তিনখানি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন তা আমরা অবগত আছি। সেগুলি হল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্য এবং নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ'। রচনাগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ -প্রকাশিত বঙ্কিমরচনাবলীতে এবং আরও পরে যোগেশচন্দ্র বাগলের ভূমিকা সংবলিত সাহিত্য সংসদ্ -প্রকাশিত বঙ্কিমরচনাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু এই রচনা-তিনটির সম্পূর্ণ অংশ কোনো গ্রন্থাবলীতেই প্রকাশিত হয় নি। সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদক রচনাগুলির অংশবিশেষ মাত্র মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু মূল রচনার যে নির্বাচিত অংশ মাত্র মুদ্রিত হল, এই নির্বাচিত অংশই যে সম্পূর্ণ রচনা নয়, তা গ্রন্থাবলীতে নির্দেশিত হয় নি। পরবর্তীকালে সাহিত্য সংসদ্ যে রচনাবলী প্রকাশ করলেন, তাতে কেবল সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে।

সুতরাং, আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ -বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় তাঁর গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে নেই,

সে পরিচয় রয়েছে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অধুনা বিস্মৃত কয়েকটি সমালোচনা-নিবন্ধের মধ্যে। সমালোচনাগুলি যে-যে শিরোনামে এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকার যে-সকল সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল তা প্রদত্ত হল :

ক. অবকাশরঞ্জিনী / বৈশাখ ১২৮০, খ. দানবদল কাব্য / জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, গ. মানসবিকাশ / পৌষ ১২৮০, ঘ. বৃত্রসংহার / মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১, ঙ. ঋতুবর্ণন / বৈশাখ ১২৮২, এবং চ. পলাশির যুদ্ধ / কার্তিক ১২৮২।

২

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনে 'অবকাশরঞ্জিনী'ই বোধ হয় প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনার সম্মান লাভ করে। সে সমালোচনাও স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর রচিত। তখন আমি তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।" আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে বঙ্গদর্শনে 'অবকাশরঞ্জিনী' পুস্তকেরই প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এদিক থেকে নবীনচন্দ্র গৌরব লাভের অধিকারী।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "অবকাশরঞ্জিনী কতকগুলি খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ। ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি স্থকবি এবং বিশুদ্ধরুচি; তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। ভরসা করি পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে আপনার পরিচয় দিবেন।"

'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এটিই নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কাব্যে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যটি পাঠ করে কবি-সম্পর্কে যে-আশা প্রকাশ করেছিলেন তা ভবিষ্যতে সফল হয়েছিল বলা যায়।

'অবকাশরঞ্জিনী' ও তার কবি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরও যা ব্যাখ্যা করেছিলেন তা উদ্ধৃত হল :

"যে সকল মোহিনী স্থষ্টির গুণে কবিগণ চিরস্মরণীয় হয়েন, অবকাশরঞ্জিনীতে তাহার কিছু নাই। এবং থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। অপিতু কোন রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে সকল স্থষ্টি বা অবতারণায় সক্ষম যে সকল মহাত্মা, তাঁহারা এ জগতে অতি দুর্লভ। সে সকল গুণ না থাকিলেও অবকাশরঞ্জিনীর কবিকে স্থকবি বলা যায়। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দচতুর। কতকগুলা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দচতুর বলি না; অথবা যিনি শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণপথে আইসে। এই কবির সেই শব্দ প্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলি আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাই উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট করেন। অবকাশ-রঞ্জিনীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

"অল্পবয়স্ক কবিগণ, বিনানুকরণে রচনা করিতে সক্ষম হইলেও একটু একটু অনুকরণপ্রিয় হয়েন। অবকাশরঞ্জিনী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে স্মরণ হইবে।—

ছিলে তুমি অয়ি গঙ্গে! হিমাচল শিরে,/তরল রজতাসনে রাজরাণী প্রায়
ভূতলে পতিত এবে তাই ধীরে ধীরে,/কাঁদিতেছ মনোদুঃখে একাকিনী হায়!
আমি ভাবি শুনি মম দুঃখের কাহিনী,/কাতরে কাঁদিছে আহা! নগেন্দ্রনন্দিনী।

"নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির ন্যায় রচনা পাঠ করিয়া হেমবাবুকে স্মরণ হয়, এবং উভয়ের আদর্শ বাইরনকেও মনে পড়ে :

নাচ রে ময়না নাচ রে আবার,/দুই [দিই ?] করতালি নাচ আর বার,
চন্দ্রানন হতে ঢাল একবার,/ঢালরে সঙ্গীত অমৃতের ধার,
কি কটাক্ষ ! হলো জেনেছি এবার,/কাশী নরেশের হৃদয় বিদার।

"আমরা এমত বলিতেছি না যে এই কবি অন্য লেখকের নিকট ঋণী। পশ্চাদ্বর্তী লেখকগণকে পূর্ববর্তী লেখকগণের নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঋণী হইতেই হয়। সেই পরিমাণের অতিরেকে ইনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইনি নিজমানস প্রসূত কবিত্বরত্ন যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে পরের নিকট ঋণী বলিলে অন্যায় নিন্দা করা হয়।"

৩

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' প্রকাশিত হয়। বৈশাখে 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনা লিখে পরের মাসেই বঙ্কিম 'দানবদলন কাব্যে'র সমালোচনা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নবীন কবি। নবীন কবি হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ কাব্যে বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া অসমসাহসের কাজ বটে। শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে তাবৎ পক্ষ অতিমানুষ প্রকৃতি বিশিষ্ট। এক পক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শাস্তা অসুরকুল, পক্ষান্তরে সর্বনাশিনী মূর্তি বিশিষ্টা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। কাব্য প্রণয়নে বিশেষ কৌশল বিশিষ্ট কবি ভিন্ন ইহাতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, নবীন কবি রামচন্দ্রবাবু ইহাতে অনেক দূর কৃতকার্য হইয়াছেন। যে কৌশলে প্রাচীন কবিরা, দৈব চরিত্র মনুষ্যের সহৃদয়তাস্পদ করিয়াছেন, ইনিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত প্রথানুসারে সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। অসুরগণকে মানব প্রকৃত করিয়া উপাখ্যানের মনোহারিতা সম্পাদন করা যে কৌশল, অনেক কাল হইল পৌরাণিকেরা তাহার উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কবি প্রথমে চণ্ডীর উগ্রচণ্ডা মূর্তিকে মানবমূর্তি সদৃশী করিয়াছেন। চণ্ডীকে কেবলমাত্র অতিপ্রকৃত বলবীর্যের আধার কল্পনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে, তাঁহাকে মানব প্রকৃতিশালিনী করিয়াছেন।"

বঙ্কিম এই লেখকের বর্ণনাশক্তি, শব্দচাতুর্য ও উপমা প্রয়োগের প্রশংসা করেছেন।

কবি রামচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, "তিনি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দঃ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দঃ রামচন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলিয়া যে সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই কবির ভাষা কোন কোন সময়ে কর্কশ বোধ হয়, কিন্তু সেটি আমাদের সংস্কারের দোষ হইলেও হইতে পারে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষাটি আর একটু পরিষ্কার করিলে ভাল হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার মধ্যে কাব্যের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন রামচন্দ্রের বর্ণনাশক্তির পরিচয়দান প্রসঙ্গে।

সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, "সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে

যে দানবদলন কাব্য ইদানীন্তনের বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার সকল স্থান সমান নহে— অনেক দোষও আছে— বিশেষ দেখা যায় যে, কবির কবিত্ব শক্তি অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রকৃতি ইঁহাকে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি দিয়াছেন; কাল সহকারে এবং শিক্ষা এবং অভ্যাসের সাহায্যে ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

৪

দীনেশচরণ বসুর 'মানসবিকাস' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'মানসবিকাশ' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অতঃপর লেখক একাধিক কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন। 'মানসবিকাশে'র আখ্যাপত্রে কবির নাম ছিল না। তাই বঙ্কিমের সমালোচনাতেও কবির নাম নেই। এই কাব্যগ্রন্থটি যে দীনেশচরণের রচনা তার একটি প্রমাণ হল— কবির 'মহাপ্রস্থান কাব্যে'র আখ্যা-পত্রে " 'মানসবিকাশ' 'কবি-কাহিনী' ও 'কুল-কলঙ্কিনী' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীদীনেশচরণ বসু প্রণীত" এরূপ মুদ্রিত আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকাতেও 'মানসবিকাশে'র গ্রন্থকার হিসাবে দীনেশচরণের নাম আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'মানসবিকাশে'র সমালোচনার উপসংহারে চার শ্রেণীর কবির উল্লেখ করেছিলেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে দেখা গিয়েছে সমালোচক বাংলা গীতিকাব্যে তিন শ্রেণীর কবির উল্লেখ করেছেন। এক শ্রেণীর কবির কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, আর এক শ্রেণীর কবির রচনায় অন্তঃপ্রকৃতির প্রাধান্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর কবি অর্থাৎ আধুনিক গীতিকাব্য লেখকগণের কবিতায় ইতিহাস বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন অন্তঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত চিত্রিত করতে না পারলে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ ঘটে, এবং যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতি ছায়া সমেত চিত্রিত করতে সক্ষম না হলে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মায়। 'মানসবিকাশে'র সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব এবং আধ্যাত্মিকতা দোষের নিদর্শন 'মানসবিকাশে'র কাব্যকার। উভয় প্রকৃতিকে যিনি সহচরীরূপে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই সুকবি। বঙ্কিমের অভিমত, এই শ্রেণীর কবির উদাহরণ জ্ঞানদাস ও রায়শেখর। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বা দীনেশচরণ কেউই জ্ঞানদাস বা রায়শেখরের তুলনায় সুকবি নন। এর প্রধান কারণ এঁরা সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে ইংরেজি কবি সম্প্রদায়ের শিষ্য। তার ফলে সকলের কাব্যেই কম বেশী আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মেছে। এঁদের চিন্তা ও বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলে এঁদের কবিতাও দূরসম্বন্ধ প্রকাশিকা হয়েছে, এবং এই বিস্তৃতিগুণের কারণে প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হয়েছে। জ্ঞানদাস বা রায়শেখর কোনো ইংরেজ কবির শিষ্য নন, তাই তাঁদের কবিতা বহুবিষয়িণী বা দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী নয়, এবং তাই কবিতা অতি প্রগাঢ়; মধুসূদন প্রমুখ আধুনিক কবির কবিতার বিষয় বিস্তৃত বা বিচিত্র বলেই কবিত্ব সেরূপ প্রগাঢ় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তাঁর সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র অনেক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা দোষমুক্ত এবং সুকবি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র যে-পরিমাণ সুকবি 'অবকাশরঞ্জিনী'র লেখক নবীনচন্দ্র ও 'মানসবিকাশে'র লেখক দীনেশচরণ সে পরিমাণে সুকবি নন,— কারণ এঁদের রচনায় আধ্যাত্মিকতা দোষ অতি প্রবল। 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে আরও কি কি ত্রুটি রয়েছে তা বঙ্কিম উক্ত

গ্রন্থের সমালোচনায় ব্যক্ত করেছেন, 'মানসবিকাশে'ও প্রগাঢ়তা গুণের অভাব ঘটেছে। তথাপি কাব্যটি নিকৃষ্ট নয়, বরং নানা কারণে প্রশংসার যোগ্য বলে সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১]

৫

১২৮১র মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় 'বৃত্রসংহার' কাব্য সমালোচিত হলেও এর পূর্বেই যে হেমচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন এবং হেমচন্দ্রকে যে একজন উৎকৃষ্ট কবি হিসাবে বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন— সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। শুধু যে 'অবকাশরঞ্জিনী' বা 'মানসবিকাশে'র সমালোচনায় হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গ আছে তাই নয়, ১২৮০ ভাদ্র সংখ্যায় 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে অতিরিক্ত সংযোজন অংশে বঙ্কিম স্বাক্ষরিত যে-মন্তব্য আছে তাও লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণা, "কিন্তু 'বঙ্গকবি সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের এই মন্তব্যের সঙ্গে একালের পাঠক পরিচিত নন। অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক বা তাঁর গ্রন্থাবলীতে অদ্যাবধি অমুদ্রিতই রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এ উক্তি করেন তখনও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য প্রকাশিত হয় নি। তবে ১২৮০ বঙ্গাব্দের পূর্বেই হেমচন্দ্র-লিখিত 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১) 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) 'কবিতাবলী' (১৮৭০) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের নিদর্শন হিসাবে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন।

'বৃত্রসংহার' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুঅরি, ১২৮১ বঙ্গাব্দে। 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৭-এর ১৫ সেপ্টেম্বর, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ প্রায় তিন বৎসর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নন। নবীনচন্দ্রের উক্তি ('আমার জীবন' গ্রন্থে), বঙ্গদর্শনে 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাটি সঞ্জীবচন্দ্র-কৃত। সুতরাং বঙ্কিম কৃত প্রথম খণ্ডের সমালোচনাটিই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত, দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনাটি নয়।

প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় প্রথমেই বলা হয়েছে, "হেমবাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নির্বাচন সাধ্য নহে; অর্দ্ধনির্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না; অঙ্গমাত্র দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেকদিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না। এরূপ কাব্য সর্বদা জন্মে না।"

---

১ এই প্রবন্ধে 'মানসবিকাশে'র সমালোচনাংশটি উদ্ধৃত হল না। 'বঙ্কিমচন্দ্রের একটি দুষ্প্রাপ্য রচনা' শিরোনামে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় বর্তমান লেখক কর্তৃক উক্ত রচনাটি সংকলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ সমালোচনা, ঠিক সমালোচনা নয়— একপ্রকার গ্রন্থের পরিচয় দান মাত্র। সে কথা সমালোচক নিজেও স্বীকার করেছেন।

'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ডে একাদশটি সর্গ ছিল। বঙ্কিম এই একাদশটি সর্গেরই বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিচয় দানের ফলে কাব্যের শ্রেষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে পাঠক সহজেই পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। মূল কাব্যের রসও পাঠক নানাস্থানে আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছেন। কারণ বঙ্কিম তাঁর সমালোচনায় কাব্যের বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যের উপাখ্যান ভাগ, নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র এবং কাব্যের নিগূঢ় মর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমরা আর কিছুই করি নাই। আমরা যে পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তুলিতে সক্ষম হইতাম না; গ্রন্থকার যে অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।" উদ্ধৃতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশ্লেষণ এবং মধ্যে মধ্যে যে মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে, তা বিশেষভবে লক্ষ্য করবার মত। বঙ্কিমের কোনো কোনো মন্তব্য তো সে যুগে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় সর্গ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—

'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি— মিলটনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।" 'বৃত্রসংহারে'র এতখানি প্রশংসায় সেযুগে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।[২]

---

২ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' ছদ্মনামে 'বঙ্গীয় সমালোচক' শীর্ষক একটি 'কাব্যে' বঙ্কিমের এই সমালোচনাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন,

কে লিখেছে— হেমচন্দ্র, বলিহারি যাই,
এমন সুন্দর বই আর দেখি নাই॥
পদের লালিত্য হেন— শুধু তাই বলি কেন?
ভাবের গৌরব আর সুন্দর সমাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
এ গ্রন্থ অমূল্য বলি মিলটন যাও চলি
স্বর্গ মর্ত রসাতল— নরক সংসার
এক কালে এক গ্রন্থে প্রবেশ সবার।

(বর্তমান লেখকের 'সেকালের ছড়া ছবি ও প্রহসনে বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ আষাঢ় ১৩৭৭)

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' গ্রন্থে আছে, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাছে বৃত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে? আমি বলিলাম, আমি হেমবাবুর শিষ্যস্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে। অক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন, মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে বলেছেন, "এই কাব্যে হেমবাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন— অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী।"

হেমচন্দ্র বর্ণিত নিয়তির স্বরূপ কি, গ্রীসীয় নিয়তির ও হেমচন্দ্রের নিয়তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়, কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞান কি ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে, বৃত্রসংহারে তার উদাহরণ কোথায়— ইত্যাদি প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার উপসংহারে হেমচন্দ্রের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমালোচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করছি,

"গ্রন্থকারের ছন্দঃসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল— সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বৈচিত্র্য ও লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগপূর্বক, দেশী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 'কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল' হইয়াছেন। কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্যের তাদৃশ ঔৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য হওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দঃ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার কাব্য যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু 'একোহি দোষো গুণসন্নিপাতেনিমজ্জতীত্যাদি।' আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, হেমবাবু দীর্ঘজীবি হইয়া, বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।"

এইখানে 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ডের সমালোচনা শেষ হয়েছে।

'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন হেমচন্দ্র নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। হেমচন্দ্রের ভূমিকার চরণ বঙ্কিম তাঁর সমালোচনায় উদ্ধৃত করেছেন। ভূমিকায় হেমচন্দ্র কি লিখেছিলেন তা প্রথমে জানা প্রয়োজন।

হেমচন্দ্রের বক্তব্যের সূত্রগুলি হল এই :

ক. গ্রন্থে পয়ারাদি বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

খ. মিত্রাক্ষর ছন্দ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ উভয়বিধ ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ আছে বটে, কিন্তু সেখানে সাধারণ সংস্কৃত চার চরণ শ্লোকের রীতি অনুসারে চৌদ্দ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তি চার পংক্তিতে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

এবার বঙ্কিমের বক্তব্য সূত্রাকারে নির্দেশিত হল :

ক. একটি দীর্ঘ কাব্য বা মহাকাব্য আগাগোড়া একই ছন্দে লিখিত হওয়া কুপ্রথা। সর্গে সর্গে ছন্দ পরিবর্তনের যে রীতি এ দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে বর্তমান— তা শ্রেয়।

খ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংস্কৃত শ্লোকের আকারে রচিত হওয়ায় ভাল হয়েছে।

গ. সংস্কৃত ছন্দের মাত্রাবৃত্ত রীতি পরিত্যাগ করাতে হেমচন্দ্রের পদ্যের তাদৃশ উৎকর্ষ হয় নি। অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর অপেক্ষা মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ শ্রেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের গৌরব নির্দেশ করেন। কিন্তু আধুনিক কালের পাঠক মহাকাব্যের মধ্যে ছন্দ প্রয়োগে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের দুর্বলতা ও ত্রুটি কোথায় তা সহজেই অনুভব করেছেন। হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যেও একাধিক ছন্দের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখি। মহাকাব্যের মধ্যে নানা ছন্দের ব্যবহার করতে গিয়ে হেমচন্দ্র মহাকাব্যের গম্ভীর পরিবেশ অত্যন্ত লঘু করে ফেলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ ধ্বনি নির্ঘোষ ও বৈশিষ্ট্য তিনি ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। কেবল পয়ারের মিলটুকু তুলে দিয়ে হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। মোহিতলাল রসিকতা করে হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে 'মালগাড়ির ছন্দ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষরের দুর্বলতা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেন নি। এবং একাধিক ছন্দ প্রয়োগের ফলে বৃত্রসংহার কাব্যটির যে ক্ষতিই হয়েছে— এদিকটিও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক লক্ষ্য করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য, সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বাংলা কবিতায় সহজেই ব্যবহার করা যায়। হেমচন্দ্রের বক্তব্য, বাংলায় লঘু-গুরু উচ্চারণ ভেদ না থাকায় সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় অনুকরণ করা কঠিন। হেমচন্দ্রের বক্তব্যই যথার্থ। এ প্রসঙ্গে 'ছন্দ' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি বলেছেন, কোনো কোনো কবি "বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।" কিন্তু চেষ্টা যে পরিমাণই হোক, বাংলার পক্ষে এ রীতি স্বাভাবিক নয় এবং তা চলতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের অভিমত, "বাংলায় এ জিনিস চলিবে না ; কারণ বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে।" বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেউ কেউ, ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে আরও কোনো কোনো কবি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা নিতান্তই চেষ্টা মাত্র।

৬

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এঁর পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম। অক্ষয়চন্দ্রের লেখা 'পিত্রাপুত্র' নিবন্ধে বঙ্কিমন্দ্রের সঙ্গে পিতাপুত্রের কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল তার বিবরণ আছে। অক্ষয় সরকার এখানে জানিয়েছেন, "৮২ সালের [১২৮২] বৈশাখে বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে ঋতুবর্ণনের সমালোচনা করিলেন।"

'ঋতুবর্ণনে'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় হেমচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন।

কাব্যের দুই উদ্দেশ্য— বর্ণন ও শোধন।

এক শ্রেণীর কবি, জগৎ যেমন আছে, ঠিক তার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করে থাকেন।

আর এক শ্রেণী, প্রকৃতি সংশোধন করে সৌন্দর্য সৃজন করেন।

বঙ্কিমের ভাষায়, "যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।"

"সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, 'যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই' সেই আত্মচিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া সুন্দরকে আরও সুন্দর করে" যে শ্রেণীর কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার। "যাহার উদ্দেশ্য কেবল যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তার "উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন"। এক্ষেত্রে 'উৎকৃষ্ট উদাহরণ' শব্দটি কাব্যের কতখানি উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করছে তা সহজেই অনুমেয়। বঙ্কিমচন্দ্র একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন হেমচন্দ্র ও গঙ্গাচরণের কাব্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। "উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে— গঙ্গাচরণবাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ উৎকৃষ্টরূপে আত্মকার্য সম্পন্ন করে, যথা—

ঘনতম ঘোরতট ক্রমে ঘোরতর, / চতুর্দিকে অন্ধকার, অতি ভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির। / ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই— তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দক নাই। পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখ—

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ, দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাবে,
বেগে দীপ্ত গিরি কায়, বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাবে॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটা করি লহরে লহরে॥"

'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে উল্লেখ করেছিলেন, "হেমবাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী।"

সমালোচ্য লেখকের সঙ্গে দেশী বা বিদেশী কোনো লেখকের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার একটি বিশেষ প্রবণতা। 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় মধুসূদন হেমচন্দ্র ও বাইরনের প্রসঙ্গ উঠেছে, 'দানবদলনে'র সমালোচনায় মধুসূদনের কথা আছে, 'মানসবিকাশে'র সমালোচনায় কালিদাস জয়দেব ভারতচন্দ্র জ্ঞানদাস রায়শেখর মধুসূদন হেমচন্দ্র এবং পোপ জনসন বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রসঙ্গ এসেছে, 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনায় 'ইলিয়ড' কাব্যের প্রসঙ্গ বা ভারতচন্দ্র মধুসূদন ও বলদেব পালিতের কথা আছে। গঙ্গাচরণ সরকারের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেও ইংরেজ কবির কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়েছে। বঙ্কিম লিখছেন, "গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব (Crabb)কে মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনাকাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব নীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় গীতিকাব্য কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। এবং সেখানে কাব্যের বর্ণন ও শোধন এইরূপ কোনো বিভাগ করেন নি। উক্ত সমালোচনায় বঙ্কিম বাংলায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর নাম করেছেন। উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের নিদর্শন হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলেন নি। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহে'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদিগের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না।" ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য, "তাঁর কবিতা অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয়, তাঁহার কবিতায় নাই।" এ হেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে 'ঋতুবর্ণন' কাব্যের সমগোত্রীয়তা আবিষ্কারে গঙ্গাচরণের কবিত্বের ঔৎকর্ষ প্রমাণ করে না।

সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র যা বিবৃত করেছেন, তা উদ্ধৃত হল :

"পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি যে, গঙ্গাচরণবাবু এই ঋতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না— না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষগুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।"

৭

'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এর চার বৎসর পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনা যখন প্রকাশিত হয় তখনও লেখক ও সমালোচকের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিচয় ছিল না। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধে'র সমালোচনা যখন রচিত হয় তখন নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন, "একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি 'পলাশির যুদ্ধে'র রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে 'পলাশির যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য— next, if at all, to Meghnad— মেঘনাদবধের সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্তী স্থান পাইবার যোগ্য।' আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে, তিনি লিখিলেন উহা বঙ্গদর্শন প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছয় মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন,— তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না, অতএব 'সাধারণী প্রেসে' ছাপিতে হস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন।"

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনা ও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সমালোচনার রীতি একরূপ। প্রতি সর্গ অবলম্বনে সমালোচনা রচিত হয়েছে। পাঁচ সর্গে সম্পূর্ণ 'পলাশির যুদ্ধে'র সকল সর্গেরই পরিচয় বা প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় উত্থাপিত হয়েছে। 'পলাশির যুদ্ধে'র দোষ এবং গুণ উভয় দিকের প্রতিই সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'পলাশির যুদ্ধে'র প্রথম সর্গে ষড়যন্ত্র সভার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিম বলেছেন, "ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং নবীনবাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে।"

"দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়।"

"তরণীর নাবিকদিগের গীত অতি মনোহর— বাইরণের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বাইরণকৃত নাবিক-দস্যুর গীত মনে পড়ে। (*The Corsair)"

"তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্যগীতের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এমত সময়ে, সহসা ইংরেজের বজ্র গর্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণকৃত ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে— There was a sound of revelry by night &c. নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাইরণের যোগ্য—

বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময় / বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয় / চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল / বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !"

চতুর্থ সর্গের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। কবির কোনো প্রশংসাই নেই।

পঞ্চম সর্গ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই, কেবল বলা হয়েছে, "পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, সিরাজদ্দৌল্লার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বায়রনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা।" এবং "বাইরণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।"

যে-সকল অংশ উদ্ধৃত করা হল, তার মধ্যে নবীনচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানেই সমালোচনা সম্পূর্ণ হয় নি। কাব্যরচনায় নবীনচন্দ্রের দোষত্রুটির পরিমাণ কম নয়, এবং বায়রনের সঙ্গে তাঁর যেমন কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যের পরিমাণও স্বল্প নয়। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে তবেই নবীনচন্দ্রের কাব্য বা কবি-প্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথম সর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য, "এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না।"

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের আলোচনার শেষে বলেছেন, "এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গ সকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজ সেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল এই মাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না।"

চতুর্থ সর্গ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তি, "ইংলণ্ডের রণজয় হইল— সূর্যাস্ত হইল— কবি সূর্যকে সাক্ষী করিয়া নিজ মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যান-কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইল্ড হেরল্ডে বাইরণ সচরাচর এইরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণন-কাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান-কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্যের গতিরোধ করা কর্তব্য হয় নাই।"

পঞ্চম সর্গের দোষগুণের কোনো কথাই নেই, কেবল এক ছত্রে উক্ত সর্গের মূল বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে মাত্র।

পাঁচটি সর্গের প্রসঙ্গ শেষ করে বঙ্কিমের বক্তব্য, "মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা-সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর, রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা-সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য বা সৃষ্টিবৈচিত্র্য সংঘটনে নবীনচন্দ্র বিশেষ কবিত্ব বা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র একটি বিশেষ গুণ, তাতে উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, গীতিকাব্য আছে। 'পলাশির যুদ্ধ' উপাখ্যান বা বৃত্তান্তধর্মী রচনা, কিন্তু এতে অকারণে গীতিকাব্য প্রাবল্য পেয়েছে, মূল উপাখ্যান বা নাটকের ভাগ প্রাধান্য লাভ করে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার উপসংহারে বলেছেন, "কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।"

বঙ্কিমের এই মন্তব্যের বিশ্লেষণ আবশ্যক। তিনি যথার্থ কি বলতে চাইছেন? নবীনচন্দ্রকে কবি হিসাবে উচ্চ আসনে বসাতে পারি না পারি, তাঁকে বাংলার বায়রন বলে পরিচিত করতে পারি।—এ কথার অর্থ কি, এর মধ্যে প্রশংসার ব্যঞ্জনাই বা কতখানি রয়েছে? কোনো কবিকে বাংলার ক্র্যাব কোন কবিকে বাংলার বায়রন বললে কি সেই সেই কবির যথার্থ পরিচয় প্রদান করা হয়? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র এক স্থানে লিখেছেন, "তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতি ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর-কিছু; আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।" পিতৃদত্ত মূল নামটি গোপন রেখে ডাকনামে পরিচয় প্রদানের রীতিকে রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করেছেন। আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ—শেলি বা কীট্‌স্ নন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। সেই রকম নবীনচন্দ্রকে কবি নবীনচন্দ্র হিসাবেই বিচার করতে হবে। হয় তিনি শক্তিশালী কবি—প্রশংসার পাত্র, নতুবা তিনি শক্তিহীন কবি—প্রশংসার যোগ্য নন। কিন্তু বাংলার বায়রন বা শেলি বললে কবির যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বাংলার বায়রন বলে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কবি হিসাবে তাঁকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচ্য কবিকে বাংলার বায়রন বলে পরিচিত করে জানিয়েছেন যে 'এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নয়'। আমাদের প্রশ্ন, এ প্রশংসার স্বরূপটা কি? তুমি বড় কবি নও, কিন্তু বায়রনের সঙ্গে তোমার কোনো কোনো বিষয়ে মিল রয়েছে—তাই তুমি বাংলার বায়রন—এটা কি কবির যথার্থ প্রশংসা? বায়রনের কবিতায় কিছু কিছু ত্রুটি আছে, নবীনচন্দ্রের কবিতার মধ্যেও যদি সেই সেই ত্রুটিগুলি লক্ষিত হয়—তাহলেও কি তিনি বাংলার বায়রন! ত্রুটির দিক থেকেও তো লেখকে লেখকে সাদৃশ্য থাকতে পারে—সেই সাদৃশ্যের বিচারে যদি কাউকে বাংলার শেক্সপীয়র বা বাংলার 'শ' বলি—তবে কি তিনি প্রশংসার যোগ্য হলেন!

সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কোনো কোনো স্থানে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বায়রনে যা আছে নবীনচন্দ্রে তা নেই।

চতুর্থ সর্গের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বায়রনের 'চাইল্ড হেরল্ডে'র সঙ্গে 'পলাশির যুদ্ধে'র তুলনা করেছেন। সে অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি। সেখানে তিনি বলেছেন—'চাইল্ড হেরল্ড' বর্ণন-কাব্য, আর 'পলাশির যুদ্ধ' উপাখ্যান-কাব্য; 'চাইল্ড হেরল্ডে' যা আছে 'পলাশির যুদ্ধে' তা সাজে না।

সমালোচক আর এক স্থানে বায়রনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন—কিন্তু সেটা গুণগত নয়। বায়রনেও যে গুণ নেই, নবীনচন্দ্রেও সেই গুণের অভাব—উভয়ের এই প্রকার সাদৃশ্য। "চরিত্রের আশ্লেষণে (synthesis) দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই।" তবে বিশ্লেষণের (analysis) ক্ষেত্রে উভয় কবিরই "কিছু" শক্তি আছে। ক্লাইবের নৌকারোহণ অংশ বর্ণনায় নবীনচন্দ্র বায়রনের ন্যায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, "কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটির প্রতি অনুকূল মনোভাব ছিল না তা নবীনচন্দ্রের উক্তির মধ্যেও ধরা পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র একদা 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি ছাপাবার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা মুদ্রিত করেন নি। 'পলাশির যুদ্ধ' অন্য প্রেস থেকে প্রকাশিত হল। নবীনচন্দ্র লিখেছেন, "বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন— It is unfortunate Hem should have made his *debut* before you.— তোমার দুর্ভাগ্য যে হেম তোমার পূর্বে আসরে নামিয়াছেন। কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম হেমবাবুর বৃত্রসংহারের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম, এবং যখন বঙ্গদর্শনে উহার— 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'— সম্বলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম এবং শুনিলাম এমন একটা লাইন সেক্ষপিয়ার কি মিলটনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি ত কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই।"

নবীনচন্দ্র লিখেছেন, 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের পর বঙ্কিমবাবুর 'সুর' পালটে গিয়েছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র আগাগোড়া যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পাঠ করে আমাদের তো মনে হয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের পরে ও পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি 'সুর' বা একটি মনোভাবই প্রথমাবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মুদ্রিত করতে চাইলে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে লিখেছিলেন, "বঙ্গদর্শনে ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে।" এখানে প্রশ্ন, কার অগৌরব? 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের, না, বঙ্গদর্শন পত্রিকার?

৮

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" এতদিন পর্যন্ত আমরা সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ সত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি নি। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে তাঁর যে-সকল সমালোচনা সংকলিত হয়েছে তাতে সাহিত্যবিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, কিন্তু তাঁর কালের সাহিত্যগ্রন্থাদির দোষগুণের বিচারের কোনো নিদর্শন নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বঙ্কিমের সমালোচনা কার্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমকালীন গ্রন্থের সমালোচনার কথাই বলেছেন, সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারমূলক রচনার কথা নয়। একালের পাঠক সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত নন। বর্তমান প্রবন্ধে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুদ্‌ঘাটিত দিকটির প্রতি কিছু আলোকপাত করতে সচেষ্ট হয়েছি।

নামধাতু-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

নামধাতু যে কোনো ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য। এ দেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে নামধাতু অপ্রতুল নয়। এমন-কি, মাইকেল-পূর্ব বাংলা সাহিত্যেও নামধাতুর প্রয়োগ উপেক্ষণীয় নয়। তা ছাড়া প্রাকৃত বাংলা অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের কথাবার্তায় নামধাতুর প্রয়োগ অপর্যাপ্ত। একজন কৃষকের ভাষায় ধান কলায় (অর্থাৎ কল করে বা অঙ্কুরিত হয়), ফুলায় (ফুল ধরে), শিষায় (শিষ ধরে), বেশি পাকলে ঝাঁঝায় (ঝাঁ ঝাঁ করে)। ধান রুইতে হলে জমি কাদাতে (কাদা করতে) হয়। এরকম অসংখ্য আছে। সাধারণভাবে বাঙালি সাধারণের মুখের ভাষাতেও নামধাতুর প্রয়োগ নিতান্ত বিরল নয়। কিলোনো, চড়ানো, জুতোনো, বেতানো ইত্যাদি। তবুও এটা সত্য যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের তুলনায় নামধাতু সম্পদে আমরা দীন। নিঃসন্দেহেই এই দীনতা মোচনে মাইকেল উৎসাহিত হয়ে যে দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছিলেন তা 'মেঘনাদবধকাব্যে'র ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত।

রবীন্দ্ররচনায় প্রচলিত অপ্রচলিত নামধাতুর সংখ্যা অন্তত পক্ষে সহস্রাধিক। অবশ্য মাইকেলের সঙ্গে রচনার পরিমাণগত তুলনায় এ সংখ্যা নগণ্য। আরো লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের নামধাতুর প্রয়োগ বিসদৃশ বোধ হয় না। এই বিষয়ে মাইকেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ মূলগত। ভাষার প্রকৃতির প্রতি মাইকেলের উপেক্ষাই এর কারণ কিনা তা বিচার্য। বস্তুত পরপর অনেকগুলি নামধাতুর প্রয়োগেও রবীন্দ্ররচনা ক্লান্তিকর হয় না :

> 'দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
> বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
> এ বক্ষপঞ্জরে, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
> সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
> অন্ধকারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
> কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
> শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
> প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে'

—বসুন্ধরা (সো. ত. ৩।১৩১ পৃ.)।

রবীন্দ্ররচনার প্রথম দিকের অধিকাংশ নামধাতুরই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মঙ্গলকবিরা, বৈষ্ণব-কবিরা, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন ও বিহারীলাল প্রমুখ কবিরা রবীন্দ্রনাথের উত্তমর্ণ। মাইকেল-ব্যবহৃত নামধাতুর অনেকগুলির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ-প্রযুক্ত নামধাতুর মিল আছে। সেগুলির সবগুলিই যে মাইকেল প্রথম প্রয়োগ করেছেন তা বলতে পারি না। শব্দের ইতিহাস-অনুক্রম বিবরণ প্রচলিত বাংলা অভিধানগুলিতে নেই। ফলে অভিধানগুলিতে মঙ্গলকাব্যে বা অন্যত্র ব্যবহৃত অনেক নামধাতুরও বিবৃতির অভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গদ্য সাহিত্যেও নামধাতুর প্রয়োগ ছিল। রবীন্দ্রনাথেও কিছু নামধাতুর গদ্যে

প্রয়োগ আছে। যেমন— অবহেলিয়া, ক্ষরিয়া, জিনিতে, বাঁকিল, দীর্ঘায়মান, মর্মরায়মান ইত্যাদি। মুখের ভাষায় যখন নামধাতুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়, তখন বর্তমানে কেবল পদ্যেই বা কেন তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হল জানি না।

অনেক সময় আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে 'ইতে' ও 'ইয়া' যুক্ত হলে পদ্যে ধাতুর 'আ' লোপ হয় এবং মূল ধাতুর সঙ্গে 'ইতে', 'ইয়া' যুক্ত হয়। যেমন— আঁকড়া+ইতে>আঁকড়িতে, আঁকড়া+ইয়া>আঁকড়িয়া। আবার কখনো কখনো 'ইয়া' 'ইয়ে'-তে রূপান্তরিত হয়— আঁকড়িয়ে। এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ 'আঁকড়ি'ও দেখা যায়। বস্তুত সকল 'ইতে' ও 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর 'তে' ও 'য়া' লুপ্ত রূপ পদ্যে প্রচলিত। রবীন্দ্রকাব্যে অনেক ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত রূপগুলির ব্যবহারের অন্যতম কারণ অন্ত্যমিল। সময়ে সময়ে 'ইতেছে' প্রত্যয় 'ইছে' সংক্ষিপ্তরূপে সাধারণ ধাতুর শেষে পদ্যে ব্যবহৃত হয়। নামধাতুর ক্ষেত্রেও এইসব রীতির ব্যত্যয় নেই।

ছন্দ ও অন্ত্য মিলের অনুরোধে দু-এক ক্ষেত্রে প্রচলিত রূপের নবরূপ দেখা যায়। যথা— আভানি<আহ্বানি, ঘনিয়া<ঘনিয়ে, চুরায়ে<চুরিয়ে, তেয়াজি<তেয়াগি, রণিয়া<রণিয়ে; খিলিখিলি (তালিকা দ্র°)।

অনেক চলতি নামধাতুও রবীন্দ্রকাব্যে দেখা যায়। যেমন— ফেনিয়ে, লতাইবে, কলকলিয়ে ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত নামধাতুর একটি তালিকা এইসঙ্গে উপস্থাপিত করছি। এই তালিকা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও নিঃশেষিত নয়। সাধারণভাবে অতিপ্রচলিত ও বৈচিত্র্যহীন নামধাতুগুলি এই তালিকারচনায় ধরা হয় নি। তবে কিছু পুরোনো নামধাতুও এই তালিকায় আছে। সেগুলি রবীন্দ্রপূর্ব কালের। অপরপক্ষে ঠিক কোন্‌গুলির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথই তা বলা শক্ত। কিন্তু এ অনুমানও সত্য যে কতকগুলির তিনিই সৃজনকর্তা। আজ যত দুরূহই হোক ভাবীকালে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নামধাতু চিহ্নিত হবেই। বর্তমানের এই তালিকা ভাবী গবেষকের সে কাজে সহায়ক হবে। সেই ভাবী সার্থকতায় এই তালিকার আসল মূল্য নিহিত।

নামধাতুর তালিকা[১]

অঙ্কিল। অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু/উত্তরীয় প্রান্তে প্রান্তে। ব. ১৫।১১৬

অঙ্কুরি। ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি/অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি। প. ১৫।১৭১

অঙ্কুরিছে। যেথা হতে অহরহ/অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ। সো. ত. ৩।১৩৮

অঞ্জলিয়া। বৎসরের শেষগান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া/নিশীথগগনে। ক. ৭।১৮৮

অন্বেষিয়া। সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেষিয়া। ভ. অ-১।২৫৯

অপসারি। বিঘ্ন দাও অপসারি। গীতবিতান ১।৫৮

অপেক্ষিয়া। মহারাজ,/স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ। ক. ৫।১১৪

১ তালিকায় প্রত্যেক নামধাতুর রূপে একটি মাত্র আকর উল্লেখ করা হইয়াছে। আকর সংকেত নিম্নরূপ— অ-১, অ-২ অচলিত সংগ্রহ ১ম ও ২য় খণ্ড। আকরের অন্তে বর্ণ ও অঙ্কগুলি অচলিত সংগ্রহ খণ্ডদ্বয়; ও রচনাবলী ২৭ খণ্ড-ভুক্ত গ্রন্থের নামের আদ্যঅক্ষর, খণ্ড—, পৃষ্ঠা—, সংখ্যা-নির্দেশক। রচনাবলীবহির্ভূত গ্রন্থের ক্ষেত্রে পূর্ণনাম, খণ্ড—, পৃষ্ঠা—বা পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ আছে। এই তালিকা-প্রণয়নে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে।

অবজ্ঞিয়া। অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে। ব. ১৫।১২৮

অবারি। এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয়ে সব অবারি। বা. ১।২২৫

অর্জিল। বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়। গীতবিতান ১।২৫৪

অর্পিনু। অর্পিনু সেথা মোর বীণা। ম.১৫।২৪

অর্পিব। প্রভু, এই আমার বন্দনা / নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে। ন. ১৮।১৯৮

অর্পিয়াছ। তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার। নৈ. ৮।৪৬

অর্পিয়াছি। জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে/ জন্ম জন্ম ধরি। চি. ৪।৩৫

অর্পিয়াছিনু। সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী। বী. ১৯।৩৪

আকুঞ্চিয়া। ভুরু কেন আকুঞ্চিয়া। ভ. অ-১।২২৫

আকুলি। উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে। মা. খে. ১।২৩৫

আকুলিছে। অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে। পূ. ১৪।৫৯

আকুলিতে। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি/ কল্পনাবিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে/আকুলিতে থাকে কিলিবিলি। ম. ১৫।৫৫

আকুলিয়া। কৃষ্ণহীরা-সম কৃষ্ণ আঁখি-তারা/ আঁধার-আগার হতে আলো-ধারা/হানিবে হেথায়, হানিবে হোথায়/আকুলিয়া দশ দিশ। ভ. অ-১।১৯৩

আবর্তিছে। আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকার পথে/আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে। বী. ১৯।১০৩

আবর্তিয়া। রক্তবেগতরঙ্গিত বুকে/গম্ভীর জলদ-মন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে নব ছন্দ। কা. ৫।৯৪

আভানি<আহ্বানি। এত বলি ধীরে কলপনা-রানী/বীণায় আভানি তান/বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া/অবশ করিয়া প্রাণ। শৈ. অ-১।৪৩১

আভাসি। কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী/নয়নে উঠে গো আভাসি। উ. ১০।১৮

আরোহিব। যত উচ্চে আরোহিব তত হবে দারুণ পতন। ভ. অ-১।১৩৭

আলোকি। সখী/সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিবে আলোকি। পূ. ১৪।৫৮

আলোড়িছে। কিন্তু এই-যে এই মুহূর্তে বেদন-হোমানল/আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল। সেঁ. ২২।৪৯

আলোড়িয়া। অনন্ত আকাশ-'পরি ছুটিস রে হা হা করি,/আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর। ছ. গা. ১।১৩০

উচ্চারি। রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গল গীত। ক. ৭।৪৫

উচ্চারিয়া। রাজপথে/অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ নগর ছাড়িয়া। কা. ৫।১১২

উচ্চারিল। দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে। শে. ২৬।৪৯

উচ্চারিলে। তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ, ঊর্ধ্ব-শীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা। ব. ১৫।১১৫

উছলিতে। আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায়/ অফুরান নৈরাশায় / উছলিতে থাকে একতানে / আন-মননীর কানে কানে। সা. ২৪।১৩৬

উছলিয়া। পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া/নদীর জল ছলছলিয়া উঠে। প. ১৫।২১৭

উছসিল। তার পরে মহা হাসি/উছসিল রাশি রাশি। চি. ৪।৭০

উছাসিছে। নব রাগ রাগিণী উছাসিছে। বা. ১।২২৫

উচ্ছলি। নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি/শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া। ক. ৭।১২২

উচ্ছলিছে। প্রসন্নতা তার অন্তহীন /রাত্রিদিন / গভীর কী উৎস হতে/উচ্ছলিছে আলোঝলা কথাবলা স্রোতে। ম. ১৫।৭৫

উচ্ছলিবে। উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস/উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস। ম. ১৫।৫

উচ্ছলিয়া। যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে /রবির সোহাগ-গর্ব বর্ণ গন্ধ মধুরসধারে/বৎসরের ঋতু-পাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে। প. ১৫।৩০২

উচ্ছলিল। যতটুকু পাই ভীরু বাসনার/অঞ্জলিতে/ নাই বা উচ্ছলিল। সা. ২৪।১১৫

উচ্ছ্রিয়া। উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে। ব. ১২।২২

উচ্ছলিয়া। বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে / উচ্ছলিয়া উঠে জেগে। ম. ১৫।৭১

উজলিয়া। দীপাবলীর থালাতে নাই / তাহার ম্লান হিয়া, / তারায় তারি আলোক তাই / উঠিল উজলিয়া। প. ১৫।২২৭

উজ্জ্বলি। চপল চক্ষে তরল তারকা / কেন উঠে উজ্জ্বলি। ক্ষ. ৭।২৯০

উত্তারি। আমার আহ্বান যে অভ্রভেদী তব জটা হতে / উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধা স্রোতে। ন. ১৮।১৯৮

উৎসারিছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি, / কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেইমতো উচ্ছ্বাসি / উৎসারিছে প্রাণের ধারা। আ. ২৩।১০১

উৎসারিয়া। হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দাম অগ্নিতাপবেগে / আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে / সে তাপ হারায়ে গেছে। উ. ১৪।৪২

উৎসারিল। যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে / জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে। প. ১৫।১৮২

উৎসাহি। নবীন বদনে অভয় কিরণ / জ্বলি উঠে উৎসাহি। ক. ৭।৫৮

উৎস্রাবি। এই সাধনায় বিশ্বকবির / আনন্দবীন বাজে, / আপ্‌নারে দেয় উৎস্রাবিয়া / আপন সৃষ্টি-মাঝে। প. ১৫।২৯১

উদাসিয়া। ধরি ধরি করি সুর ধরিতে না পারে মন, / উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ। শৈ. অ-১। ৪৫১

উদাসে। যাবার লাগি মন তারি উদাসে। গী. ১১।২৮৩

উদ্‌গারিছে। তাই এই রাজ্যের মনে / বিদ্বেষ-অনল উদ্‌গারিছে কৃষ্ণ ধূম / নিন্দা রাশি রাশি। রা. রা. ১।২৮১।

উদ্‌ঘাটিছে। অসংখ্য এ রচনায় উদ্‌ঘাটিছে মহা ইতিহাস,— যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস। প. ১৫।১৭১

উদ্‌ঘাটিবে। মৃত্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি, / ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা। রো. ২৫।১৩

উদ্‌ঘাটিয়া। যেথা পূর্ব ঋষিগণে / বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে / দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড় হাতে। উ. ১০।৪৫

উদ্‌ঘাটিল। এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প করি / প্রাণ পঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি / জড়ের বিরাট অঙ্কতলে / উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় পরিচয় / শাখায়িত রূপে রূপান্তরে। জ. ২৫।৭৩

উদ্‌ঘাটিলে। হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার / যুগে যুগে উদ্‌ঘাটিলে সামনে সবার। ন. ২৪।২৩

উদ্‌ঘোষিল। কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে / জয়, জয়, জয়। পূ. ১৪।৫৪

উদ্‌বারি। অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি / তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি। জ. ২৫।৭৯

উদ্‌বারিয়া। আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর। জ. ২৫।৯৩

উদ্‌বারিল। উদ্‌বারিল গন্ধ তার, / সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার। সা. ২৪।৯০

উদ্‌বেলিয়া। শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে / অন্তরের অন্তহীন অশ্রু পারাবার / উদ্‌বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার গভীর নিস্বনে। সো. ত. ৩।৭৬

উদ্‌বোধিয়া। দেখি নি কি আর্তচিত্ত উদ্‌বোধিয়া রাখে / মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনার নিত্য আন্দোলনে। বী. ১৯।৬৫

উদ্‌ভাসি। সন্ধ্যাতারা সম / শেষবাণী উঠুক উদ্‌ভাসি— / "ভালোবাসি।" শে. ১৮।১১৪

উদ্‌ভাসিয়া। মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল / অঙ্গের সীমান্তপ্রান্তে উদ্‌ভাসিয়া উঠে, / এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে। সো, ত. ৩।৬৫

উন্মথিয়া। দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে, / রিক্ততারে টুটি / রহস্য সমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে / রত্ন মুঠি মুঠি। পূ. ১৪।৫০

উন্মনে। সে যে তোমার মুখ তুলে চায় উন্মনে। গীতবিতান ১।১৪৯ তু. সংস্কৃত নামধাতু— উন্মায়তে।

উন্মাদিয়া। কেন তোর সর্ব তন্ত্র সবলে প্রহত / মিলিত ঝংকার-ভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া / আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া / উঠিল না বাজি। উ. ১০।৮৬

উন্মূলে। অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে, / স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে। ব. ১৫।১৩৬

উন্মেষিছে। উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ। প. ১৫।২৩১

উপহাসি। অগ্নিহাসি উপহাসি উল্কা অভিশাপ-শিখা / পড়িছে খসিয়া। ছ. গা. ১।১৫৩

উর্বরিয়া। সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া, / শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া। বা. অ-১।৫৪২

উলসি। শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয় / উলসি বিলসি নাচে। চি. ৪।১০০

উলসিছ। আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে। চি. ৪।২১

উল্লঙ্ঘিয়া। উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস / ম. ১৫।৫

উল্লসি। আবার আনন্দপূর্ণ স্বরে / উল্লসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে। সো. ত. ৩।৫৬

উল্লসিয়া। প্রথম আষাঢ় দিনে গুরু গুরু রবে / ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে-গৌরবে। ম. ১৫।৭৪

উল্লাসি। বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় / নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি। সো. ত. ৩।১৩৫

ওঙ্কারিয়া। মোর চেতনায় / আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়। জ. ২৫।৮৫

কটাক্ষিয়া। কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি, / যেন সে ছলনা-ভরা সুগভীর ছুরি। কা. ৭।১০৮

কণ্টকিয়া। নূতন সৃষ্টির বক্ষে / কণ্টকিয়া উঠিবে আবার। রো. ২৫।৩৬

কম্পি। কৌতুক সুখ চক্ষে ফুটুক, / বিদ্যুৎশিখা কম্পি উঠুক / তব চঞ্চল কঙ্কণে। ন. ১৮।২১০

কম্পিয়াছে। যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি / অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া। বি. ৪।১৩১

কলুষিবে। মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস, / বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস। ন. ২৪।১২

কুঞ্চিয়া। ভ্রূকুঞ্চিয়া কহে রাজা! কা. ৭।১১০

কুসুমি। যে অজস্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি / ভূতলের চিরন্তনী কথা। ব. ১৫।১২২

ক্রন্দি। স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি সুরপরিষদ বন্দী। গীতবিতান ১।১০৩

ক্রন্দিয়া। বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া / ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে। ক. ৭।১৯২

ক্ষরিয়া। জিহ্বায় খাদ্য-সংযোগের উত্তেজনায় আপন রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাক-রসের উদ্রেক হয়। ধ. ১৩।৪৩৩

ক্ষলিয়া। নবরবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া / নিশার আঁধাররাশি ফেলিল ক্ষালিয়া। শৈ. অ-১।৫০৩

ক্ষুভিল। ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস / সন্ধ্যার আকাশে। যা. ১৯।৪০৮

খণ্ডি। অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি / অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি / ন. ২৪।৩৬

খণ্ডিতে। দুঃখ লজ্জা ভয় / ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে। বী. ১৯।৬৪

খণ্ডিব। সাম্রাজ্য সম্পদে / বঞ্চিত হয়েছে যারা মাতৃ-স্নেহধনে / তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে / কহো মোরে। কা. ৫।১৫৭

গ্রন্থিবারে। বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস / আপন বীণার তন্তুতে। প. ১৫।১৬১

গ্রন্থিয়া। কে জানিত, আজ আমি এ-জন্মের জীবন মন্থিয়া / যে-বাণী উদ্ধার করি চলেছি গ্রন্থিয়া / দিনে দিনে আমার আয়ুতে। বী. ১৯।৬১

ঘনায়িত। তাহায় চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর রন্ধ্রমাত্র ছিল না। চো. বা. ৩।৪৭৩

ঘনিয়া। অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া / সন্ধ্যা-কাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া। ন. ১৮।২৪৫

ঘাতি। দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর ভয়। গীতবিতান ১।১৫৬

চকিয়া। চিকুর চিকিমিকে / চকিয়া দিকে দিকে / তিমির চিরি যায় চলে। সো. ত. ৩।৮০

চঞ্চলি। আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি'। গী. ১১।২৩৭

চঞ্চলিছে। বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি / অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী। ন. ১৮।২৩৮

চঞ্চলিতে। ওই ধ্বনি আমার স্বপন / চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায়। বী. ১৯।৪৪

চঞ্চলিয়া। আকাশ ছড়ায় উচ্চহাস / চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর / শিশির-মন্থর। ব. ১২।৩২

চলকি। তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে, / চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে। সো. ত. ৩।২৫

চলকিয়া। গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল। বী. ১৯।৫৪

চিন্তিছে। অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই, / কত গুনী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই, / সো. ত. ৩।৮৯

চিরায়মান। প্রিয় প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে / প. ২০।৩৯

চিরায়মানা। ক্ষ. ৭।৩২

চুমি। ব্যথা-পথের পথিক তুমি / চরণ চলে ব্যথা চুমি। গী. ১১।২২২

চুমিনু। বক্ষে লয়ে চুমিনু তার / স্নিগ্ধ বয়নে। চি. ৪।১০৫

চুমিয়ে। সুকোমল শিথিল আঁচলে / পড়ে আছে আরামে চুমিয়ে। ছ. গা. ১।১২১

চুরায়ে। কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে। শি. ৯।১৪

চেতাইল। সহসা স্তিমিত জলে আবেগসঞ্চার / দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে। কা. ৭।১০৪

ছলকে। অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে / ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা। বী. ১৯।৫৩

ছলি। খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও, / খনে খনে যাও ছলি। উ. ১০।১৫

ছলিলে। প্রভু, মোরে কী ছল ছলিলে। চৈ. ৫।১০

জিনিতে। অন্যে তাহাকে জিনিতে পারে না। চো. বা. ৩।৩৯৭

ঝনকি। কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি। ভোলায় রে দিগ্‌ভ্রান্তে। ক্ষ. ৭।২৯০

ঝনকে। ঝিল্লি ঝনকে ঝিনিঝিনি। শ্রা. ২৫।১২২

ঝনিল। বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা / ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে। ন. ২২।৬৭

ঝলকি। যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়, / বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়। / তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে, / চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে। সো ত. ৩।২৫

ঝলকিছে। ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা/আজ তোমার ওই বক্ষে ঝলকিছে। প. ১৫।২৩৮

ঝিকিয়া। নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে / আলোকে ঝিকিয়া। সো. ত. ৩।১৩৭

তলাশিয়া। যেতে হয় যদি চলো নিরবধি / সেই ফুলবন তলাশিয়া। চি. ১৬।২৭৯

তাপিয়া। সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া। ভ. অ-১।১৫৮

তুড়িয়ে। তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব তুড়িয়ে। খা. ২১।১২

তেয়াজি। আহা বরিল তোমারে কে আজি / তার দুঃখশয়ন তেয়াজি', / তুমি ঘুচালে কাহার বিরহকাঁদনা। শে. ১৮।১৪০

তোলপাড়িয়ে। তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া, / তবু কর্তা দেন না সাড়া। খা. ২১।৬০

ত্রাসিয়া। দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া / কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া, / সো. ত. ৩।১০৯

দীক্ষিছে। এই পলায়নে ভূতভবিষ্যৎ / দীক্ষিছে ধরণীরে। সেঁ. ২২।৩৫

দীর্ঘায়মান। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া অক্ষাটির চিরদীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পারছে না। জা. ১৯।৩১৮

দীর্ঘায়মানা। দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য। চা. ১৩।২৮১

দুখায়। অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে। শে. ১৯।১৯৫॥ তুঃ সংস্কৃত নামধাতু—দুঃখায়তে।

ধিক্কারিল। আপনারে ধিক্কারিল। কা. ৭।১১৩

ধ্যায়। ধ্যায় অহরহ। ক. ৭।৫২

ধ্বংসি। তাপিত নিকুঞ্জের মৌন / নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি। ব. ১৫।১৫৩

নন্দিয়া। এতদিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া / নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি। ক. ৭।১৯২

নর্তিয়া। মানবচিত্ত-তুঙ্গ শিখর হতে / সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া / ছুটছে—সেঁ. ২২।৪৮

নষ্টে যায়। তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়? /

আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা। / ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়। সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চারজনা। ক্ষ. ৭।২২৯

নিঃশেষিয়া। নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি / নিঃস্ব-করা দানে। প. ১৫।১৬৫

নিঃশেষিয়ে। সে-সব দিনের কান্না হাসি, / সত্য মিথ্যা ফাঁকি, / নিঃশেষিয়ে যাস রে নিয়ে— / রাখিস নে আর বাকি। ক্ষ. ৭।৩১২

নিঃসরিছে। নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে / যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে / সংগীত তোমার। পু. ১৪।১৪৯

নিঃস্বনি। অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি। প. ১৫।২৮৩

নিঃস্বনিছে। অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহিরে— / "নাহি রে, নাহি রে।" পু. ১৪।২৩

নিপাতিব। বিজনেই নিপাতিব দেহ। শৈ. অ-১।৫০৬

নিবেশিলা। ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি, / আবার সে পুঁথি 'পরে নিবেশিলা আঁখি। কা. ৭।১০৮

নিমীলিয়া। অবশ নয়ন নিমীলিয়া / সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া, / স. ১।১১

নিরোধি। যা লিখেছে সব কটা সমাজের বিরোধী, / মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি। ২৬।৩১

নির্ঝরিয়া। তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে / প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ। গীতবিতান ১।১০৩

নির্দেশিয়া। মনে হল ভগবান / সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া / দিলেন দেখায়ে। চি. ৩।১৭৫

নিশ্বসিতে। পূর্ণিমার অমল চন্দনে / মাখা হয়ে নিশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-'পরে। ব. ১৫।১২৮

নিশ্বসিয়া। কপোলে, কানের কাছে, যায় নিশ্বসিয়া / কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস। মা. ২।১৮০

নিশ্বাসিয়া। নিশ্বাসিয়া উঠল হু হু / ধূ ধূ বালুর ডাঙা। ক্ষ. ৭।২৬৬

নিষ্ক্রমিলা। বর্তমান কাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে। প. ১৫।৩১১

পদার্পিল। বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে। ক. অ-১।৩১

পরিহাসো। অট্টহাসে / নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরি-হাসো। ন. ১৮।২৩০

পর্যটিব। মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন পর্যটিব, / হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার। ক. অ-১।২৩

পল্লবি। চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি। বী. ১৯।২২

পাকালিয়া। হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ। সো. ত. ৩।৩৪

প্রকাশিবে। কবি তার মরমের প্রণয়-উচ্ছ্বাস-কথা / কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া। ক. অ-১।১৯

প্রকাশিল। মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃত-রেখা। শে. ১৮।১০৭

প্রকাশিলে। স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে। ধরার বৈভব / কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে। ন. ১৮।২২৫

প্রক্ষালি। রেখেছে ফুলের ডালি / শিশিরে প্রক্ষালি / বী. ১৭।১৫

প্রক্ষলিয়া। শেষ রক্তে তার / দিবে গো সে প্রক্ষালিয়া চরণ তোমার। ভ. অ-১।২৬৩

প্রতিষ্ঠিলে। সন্তরি সমুদ্রঊর্মি দুর্গম দ্বীপের

শূন্য তীরে / শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়। ব. ১৫।১১৬

প্রতীক্ষিয়া। বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা, / দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে পাণ্ডবের তরে / প্রতীক্ষিয়া। কা. ৫।৭১

প্রবঞ্চিতে। কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে। শে. ২৬।৫১

প্রবাহিয়া। অন্তঃশীলা জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া। প্রা. ২২।৫

প্রবোধিতে। মিছা হৃদয়েরে আজ চাস প্রবোধিতে। ভ. অ-১।২২৬

প্রস্ফুরিল। মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়-প্রদোষে / পক্বপত্র যথা। শিবাজী-উৎসব, সঞ্চয়িতা ৪৭৬।

প্লাবিয়া। আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া / আকুল পাগল পারা। প্র. ১।৬০

বহুশাখায়িত। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য। মা. ৪। সূচনা ৵০

বাঁকিল। মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রর মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। চো. বা. ৩।৩৬৬

বিচলিয়া। কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া/ ঘাসের 'পরে লুটে। প. ১৫।২১৭

বিচ্ছুরি। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে। ন. ১৮।২০৮

বিচ্ছুরিছে। সে-স্পন্দন শিরায় আমার / রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো / আজি দেয়ালির দিনে। সা. ২৪।১১২

বিচ্ছুরিল। পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে / বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। প্রা. ২২।১৭

বিথাইয়া। লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল। ক. কো. ২।৩৩

বিদলিয়া। নিজ হৃদি বিদলিয়া / হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোন দিনরাত। ভ. অ-১।২২৬

বিদীরিয়া। বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া / ব. ১২।৬২

বিদীরিল। বিদীরিল যে গিরি-শিখর। ক. কো. ২।৩৩

বিদ্যুতিয়া। স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিদ্যুতিয়া। ভ. অ-১।১৬৯

বিপ্লাবিয়া। সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন / একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে মন। স. ১।৩৩

বিবশে। ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো / পথিকের প্রাণ বিবশে। মা. ২।২৩৪

বিভাসিল। আলোকে প্রেমে আনন্দে / সকল জগত বিভাসিল। গীতবিতান ১।১৭৮

বিভেদিয়া। ফসল যত উঠেছে ফলি / বক্ষ বিভেদিয়া / কণাকণায় তোমারি পায় / দিয়েছি নিবেদিয়া। প. ১৫।১৬৫

বিরচিব। তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা / বিরচিব তাহাদের গীত। ক. ৭।১৯৮

বিরচিবি। আকুল সে ফুলগুলি যতনে আনিস্ তুলি, / তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার। ভ. অ-১।১২৯

বিরচিয়া। কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন / পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো কবি, / পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলব্ধ জনতাদেবীরে / বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। প্রা. ২২।১৩

বিরচিলে। কী অদৃশ্য তপোভূমি / বিরচিলে এ পাষাণনগরীর শুষ্ক ধূলিতলে। উ. ১০।৪৫

বিলসি। শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয় / উলসি বিলসি নাচে। চি. ৪।১০০

বিলসিছ। দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে। চিত্রা ৪।২১

বিলসিয়া। মোর পুলকিত হিয়া সর্ব দেহে বিলসিয়া / বক্ষে উঠে বিকশিয়া পরম সুন্দর, / নব অমৃতনির্ঝর। চি. ৪।১০২

বিলুণ্ঠিতে। দুশ্চিন্তার গুরুভারে / নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব। ব. ১৫।১১৭

বিসর্পিয়া। গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত / নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায় / বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া ধায় যথা শাখায় শাখায়। প্রা. ২২।৫

বিস্ফারি। অবাক রয়েছে ব'সে / বিস্ফারি পথিকপানে যুগল নয়ন। ব. অ-১।৬০

বিস্ফারিয়া। বিস্ফারিয়া নেত্রদ্বয় পথিক অবাক্ রয়। ব. অ-১।৫৮

বিস্ফুরিল। অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি। প্র. ১।৮৩

বেষ্টিয়া। কিন্তু এ দু'দিন তার শত বাহু দিয়া / চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া। স. ১।৩৩

বেষ্টিল। সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারিধারে। চি. ২৫।১৩১

ভঙ্গিয়া। আছি যেথা সমুদ্রের / তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের / অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। প. ১৫।২৪২

ভর্ৎসিয়া। তপ্ত বালুরে ভর্ৎসিয়া মুহুমুহু / তাপিত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহু / ম. ১৫।৫৮

ভাষিতে। আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে / সে কথা বুঝায়ে দাও। মা. ২।২৫৭

ভাষে। কাছে আসে বসে পাশে তবুও কথা না ভাষে / অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়। ক. কো. ২।৩৮

ভ্রূকুটিয়া। অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে / শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে / ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে। ন. ১৮।২০৮

মন্থি। মন্থি আমুক মর্ত্য স্বর্গ / তোমার অর্ঘ্য-অঞ্জলি। ন. ১৮।২০৪

মন্থিতে। জানি আমি, সংসারের সমুদ্র মন্থিতে / কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল। সো.ত. ৩।১৪৩

মন্থিয়া। মত্তকরী যত পদ্মবন দলে / বিমল সরোবর মন্থিয়া। কা. ১।৩৩১

মন্থে। কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে। ক. ৭।৫৬

মার্জিয়া। নির্মম শীত তারি আয়োজনে / এসেছিল বনপারে। / মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি / মার্জনা নাহি কারে। ম. ১৫।৭

মুখরিবে। সেদিন নূতন কবি দক্ষিণ পবনে, / মধু-ঋতু মুখরিবে তোমাদের স্তবনে। প্র. ২৩।৭

মুখরিয়া। তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—/ মঞ্জরিতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা। ব. ১৫।১২২

মুখরিল। নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ / ঘন জনতার গর্জনে, / অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়। পূ. ১৪।২৭

মুচুকি। তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে / মুচুকি। উ. ১০।১৫

মেঘায়িত। আর একপ্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা / বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে। শে. ১৮।১৮

ম্লানায়মান। আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্ত-দীপ্তির মধ্য দিয়া। নৌ. ৫।২৪৪

রণিয়া। আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া / বাজিবে তবে। উ. ১০।৩৩

রণিয়ে। পাশের গলির চিকঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে / হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে / সংকেত ঝংকার। জ. ২৫।৯৬

রুধি। দেখে গেলেম নতুন বধূ আধেক দুয়ার

রুধি / ঘোমটা থেকে ফাঁক করে তার কালো চোখের কোণা / দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা। সেঁ. ২২।৪৭

রুধিয়া। ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ / রুধিয়া রাখিতে নারি। প্র. ১।৫৮

রুধিল। শূন্যপানে চক্ষু মেলি / দীর্ঘশ্বাস ফেলি / দূরযাত্রী নাম নিল দেবতার, / তালা দিয়ে রুধিল দুয়ার। সেঁ. ২২।৫০

রুধিলা। শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে / রুধিলা নয়নের বারি। ক. ৭।২৩

রোমাঞ্চিয়া। যে-বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে / রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণ-যাত্রী, অন্ধকার হতে। ব. ১৫।১৩৮

লক্ষিয়া। কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে। পূ. ১৪।২৬

লক্ষ্যি। আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে / মনখানা উড়ো পক্ষী / বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায় / অজানার পানে লক্ষ্যি। সা. ২৪।১৩৩

লালসিয়া। বসে আছি / তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ / লালসিয়া। বি. ২।২৮৯

লুণ্ঠিয়া। নব নব রূপে ওগো রূপময় / লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়, / কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দয়, / চঞ্চল প্রেম দিয়ে। চি. ৪।৬১

লেহিয়া। ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল / প্রলয়লোলুপ রসনা। ক. ৭।৪৩

লোভাতে। মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরান / তরুণ হৃদয় লোভাতে। মা. ২।২৩১

লোভায়। শুনেছি আকাশ তারে / নামিয়া মাঠের পারে / লোভায় রঙিন ধনু হাতে। শি. ৯।২১

লোলুপায়মান। লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে…। গ. ২১।২২৬

শ্বসিছে। মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ। ক. ৭।১৯৭

শ্বসিয়া। চারি দিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হুহু করি / উঠিছে শ্বসিয়া। ছ.গা. ১।১৫২

সচকিবে। তুই যদি যাস দূরে / তোরি সুরে / বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে / ঝলিয়া উঠিবে নিত্য, / মোর চিত্ত / সচকিবে আলোকে আলোকে। পূ. ১৪।৪৭

সচকিয়া। সচকিয়া আলোকে পুলকে প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে। সো.ত. ৩।১৩১

সঞ্চি। শুঁড় সুড়্‌সুড়ি দিতে / নিয়ে গেল কঞ্চি, / সাত জালা নস্যি ও / রেখেছিল সঞ্চি। খা. ২১।২২

সঞ্চিয়া। সারা রাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া / রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া। ক.কো. ২।৮৪

সন্তরি। সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি / দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা। ক. ৭।১২২

সন্তরিয়া। অন্ধকারে সূর্যালোতে / সন্তরিয়া মৃত্যু-স্রোতে / নৃত্যময় চিত্ত হতে / মত্ত হাসি টুটে। মা. ২।১৯৯

সন্তরে। কে আমার ভাষাহীন অন্তরে / চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে। বী. ১৯।১৯

সন্ধানি। যে বন্দী গোপন গন্ধখানি / কিশোর কোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি / পূজার নৈবেদ্যডালি। প. ১৫।১৬২

সন্ধিতে। সন্ধিতে পারে লক্ষ্য কীণাঙ্কিত তার বাহু। চি. ২৫।১৪৯

সন্ধিয়া। সঘনে খর শর সন্ধিয়া। কা.অ-১। ৩৩১

সমাপিনু। নিদ্রাহারা প্রহর-যে একে একে হয় অপগত, / তাই আজ সমাপিনু ব্রত। প. ১৫।২১১

সমাপিব। এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,

নির্জনে চরণতলে কবি প্রণিপাত / এ জন্মের পূজা সমাপিব। নৈ. ৮।৩৪

সমাপিয়া। নিয়মের পাঠ সমাপিয়া / সাধ গেছে খেলা করিবারে। প্র. ১।৯০

সমাপিলে। একদিন শুধু মোরে ছায়া দিয়ে, শেষে / সমাপিলে খেলা। বি. ১৭।১৪

সমুচ্ছ্বাসি। অদূরে সুনীল সাগরে উর্মিরাশি / উত্তালবেগে উঠিছে সমুচ্ছ্বাসি। বি. ১৭।১৩

স্তব্ধি। ভাষার নাগালছাড়া কত উপলব্ধি / ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি। ন. ২৪।৩৬

স্পন্দিয়া। সমুখ-পানে বালুতটের তলে / শীর্ণ নদী শান্ত ধারায় চলে, / বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে / উঠিছে স্পন্দিয়া। বী. ১৯।৪৭

স্পর্ধিছে। স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে। চৈ. ৫।১৯

স্পর্শিতে। চিত্ত অগ্রসরি / সমস্ত স্পর্শিতে চাহে। সো. ত. ৩।১৩৪

হরষিয়া। নব রৌদ্রালোকে / তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে / কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া। সো. ত. ৩।১৭৭

হিল্লোলিয়া। নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি / অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া। সো. ত. ৩।৭৩

অনুকার-সূচক অব্যয়-পদ মূলক নামধাতু

উস্‌খুসিয়ে। একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশ-বারোটা কড়ি / মেজের 'পরে করলে ছড়াছড়ি। প. ১৫।১৮৯

কনকনিয়া। তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া / ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া। ক. ৭।১২৩

খড়্‌খড়ায়িত। জানালার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়্‌খড়ায়িত। ভানুসিংহের পত্রাবলী ২২।৩

খিলিখিলি। ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে / পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে, / লাগায় ঝিলি-মিলি। / বাঁশ বাগানের মাথায় মাথায় / তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায় / হাসায় খিলিখিলি। শি. ১৩।১১৫

চিকচিকিয়ে। দেখছে চেয়ে ফুলের বনে। গোলাপ ফোটে-ফোটে, / পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে, / চিকচিকিয়ে ওঠে। শি.৯।৬১

ছমছমিয়ে। ছমছমিয়ে এল রাতি ভুবনডাঙার মাঠে / একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে। পূ. ১৪।১২৭

জর্জরি। আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি / কর্কশস্বরে গর্জন করে / বাতাসের জর্জরি। ন. ২৪।২৫

জর্জরিয়া। বিরোধ উঠে ঘর্ঘরিয়া, / বাতাস উঠে জর্জরিয়া / তৃষ্ণাভরা তপ্তবালু-ঢাকা। ধ. ১৯।৬২

ঝকমকি। বাহিরেতে আমলকী / করিতেছে ঝকমকি। ব. ১৫।১৩৯

টলমলিয়ে। তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায় / আমার কানে কানে / টলমলিয়ে কী বলত যে / ঝলমলানির গানে। শি. ১৩।১১১

টুপটুপিয়ে। সকালবেলা হলে / ফুলের 'পরে মুক্তোগুলি দোলে, / টুপটুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে। শি. ৯।৫৫

ঢঙঢঙিয়ে। জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়, / ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়। আ. ২৩।১১৬

ঢিপ্‌ঢিপিয়ে। ঢিপ্‌ঢিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা। প্র. প্র. ১।১৭৯

দবদবিয়ে। মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে / দবদবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ। শ্যা. ২০।৯৬

দুড়্দাড়িয়ে। ডালপালা সব দুড়্দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে। ন. ২৪।৪৮

দুদ্দাড়িয়ে। অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে / কে যে কারে যায় তাড়িয়ে, । শি. ১৩।৮৯

দুর্দাড়িয়া। ইন্দ্রলোকের পাগ্লা-গারদ / খুলল তারই দ্বার, / পাগল ভুবন দুর্দাড়িয়া / ছুটল চারিধার। খা. ২১।৫৬

বুদ্বুদিয়া। আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায় / দুষ্ট যেন উঠে বুদ্বুদিয়া। ম. ১৫।৫৫

মকমিয়ে। মাঠে মাঠে মকমকিয়ে ডাকছে ব্যাঙ। ছ. ২৬।২০। তু. সংস্কৃত নামধাতু—ভেকঃ মকমকায়তে।

মর্মরায়মাণ। মর্মরায়মাণ বেণু কুঞ্জে। আ. ৩।৫২৬

মিটমিটিয়ে। আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে, / গ্যাসের আলো মিটমিটিয়ে জ্বলে। শি. ৯।২৮

লকলকি। বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে / লকলকি। ছ. ২৬।১৯

শিরশিরিয়ে। শিশির-হাওয়া শিরশিরিয়ে / কখন রাতারাতি / হিমালয়ের থেকে আসে / তোমার ছুটির সাথি। প. ১৩।৫৯

হিসহিসিয়ে। ময়লা কাপড় হিস্হিসিয়ে / আছাড় মারে ধোবাতে। ছ. ২৬।১৯

হুড়্মুড়িয়ে। এমনি চাপড় খেত, তাহার ফলে / হুড়্মুড়িয়ে ভেঙেচুরে পড়ত অগাধ জলে। ছ. ছ. ২১।৯৯

শান্তিনিকেতনস্থিত রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্ররচনার বহু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। তন্মধ্যে গ্রন্থ-বহির্ভূত অনেক অংশ, মুদ্রিত রচনার বহু পাঠভেদ, লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো শব্দ পদসমুচ্চয় বা ছত্র বারংবার পরিবর্তন করিয়া কবি কিভাবে মনোনীত পাঠে উপনীত হইয়াছেন, তাহার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে এ-সকল পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত। বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্প হইতে বর্তমানে এই রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-সমূহের বিবরণ প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে 'পুষ্পাঞ্জলি' 'নলিনী' 'পূরবী' ও 'শিশু' বিশ্বভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় (১৩৭৫ শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ / ১৩৭৬ কার্তিক-পৌষ / ১৩৭৭ শ্রাবণ-আশ্বিন) ইতঃপূর্বে প্রকাশিত। অপর দুইটি পাণ্ডুলিপির বিবরণ এ স্থলে সংকলিত।

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১১০ ও ২৭৩

খসড়া-খাতা : খেয়া - 'স্বদেশী' গান / খেয়া - 'সুপ্রভাত' কবিতা

রচনাকাল : আষাঢ় ১৩১২ - ২০ আষাঢ় ১৩১৩ এবং ৮ বৈশাখ ১৩১৪ ('সুপ্রভাত')।
স্থান : মুখ্যতঃ শান্তিনিকেতন কলিকাতা গিরিডি ও শিলাইদহ।
লেখা : রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পেন্সিলের লেখা ('সুপ্রভাত' কপিং পেন্সিলে)।

পাণ্ডুলিপি ১১০

বিবরণ : মলাটহীন অবস্থায় রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত, ঐ সময় প্রথম পৃষ্ঠায় খেয়ার প্রথম কবিতা ও শেষ পৃষ্ঠায় ইংরাজিতে এই নাম ঠিকানা : Deota Prasad. / 2 Kartik Bose's Lane / Hathibagan / ২২টি রুল-টানা পৃষ্ঠার মাপ মূলতঃ ১৮·৩৫ × ১১·৮ সেন্টিমিটার ছিল মনে হয়। বহির্মুখ কোণ দুটি গোল করিয়া কাটা। ১৯৫৭ মার্চে সংরক্ষণোপযোগী ব্যবস্থায় বাঁধানো। মলাট রেক্সিনে ও চামড়ায়। মোটের উপর মাপ ২০·১ × ১৫·৯ × ৩ (পুটের দিকে) সেন্টিমিটার।
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৮। খেয়ার কবিতা : পৃ ১-২৯, ৩৪-৯৯, ১২৭ (উৎসর্গ পত্র)। গান : পৃ ৩০-৩৩ / পৃ ১২৬-১০০ (খাতা উল্টাইয়া লেখা হয়)। (পৃ ৩৩ : রাখীসঙ্গীত / বাংলার মাটি বাংলার জল / নীচের দিকে আড়ভাবে স্বাক্ষর : বাসন্তী দেবী) পৃ ১২৮ : পূর্বসংকলিত নাম-ঠিকানা ছাড়া খাতা উল্টাইয়া কতকগুলি বাংলা শব্দ-সংকলন।

পাণ্ডুলিপি ২৭৩

বিবরণ : ৭ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ-ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রাতা শ্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। সাদা (রুল-না-টানা)

পাতার মাপ মূলতঃ ২০·৩ × ১৬·২ সেন্টিমিটার। ১৯৫৯ মার্চে সংরক্ষণোপযোগী ব্যবস্থায় বাঁধানো। বোর্ড ও রেক্সিনের মলাট। উপস্থিত মাপ : ২২·৮ × ২০·১ × ১·৬ (পুটের দিকে) সেন্টিমিটার।
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮। খেয়ার কবিতা : পৃ ১-২৪। রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি ইত্যাদি ('সুপ্রভাত') : পৃ ২৫-২৮।

রচনাপঞ্জী

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গান / কবিতার গণনাসিদ্ধ ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হইল, তবে এই ক্রমিক সংখ্যা দিতেও এক দিকে খেয়ার কবিতা / গান অন্য দিকে অবশিষ্ট রচনা (মুখ্যতঃ গান) পৃথক্ ভাবে দেখানো হইয়াছে— এই দ্বিতীয় গুচ্ছের সর্বশেষ রচনা 'সুপ্রভাত'। গান / কবিতার শিরোনাম পাণ্ডুলিপিতে প্রায় দেখা যায় না, মুদ্রিত গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত— পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত এরূপ সর্ববিধ সংকলন [ ] বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া গেল। পাণ্ডুলিপিতে রচনার স্থান-কাল দেওয়া থাকিলেও, সব সময় একভাবে লেখা হয় নাই ; সন তারিখ নির্দিষ্ট 'স্থান'এর আগে, পরে, অথবা যুগপৎ আগে ও পরে লেখা থাকিতে পারে এক দুই অথবা অধিক পঙ্‌ক্তিতে। পরবর্তী সংকলনে 'স্থান' আগে ও 'কাল' পরে দেওয়া হইবে এবং স্থান-কাল-নির্দেশে পাণ্ডুলিপি-ধৃত পঙ্‌ক্তিভেদ সর্বথা বুঝাইবার প্রয়াস থাকিবে না।

পাণ্ডুলিপি ১১০

পৃষ্ঠা	সংখ্যা	কবিতা ॥ রচনা	সাময়িক পত্রে প্রকাশ
১-২	১	[শেষ খেয়া] / দিনের শেষে ঘুমের দেশে ॥ আষাঢ় ১৩১২	বঙ্গদর্শন ৩।১৩১২। পৃ ১৪২
৩-৪	২	[শুভক্ষণ][১] / ওগো মা, / রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ॥ বোলপুর / ১৩ই শ্রাবণ ১৩১২	বঙ্গদর্শন ৮।১৩১২। পৃ ৩৮৩
৫-৮	৩	[প্রভাতে] / এক রজনীর বরষণে শুধু ॥ ১৪ই শ্রাবণ ১৩১২	দ্র. মজুমদার পাণ্ডু.
৯-১২	৪	[বালিকা বধূ] / ওগো বর, ওগো বঁধু ॥ ১৫ই শ্রাবণ ১৩১২	বঙ্গদর্শন ১০।১৩১২। পৃ ৫০৫
১৩-১৪	৫	[খেয়া] / তুমি এপার ওপার কর ॥ ১৫ই শ্রাবণ ১৩১২	বঙ্গদর্শন ২।১৩১৩। পৃ ৮৯
১৫-১৬	৬	[অনাবশ্যক] / কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে ॥ বোলপুর / ২৫শে শ্রাবণ ১৩১২	
১৭-২০	৭	[অনাহত] / দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা ॥ বোলপুর / ২৬শে শ্রাবণ ১৩১২	বঙ্গদর্শন ১১।১৩১২। পৃ ৫৪২
২১-২৩	৮	[আগমন] / তখন রাত্রি আঁধার হল ॥ কলিকাতা / ২৮শে শ্রাবণ ১৩১২	বঙ্গদর্শন ৬।১৩১২। পৃ ২৬৭
২৪-২৫	৯	[বাঁশি] / ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি ॥ কলিকাতা / ২৯শে শ্রাবণ ১৩১২	
২৬-২৮	১০	[দান] / ভেবেছিলেম চেয়ে নেব ॥ গিরিডি / ২৬শে ভাদ্র ১৩১২	বঙ্গদর্শন ৮।১৩১২। পৃ ৩৯৪
২৯	১১	[ঘাটে] / আমার নাইবা হল পারে যাওয়া ॥ গিরিডি / ২৭শে ভাদ্র [১৩১২]	
৩০	(১)	[বাউল] / ঘরে মুখ মলিন দেখে	
৩১-৩২	(২)	ভুবনেশ্বর হে	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১১।১৩১২। পৃ· ১৭১

৩৩ ॥ (৩) রাখীসঙ্গীত / বাংলার মাটি বাংলার জল ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২৩৭
বঙ্গদর্শন ৭।১৩১২। পৃ ৩৫৩
৩৪-৩৭ ॥ ১২ [অবারিত] / ওগো তোরা বল্ ত এরে ॥ শান্তিনিকেতন / ১৫ই পৌষ ১৩১২
৩৮-৩৯ ॥ ১৩ [লীলা] / আমি শরৎশেষের ॥ শান্তিনিকেতন / বোলপুর / ২০শে পৌষ [১৩১২]
বঙ্গদর্শন ১১।১৩১২। পৃ ৫৩২
৪০-৪২ ॥ ১৪ [গোধূলিলগ্ন] / আমার গোধুলি লগন ॥ শান্তিনিকেতন / ২৯শে, পৌষ সংক্রান্তি। ১৩১২
৪৩-৪৪ ॥ ১৫ [মিলন] / আমি কেমন করিয়া ॥ শিলাইদহ / পদ্মা।[২] / ২৩শে মাঘ সোমবার ১৩১২
৪৫-৪৬ ॥ ১৬ [বিচ্ছেদ] / তোমার বীণার সাথে আমি ॥ শিলাইদহ / পদ্মা / ২৪শে মাঘ ১৩১২
৪৭ ॥ ১৭ [বিকাশ] / আজ বুকের বসন ॥ শিলাইদহ / পদ্মা / ২৫শে[৩] মাঘ [১৩১২]
৪৮ ॥ ১৮ [সীমা][৪] / সেটুকু তোর অনেক আছে ॥ শিলাইদহ / পদ্মা / ২৫শে মাঘ [১৩১২]
৪৯-৫০ ॥ ১৯ [ভার][৪] / তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার ॥ পদ্মা / ২৫শে মাঘ [১৩১২]
৫১ ॥ ২০ [টিকা] / আজ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে ॥ পদ্মা / ২৬শে মাঘ [১৩১২]
৫২-৫৫ ॥ ২১ [নিরুদ্যম] / তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে ॥ কলিকাতা / ৬ই চৈত্র ১৩১২
৫৬-৫৮ ॥ ২২ [কৃপণ] / আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম ॥ কলিকাতা / ৮ই চৈত্র [১৩১২]
৫৯-৬০ ॥ ২৩ [কুয়ার ধারে] / তোমার কাছে চাই নি কিছু ॥ [কলিকাতা] / ৯ই চৈত্র ১৩১২
৬১-৬২ ॥ ২৪ [জাগরণ] / পথ চেয়ে ত কাটল নিশি ॥ কলিকাতা / ১০ই চৈত্র ১৩১২
৬৩-৬৪ ॥ ২৫ [হার] / মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে ॥ বোলপুর / ১২ই চৈত্র [১৩১২][৫]
৬৫-৬৬ ॥ ২৬ [ফুল ফোটানো] / তোমরা কেউ পারবে না গো ॥ বোলপুর / ১১ই চৈত্র [১৩১২][৫]
৬৭-৬৮ ॥ ২৭ [নীড় ও আকাশ] / নীড়ে বসে গেয়েছিলাম ॥ বোলপুর / ১২ই চৈত্র [১৩১২]
৬৯-৭০ ॥ ২৮ পথের শেষ / পথের নেশা আমায় লেগেছিল ॥ বোলপুর / ১৪ই চৈত্র [১৩১২]
৭১-৭২ ॥ ২৯ বিদায়। / বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই ॥ বোলপুর / ১৪ই চৈত্র ১৩১২
৭৩-৭৪ ॥ ৩০ [সমুদ্রে] / সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন ॥ [বোলপুর] / ৭ই বৈশাখ ১৩১৩
৭৫-৭৬ ॥ ৩১ [বৈশাখে] / তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ ॥ [বোলপুর] / ৭ই বৈশাখ ১৩১৩
৭৭-৭৮ ॥ ৩২ [দিনশেষ] / ভাঙা অতিথশালা ॥ [বোলপুর] / ৮ই বৈশাখ ১৩১৩
৭৯-৮০ ॥ ৩৩ [পথিক] / পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি ॥ বোলপুর / ৮ই বৈশাখ ১৩১৩
৮১-৮২ ॥ ৩৪ [বন্দী] / বন্দী তোরে কে বেঁধেছে ॥ বোলপুর / ৯ই বৈশাখ ১৩১৩ ভাণ্ডার ২।১৩১৩। পৃ
৮৩-৮৪ ॥ ৩৫ [সমাপ্তি] / বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা ॥ বোলপুর / ১০ই বৈশাখ ১৩১৩
বঙ্গদর্শন ১।১৩১৩। পৃ ৪৮
৮৫-৮৬ ॥ ৩৬ [প্রতীক্ষা] / আমি এখন সময় করেছি ॥ কলিকাতা / ১৭ই বৈশাখ [১৩১৩]
৮৭-৮৯ ॥ ৩৭ [দিঘি] / জুড়ালো গো দিনের দাহ ॥ শান্তিনিকেতন / ২৭শে বৈশাখ ১৩১৩
৯০-৯১ ॥ ৩৮ [কোকিল] / আজ,[৬] বিকালে কোকিল ডাকে ॥ বোলপুর / ২৯শে বৈশাখ [১৩১৩]
ভাণ্ডার ৩।১৩১৩। পৃ
৯২-৯৪ ॥ ৩৯ [গান শোনা] / আমার এ গান শুনবে তুমি যদি ॥ বোলপুর / ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

৯৫-৯৭ ॥ ৪০ [জাগরণ] / কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ ॥ বোলপুর / ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

৯৮-৯৯ ॥ ৪১ ঝড়। / আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ॥ কলিকাতা / ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

১২৬ ॥ (৪) [দেশের মাটি] / ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে[৭] বঙ্গদর্শন ৬।১৩১২। পৃ ২৯৮

১২৫ ॥ (৫) [মাতৃগৃহ] / মা কি তুই পরের দ্বারে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ১৯৬

১২৪ ॥ (৬) [বান] / এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ১৮৩

১২৩ ॥ (৭) [বাউল] / যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২০৩

১২২ ॥ (৮) [একা] / যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ১৮৪

১২১ ॥ (৯) [বাউল] / যে তোরে পাগল বলে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২০৪

১২০ ॥ (১০) [প্রয়াস] / তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ১৯৭

১১৯ ॥ (১১) [সার্থক জন্ম] / সার্থক জনম আমার

১১৮ ॥ (১২) [অভয়] / আমি ভয় করব না, ভয় করব না বঙ্গদর্শন ৭।১৩১২। পৃ ৩৪১

১১৭ ॥ (১৩) [বাউল] / ওরে তোরা নেইবা কথা বলি ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২০৪

১১৬ ॥ (১৪) [বিলাপী] / ছি ছি চোখের জলে ভেজাস্‌নে আর ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ১৯৮

১১৫ ॥ (১৫) [দ্বিধা] / বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বঙ্গদর্শন ৭।১৩১২। পৃ ৩৪১

১১৪ ॥ (১৬) [হবেই হবে] / নিশিদিন ভরসা রাখিস, হবেই হবে বঙ্গদর্শন ৭।১৩১২। পৃ ৩৪০

১১৩ ॥ (১৭) [বাউল] / জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২০৬

১১২ ॥ (১৮) [পথের গান] / আমরা পথে পথে যাব সারে সারে

১১১-১১০ ॥ (১৯) [মাতৃমূর্তি] / আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ১৯৫

১০৯ ॥ (২০) [বাউল] / আপনি অবশ হলি তবে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২০৫

১০৮ ॥ (২১) [বাউল] / যদি তোর ভাবনা থাকে ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২০৫

১০৭-১০৬ ॥ (২২) আমাদের, যাত্রা হল, সুরু, এখন ॥ গিরিডি / ২১শে আশ্বিন ১৩১২

১০৫ ॥ (২৩) [রাখী সঙ্গীত] / বিধির বাঁধন কাটবে তুমি ॥ গিরিডি / ২১শে আশ্বিন ১৩১২
ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২৩৮

১০৪ ॥ (২৪) [রাখী সঙ্গীত] / ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ॥ রেলগাড়ি / ২২শে আশ্বিন ১৩১২
ভাণ্ডার ৫-৬।১৩১২। পৃ ২৩৭

১০৩ ॥ (২৫) আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে ॥ কলিকাতা / ২৪শে আশ্বিন [১৩১২]

১০২ ॥ (২৬) [গান] / ওরে ভাই, মিথ্যা ভেব না ॥ কলিকাতা / ২৫শে আশ্বিন [১৩১২]
ভাণ্ডার ৭।১৩১২। পৃ ২৪৭

১০১ ॥ (২৭) [কোজাগর] / গভীর রাতে ভক্তিভরে বসুধা ৭।১৩১২

১০০ ॥ (২৮) [পূজার লগ্ন] / এখন আর দেরি নয় ধর্‌গো তোরা ভাণ্ডার ১১।১৩১২। পৃ ৩৭৫

পাণ্ডুলিপি ২৭৩

১-৩ ॥ ৪২ [প্রচ্ছন্ন] / কোথা ছায়ার কোণে ॥ শান্তিনিকেতন / বোলপুর / ২রা আষাঢ় ১৩১৩

৪-৫ ॥ ৪৩ [অনুমান] / পাছে দেখি তুমি আসনি তাই ॥ বোলপুর / ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৩

৬-৮ ॥ ৪৪ [বর্ষাপ্রভাত] / ওগো এমন সোনার মায়াখানি ॥ বোলপুর / ৭ই আষাঢ় ১৩১৩
৯-১২ ॥ ৪৫ [সব পেয়েছি'র দেশ] / সব পেয়েছির দেশে ॥ [শান্তিনিকেতন] / ৯ই আষাঢ় ১৩১৩
ভাণ্ডার ৪-৫ । ১৩১৩ । পৃ
১৩-১৫ ॥ ৪৬ [বর্ষাসন্ধ্যা] / আমায় অমনি খুসি করে ॥ [শান্তিনিকেতন] / ৯ই আষাঢ় রাত্রি [১৩১৩]
১৬-১৭ ॥ ৪৭ [হারাধন] / বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন ॥ বোলপুর / ১০ই আষাঢ় ১৩১৩
১৮-২০ ॥ ৪৮ [চাঞ্চল্য] / নিঃশ্বাস রুধে দু চক্ষু মুদে ॥ বোলপুর / ১৩ই আষাঢ় [১৩১৩]
২১-২২ ॥ ৫০ [সার্থক নৈরাশ্য] / তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা ॥ কলিকাতা/১৯শে আষাঢ় ১৩১৩
২৩-২৪ ॥ ৫১ [প্রার্থনা] / আমি বিকাব না কিছুতে আর ॥ কলিকাতা / ২০শে আষাঢ় ১৩১৩

পাণ্ডুলিপি ১১০

১২৭ ॥ ৪৯ [উৎসর্গ] / বন্ধু, / এ আমার লজ্জাবতী লতা ॥ কলিকাতা / ১৮ই আষাঢ় ১৩১৩

পাণ্ডুলিপি ২৭৩

২৫-২৮ ॥ [১] [সুপ্রভাত] / রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি ॥ বোলপুর / ৮ই বৈশাখ ১৩১৪ সুপ্রভাত[৮] ৪।১৩১৪

তথ্যপঞ্জী

পাণ্ডুলিপি ১১০ ॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর স্বাক্ষর আছে এই পাণ্ডুলিপিতে (পৃ ৩৩) তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয় জানাইতেছেন : ১৯৩১ সালে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় শ্রীযুক্ত অমল হোম এই পাণ্ডুলিপি শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া জয়ন্তী-প্রদর্শনীতে দেন। তথা হইতে বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত। এই সংগ্রহের বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ রবিবারে প্রকাশিত হয়, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তাহার আংশিক সংকলন দ্রষ্টব্য।

খেয়ার কবিতার সহিত এই পাণ্ডুলিপিতে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন-কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ স্বদেশী গান লিপিবদ্ধ আছে। রচনাস্থান মুখ্যতঃ গিরিডি ; রচনাকাল ১৩১২ বঙ্গাব্দে, মোটের উপর, ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ অবধি। পূর্বসংকলিত কবিতা-গানের তালিকা বা 'রচনাপঞ্জী' দ্রষ্টব্য। দেখা যাইবে অন্তত ২টি কবিতায় (সংখ্যা ৭ ও ৮ / 'অনাহত' ও 'আগমন') একটি নূতন সুর লাগিয়াছে, একটি নূতন ভাবের ইঙ্গিত স্পষ্ট— রচনা ২৬ ও ২৮ শ্রাবণ তারিখে।[৯] কবিতা দুটি যথাক্রমে বোলপুরে ও কলিকাতায় লিখিত। গিরিডিতে গিয়া ২৬ ভাদ্র তারিখে (প্রায় ১ মাস পরে) কবি লেখেন ১০ সংখ্যক কবিতা ('দান'), তাহাতে নূতন সুরে নূতন ভাবের ব্যঞ্জনা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই :

এ ত মালা নয় গো, এ যে / তোমার তরবারী / …
আজ্‌কে হতে জগৎমাঝে / ছাড়ব আমি ভয়—
আজ হতে মোর সকল কাজে / তোমার হবে জয় / …
তোমার তরবারী আমার / করবে বাঁধন ক্ষয় /

অন্তবর্তী একটিমাত্র কবিতা (১১ / 'ঘাটে') অন্য সুরের হইলেও, অব্যবহিত পরের গানগুলিতে 'দান' কবিতারই ভাবের অনুবৃত্তি চলিতেছে দেখিতে পাই ; সংকলিত রচনাপঞ্জীতে এগুলির সংখ্যা (১) — (২৮)। প্রত্যেকটি লেখার তারিখ না থাকিলেও, এগুলি প্রায় সবই অবিচ্ছেদে রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে কেবল সংখ্যা (২৪) গিরিডি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন-কালে রেলগাড়িতে লেখা আর সংখ্যা (২৫) ও (২৭) কলিকাতায়, সংখ্যা (২৬) ও (২৮) কোন্ তারিখে কোথায় রচিত জানা যায় না। সর্বশেষ রচনা ভাণ্ডার পত্রের ১৩১২ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায়, ইহা অনেক পরের রচনা ; অন্য স্বদেশী গানগুলি অবিচ্ছেদে লেখার পরে কয়েক মাস গত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব না হইতে পারে।

সংখ্যা (২)॥ ভুবনেশ্বর হে ইত্যাদি॥ ইহা যুগপৎ ব্রহ্মসংগীত (ধর্মসংগীত) ও স্বদেশসংগীত -রূপে গণ্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মননে ও উপলব্ধিতে স্বদেশের ভাগ্যবিধাতা ও ভুবনেশ্বর / বিশ্ববিধাতা অভিন্ন ইহা নিশ্চিত। এই রচনায় যে বিশেষ অভীপ্সা ও আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষ দেশ কাল অবস্থার উপযোগী :

মোচন কর বন্ধন সব / ···
প্রভু, মোচন কর ভয় / ···
মোচন কর জড় বিষাদ / ···
মোচন কর স্বার্থপাশ / ···
মোচন কর সব বিরোধ / ১০···
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী / সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে। / ১১

বর্তমান পাণ্ডুলিপির ১-২৯ -অঙ্কিত পৃষ্ঠায় খেয়ার ১১টি কবিতা লেখার পর আলোচিত সংগীত রচনার পর্ব শুরু হয়— ৩টি গান দেখা যায় ৩০-৩৩ -অঙ্কিত পৃষ্ঠায়— খাতা উল্টাইয়া লইয়া ইহারই অনুবৃত্তি চলে ১২৬-১০০ অঙ্কিত পৃষ্ঠায়, ইহা রচনাপঞ্জী হইতেই স্পষ্ট হইবে। এই গান রচনার পর্ব শেষ হইলে খেয়া কাব্যের নিরুদ্ধ স্রোত পুনরপি বহিয়া চলে এই পাণ্ডুলিপির ৩৪-৯৯ অঙ্কিত পৃষ্ঠায় (সোজা দিকে / রচনাকাল : ১৫ পৌষ ১৩১২ - ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) এবং ইহার মলাট-তুল্য শেষ পাতার ভিতর-পৃষ্ঠা ব্যতীত লিখিবার স্থান না থাকায় কবি অন্য একখানি খাতা গ্রহণ করেন— সেখানিই পাণ্ডুলিপি ২৭৩।

পাণ্ডুলিপি ২৭৩॥ এই পাণ্ডুলিপিতে অল্পকালের ভিতর (২-২০ আষাঢ় ১৩১৩) খেয়ার অবশিষ্ট কবিতাগুলি লেখা হওয়ার শেষ দিকে 'খেয়া' এই কাব্যটি নামরূপ লইয়া কবির মনে একটা স্পষ্টতা লাভ করে এরূপ মনে হয় এবং এই কাব্য দরদী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করার কথাও মনে উঠে। তদনুযায়ী এক সময় খেয়ার পুরাতন খাতাতেই (পাণ্ডুলিপি ১১০) উৎসর্গ-কবিতাটি লেখা হয়— রচনার কালক্রমে যে দুটি খেয়ার শেষ কবিতা (তালিকা-ধৃত সংখ্যা ৫০ ও ৫১) তাহারই আগে।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির অবশিষ্ট দুখানি পাতায়, দীর্ঘকালের ব্যবধানে অর্থাৎ ৮ বৈশাখ ১৩১৪ তারিখে, 'সুপ্রভাত' কবিতাটি লিখিত হয়, তাহাতে যেমন আন্তরিক প্রেরণা তেমনি বাহিরের তাগিদও সক্রিয় হইয়া থাকিবে এরূপ মনে হয়। কেননা, অভিন্ননাম সাময়িক পত্রে অল্পকাল পরেই তাহার প্রচার।

॥ বাউল ॥ গান/কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশ সম্পর্কে যথালব্ধ তথ্য রচনাপঞ্জীতেই সংকলিত হইয়াছে। স্বদেশী গানগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের 'বাউল' গ্রন্থে সংগ্রথিত, উহা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ (১৪ আশ্বিন ১৩১২) তারিখে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্ত হয়— তৎপূর্বে প্রকাশিত। এ স্থলে সংকলিত রচনাপঞ্জীর সংখ্যা নির্দেশে বলিতে গেলে, 'বাউল' গ্রন্থে পাওয়া যায়: (১) ও (৪) — (২১)।

'বাউল' গ্রন্থ -ধৃত (১৩১২ আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) একমাত্র 'সোনার বাংলা' (আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ইত্যাদি) গানটি খেয়ার পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না।

খেয়ার পাণ্ডুলিপি -ধৃত কতকগুলি 'স্বদেশী' গান বাউল গ্রন্থে পাওয়া যায় না, যেহেতু স্পষ্টতই সেগুলি গ্রন্থপ্রচারের পরে লিখিত।

পাঠপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যের পাঠপঞ্জীকৃত সংস্করণ ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইতে পারিবে, এজন্য পাণ্ডুলিপি -ধৃত প্রত্যেক কবিতা/গানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠভেদ প্রদর্শন, অথবা মুদ্রিত কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণে নানারূপ পাঠবিবর্তনের নিদর্শন -সংকলন, বর্তমান পাণ্ডুলিপি-বিবরণে একান্ত আবশ্যক নহে। অথচ পাঠের যেসব বৈচিত্র্য আলোচ্য পাণ্ডুলিপি-যুগ্মে সহজেই চোখে পড়ে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত এ স্থলে তুলিয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হওয়া যাইবে, তাহা অল্প লাভজনক নয়। যে যে গান/কবিতা হইতে পাঠ উদাহৃত হইবে, রচনাপঞ্জী -ধৃত তাহার ক্রমিক সংখ্যা উল্লিখিত; যে স্তবক ও ছত্র -সংখ্যা নির্দেশ করা হইবে, তাহা মুদ্রিত/প্রচলিত গ্রন্থের। (×) চিহ্ন দিয়া পাণ্ডুলিপির বর্জনচিহ্নিত পাঠ কদাচিৎ উদাহৃত হইলে, পাণ্ডুলিপিতে গ্রাহ্য পাঠ কী আছে তাহাও পরে দেওয়া হইবে। মুদ্রিত একাধিক পাঠ উদাহৃত হইলে, প্রকাশকালের নির্দেশে সংস্করণ বুঝানো হইবে। রচনার আনুষঙ্গিক/প্রাসঙ্গিক বিশেষ কোনো তথ্য বা তৎসম্পর্কিত ইঙ্গিত পাণ্ডুলিপিতে থাকিলে, তাহাও উল্লেখ করা হইবে।

প্রথমে ১১০ -সংখ্যক পাণ্ডুলিপি -ধৃত 'স্বদেশী' গানগুলির (তন্মধ্যে 'ভুবনেশ্বর হে' গানটিও আছে), পরে যুগ্ম-পাণ্ডুলিপিতে -ধৃত খেয়ার কবিতাবলির ও সব-শেষে ২৭৩ -সংখ্যক পাণ্ডুলিপি -ধৃত 'সুপ্রভাত' কবিতার পাঠ সংকলন করা যাইতেছে।

॥ স্বদেশী গান ॥

দ্রষ্টব্য প্রচল গীতবিতান, খণ্ড ১ ও ৩

(১)/ ঘরে মুখ মলিন দেখে / ১২কপাল-টুক্‌নি : এমন দিনে /

(২)/ ভুবনেশ্বর হে / ১২পাশ-টুক্‌নি : সংসারে মন দিয়েছিনু / পাণ্ডুলিপিতে ৪টি স্তবক। তন্মধ্যে অন্তিম স্তবক অদ্যাবধি অপ্রকাশিত :

ভুবনেশ্বর হে / মোচন কর সব বিরোধ / মোচন কর হে !
শিরে বাঁধ বিজয়-লেখ, / কর অমৃতে অভিষেক /

শতধাকৃত খণ্ডিত চিত / করিয়া লহ এক—

তিমিররাত্রি, অন্ধযাত্রী / সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে। /

(৩) / বাংলার মাটি বাংলার জল / ছত্র ১ (গীতবিতান ১), 'বাংলার বায়ু' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে: বাংলার হাওয়া /

(৪) / ও আমার দেশের মাটি / ১২কপাল-টুকনি : (সোনার গৌর কেনে) /

ছত্র ২ (গীতবিতান ১), 'তোমাতে বিশ্বময়ীর' পাণ্ডুলিপিতে নাই।

(৭) / যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক / ১২কপাল-টুকনি : চিরদিন এমনি ভাবে (ও মন) অসার মায়ায় ভুলে রবে /

(৮) / যদি তোর ডাক শুনে / ১২কপাল-টুকনি : হরিনাম দিয়ে / [জগত মাতালে] /

(৯) / যে তোরে পাগল বলে / শেষ ছত্রে (গীতবিতান ১), 'কালকে' স্থলে পাণ্ডুলিপি-ধৃত : কাল কি /

(১১) / সার্থক জনম আমার / ১২কপাল-টুকনি : কেমনে ফিরিয়ে যাস্ না দেখে তাঁহারে /

(১৭) / জোনাকি কি সুখে ঐ / ১২কপাল-টুকনি : যদি বারণ কর তবে গাহিব না] /

(১৮) / আমরা পথে পথে যাব / ছত্র ৩ (গীতবিতান ১), 'জননীকে কে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে: জননীরে কি /

ছত্র ৮ ও ৯ (তদেব) 'যন্ত্রেরই' ও 'শেষে' স্থলে : যন্ত্রের / তখন /

(২১) / যদি তোর ভাবনা থাকে / ১২কপাল-টুকনি : ও রাজা / মুদ্রিত পাঠের সহিত (গীতবিতান ১) পাণ্ডুলিপি-ধৃত শেষ কয় ছত্র তুলনীয় :

যদি তোর / আপন হতে অকারণে
দিবারাত / সুখ সদা না জাগে মনে—
তবে তুই / তর্ক করেই সকল কথা
করবি নানাখানা। /

(২২) / আমাদের যাত্রা হল সুরু /

মোটের উপর বর্তমান পাণ্ডুলিপির পাঠই প্রচলিত গীতবিতানে / ৪৭শ স্বরবিতানে মুদ্রিত। কবি একটি পাঠান্তরের সৃষ্টি করেন 'গীতাঞ্জলি'র সমসময়ে (১৩১৭ ?), ক্ষিতিমোহন সেন-সংগ্রহের 'গীতাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপিতে তাহা পাওয়া যায়— তদনুসারে স্বরলিপি মুদ্রিত হয় 'গীতলিপি ৪' গ্রন্থে (১৩১৭ / মাঘ-ফাল্গুন ?)। যাহা-কিছু পরিবর্তন তাহার একটি কারণই অনুমান করা যায় যে, এটি মূলতঃ সমবেত কণ্ঠের গান ছিল, এসময় একক গায়কের জন্য উদ্দিষ্ট হয়; এজন্য যে যে স্থলে 'আমাদের' 'আমরা' ও 'মোদের' ছিল যথাবিধি রূপান্তর করা হইয়াছে: 'আমার এই' 'আমি' 'আমার'। ছুটি পাণ্ডুলিপিতে আর-একটি পাঠভেদ এই যে, সর্বশেষ বাক্যে 'কেবল তুমি আছ' (পাণ্ডু ১১০) স্থলে হইয়াছে : 'কেবল তুমিই আছ' এবং শেষোক্ত পাঠ ('তুমিই') প্রায় সর্বত্র মুদ্রিত দেখা যায়। অর্থাৎ, যখন ১১০-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পাঠ ছাপা হইয়াছে তখনও দেখা যায়।

১১০-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠের মুদ্রণকালে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়— ধর্ম্মসঙ্গীত (১৯১৪), গীতবিতান (১৩৩৮ আশ্বিন)—যথাক্রমে একটি মুদ্রণপ্রমাদ ও সম্ভবতঃ একটি পাঠান্তর উদ্ভূত হইয়াছে নিম্নলিখিত ছত্রে: 'আমার কেবা আপন ...... কোথা বা ঘর'। এই পাঠে 'আমার' মুদ্রণপ্রমাদ সন্দেহ নাই, আর 'কোথায় বা' উভয় পাণ্ডুলিপি -ধৃত হইলেও 'কোথা বা' কবি-অভিপ্রেত পাঠান্তর হওয়া অসম্ভব নয়।

(২৬) / ওরে ভাই, মিথ্যা ভেব না / [১২]কপাল-টুকনি : ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনে /

(২৮) / এখন আর দেরি নয় / পাণ্ডুলিপি -ধৃত : আন্ আপনার থালা ভরে,
আন্‌রে পূজার প্রদীপ জ্বেলে, / আন্‌রে পূজার খড়্গ।
গীতবিতান (১৩৩৯ শ্রাবণ), পৃ ৮৫১ : সাজা পূজার থালার পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় / মঙ্গলঘট ভর্ গো। /

॥ খেয়া ॥

বিশেষ উল্লেখের অভাবে সব সময় বুঝিতে হইবে খেয়ার প্রথম সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি উভয়ের তুলনা করা হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি ১১০

১ / দিনের শেষে ঘুমের দেশে / স্তবক ৩। ছত্র ৫-৬, পাণ্ডু : ফুলের বার নাহিক আর··· / চোখের জল
খেয়া (১৩১৩) -ধৃত অনুরূপ : ফুলের বার নাইক আর··· / চোখের জল
পরের সংস্করণগুলিতে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তম খণ্ড কাব্যগ্রন্থে খেয়া-সংকলনের সময় হইতে) পরিবর্তিত : ফুলের বাহার নাইক যাহার··· / অশ্রু যাহার
প্রচলিত সংস্করণ প্রথমেরই প্রতিরূপ। উহার গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২ / ওগো মা, / রাজার দুলাল / শেষাংশে 'ধুলার পরে' 'ধূলায় রহিল'— একই শব্দের দুই বানান।

৩ / এক রজনীর বরষণে শুধু /
১৩৫৯ বা তৎপরবর্তী মুদ্রণের খেয়ায় পাণ্ডুলিপি-চিত্র[১৩] এবং তৎসম্পর্কে গ্রন্থপরিচয়-ভুক্ত চিত্র-পরিচয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই কবিতা-রচনার প্রেরণা ও চেষ্টা ১৩০৯ পৌষ ৭ হইতে ১১ তারিখের মধ্যে (মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে স্মরণের কবিতাগুলি লিখিবার সমকালে), ইহা উক্ত চিত্র তথা চিত্রপরিচয় হইতে পরিষ্কার জানা যায়। দ্রষ্টব্য আলোচনা— রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি, রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ ২৭৬-৭৭।

বর্তমান কবিতার অপ্রকাশিত একটি স্তবক (মুদ্রিত তৃতীয় ও চতুর্থের অন্তর্বর্তী, এজন্য পাণ্ডুলিপিতে এটিই চতুর্থ স্তবক / অন্তিম স্তবক পঞ্চম)[১৪] পাণ্ডুলিপি হইতে এ স্থলে সংকলন করা গেল : তারি মুখে আজ একদিঠে সবে / রয়েছে চেয়ে—
সকল বনের ফুলের গন্ধ / এসেছে ধেয়ে—
শুধায় আকাশ, শুধায় বাতাস, / কথা নাহি তার, মুখে শুধু হাস,
জানে সে কি সে যে কিসের বিকাশ / কি সুধা পেয়ে।

তারি পানে আজ একদিঠে সবে / রয়েছে চেয়ে ! /

পাণ্ডুলিপি -ধৃত প্রত্যেক স্তবকের শেষেই ৪-ছত্র-পরিমিত একটি 'ধুয়া' ছিল দেখা যায় ; স্তবকে স্তবকে ইহার ভাষাগত কতটা পার্থক্য ছিল বলা যায় না— কেননা, পেন্সিলের মূল লেখা পুনশ্চ পেন্সিলে নানারূপ নক্সা কাটিয়া এভাবে "অলঙ্কৃত" করা হইয়াছে যে, পাঠোদ্ধার বিশেষ ক্লেশসাধ্য বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়-উপকরণ-সাধ্য। কেবল দুটি ছত্র কোনোরূপে পড়া যায় : বাজাও আজি রে বাজাও নবীন গানে / দুখের বাঁশিটি বাজাও সুখের তানে / সম্ভবতঃ কোনো স্তবকের পরেই এ দুটি ছত্রে পাঠভেদ ঘটে নাই। এই ধুয়ার শেষ দুই ছত্র শেষ স্তবক হইতে অংশতঃ এরূপ মনে হয় : … … দানে [১২ মাত্রা] / অতুল রূপের বানে / যাহা হউক, এই ধুয়া সর্বত্র নির্মমভাবে বর্জিত।

৪ / ওগো বর, ওগো বঁধু / স্তবক ৬। ছত্র ৩, 'অপরাধ পাছে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : পাছে অপরাধ /

৭ / দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা /

স্তবক ৩। ছত্র ২, পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণ -ধৃত 'বৈশাখের দিন' পরে পরিবর্তিত : বৈশাখের এক দিন /

স্তবক ৪। ছত্র ২, 'বজ্রভেরীর' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : বজ্র-বাঁশির /

১০ / ভেবেছিলেম চেয়ে নেব / শেষ স্তবক। ছত্র ১, 'অঙ্গ ভরি' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : একলা ঘরে /
ছত্র ৩, 'নাইবা' স্থলে : নেইবা /
ছত্র ৭, 'একলা ঘরে' স্থলে : বিষাদ ভরে /
ছত্র ১, 'করব না আর' স্থলে : করব নাকো /

১১ / আমার নাইবা হল /

ছত্র ৬-৭, পাণ্ডুলিপিতে : আপন তরী ডুবেছে ত / দেখব সবার / মুদ্রিত পাঠ : আমার আশার তরী ডুবল যদি / দেখব তোদের /

ছত্র ২, 'আমার সেইখানেতেই কল্পলতা' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সেইখেনে মোর স্বর্গপুরী /

১২ / ওগো তোরা বল্‌ত /

স্তবক ৩। ছত্র ১, 'শঙ্খ বাজে' (প্রচলিত) স্থলে প্রথম সংস্করণে ও পাণ্ডুলিপিতে : বাজে শঙ্খ /
স্তবক ৩'এর অন্তর্নিবিষ্ট ও বর্জনচিহ্নিত : ঐ আবার বাজে বাঁশি / আবার আকাশ ছেয়ে উঠল ফুটে সব-ভোলানো হাসি / ২৯-সংখ্যক কবিতার পূর্বাভাস।

১৪ / আমার গোধূলি লগন /

স্তবক ১। ছত্র ২, 'আসিছে মধুর' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : আসে মন্দমধুর /

স্তবক ২। ছত্র ২, 'কখনো কত কি' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : কখনো বা কত /

স্তবক ৪। ছত্র ৪, 'কে তারা' স্থলে ছিল : কে ওরা /

১৫ / আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার / স্তবক ১। ছত্র ৬, 'নিবিড় নীরব' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : নীরব নিবিড় / এক পাতার এক পৃষ্ঠায় এই কবিতার শেষাংশের (শেষ ৬ ছত্র) কবি-কৃত প্রেসকপি বা পরিচ্ছন্ন নকল সংরক্ষিত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগ্রহে।

১৭/ আজ বুকের বসন/ ছত্র ৩, 'রাখিস্‌নে আর' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : রাখিস্‌নে রে/

২০/ আজ পূরবে প্রথম/ স্তবক ১। ছত্র ৪, 'প্রভাত তপন' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : তরুণ তপন/
মুদ্রিত সর্বশেষ ছত্র 'উদয়রবির টীকা' পাণ্ডুলিপিতে নাই।

২১/ তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে/
স্তবক ১। ছত্র ২, মুদ্রিত 'ব্যস্ত হয়ে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সিধা পথে/

স্তবক ২। ছত্র ১, 'গাইনি ত' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : গাহি নি/
ছত্র ৩, 'চাইনি ভুলে' স্থলে : চাহিনি কেউ/
ছত্র ৫, 'হাসিনি কেউ, কইনি কথা' স্থলে : লক্ষ্য ভুলে বসিনি কেউ/
স্তবক ৬। ছত্র ৪, 'চক্ষে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : চোখে/
স্তবক ৮। ছত্র ৪, 'দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে' স্থলে · তুমি আছ শিয়রদেশে/
স্তবক ৯। ছত্র ৩, 'সকল ব্যর্থ' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সবি বিফল/

ছত্র ২, 'যখন আমি' স্থলে : আমি কখন্/

২২/ আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম/
স্তবক ৪। ছত্র ৬, 'ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে' স্থলে : ভিক্ষা চাও ভিখারীর কাছে/
ছত্র ২, 'দিলেম' স্থলে : দিলাম/

এই কবিতার শিয়রে বর্জিত ২ ছত্র :
আমি নীড়ে বসে গেয়েছিলেম আলোছায়ার গান।/ ২৭-সংখ্যকের পূর্বাভাস।

২৩/ তোমার কাঁছে চাইনি কিছু/ স্তবক ১। ছত্র ৩, পাণ্ডুলিপি-ধৃত 'নিলে' স্থলে প্রথমাবধি প্রচলিত 'দিলে' মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র (১৩১৩-১৩৪৮), পরে সংশোধিত হয় (আষাঢ় ১৩৫৩)।

২৪/ পথ চেয়ে ত কাট্‌ল নিশি/ স্তবক ২। ছত্র ৩, 'বকুল ফুলের' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : বনফুলের/

২৫/ তোমরা কেউ পারবে না গো/ পারবে না ফুল ফোটাতে/ পাণ্ডুলিপি-ধৃত সূচনার এই দুই ছত্র, প্রথম সংস্করণ খেয়ায় যথাযথ মুদ্রিত; ইহাদের পুনঃপুনরাবৃত্তিতেও উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সপ্তমখণ্ড কাব্যগ্রন্থে খেয়ার পুনর্মুদ্রণকালে কবি বহু স্থলে বহু পরিবর্তন করেন, এই দুই ছত্রের পরিবর্তিত পাঠ : তোরা কেউ/ পারবি নে গো/ পারবি নে ফুল ফোটাতে/

২৬/ মোদের হারের দলে/ স্তবক ১। ছত্র ৩, মুদ্রিত 'করব প্রয়াণ' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : করব যাত্রা/

সর্বশেষ ছত্রে মুদ্রিত 'সে কথা কেউ' স্থলে : সে কি কেহ/

২৭/ নীড়ে বসে গেয়েছিলেম/ আলোছায়ার বিচিত্র গান/ ২২-সংখ্যক রচনার শিয়রে যে দুই ছত্র বর্জন-চিহ্নিত আছে তাহাই যথাযথ টুকিয়া, পরে 'বিচিত্র' যোগ করা হইয়াছে।
স্তবক ১। ছত্র ৪, মুদ্রিত 'বনভূমির' স্থলে : বনতলের/
ছত্র ১০, 'শ্রাবণ রাতে' স্থলে : বর্ষারাতের/

২৮ / পথের নেশা আমায় লেগেছিল / স্তবক ১। ছত্র ৪, 'নৌকা' স্থলে পাণ্ডুলিপি-ধৃত : নৌকো /
স্তবক ২। ছত্র ৪, 'কি মোহগান উঠ্‌তেছিল' স্থলে : কি গান ও যে উঠেছিল /
ছত্র ৫, 'ফেলতেছিল' স্থলে : ফেলেছিল /
স্তবক ৩। ছত্র ১, 'এলেম' স্থলে : এনু।

স্তবক ৪। ছত্র ৬, 'নূতন' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : নতুন।

২৯ / বিদায় দেহ ক্ষম আমায় / স্তবক ১। ছত্র ৩, মুদ্রিত 'সবে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সবাই /
স্তবক ২। ছত্র ২, মুদ্রিত 'চলেছিলেম সবাই' স্থলে : সবাই মিলে ধরে /
স্তবক ৩। ছত্র ২, 'সে সব মিছে হয়েছে মোর' স্থলে : মিথ্যা হয়ে গেছে আমার /
সর্বশেষ ছত্রে মুদ্রিত 'সবে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সবাই /
১২ সংখ্যার তৃতীয় স্তবকে প্রক্ষিপ্ত (বর্জিত) ৩ ছত্র পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই তুলনা বর্তমান কবিতার স্তবক ৪। ছত্র ১-২ : আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি / আমার প্রাণে বাজালো আজ বাঁশি। /

৩১ / তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ / স্তবক ৩। ছত্র ৩, মুদ্রিত 'গ্রামের ধারে ঘাটের পথে' স্থলে : বিকাল হল গ্রামের পথে /

৩২ / ভাঙা অতিথ শালা / স্তবক ১। ছত্র ৪-৫, মুদ্রিত 'তপ্তপথে / কেটেছে দিন কোনমতে,' স্থলে : সারাটা দিন / চল্‌ছি পথে বিরামহীন /
স্তবক ৩। ছত্র ৭, মুদ্রিত 'বাঁশের শাখা' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : বাঁশের বনে /
ছত্র ২, মুদ্রিত 'বিজন দীর্ঘ' স্থলে : আঁধার বিজন /

৩৩ / পথিক, ওগো পথিক /
স্তবক ১। ছত্র ২, মুদ্রিত 'গভীর ঘোর' স্থলে মূলে : দ্বিপ্রহরা / 'দ্বিপ্রহরা' উদ্ভাবিত হইবার পূর্বে আরও দুটি পাঠ লেখা হয়, অব্যবহিত পূর্বপাঠ যতদুর মনে হয়, ছিল : গহীন ঘোর /
স্তবক ১। ছত্র ৮, 'দেখ' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সুখে /

৩৪ / বন্দী তোরে কে বেঁধেছে /
স্তবক ১। ছত্র ৩, 'যে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : গো /
শেষে পাণ্ডুলিপি-ধৃত অপ্রকাশিত ৪ ছত্র :
আমরা যাহা লুঠ করে নিই / তোমার সে ধন প্রভু !—
আমরা ঘুমাই তুমি জাগো, / ভুল্‌ব না আর কভু। /
স্তবক ২। ছত্র ৬, 'করবে জগৎ' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : জগৎ করবে /

৩৬ / আমি এখন সময় করেছি /
স্তবক ১। ছত্র ৩, মুদ্রিত 'সাঁঝের প্রদীপ' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : সন্ধ্যাপ্রদীপ /

৩৭ / জুড়ালো গো দিনের দাহ /

স্তবক ১। ছত্র ১, মুদ্রিত, 'জুড়ালরে' স্থলে : জুড়ালো গো /
ছত্র ৩, 'স্বপ্নভরা' স্থলে : স্বপনভরা /
স্তবক ২। ছত্র ২, পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণ-ধৃত 'পথে হতে' পরে (১৯১৬) হয় : পথে চল্‌তে /
স্তবক ৬। ছত্র ৩, 'ম্লান ধূসর' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : ম্লান সোনার /

৩৮ / আজ বিকালে কোকিল ডাকে /
স্তবক ১। ছত্র ৪, 'তিনশো' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : দুইশ /
স্তবক ৩। ছত্র ৫, 'বিনিয়ে খোঁপা' স্থলে : চুলটি বেঁধে /
স্তবক ৪। ছত্র ১, 'তিনশো' স্থলে : দুইশ /
স্তবক ৫। ছত্র ৭-৮, 'দিনের সুরে / কোকিল কেন' স্থলে : সুরে, কোকিল, / কিসের লাগি /

৩৯ / আমার এ গান শুনবে যদি / তৃতীয় স্তবকটি (প্রতি স্তবকে ১৬ ছত্র) রচনাশেষে লেখা হয়।

৪০ / কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ / পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক (প্রতি স্তবকে ৮ ছত্র) অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ টানা লেখার ভিতরে নাই, পরে যোগ করা হয়। /

৪১ / আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে / দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ টানা লেখায় নাই, পরে লেখা পৃষ্ঠার মার্জিনে।
স্তবক ১। ছত্র ৩, পাণ্ডুলিপিতে 'সুর' কাটিয়া 'তাল' ; মুদ্রিত : ডাক /
স্তবক ৩। ছত্র ২, মুদ্রিত 'পথের থেকে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : ব্যর্থ আশায় /
ছত্র ৩, 'পড়েছেরে' পাণ্ডুলিপি ও প্রথম সংস্করণ-ধৃত, পরে (১৯১৬) : পড়ছে রে তা'র /
ছত্র ৪, মুদ্রিত 'অলক বেয়ে বেয়ে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : কাহার অলক বেয়ে /
ছত্র ৫, মুদ্রিত 'মল্লারেতে মীড় মিলায়ে' স্থলে : মল্লারে মূর্চ্ছনা দিয়ে /
স্তবক ৫। ছত্র ৩, 'কোন্ সে পাগল পারাবারের' স্থলে : সে কোন্ অশ্রুপারাবারের /
স্তবক ৬। ছত্র ২, 'সকল গড়া সকল ভাঙা' স্থলে : সকল বর্ণ সকল গন্ধ /

পাণ্ডুলিপি ২৭৩

৪২ / কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি /
স্তবক ৩। ছত্র ১, মুদ্রিত 'কোন্ লাজে বা' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : কেমন করে /
ছত্র ২, 'আমি বল্‌ব কেমন করে' স্থলে : তুমি আসবে আমার লাগি /
ছত্র ৩, 'শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি' স্থলে : আমি তোমারি পথ চেয়ে শুধু /
ছত্র ৪, 'তুমি আসবে আমার তরে' স্থলে : আমি রজনীদিন জাগি /
পর পর ৬টি স্তবক লেখা হয়, কিন্তু মুদ্রিত তৃতীয় স্তবক মূলতঃ ষষ্ঠ ছিল, স্থান-পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাণ্ডুলিপি-ধৃত।

৪৩ / পাছে দেখি তুমি আসনি তাই / স্তবক ১। ছত্র ২, মুদ্রিত 'মুদিয়ে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : মেলিয়া /

৪৪ / ওগো এমন সোনার মায়াখানি /

স্তবক ৩। ছত্র ৭, মুদ্রিত 'সোনার মধু' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : হাওয়ায় আলোয় /
স্তবক ৫। ছত্র ৮, 'পড়েছে' স্থলে : উড়িছে /

৪৫ / "সব-পেয়েছি"র দেশে কারো / স্তবক ৪। ছত্র ১, মুদ্রিত 'নৌকা' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : নৌকো /
শেষ স্তবক। ছত্র ৭ মুদ্রিত 'সেতারখানা' স্থলে : সোনার তন্ত্রী /

৪৬ / আমায় অম্‌নি খুসি করে রাখ /
স্তবক ১। ছত্র ৮, মুদ্রিত 'গভীর' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : মধুর /
শেষ স্তবক। ছত্র ৬, 'ঘনধারায়' স্থলে : গহন রাতে /
ছত্র ৯, 'ভরে লব' স্থলে : ভরে রব /

৪৭ / বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন / শেষের পূর্বছত্র, মুদ্রিত 'মিথ্যা খোঁজা' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : কারে খোঁজো /

৪৮ / নিঃশ্বাস রুধে /
পাণ্ডুলিপিতে প্রথম দ্বিতীয় উভয় স্তবকেরই প্রাগন্তিম ছত্র : আমার বরষা কালো বরষা যে /
মুদ্রণকালে দ্বিতীয় স্তবকে পরিবর্তন : আজি মোর বর মোর কালো ঝড় /
পাণ্ডুলিপি-ধৃত শেষ ৪ ছত্র :

ভরিয়া গগন গরজি সঘন
পীত বিদ্যুৎ-বাসে
× সহসা বিজুলি-হাসে, ×
মেঘের বরণ হৃদয় হরণ
আমার মরণ আসে ! /

তৎপরিবর্তে মুদ্রিত :

"জানি না ত আমি কোথা হতে নামি / কি ঝড়ে আঘাত লেগে
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া / কে আসিছে কালো মেঘে !" /

পাণ্ডুলিপি ১১০

৪৯ / বন্ধু, / এ আমার / মুদ্রিত সূচনা : বন্ধু, / এ যে আমার /
স্তবক ১। ছত্র ২, মুদ্রিত 'নীরব' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : গোপন /
স্তবক ২। ছত্র ৬, মুদ্রিত 'ফুলগুলি সব' স্থলে : ফুলগুলি ওর /

পাণ্ডুলিপি ২৭৩

৫০ / তখন ছিল যে গভীর /
স্তবক ১। ছত্র ৬, মুদ্রিত 'ছিল বসে মোর প্রাণে ;' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : কে ছিল প্রাণের দ্বারে— /
ছত্র ৮, 'চায় যে কারে কে জানে !' স্থলে : খুঁজিতে এসেছে কারে। /
স্তবক ২। ছত্র ২, মুদ্রিত 'ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : রুদ্ধ ক্ষুধিত /
ছত্র ৪, 'হারাল রে' স্থলে : হারায়েছে /

ছত্র ৭, 'আঁধারে কখন্ সে এসে যায় গো' স্থলে : নিবিড় তিমিরে এসে চলে যায় /

৫১ / আমি বিকাব না /

স্তবক ২। ছত্র ৪, পাণ্ডুলিপিতে 'মধ্যে' কাটিয়া 'মাঝে', কিন্তু মুদ্রিত : মধ্যে /

স্তবক ৩। ছত্র ৪, মুদ্রিত 'বীণাযন্তরে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : বীণাযন্ত্ররে / মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছে অথবা ঘটে নাই নিশ্চিত বলা কঠিন। (স্তবকের অষ্টম ছত্রে : মন্ত্ররে / অর্থাৎ, 'মন্ত্র রে'।)

স্তবক ৩। ছত্র ৫, 'যাহাই' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : যা কিছু /

সুপ্রভাত*

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি ইত্যাদি

স্তবক ১। ছত্র ৬, মুদ্রিত 'গেছে কিনা' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে : গিয়েছে কি /

স্তবক ২। ছত্র ৮, 'অমানিশা গেল' স্থলে : রাত্রি গিয়েছে /

ছত্র ৯-১০, 'খড়্গ আঁধার-মহিষে দুখানা করিল' স্থলে : খড়্গে আঁধার মহিষে / দুখানা করিলে /

স্তবক ৩। ছত্র ৫, 'তারা যে' স্থলে : তাহারা /

ছত্র ৯, 'আনো বহি আনো' স্থলে : করগো বাহির /

স্তবক ৪। ছত্র ৭, 'মরণনৃত্যে' স্থলে : প্রলয়নৃত্যে /

স্তবক ৫। ছত্র ৩, 'হবে যে বাজাতে' স্থলে : বাজায়ে চলিব / চতুর্থ স্তবকের পরে রচনার স্থান কাল লেখা ; এজন্য মনে হয় পঞ্চম স্তবক একরূপ 'after thought' বা সংযোজন।

॥ পুনশ্চ জ্ঞাতব্য ॥

লক্ষ্য করা যাইবে, খেয়ার অধিকাংশ কবিতা ১১০ ও ২৭৩ সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে রচনার তারিখ -সহ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না কেবল—

(ক) ঘাটের পথ / ওরা চলেছে দীঘির ধারে ইত্যাদি

(খ) মুক্তিপাশ / ওগো নিশীথে কখন্ ইত্যাদি

(গ) দুঃখমূর্তি / দুখের বেশে এসেছ বলে' ইত্যাদি

(ঘ) মেঘ / আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে ইত্যাদি

স্বদেশী গানের মধ্যে পাওয়া যায় না সুবিখ্যাত—

(ঙ) সোনার বাংলা / আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি ইত্যাদি

এই রচনাগুলির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খুচরা দুই-পাতা রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে সদ্য আবিষ্কৃত। পাতা দুইখানি বড়ো আকারের ডায়ারির পাতা (২৭×২০·২ ও ২১·১ সে. মি. / তা° 1898 January 1-5 & 13-19, pp 1-2 & 5-6) সংরক্ষণের উদ্দেশে বর্তমানে কাচ-কাগজে আবৃত। (এই পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে উপহার দেন শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী।) দুঃখের বিষয় মাঝের একখানি পাতা না পাওয়ায় বা রক্ষা না পাওয়ায়, পূর্বোক্ত প্রথম কবিতার অন্তিম তিন স্তবক ও দ্বিতীয় কবিতার প্রথম-দ্বিতীয় স্তবক পাওয়া গেল না। (যাহা পাওয়া যায় তাহার মূল্য অল্প নয়) মূলতঃ পেন্সিলে লেখা

হইলেও (প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কবিতার শিয়রে কতকগুলি শব্দসূচী : অ। কম, কম্‌লা, কমি ইত্যাদি) প্রথম কবিতার কতক অংশে কালীতে যৎসামান্য শব্দ-সংযোজন ও পরিবর্তন আছে। ডায়ারির মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক ধরিয়া অন্যান্য তথ্য নিম্নে দেওয়া গেল—

pp. 1-2 পাণ্ডুলিপি-ধৃত ৭টি স্তবকের গ্রাহ্য পাঠ মুদ্রিত স্তবক ১-৭'এর সহিত মিলাইয়া একমাত্র পাঠভেদ দেখা যায় তৃতীয় স্তবকের শেষ ছত্রে— মুদ্রিত 'আমি কি' স্থলে : কি আমি /

pp. 5-6 দ্বিতীয় কবিতার পাণ্ডুলিপি-ধৃত শেষ স্তবকে কোনো পাঠভেদ নাই। রচনার স্থান-কাল আদ্যাবধি জানা ছিল না, পাণ্ডুলিপিতে কবিতা-শেষে : ৭ই শ্রাবণ ১৩১২ / কলিকাতা তৃতীয় কবিতা ডায়ারির পঞ্চম পৃষ্ঠারই নীচের দিকে শুরু হয়, পরপৃষ্ঠায় ইহার অনুবৃত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তবক। সমুদয় কবিতায় কোনোরূপ কাটাকুটি নাই। (কবিতার শিয়রে কোনো ফুলের বা তাহার কর্তিত একাংশের রেখাচিত্র।) সব-শেষে রচনার অজ্ঞাতপূর্ব স্থান-কাল : ১৩১২ / ৭ই শ্রাবণ / কলিকাতা মাঝের এক পাতা খুঁজিয়া না পাওয়ায় 'ঘাটের পথ' কবিতা রচনার নিশ্চিত স্থান-কাল-নির্দেশ সম্ভবপর নহে, কবিতাটি ১৩১২ সনের ৭ শ্রাবণে বা অব্যবহিত পূর্বের কোনো তারিখে লেখা ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১১০ ও ২৭৩ বহির্ভূত পূর্বোক্ত ৫টি কবিতার মধ্যে ৪টি প্রকাশিত হয় নবপর্যায় **বঙ্গদর্শন** পত্রে ১৩১২ সনে— (ক) ভাদ্র। পৃ ১৯৯ (খ) পৌষ। পৃ ৪৪৩ (গ) মাঘ। পৃ ৪৮৮ (ঙ) আশ্বিন। পৃ ২৪৭

(ঘ) 'ভারতীয় খেয়াল' নামে ভারতী পত্রের ১৩১২ বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ৮০) প্রথম প্রচারিত।

'আমার সোনার বাংলা' (৬) এবং আমাদের পূর্ব-তালিকা-ধৃত আরও চারটি স্বদেশী গান কোন্ তারিখে প্রথম প্রচারিত হয় সঞ্জীবনী পত্রিকায় (সাপ্তাহিক) এ সম্পর্কে গল্পভারতী মাসিক পত্রের ১৩৭৮ বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীসত্যেন রায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত / সংগীত নয়— সঞ্জীবনী' প্রবন্ধে (পৃ ১০২৩-২৪) জানিতে পারি—

সঞ্জীবনী : ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ / বাংলা ১৩১২

আমার সোনার বাংলা (৬)	৭ সেপ্টেম্বর / ২২ ভাদ্র
বাংলার মাটি বাংলার জল (৩)	
আমাদের যাত্রা হল শুরু (২২)	
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি (২৩)	১২ অক্টোবর / ২৬ আশ্বিন
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (২৪)	

১১০-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে শুধু কবি রবীন্দ্রনাথের নয়, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের কিছু-কিছু কাজ যত্রতত্র আমাদের চোখে পড়ে, রচনার বহু বর্জিত অংশকে তিরস্কৃত বা গুণ্ঠিত করিয়া বিচিত্রভাবে বিতানিত রেখাজালে এগুলি পাণ্ডুলিপির বহু পৃষ্ঠার ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। কোথাও অনেকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট বর্জিত পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটি অক্ষর ঘিরিয়া ঘিরিয়া নানা সূক্ষ্ম রেখার টানাপোড়েনে যেন কারুকার্যখচিত কার্পেট বোনা হইয়াছে। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' আলোচ্য পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় (১০৫) লেখা তাহার চিত্র গীতবিতানে মুদ্রিত থাকায়, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এইপ্রকার রেখাশৈলীর কিছু পরিচয় সকলের জানা।

১ এ কবিতায় প্রথমাংশের শিয়রে 'শুভক্ষণ। / ১' ও দ্বিতীয়াংশের শিয়রে 'ত্যাগ। / ২' বঙ্গদর্শনে (অগ্রহায়ণ ১৩১২ / পৃ ৩৮৩ ও ৩৮৪) ছাপা হয় দুই-দুই ছত্রে। তদনুসৃতি খেয়া কাব্যেও দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমাংশ প্রথম স্তবক-রূপে ও দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় স্তবক-রূপে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত। সঞ্চয়িতায় (পৌষ ১৩৩৮) প্রত্যেক অংশে দুইটি স্তবক, দ্বিতীয় অংশের পৃথক্ শিরোনাম বর্জিত।

২ 'পদ্মা' বলিতে কবির ভাসমান গৃহ 'পদ্মা বোট' অনুমিত হয়। ৩ '২৪শে' লিখিয়া, পরে সংশোধন : ২৫শে

৪ রবীন্দ্রসদনে একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপিতে (পুরা ১ পাতাও নয় / মাপ : ৮৩ × ১০.৬ সে.মি.) রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া যায় :

যেথানে যা-কিছু পেয়েছি, কেবলি সকলি করেছি জমা।
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও!
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে এ যাত্রা মোর থামাও।

—০—

এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা!
ফুলবনে তোর একটি কুসুম তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর বেড়া / সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া, সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
[লোকে] র কথা নিস্ নে কানে, ফিরিস্ নে আর হাজার [টানে,]
[যেন রে তোর] হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
[একতারাতে একটি যে তার] আপনমনে সেইটি বাজা।

বন্ধনীবদ্ধ অংশগুলি কাগজের ছিন্ন অংশে থাকায় লুপ্ত হইয়াছে। এই কাগজের অপর পিঠে পরিচিত দুইটি গানের প্রাথমিক রূপ—

১) সুরট / কোথা হতে জাগে প্রেমবেদনারে।
ধীরপদে বুঝি অন্ধকারঘন হৃদয় অঙ্গনে আসে সখা মম ইত্যাদি।

২) ভৈরোঁ / জননী তোমার +চরণকমল / করুণ চরণখানি ইত্যাদি।

কোনো ক্ষেত্রে কোনো রচনাকাল পাওয়া যায় না। লক্ষ্য করার বিষয় হইল এই যে, 'সীমা' কবিতার সূচনার ৪ ছত্র বাদ দিয়া যেরূপ পাঠ পাওয়া যাইতেছে তাহা বহুপ্রচলিত গানেরই পাঠ। এই পাণ্ডুলিপি-ধৃত অপর রচনা-তিনটিও গান। এই ৪টি গানই কলিকাতায় মহর্ষিভবনে ১৩১৫ সনের মাঘোৎসবে গীত হয় তাহা ঐ সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে জানা যায়। খেয়ার কবিতা-দুইটি ১৩১২ সনের হইলেও, সুর-রচনা সম্ভবতঃ উক্ত মাঘোৎসবের প্রাক্‌কালে। (+ঢেরা চিহ্ন দিয়া বর্জনচিহ্নিত পাঠ সংকলন করা হইয়াছে।)

৫ সংরক্ষণের উদ্দেশে মূল পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক পাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দুই পিঠে কাচ-কাগজ বা স্বচ্ছ কাগজ আঁটা হইয়াছে ; ঐ সময়েই পাতার ওলট-পালটে আগের রচনা পরে আসিয়াছে এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া গেল রচনাকাল-অনুযায়ী।

৬ প্রথম ছত্রের প্রথম পাঠ : আজ, বিকাল বেলা কোকিল ডাকে / পরিবর্তনের পরে 'কমা'টি লোপ করা হয় নাই।

৭ ইহার পূর্বপৃষ্ঠা ১২৭, সেটি মলাটের ভিতর-পৃষ্ঠা— এখানে '১২৭'-ধৃত খেয়ার উৎসর্গ কবিতার উল্লেখ করা হইল না। রচনার কালক্রমে পরে আসিবে। খাতা উল্টা ধরিয়া রচনা শুরু করায় 'স্বদেশী' গানগুলির ক্রমিক সংখ্যা যে দিকে বাড়িয়া চলিয়াছে, পৃষ্ঠাঙ্কের চাল তাহার উল্টা : ১২৬-১০০।

৮ সুপ্রভাতের এই সংখ্যা দেখা হয় নাই। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (শ্রাবণ ১৩১৭/দ্র. পৃ ৩) বলা হইতেছে : জন্মমাত্রেই কবি এই বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, / ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ / ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী, / রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল / সুপ্রভাতের রাগিণী! / উল্লিখিত কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের সূচনাতেই এই ৪ ছত্র রহিয়াছে।

৯ কার্জন সাহেব বঙ্গবিভাগের সরকারী সংকল্প ঘোষণা করার পরে ২২ শ্রাবণ ১৩১২ (৭ আগস্ট ১৯০৫) তারিখে বাংলাদেশের সর্বত্র মিছিল ও সভা-সমিতি করিয়া উহার প্রতিবাদ হয় এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় বলা যাইতে পারে।

১০ অন্তিম স্তবক -ধৃত ; এ স্তবক ইতঃপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই।

১১ কলিকাতায় মহর্ষিভবনে ১৩১২ সনের মাঘোৎসবে গীত হয়, ঐ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ দেন। তুলনার্থে স্মরণযোগ্য, জাতীয়সংগীত (ভারত-বিধাতা / জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ইত্যাদি) ১৩১৮ সনে কংগ্রেস মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১১ পৌষ ১৩১৮) গীত হওয়ার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ পায় এই শিরোনামে : ভারত-বিধাতা। / (ব্রহ্মসঙ্গীত) / ১১ মাঘ ১৩১৮ তারিখে মহর্ষিভবনে যে ব্রহ্মোৎসবের অনুষ্ঠান তাহাতে সান্ধ্য উপাসনা-কালে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন (ধর্মের নবযুগ / সঞ্চয়), উহারও সব-শেষে উল্লিখিত জাতীয়সংগীত তথা ব্রহ্মসংগীতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি : জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, / মানবভাগ্যবিধাতা ! / এরূপ অনুমান অসংগত হইবে না যে উক্ত ভাষণের পূর্বে বা পরে ঐ অনুষ্ঠানেই পূর্বোক্ত গান কবির সমক্ষে (তাঁহার অধিনায়কতায় ?) গাওয়া হইয়া থাকিবে।

১২ কপাল-টুক্নি (বা পাশ-টুকনি) যে কথাগুলি পাওয়া যায়, এ সকল ক্ষেত্রে তাহা কোনো না কোনো গানের সূচনা নির্দেশ করিতেছে। নির্দিষ্ট গানের ছাঁদে রবীন্দ্রনাথ নূতন গান রচনার ইচ্ছা করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর। তবে সব ক্ষেত্রে পূর্বনির্দিষ্ট গান আর নূতন গান উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহা বলা যায় না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যল্প সাদৃশ্য থাকিতেও পারে। যাহা হউক, এ বিষয় সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের বিচার্য।

১৩ শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সংগ্রহ-ভুক্ত যে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি মজুমদার-পাণ্ডুলিপি নামে খ্যাত, তাহারই একটি পৃষ্ঠার চিত্র।

১৪ বহু ক্ষেত্রেই কবি একটানা অনেকগুলি স্তবক লিখিয়া, পরে কী বুঝিয়া পরের স্তবক আগে আনিয়াছেন, অর্থাৎ তদুপযোগী সংকেত বা / এবং নির্দেশ দিয়াছেন ; কখনো বা লেখা একরূপ শেষ করিয়া, অর্থাৎ রচনার স্থান / কালও লিখিয়া পুনশ্চ নূতন স্তবক লিখিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন। বর্তমান কবিতায় পর-প রস্তবকগুলি এইভাবে লেখা— স্তবক ১, ৩, ৪ (অপ্রকাশিত / এ স্থলে সংকলিত), ২ ও ৫। কবি ৪-অঙ্কিত স্তবকের পরেই এক দফা রচনার তারিখ (১৪ই শ্রাবণ ১৩১২) লিখিয়া দিয়াছিলেন। এরূপ স্তবক-রচনার নানা বৈচিত্র্য বা বিন্যাসের বহু পরিবর্তন, সাধারণতঃ বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করা হইল না।

১৫ প্রথম সংস্করণে, এমন-কি সপ্তমখণ্ড কাব্যগ্রন্থে (১৯১৬), এ কবিতার স্তবক ভাগ বুঝিবার উপায় ছিল না। পাণ্ডুলিপি-ধৃত সংকেত অনুযায়ী প্রচলিত মুদ্রণে আট-আট ছত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক বিন্যস্ত।

* পূরবী কাব্যে (শ্রাবণ ১৩৩২) 'সঞ্চিতা' অংশের শেষ কবিতা। পূরবীর পরবর্তী মুদ্রণে 'সঞ্চিতা' অংশ বর্জিত। কবিতাটি প্রচলিত সঞ্চয়িতা গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৪০) প্রথম উহার অঙ্গীভূত হয়। এ স্থলে পাণ্ডুলিপি ও সঞ্চয়িতা (আশ্বিন ১৩৭৩) পরস্পরের তুলনা করা হইল। অবশ্য, পূরবী (১৩৩২) ও সঞ্চয়িতা (১৩৭৩) উভয়ের মধ্যে যথার্থ পাঠভেদ কিছু নাই।

কানাই সামন্ত

মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা। বিষ্ণু দে। মনীষা, কলিকাতা ১২। মূল্য ৮·০০ টাকা।

'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের বিভিন্ন ধরণের লেখার সংগ্রহ। এর বিষয়বস্তু সাহিত্য চিত্র সিনেমা বহির্ভারতীয় আধুনিক সাহিত্য এবং আনুষঙ্গিক নানা প্রসঙ্গ। লেখাগুলি কোনো একটি সূত্র ধরে পরিকল্পিত নয়— সাহিত্য-সাময়িকীতে নানা উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ। মাইকেল সম্বন্ধে বিষ্ণুবাবুর নিজস্ব চিন্তা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে; রবীন্দ্রনাথও বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে স্বভাবতই এসে গেছেন— যদিও প্রচলিত প্রথায় কাব্য বা উপন্যাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নয়। অতএব এ দুজনকে শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি আছে। 'জিজ্ঞাসা' শব্দটি দিয়ে লেখক নম্রতা প্রকাশ করেছেন, যেন এ বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা মাত্র আছে—সিদ্ধান্ত নেই।

কিন্তু নম্রতা মানেই প্রত্যয়ের অভাব নয়। মাইকেল সম্বন্ধেও বক্তব্য তাঁর নিজস্ব। সমকালীন লেখকদের সম্বন্ধে ('এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য') ও বাংলাদেশের সমাজ ('লোকশিল্প ও বাবুসমাজ' 'জনসাধারণের রুচি') সম্বন্ধেও বিষ্ণুবাবুর বলবার বিষয় আছে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যে চরিত্র-বিবরণ তিনি রচনা করেছেন তা এককথায় অপূর্ব। জিজ্ঞাসা কথাটা এই অর্থেই নেওয়া যেতে পারে— প্রচলিত ধারণাকেই নতুন করে প্রশ্ন করে নিতে চাইছেন। বিষ্ণুবাবু চান আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে। তাঁর মন নানা বিষয়ে সঞ্চরণ করে ফিরেছে, তাতে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ পাঠকের মনেও চিহ্ন ফেলে যায়। পাঠক তাঁকে অনুসরণ করে ফেরেন, তাঁরই দৃষ্টিতে পাঠককে দেখতে শেখান, তাঁরই চিন্তায় চিন্তিত করে তোলেন। বিষ্ণুবাবুর চিন্তায় একটি অসংকুচিত দৃঢ়তার ছাপ আছে। কোনো দ্বিধার প্রশ্রয় নেই। তাঁর বহুবিধ পড়াশোনা, প্রসঙ্গ উত্থাপনে নৈপুণ্য, মনের সপ্রতিভতা, বিষয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়তাবোধ তাঁর রচনাকে সযত্ন অনুশীলনের বস্তু করে তুলেছে। তাঁর লেখার একটি গুণ মডার্নিজ্‌ম।

আধুনিকতা তাঁর চিন্তায় এবং ভাষায়। এ গদ্যভঙ্গি তাঁর নিজস্ব। এ গদ্য না সুধীন্দ্রনাথের না রবীন্দ্রনাথের। তাঁর শব্দপ্রয়োগে লৌকিক ভঙ্গির দিকে ঝোঁক যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় আধুনিক জীবন থেকে আহৃত নানা অনুষঙ্গ, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিত চিত্রকল্প। পরিচ্ছন্ন শব্দের উপর তাঁর অধিকার নিরঙ্কুশ; সেই সঙ্গে লৌকিক ইডিয়মের দ্বারা বারবার অ্যান্টিক্লাইম্যাকস বেশ জটিল অর্থের সৃষ্টি করে। লেখায় আছে ব্যঙ্গের ঝাঁজ। তাঁর রচনায় মাধুর্যের চেয়ে তীক্ষ্ণতা বেশি, মিষ্টতার চেয়ে ঝাল। তাঁর বাক্যগঠন মাঝে মাঝে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে—'সচরাচর এই কবিতার চেতনা এর আধিদৈবিক শক্তিমত্তা শরীর পায় কবির স্বকীয় ক্রাইসিসে রবীন্দ্রনাথের মতো সদর স্ট্রীটে গরু-গাধার মৈত্রীর দৃশ্য দেখে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে অথবা আবার প্রবীণ সিদ্ধির বয়সে অরাম-সেঠ মার্কা আত্মহত্যার লক্ষণযুক্ত ঝোঁকে।' এই গদ্যের বাক্যগঠনে ইংরেজির প্রভাব বেশি। আজকাল এটা অবশ্য উল্লেখযোগ্য কথাই নয়। আমাদের অলক্ষ্যে বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতি এত বেশি প্রবেশ করেছে যে যদি আজ ঈশ্বর গুপ্ত হঠাৎ এসে যেতেন তবে এ ভাষার একটা লাইনও বুঝতেন কিনা সন্দেহ। কথাটায় অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু মিথ্যা নয়।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বিষ্ণুবাবুর ঔৎসুক্যও আমাদের অজানা নয়। ঈশ্বর গুপ্ত সেই লোকসমাজেরই কবি।

যে সমাজ থেকে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি সরে এসে কৃত্রিম 'বাবু' কালচার তৈরি করেছে। বিষ্ণুবাবুর মতে 'নবযুগ-নির্মাণে তাই আমাদের দেশজ সংস্কৃতি বৃহত্তর অর্থেই আমাদের সহায়।' আমাদের সংস্কৃতির অঘটন ঘটছে সেইখানে যেখানে আমাদের লোকসমাজ এই শহুরে কালচার থেকে আলাদা হয়ে রইল। এই জন্যে যেখানে তিনি দেখেন তার আভাস, সেইখানেই তিনি উৎসুক হয়ে মনোযোগ নিক্ষেপ করেন। ইংরেজিআনা সত্ত্বেও লৌকিক ভঙ্গির প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য মধুসূদন বিষ্ণুবাবুর অনুরাগ অর্জন করেছেন।

মধুসূদন-প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবু যে বিচারসূত্রটি প্রয়োগ করেছেন সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব নয়। তিনি মধুসূদনের পশ্চাৎপটে খুঁজেছেন এক দ্বিধাকে। আমরা উনিশ শতক সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই সূত্রটি প্রযুক্ত হতে দেখেছি এক শ্রেণীর ভাবুকদের দ্বারা। কাব্যটেকনিকে আশ্চর্য অধিকার সত্ত্বেও মধুসূদনের কবিতা যে সমান উৎকর্ষ বজায় রাখতে পারে না— 'উৎকৃষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্ট যে তাতে মিশে আছে, এর কারণ তাঁর সমাজ তাঁর যুগও ঐ ভঙ্গিলতার জন্য দায়ী।' ইংরেজি ভাষায় তাঁর অসাধারণ প্রবেশ এবং লৌকিক সংস্কারে তাঁর বদ্ধতা—এই দোটানাতেই তাঁর কাব্য দ্বিধাগ্রস্ত। ইঙ্গজাগরণের আবর্তে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট, অন্তত অস্পষ্ট ছিল তাঁর চেতনা। মাইকেল নিজের প্রতিভাকে সম্পূর্ণ বাঁধনমুক্ত করতে পারেন নি। দ্বিধা নয়, দ্বিধাকে জয় করবার মতো 'কোনো সংলগ্নতার মর্মান্তিক জিজ্ঞাসায় চরম এক উৎক্রান্তি বা ক্রাইসিস' মধুসূদনের ছিল না যা যে-কোনো বড়ো কবির বিকাশসন্ধিতেই থাকে। মধুসূদন যন্ত্রণার উৎক্রান্তি পর্বের অনির্দিষ্টতাতেই আবদ্ধ ছিলেন ঐতিহাসিক সামাজিক ঘূর্ণির কারণে। অর্থাৎ মধুসূদন যদি প্রবল প্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন তবে তাঁর কাব্য হত সুমিত। দ্বিধা আসবে সমাজ-জীবন থেকে কিন্তু দ্বিধাকে জয় করে ব্যক্তির চেতনায় নিটোল উপলব্ধি গড়ে তুলতে হবে; রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে যেমন তিনি বলেন 'ইংরেজ শাসনে ও শোষণে তিনি নবজাগ্রত জাতীয়তাকে বাণীমূর্তি দিয়ে বিকশিত করতেন, আবার জাতীয়তার ভগ্নরূপে পিছিয়ে গিয়ে তাঁর মানস খুঁজত বিশ্বজনীন মানবিকতা। কিন্তু ঐ দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি কয়েকটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধের আবেগে বেঁধেছিলেন বলেই তাঁর রচনা ও কর্ম বৈচিত্র্যে প্রায় অন্তহীন।'

মধুসূদন পারেন নি কি দ্বিধাজয়ী নিশ্চিত মূল্যমানে পৌঁছতে? বীরাঙ্গনার নায়িকারা কি বাংলা সাহিত্যে কোনোই অশ্রুচিহ্ন রেখে যায় নি? যায় নি কি চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরী? কিংবা রাবণ যাঁর নীতিহীন হৃদয়ই ছিল নতুন মানবিকতার সংকেত? তবু মধুসূদনের কাব্যের অসমানতার যে ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন, সেটা শিল্পেরই কথা এবং সে-প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর বৈদগ্ধ্য ও রসিকতা সর্বজনবিদিত। বস্তুত বিষ্ণুবাবুর লেখার মধ্যেও অনুভব করি এক উপভোগ্য দ্বন্দ্ব। বিশুদ্ধ রসাস্বাদন এবং সামাজিক তাৎপর্য উদ্ধারের দ্বন্দ্ব। প্রতিভা সম্বন্ধেও তাঁর বিশ্বাস ধ্রুব, সেখানে তিনি ক্লাসিসিস্ট সমালোচক; তাই তিনি পাস্তারনেকের কথা বলতে গিয়ে বলেন—'উপন্যাসটি পড়ে ভীষণভাবে আশাভঙ্গে ভুগতে হল। এ উপন্যাসে তলস্তয়ের মাহাত্ম্যের নামগন্ধও নেই, এতে কোথায় পুশকিনের প্রতিভার ছাপে ছাপে পরিমিতি, দস্তএভস্কির দিব্যোন্মাদের অনিবার্য তীব্রতাও এ বইয়ে অনায়ত্ত, তুর্গেনিভের সংযত সৌন্দর্যের বিষাদই বা কোথায়?'

বিষ্ণুবাবুর লেখায় লোকসংস্কৃতির প্রতি প্রীতির ইঙ্গিত-আভাস থাকলেও তাঁর চিন্তায় সনাতন আভিজাত্যের দীপ্তিই বিচ্ছুরিত। গড্ডলিকা-চিন্তার ধারক তিনি নন। তাঁর দেখবার অনুভব করবার

নির্দেশ দেবার বিদ্রূপ করবার বিশিষ্টতায় তিনি অ্যারিস্টোক্র্যাট। আমাদের সাহিত্যে 'ইউরোপ এত কম প্রকাশ পায়' কেন (পৃ ১৪২) বলে তিনি আক্ষেপ করেন; তিনিই আবার বলেন 'বাস্তববাদ বা পরোক্ষ শিল্পনীতির পশ্চিমা সমস্যা ভারতীয় জীবনে ও শিল্পসাহিত্যে লালিত যে কোনো সুস্থ ভারতীয়ের কাছে একটু অবাস্তব লাগে' (পৃ ১২৫)। বোধহয় মননশীল লেখক মাত্রই আত্মসচেতন হতে বাধ্য।

বলা বাহুল্য আমরা এই প্রখর মননপদ্ধতির অনুরাগী। এ না হলে আমরা এই বইয়ে সংকলিত তীক্ষ্ণ রচনাগুলি পেতাম না। 'মস্কভা-পিকাসো সংবাদ' 'আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক' 'প্রমথ চৌধুরী ও আমরা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি চিন্তাকে জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায়ের শিল্পকলা বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ এতে আছে। বিষ্ণুবাবুর মতে ভারতীয় ভূমিতে যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক শিল্পীর মানস আনলেন। গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে কৌতূহল হয়। এই প্রসঙ্গে কুমারস্বামী এবং অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পব্যখ্যা তাঁর মনঃপূত নয় দেখা গেল। এই আধুনিকতা পাশ্চাত্যদেশের স্বীকৃত মানে গৃহীত প্রতীকীবাদ। আমাদের সংস্কৃতিতে 'রিয়ালিজম এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ অঙ্গাঙ্গী' বলেই রবীন্দ্রচিত্র যেন সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। রবীন্দ্রচিত্রকলার প্রতি বিষ্ণুবাবুর সশ্রদ্ধ অনুরাগ কোনো আচ্ছন্নতার ফল নয়, চমৎকার যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা। হয়তো বিষ্ণুবাবুর মতো আধুনিকমনা সমজদারের পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মহত্ত্ব নির্দেশ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং যামিনী রায়ের ছবি— একেবারে বিপরীত। তৎসত্ত্বেও সমালোচকের নিরাসক্ত মূল্যনির্ধারণ-কুশলতায় দুইই সমান প্রশস্তি পেয়েছে।

ভবতোষ দত্ত

অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য। শ্রীঅরুণকুমার মিত্র। নাভানা, কলকাতা ১৩। মূল্য ২৫·০০ টাকা।

এক সময় বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত অধিকাংশ আলোচনাই ছিল ধর্ম-সমাজ-ভাষা-পুরাতত্ত্ব বিষয়ক। সম্ভবত তার প্রতিক্রিয়ায় এ যুগের আলোচনার প্রধান বিষয় সাহিত্য-বিচার। সাহিত্য-সমালোচনায় এখন যাঁরা সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন না তাঁরা 'রসবিমুখ' বলে অনেকের কাছে ধিকৃত হয়ে থাকেন। এমন কথাও শোনা গেছে যে সাহিত্যের ইতিহাসও 'সাহিত্য' না হলে যথার্থ হল না। সাহিত্যকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি, বনস্পতির পত্র-পুষ্পের শ্রীসুষমাও যেমন অগ্রাহ্য করবার নয় তেমনি যে-ভূমির রসে এবং যে-আকাশের জলে বনস্পতির পুষ্টি সেই ভূমি এবং আকাশের সংবাদও উপেক্ষণীয় নয়। অথচ সাহিত্যের এই নেপথ্যলোক সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা 'রস-বিলাসী' সমালোচকদের বিচারে 'অরসিক'। সেই কারণে এ-যুগের বাংলা-সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনাগুলি একদেশদর্শী। 'রস-বিলাসী'দের ধিক্কার এবং অবজ্ঞা অগ্রাহ্য করে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের নেপথ্যলোক উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত আছেন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মিত্র সেই সংখ্যালঘুদের একজন। তিনি ঘরে বসে বই পড়ে একখানি মনোজ্ঞ সমালোচনা-পুস্তক লেখেন নি। তিনি অশেষ পরিশ্রমে এবং দীর্ঘকালের অনুসন্ধানে অমৃতলাল বসুর জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। অরুণকুমার

মিত্রের এই বইখানি তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস। সম্ভাব্য পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ভিন্ন অন্য পাঠকদের পক্ষে বইখানি একটু গুরুপাক হতে পারে।

এই বইখানি অসাধারণ। অনেক কারণে অসাধারণ। তথ্যের সংগ্রহে এবং বিন্যাসে, যুক্তির পারিপাট্যে, ভাষার পরিচ্ছন্নতায়, বুদ্ধির উজ্জ্বলতায়। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছিলেন, সংগৃহীত তথ্যের কিছু ফেলা যাবে কিছু কাজে লাগবে। সব তথ্যই যদি ব্যবহারে লেগে যায় তা হলে বুঝতে হবে তথ্যসংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। অরুণকুমার মিত্র তাঁর বইএর মলাটের এদিকে-ওদিকে, পরিশিষ্টে, পাদটীকায় এত দুর্লভ তথ্যসম্ভার ছড়িয়ে রেখেছেন যে বুঝতে পারি সংগৃহীত তথ্যের সবটাই তাঁর ইতিহাসে লাগে নি। তাঁর তথ্যের ভাণ্ডার বিপুল বলেই তিনি কল্পনা দিয়ে ইতিহাসের ফাঁক পূরণ করেন নি এবং অপরীক্ষিত তথ্যকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। প্রচুর তথ্যের সমাবেশে ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেক সময় লেখক দিশাহারা হয়ে পড়েন। লেখকের মনটি তথ্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে। এই বইতে তথ্যের বিপুল সমাবেশ সত্ত্বেও লেখকের মন এবং তাঁর অনুসন্ধানের প্রধান সূত্রটি কোথাও আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। বর্তমান কালের দৃষ্টিতে অতীত কালের সত্য যতটুকু প্রতিভাত হতে পারে তা হয়েছে অরুণকুমার মিত্রের এই বইতে।

জীবনী এবং সাহিত্য এই দুটি অংশে বইখানি বিভক্ত। দুটি অংশেই লেখকের গবেষণা-পদ্ধতি এক। তিনি এক অংশে ইতিহাস, আর-এক অংশে সাহিত্য-সমালোচনা করে বইএর চাহিদা বাড়াবার চেষ্টা করেন নি। অমৃতলালের জীবন এবং সাহিত্য দুই-ই তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। জীবনী অংশে তিনি অমৃতলালের 'বিভিন্নমুখী প্রতিভা' এবং 'বিচিত্র ব্যক্তিত্বে'র পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই পরিচয়ের অতি সামান্য অংশই এতদিন সাধারণের জানা ছিল। সাহিত্য অংশে লেখক অমৃতলালের সাহিত্য-সৃষ্টির সমগ্র ইতিহাস উদ্ধার করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে দিয়েছেন বাংলা-রঙ্গালয়-অভিনয়-অভিনেতাদের সম্পর্কে বহু দুর্লভ তথ্য। বইখানিকে বাংলা রঙ্গালয় এবং বাংলা অভিনয়ের ইতিহাসের একটি অধ্যায় রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। অরুণকুমার মিত্র একটি অধ্যায় যোজনা করেছেন। এই পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নট ও নাট্যকারদের জীবনী ও ইতিহাস লেখা হলে বাংলা নাটকের, রঙ্গালয়ের এবং অভিনয়ের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভব। এবং তখনই Sir Edmund Chambers ইংরেজিতে যা করেছেন তা বাংলাতেও সম্ভব হতে পারবে। গবেষণা দেখে সে-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে হয় না।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ। শ্রীতারকনাথ ঘোষ। আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা ১২। মূল্য ১২·০০ টাকা।

বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য। শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। মূল্য ২০·০০ টাকা।

রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলাসাহিত্যে যখন পালাবদলের তাগিদ এসে পৌঁছেছে অথচ সঠিক পথের হদিশ এসে পৌঁছয় নি, ঠিক তেমন সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটল।

সাহিত্যে রীতিবদলের পরিবর্তে রীতিভাঙার ঝোঁকে পাওয়া সেই যুগে, যখন বিদেশী হালহরফে হাত-মকসোও চলছিল পাশাপাশি, বিভূতিভূষণ তেমন সময়েই খাঁটি বাঙালী মৃৎশিল্প এনে হাজির করলেন যেন। ধাতব আভিজাত্য কি চাকচিক্য ছিল না তাঁর গল্পউপন্যাসে, ছিল না টেকনিক্যাল বাহাদুরী কিংবা মাথাখাটানো ভাষার মারপ্যাচ। অত্যন্ত কাছের জগতে, দৈনন্দিন তুচ্ছতার জগতে যে সরল-সত্য, যে স্বপ্নের রূপকথা চাপা পড়েছিল—দেশকাল মৃত্তিকার স্তরে স্তরে অলক্ষিত যে চিরন্তনতা, মুখচোরা দারিদ্র্যের অশ্রুবিন্দুতে যে সিন্ধুর মন্দ্রস্বর এবং মত্তস্বাদ, বৃক্ষলতাগুল্মের নিভৃত রসধারার মধ্যে যে প্রাণপরম্পরাগত নাড়ীর টান, ক্ষণকালের নিকষে যে চিরকালের মহাস্বাক্ষর, বিভূতিভূষণের ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞ রচনাবলীর মধ্যে তারই তান বিস্তার ঘটল। ভিতরে বাইরে ক্ষতবিক্ষত প্রথম-বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষ তৎক্ষণাৎ সেই বিশল্যকরণীকে চিনতে পারল। পথের পাঁচালীর লেখক রাতারাতি বাংলাদেশ জয় করে নিলেন। শরৎচন্দ্র ছাড়া এরকম নাটকীয় আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা আর-কোনো লেখকের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত ঘটে নি। এমন অন্তরঙ্গ আবেগধর্মী হার্দ্য ঝোঁক, এমন অব্যর্থ অন্তর্বেদন এবং ছন্দস্পন্দনে অলিখিত কবিত্ব শরৎচন্দ্র ছাড়া আর-কারো ভাষায় দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত বয়স্ক রূপকথার প্রথম এবং শেষ স্রষ্টা।

একদা বিভূতিভূষণ অপরিসীম খ্যাতি পেলেও সাহিত্যের দ্রুত তাণ্ডবে তিনি শীঘ্রই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন, আধুনিক সাহিত্যের প্রাত্যহিক আলোচনার আড়ালে চলে যাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। পথের পাঁচালী-আরণ্যকের অভাবিত চমকও স্তিমিত হয়ে আসছিল অন্য রচনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে। এর অনেকগুলি কারণ ছিল বলে মনে হয়। বাংলাসাহিত্যে এই সময় অতি তরুণ বুদ্ধিজীবী লেখকেরা এগিয়ে এসেছেন এবং গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্য-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। তৎসহ সাহিত্যে নানাবিধ উত্তেজক পরিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা থেকে দূরে থাকায় নির্দল-স্বভাব বিভূতিভূষণ রাজধানীবাংলার বিশাল জীবনপ্রবাহ থেকে ক্রমশ নির্বাসিত হয়ে যাচ্ছিলেন। বিভূতিবাবুর অনুগামী দল ছিল না, ব্যবসায়ী-বুদ্ধিরও যথেষ্ট অভাব থাকায় তিনি নিজে এবং তাঁর সাহিত্য প্রয়োজনীয় প্রচারের সুযোগ নিতে পারে নি। উপরন্তু, কোনোরকম রাজনৈতিক লেবেল ছিল না তাঁর কলমে। নতুন কালের সঙ্গে মোকাবিলার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। অল্পে সন্তুষ্ট এবং স্মৃতিতৃপ্ত এই মানুষটি সংসার এবং পরলোকতত্ত্বের মধ্যেই গুটিয়ে নিচ্ছিলেন সকলের অলক্ষ্যে। শেষ কারণটি রচনারীতিগত। একতারার মতো তাঁর সাহিত্যে আর যেন সুর বদল হল না, তিনি সেই গতানুগত আদি-জীবনের ধারাটিকেই বহন করে নিয়ে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। অথচ পাশাপাশি ততদিনে বাংলাসাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এগিয়ে গিয়েছে অনেকদূর, তার ভূগোল ইতিহাস দৈর্ঘ-প্রস্থ মাটি ও মানুষ প্রসারিত হয়েছে অনেকদূর। বিষয় ও স্থানান্তর গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রফল দিয়েছে বদলে। সৃজনশীল রচনার মধ্যে সাংবাদিকতা মিশে তথ্যরস যোগান দিয়েছে। বস্তুবাদী জীবনমুখিনতা নানা স্তরের ও জীবিকার বিচিত্র জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবনে, বহুমুখী বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে তুলে ধরে বাঙালী পাঠককে ক্রমশ নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে চলছিল। তাই বিভূতিভূষণের জীবিতকালে তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণ্য এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, তাঁর রচনাবলী বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা গ্রন্থিত হয় নি। মৃত্যুর পরেও প্রায় বিশ বছর অতিক্রান্ত হল বিভূতি-বিষয়ে পুনর্বিবেচনা এবং প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটতে।

বিভূতিভূষণের জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে রচিত দুখানি বৃহৎ আলোচনা-গ্রন্থ হাতে পেয়ে আজ মনে হচ্ছে এ একহিসেবে ভালোই হয়েছে। যুগের হুজুগ কেটে গিয়েছে, যে চাকচিক্য ও ঠাটঠমকে বাঙালীর কলম ও মন আটক হয়ে ছিল তা প্রায় আলেয়া-মরীচিকার আলোছায়ার মতোই মিলিয়ে গিয়েছে। এখন উচ্ছ্বাস-আবেগের আতিশয্যকর বাষ্প অন্তর্হিত। এই যথার্থ সময়, মহাকাল যাঁকে প্রাথমিক মনোনয়নে স্বীকার করে গিয়েছে তাঁকে যাচাই করে দেখার এই যোগ্য অবকাশ।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ লিখিত 'জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ' গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই একটা ভাবাবেগ এবং কবিত্বময় ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিভূতিভূষণের আত্মীয়-পরিজনের কাছের মানুষ, নয়তো বিভূতিসাহিত্যের তিনি দীর্ঘ অনুরাগী মানুষ। এবং এই গ্রন্থটিই এই পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ, প্রচলিত বিদ্যায়তনিক বা শিল্পবৈয়াকরণিক ছাঁদের কিছুটা বাইরের রচনা। স্বাধীনভাবে অনুভব এবং নীরব আস্বাদনের প্রচেষ্টা কিছুদূর পর্যন্ত সফল হয়েছে তাঁর গ্রন্থে। ছোট ছোট পরিচ্ছেদ-উপপরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বক্তব্যগুলিকে তিনি সুবিন্যস্ত করেছেন। প্রথমে বিভূতিভূষণের সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী এবং তার পরে তাঁর জীবনদৃষ্টি প্রকৃতিচেতনা মানবচেতনা জীবনজিজ্ঞাসা ও সবশেষে তাঁর সৃষ্টি অর্থাৎ উপন্যাস-ছোটগল্প-দিনলিপির নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। লেখকের ভাষা ও বিশ্লেষণ ভঙ্গি সাবলীল গতিসম্পন্ন এবং রম্য।

এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদ এবং তার উপবিভাগগুলি শিরোনামানুযায়ী লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন একটু বেশি রকম ছক ফাঁদা হয়েছিল, প্রবন্ধকারের মনে আরও একটু বিস্তারিত এবং গভীর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু স্বল্পকালমধ্যে গ্রন্থ সমাপ্ত করার দ্রুততায় শেষপর্যন্ত সে ভাবনার অনেক কিছুই কার্যে পরিণত হতে পারে নি। তাই উপবিভাগগুলির কোনো-কোনোটি একই আলোচ্য বিষয়ের পুনরুক্তি ও পুনর্নামকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত তারা, অর্থাৎ তাদের কোনো-কোনোটি, পরিচ্ছেদ হয়ে ওঠে নি, অনুচ্ছেদেই সীমিত আছে। স্বতন্ত্র নামাঙ্কিত হয়ে পাঠককে খানিকটা ধাঁধা লাগায়, গ্রন্থটিকে আপাতদৃষ্টিতে ঈষৎ জটিল দেখায়। অবশ্য এ কথা বলছি না যে, প্রবন্ধকার ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করেছেন; গ্রন্থটি দ্রুত রচিত হয়েছে, খুব কিছু ঘষামাজা বর্ধন-বর্জনের অবকাশ ঘটে নি, এই আমার ধারণা। শেষার্ধে বইটির মধ্যে বিদ্যায়তনিক ছাঁদটিই থেকে থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত, অনেক সময়ই বহিঃরৈখিক মানচিত্র অঙ্কনের মতো, যেন তার আয়তন দেখতে পাই, কিন্তু ভূ-প্রকৃতির, লোকবিন্যাসের পরিচয় পাই না। গল্প-উপন্যাস বিষয়ে নবমূল্যায়ন নেই বললেই চলে, নানামুখী আলোচনার বিস্তার ঘটে নি। ওই সামান্য সমালোচনায় যেন কৌতূহলীর মন ভরে না। যেমন দিনলিপি বিষয়ে, শিশুসাহিত্য বিষয়ে লেখক প্রায় ছুঁয়েই গিয়েছেন, বলতে গেলে কিছুই বলেন নি। অথচ তারকবাবুর কাছে আমরা অনেক-কিছু আশা করেছিলাম, আর-একটু সময় এবং মনোযোগ দিলেই তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারতেন। বিভূতিভূষণের জীবনী-অংশ সম্বন্ধেও আমাদের একই কথা। দ্বিতীয় বক্তব্য তাঁর ব্যবহৃত দীর্ঘ উদ্ধৃতি-বাহুল্য সম্পর্কে। প্রবন্ধকার যেন স্বমতের বদলে জনমতকে স্থান দিয়েছেন আগাগোড়া।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বৃহদায়তন গ্রন্থ, 'বিভূতিভূষণ: জীবন ও সাহিত্য'র মধ্যে একটি নতুন

কাজ অন্তত করেছেন। তিনি বিভূতিভূষণের জীবনের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্যের ইতিহাস যেন জোড়-কলমে লিখে গেছেন। ইতিপূর্বে অনেকেরই মনে হয়েছিল, বিভূতিবাবুর জীবন নিয়ে আতিশয্য করার প্রয়োজন নেই, তাঁর সাহিত্যই মুখ্য আলোচনীয় বিষয়। সাহিত্যের মধ্যেই লেখকের জীবনের অভিপ্রকাশ এ কথা কে না জানে। বিশেষত, বিভূতিবাবুর মতো নির্জন লেখকের, যিনি ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাতে চান নি, কাহিনীর চটকে মানুষকে মোহিত করেন নি। অনেকেরই ধারণা ছিল, বিভূতিভূষণের জীবন যেহেতু গতানুগতিক, অতি মধ্যবিত্ত আবেষ্টনের মধ্যে স্তিমিতধারা; ঘটনাসংঘাতের অভাব এবং বৈচিত্র্যহীনতা তাকে নাট্যগুণান্বিত করে তোলে নি, সেহেতু তাঁর জীবনচিত্রণের চেষ্টা অনাবশ্যক। কিন্তু কেবল সাহিত্যই যে লেখকের জীবন নয়, লেখকের জীবনও যে রূপান্তরে সাহিত্য, এবং অনেক সময়েই জীবনধারা সাহিত্য-প্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে চলে, সেই গঙ্গাযমুনার পারস্পরিক তাৎপর্য শিল্পেতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়— এ কথা সুনীলবাবুর বইটি পড়তে পড়তে দ্বিতীয় বার মনে হল। সুনীলবাবু বিভূতিভূষণের পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র রচনা করেছেন, তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করে, দিনের পর দিনকে ঘটনাসূত্রে গেঁথে। তিনি লেখক মানুষ বিভূতিভূষণের জীবনের পূর্ণাবয়ব কাঠামোটিকে একমেটে দোমেটে দিয়ে ভরিয়ে অবশেষে তেলরঙের সমাপ্তিপ্রলেপে জীবন্ত করে তুলেছেন। যে তথ্যপঞ্জী, যে ঘটনাপরম্পরা তিনি এই ব্যাপারে ব্যবহার করেছেন তার প্রামাণিকতা অবশ্য সর্বত্র যাচাই করা হয় নি, অনেক বৃত্তান্তই হয়তো অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে হলেও শ্রুতিলব্ধ এবং অনেকখানিই বিভূতিবাবুর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লিপি-দিনলিপি-স্মৃতিলিপির খণ্ডাংশ দিয়ে অনুক্তিপূরণ, কিংবা সাধ্যমত লেখকের অনুমান-কল্পনার আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি— তবু সাহিত্য-জীবনের এই জবানবন্দী প্রায় নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ গবেষকের কাছে এটি প্রায় আকর বা অঙ্গীগ্রন্থের মতোই অনুচিন্তার উপাদান জোগাবে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের যে এত মিল এ কথা দিন মাস বছর মিলিয়ে, জীবন-যাপনের চালচিত্র লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। তাঁর সাহিত্য এতই মাটির কাছাকাছির, তাঁর রচিত নরনারী এতই অন্তরঙ্গ আঙিনার মানুষ, তাঁর অঙ্কিত প্রকৃতি এতই নিকটদৃষ্ট ব্যাপার যে তাঁর ব্যাকুল উদাস জীবনের মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব মিশে রয়েছে। বিভূতিসাহিত্যে সাধারণের মধ্যে অসাধারণের লুকোচুরি, ক্ষুদ্রের মধ্যে অসীমের স্ফুলিবৃত্তি বুঝতে হলে লেখকজীবনের অভিজ্ঞানেরও বুঝি প্রয়োজন ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধানত দুটি বিভাগ। প্রথমাংশে তাঁর জীবন। জীবনের এই ইতিহাসে ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে রচনাবলীর উল্লেখও আছে। দ্বিতীয়াংশে সাহিত্য। তাঁর গল্প-উপন্যাস-দিনলিপির আলোচনার সঙ্গেসঙ্গে উৎস-প্রসঙ্গ-পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সমাবেশ করা হয়েছে। এই তথ্যও পূর্বরীতিতে সংগৃহীত, অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি ও অপরাপর গ্রন্থ থেকে আহৃত। ফলে একই ঘটনার পুনরুক্তি একাধিক জায়গায় ঘটেছে, একই ভাষার ব্যবহারও কোথাও কোথাও।

এই গ্রন্থে বিভূতি-চরিত্রের সামগ্রিকতা এবং সম্পূর্ণতা ফুটে উঠলেও গ্রন্থকর্তার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক মূল্যায়ন-বিশ্লেষণের নিদর্শন নেই। এমনকি ভাষাও স্বকীয়তা ত্যাগ করে যেন সদৃশ হয়ে উঠতে সচেষ্ট। সংগৃহীতাংশের বহুল হুবহু ব্যবহারই এর জন্য দায়ী। একজন পরিশ্রমী সংকলয়িতা ও সম্পাদকই এই গ্রন্থে ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল রচয়িতা সক্রিয় নন। বিশেষ করে গ্রন্থপরিশিষ্টে অন্য কয়েকজন লেখকের

বিভূতিসাহিত্য-প্রসঙ্গে দীর্ঘরচনা পুনর্মুদ্রিত করা কি এই জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য ব্যাপার? তবে সুদীর্ঘ গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জীটি এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতিপরিচয় পর্যায়ে বিভূতিসাহিত্যে ব্যবহৃত ফুললতা-পাতা-গাছের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানসম্মত নাম সংগ্রহ করে, ও অচলিত আঞ্চলিক শব্দাবলীর অর্থনির্দেশ করে যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান কাজ এগিয়ে রাখা হয়েছে সে-বিষয়ে কেউই অন্ততঃ দ্বিমত পোষণ করবেন না।

জীবনেতিহাস ও জীবনীউপন্যাসের মধ্যস্থ রচনার আদি স্তরে যদিও গ্রন্থটি বর্তমান তবু উপন্যাসসুলভ দ্রুতপাঠ্য হয়ে উঠেছে আগাগোড়া রচনাটি। পরবর্তী গবেষক ও লেখকজনের হাতে এর রূপান্তর ঘটবে, অন্য পরিণতি সফল হবে— বিভূতিভূষণ সম্পর্কে অনবদ্য, ক্রটিহীন গ্রন্থ রচিত হবে, নতুন ভাষ্য ও মূল্যায়ন সংযোজিত হবে, আশা করা যায়।

আনন্দ বাগচী

বিআংকার রাজা। তরু দত্ত। অনুবাদ ও সম্পাদনা: পল্লব সেনগুপ্ত। সুবর্ণরেখা, কলিকাতা ৯। মূল্য ৩.০০ টাকা।

'বিআংকার রাজা' তরু দত্তের সর্বশেষ রচনা। মূল রচনা ইংরেজিতে।

তরু দত্তের মৃত্যুর পর ১৮৭৮ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় শতাধিক বৎসর পর উপন্যাসটি বাংলায় অনূদিত হওয়ায় অনুবাদক নিঃসন্দেহে প্রশংসা দাবী করতে পারেন। বইখানির নাতিদীর্ঘ সম্পাদকীয় তথ্যপূর্ণ, তরু দত্ত সম্পর্কে পাঠকমনে নতুন করে কৌতূহল জাগাবে। একুশ বছর বয়সে প্রতিভাময়ী নারীটির অকালমৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ইংরেজিতে ও ফরাসীতে সাহিত্যচর্চা করেছেন।

উপন্যাসের অনুবাদ বাহুল্যবর্জিত প্রাঞ্জল এবং স্বচ্ছ। অনুবাদ কোথাও আড়ষ্ট না হওয়ায় উপন্যাসটি মূল ইংরেজির মতোই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে। চরিত্রচিত্রণ মনোজ্ঞ। বিআংকা এবং কলিনের চরিত্র রোমান্টিকধর্মী। গার্সিআ ভিক্টোরীয় যুগের প্রতীক।

'বিআংকার রাজা' নিবিড় বিষাদ ভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি। কাহিনীর সঙ্গে তরুর আত্মজীবনের সুর মিলে যায়। উপন্যাসটি তরুর জীবনের প্রেমের ব্যর্থতার ইঙ্গিতবাহী কি না তা জানার কোনো উপায় নেই। কাহিনীর বৃদ্ধ পিতা গার্সিআ একজন স্পেনীয় কবি। তরুর পিতা ছিলেন কবি গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। বিআংকার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইনেজের শবযাত্রার পটভূমিকায় উপন্যাসের শুরু। (তরুর দিদি অরুর মৃত্যু স্মরণীয়)। ইনেজের মৃত্যু হল; কিছুদিন পর তার প্রেমাস্পদ বিআংকা-কে বিয়ে করতে চায়। বিআংকা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তাদের গ্রামের জমিদারবাড়ির লেডী মূরের পুত্র কলিনের প্রথম দর্শনে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কলিনের কাছে, 'বিআংকা একটু দুরন্ত, অথচ কেমন গর্বিত ভাব। কত সরল ও। ওর ওই গর্বিত ভাবটুকু কত স্বাভাবিক।' কলিন বিআংকাকে চুম্বন করল। একটি ছোট চুম্বন। বিআংকার মনে বিস্ময়কর অনুভূতি জাগল। বাবাকে সব কথা বলল। গার্সিআ নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ মনে করেন, তাঁর শেষ অবলম্বন এই মেয়েটির বিয়েতে মত দিতে পারলেন না।

বাবাকে বিআংকা খুব ভালোবাসে, সে স্থির করল বিয়ে করবে না। তবে কলিনের সঙ্গে বিচ্ছেদচিন্তা তাকে শয্যা নিতে বাধ্য করল। মৃত্যু হয়-হয়; দীর্ঘরোগভোগের পর বেঁচে গেল। অনুতপ্ত পিতা ভুল বুঝলেন। কলিনের সাথে বিআংকার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হল। দুজনে ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল। ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লড়তে যাবার ডাক পড়ল কলিনের উপর। শেষ বিদায় ঘনিয়ে এল। বিআংকার আদরের 'রাজা' বিদায় নিতে এসেছে। কলিন একটি আংটি ওর অনামিকায় পরিয়ে দেয়। বিআংকার 'রাজা' আর কোনোদিন ফেরে নি।

রবিতীর্থ। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। নলেজ হোম, কলিকাতা ৬। মূল্য ১০.০০ টাকা।

বইটির পরিচয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখিত ভূমিকা থেকে পাওয়া যাবে। রবিতীর্থ গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড রবীন্দ্রজীবনালেখ্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৫ এবং দ্বিতীয় খণ্ড রবিতীর্থ পরিক্রমা ১৩৮ পৃষ্ঠা। সব শুদ্ধ জড়িয়ে গ্রন্থখানির পরিকল্পনা কিছু বিচিত্র। রবীন্দ্রজীবনালেখ্য রবীন্দ্রনাথের একটি ধারাবাহিক জীবনী ও সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আছে। রবিতীর্থ পরিক্রমা বিভিন্ন তথ্যের সংকলন এক জাতীয় কোষগ্রন্থ বলা যায়।

লেখকের বক্তব্য, আলোচনা বা সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠক অপরিচিত নন। তবে হাতের কাছে সেগুলি একত্রে পাওয়া নিশ্চয়ই সৌভাগ্য। বইটি পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-কোষ নয়, তাই যা চাই তা পাওয়া না গেলেও লেখকের প্রচেষ্টা ও তথ্যসম্ভার পরিবেশন অভিনন্দন পাবার যোগ্য। লেখক বিশাল শ্রমসাধ্য কঠিন দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

লেখক কবির সঙ্গে শিলাইদহে ছিলেন, সেখানকার অনেক বিচিত্র এবং অজ্ঞাত ঘটনার বিবরণ পাঠকের জন্য উপস্থাপিত করেছেন।

বইটির কয়েকটি পরিচ্ছেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রপরিকরে রবীন্দ্র-সুহৃৎদের এক তালিকা দেওয়া হয়েছে। কবির বন্ধুরা কবির জীবনে ছিলেন অনেকটা ঋতুফুলের মতো। অসামান্য প্রতিভার যৌবন-দীপ্ত মনের সঙ্গে তাল রেখে চলা বন্ধুদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রগ্রন্থ-উৎসর্গ পঙ্ক্তিকাটি আকর্ষণীয়। যাঁদের নামে উৎসর্গিত হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁদের সঙ্গে কবির সম্পর্ক এবং এই উৎসর্গের পিছনে যদি কোনো কারণ থাকে তা উল্লিখিত হলে এই অংশটি আরো আকর্ষণীয় হতে পারত। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রচারের নমুনাটি অতিমাত্রায় আকর্ষণীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়েছে। নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে (১৩০৮) পাই, 'শিক্ষিত নরনারীর চির আদরের, সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, অধুনা বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন লিখিত কাব্যগ্রন্থ।...কবির ভাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব, আমাদের সবিনয় অনুরোধ,—একবার পাঠ করুন।' 'নামকরণে রবীন্দ্রনাথ' অনুচ্ছেদটিও ভালো লাগবার মতো। উৎসব অনুষ্ঠান সংঘ প্রতিষ্ঠান ছেলেমেয়েদের নামকরণের উল্লেখ লেখক করেছেন।

'স্বাক্ষর-পুস্তকে (autograph) রবীন্দ্র মন্তব্য' প্রসঙ্গে লেখক কবির কয়েকটি মত কৌতুহলী পাঠকদের সুমুখে তুলে দিয়ে ভালো করেছেন :

প্র. সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে ?

উ. সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কেহ নাই।

প্র. সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

উ. জনগণ।

প্র. পুরুষের সবচেয়ে বড় গুণ কি ?

উ. সত্যের প্রতি প্রেম।

প্র. স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় গুণ কি ?

উ. জীবে প্রেম।

পরিশেষে বলা যায়, বইটির ভাষা সাবলীল প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। বেশ কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকে গেছে। সহজ সরল ভঙ্গীতে লেখক অনেক কিছুই ব্যক্ত করেছেন এবং আশা করা যায় রবীন্দ্র-রসিকের নিকট বইটি সমাদৃত হবে।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার। মিহিরকুমার দাশ। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। মূল্য ১০.০০ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটকের ইতিহাসে দুটি উজ্জ্বল নাম দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। দীনবন্ধু মাত্র ৪৩ বছর জীবিত ছিলেন— তাঁর নাট্যকৃতির সংখ্যা সীমিত। গিরিশচন্দ্র সেই অনুপাতে দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত তাঁর নাট্যকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর রচনা অজস্র। গিরিশচন্দ্রের নাটক আজও অভিনীত হয়, বিশেষ করে তাঁর 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' ও 'সিরাজ-উদ্দৌলা'। কিন্তু দীনবন্ধুর নাটক আর অভিনীত হয় না বললেই চলে। 'সধবার একাদশী' কালেভদ্রে অভিনীত হলেও 'নীলদর্পণ' আর অভিনীত হয় না। দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই এখন অধ্যাপক ও ছাত্রদের রিসার্চের বস্তু। সুতরাং এ যুগে দীনবন্ধু সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে লেখক সুধীজনের প্রশংসার্হ হয়েছেন।

এই গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভারও বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিশেষ করে দ্বাদশ কবিতা ও সুরধুনী কাব্যের বিশদ আলোচনা করে লেখক বাঙলা-সাহিত্য-ইতিহাসে একটি চিত্তাকর্ষক নূতন সংযোজন করেছেন।

দীনবন্ধুর কবিসত্তার আলোচনায় লেখক মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। দীনবন্ধুর প্রথম-জীবনের কবিতার একমাত্র সার্থকতা এই যে "দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক নাটকে আত্ম-প্রকাশ করেছে, তারই সূচনা যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত।" আর 'দ্বাদশ কবিতা'ও মূলতঃ "তাঁর নাট্যসাহিত্যের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে।" অবশ্য লেখক এ ক্ষেত্রে এগুলির স্বাধীন মূল্যেরও কথা বলেছেন। তিনি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন একটি মহৎ বেদনার প্রকাশ। বিশেষ করে 'প্রবাসীর বিলাপ' ও 'বন্ধুবিদায়' নিঃসন্দেহে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। লেখক "কমিতে কমিতে তরি

পানকৌড়ি প্রায় ভাসে নদী-অঙ্গে দেখা যায় কি না যায়" সম্বন্ধে একটু বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয়। ছবিটি সুন্দর, কিন্তু 'সমগ্র বাংলা কাব্যের সম্পদ' বললে একটু বেশি বলা হয়।

লেখক 'সুরধুনী কাব্য'কে বলেছেন 'যেন এক অলিখিত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'। এ মতটি গ্রহণ-যোগ্য বলে মনে হয় না। এটিকে গঙ্গামাহাত্ম্য বলা যেতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যের দার্ঢ্য বা মহিমা এ কাব্যে নেই।

দীনবন্ধুর গদ্যরচনার আলোচনায় লেখক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। বিশেষ করে 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষে'র আলোচনাটি সার্থক হয়েছে। লেখকের মতে এটিকে বাংলা ভাষার প্রথম ছোটগল্পের স্থান দেওয়া উচিত। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত। শুধু তাই নয়, পরশুরাম পরবর্তীকালে লঘু-গুরু রীতিতে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন সেই রীতি এই গল্পটিতে অতি নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

নাট্য-আলোচনায় লেখক প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। নীলদর্পণ নাটকের পটভূমিকা, দীনবন্ধু-পূর্ব লঘুনাটক, দীনবন্ধু ও বিদেশী নাটক— এইসব অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। লেখকের মতে দীনবন্ধুকে ঈশ্বর গুপ্তের মতো খাঁটি বাঙালি লেখক না বলে বঙ্কিমচন্দ্র বা মাইকেলের মতো বিদেশী ভাবধারায় পুষ্ট লেখক বলা উচিত। 'সধবার একাদশী' পড়লে সে বিষয়ে মতবিরোধ থাকে না, কিন্তু সেইজন্যই কি তিনি সংস্কৃত হাস্যরসপ্রধান ও অন্যান্য নাটকের আলোচনায় বিরত হয়েছেন?

নীলদর্পণ নাটকের ট্র্যাজিক মূল্যও তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিচার করেন নি। কাহিনীর শোকাবহ পরিণতি সাধারণত দু কারণে হতে পারে— এক, নায়কের চরিত্রের মধ্যে নিহিত কোনো দুর্বলতা; দ্বিতীয়ত, প্রতিকূল ভাগ্য বা নিয়তির রোষ। নীলদর্পণ নাটকে এ দুয়ের কোনোটাই নেই। বসু-পরিবার ও নীলচাষীরা নীলকরদের অত্যাচারে অত্যাচারিত। এ নাটকটির রস তাই ঐতিহাসিক। চরিত্রগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে নাট্যরস ফুটে ওঠে তা এখানে অনুপস্থিত। সেইজন্য এ নাটকে তৎকালীন শোষণের চিত্র প্রচারধর্মী তীব্রতা যতটা পেয়েছে, নাটকীয় সংঘাতজনিত পরিবর্তনের তীব্রতা ততটা পায় নি। এ নাটকে ভদ্রলোকের ভাষা যে কতখানি আড়ষ্ট ও কৃত্রিম তাও লেখক পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করেন নি। দীনবন্ধুর কবিতার ভাষা সম্বন্ধে লেখক যে মন্তব্য করেছেন (পৃ ১৮৭) তার সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। তিনি যে পঙ্‌ক্তিগুলো উদ্ধৃত করেছেন ('যে চারুহাসিনী' ইত্যাদি) সেগুলো পড়লে চমৎকৃত হতে হয়।

'সধবার একাদশী' নাটক সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে এই নাটকের কাহিনী শিথিল। সেটা নাটক হিসেবে নিশ্চয়ই দোষের। কিন্তু লেখক সাফাইস্বরূপ বলছেন যে "সব নাটকের কাহিনীতে যে গল্প থাকতেই হবে এমন কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই। এবং গল্পবিহীন নাটক নূতনত্বের দাবী করতেও পারে।" শুনতে চমকপ্রদ, কিন্তু যুক্তিসহ নয়। বর্তমানে বি-নাটকের রেওয়াজ হয়েছে। 'সধবার একাদশী'কে নিশ্চয়ই সে পর্যায়ে ফেলা চলবে না।

শ্রীযুক্ত দাশের সঙ্গে এইরমক দু-এক ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর আলোচনা আমাদের ভালো লেগেছে। দীনবন্ধু নাটকে ছড়ার ব্যবহার, দীনবন্দু ও বিদেশী নাটক ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ।

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

আধুনিক বিশ্বনাট্যপ্রতিভা। শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতি প্রকাশন। কলিকাতা ১। মূল্য ১০.০০ টাকা।

নাট্যজগতে একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন বিশ-পঁচিশ বছর পর পর আবর্তিত হয়ে উঠে আবার মিলেয়ে যায়। আমাদের জীবনের অনেক মৌল সমস্যার মতো নাট্যজগতের এই মৌল প্রশ্নটির বেলায়ও এক পুরুষের রায় উত্তরপুরুষের গ্রাহ্য হয় না। নাট্যন্যায়ের এই কচকচিটা হল নাট্যকারের জন্যই নাট্যাভিনেতা, না, অভিনেতার জন্যই নাট্যকার। অনেকে বলেন যে নাট্যকার কেবল একটা কাঠামো জোগায়— গল্পের বা আইডিয়ার কাঠামো, আর দেয় সংলাপ; আলোকশিল্পী ও মঞ্চকুশলী তাতে দেয় একটা ত্রৈমাত্রিক রূপ, স্থপতি যেমন দেয় তার শিল্পভাবনাকে; কিন্তু কণ্ঠস্বর ও গতি দিয়ে অভিনেতা সঞ্চার করে প্রাণ। এই দিক দিয়ে দেখলে সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ, যথা উপন্যাস গল্প কবিতা, যেমন লেখকের একক সৃষ্টি, নাটক তেমন একক সৃষ্টি নয়। ফলে কেউ কেউ নাটককে সাহিত্যের একটা অঙ্গ হিসাবেই স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের কাছে ভাষার দিকটা যেন বাহুল্য ও নৈমিত্তিক; নাটকের সাহিত্যমূল্যের কিছুমাত্র আবশ্যক নেই, স্ক্রিপ্‌টের যা-কিছু মূল্য হল একটা বক্তব্যকে একটা আইডিয়াকে দর্শকদের মনে পাচার করে দিতে পারায়। এই প্রসঙ্গে বার্নার্ড শ'র উক্তি স্মর্তব্য, 'অনেক আধুনিক নাটক যা মঞ্চাভিনয়ে বিরাট সাফল্য লাভ করেছে তা যে কেবল অপাঠ্য তাই নয়, মঞ্চে অভিনয় না দেখলে পর একেবারে বোধগম্যই হয় না।'

বস্তুতঃ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের কাছে সাধারণতঃ নাট্যকার একান্ত গৌণ, সেখানে অভিনেতাই পুরোধা। চেখভ অভিনেতার সম্বন্ধে বলেছেন high priests of the sacred art। দর্শকসাধারণও ভাবে নাটক হল একটা বাহন যাতে সওয়ার হয়ে অভিনেতা অবতীর্ণ হয় রঙ্গমঞ্চে। সিনেমাতে অবশ্য লেখক আরও এক ধাপ পিছে পড়ে যান; সেখানে কৃতিত্ব অভিনেতার সঙ্গে ভাগ করে নেন চিত্রপরিচালক। আজকালকার ছেলেরা জানে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', বিভূতিভূষণ তাদের মনে অনুপস্থিত। অতএব প্রেক্ষাগৃহে 'নাট্যপ্রতিভা' শব্দটা উচ্চারিত হলে নাট্যামোদীরা তৎক্ষণাৎ নাট্যকারের প্রতিভা বুঝবেন কি না সন্দেহ। সেই কারণেই বিশ্বনাট্যপ্রতিভা বললে বিশ্বের প্রতিভাবান নাট্যকারদের কথাই মাত্র স্মরণ না হতে পারে।

অবশ্য শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বিশ্বনাট্যপ্রতিভা'য় বিশ্বের প্রমুখ নাট্যকারদের কথাই আলোচিত হয়েছে। এবং সুখের কথা এই যে, পরিসরের অনুপাতে আলোচনা অতি সুষ্ঠু সুন্দর দক্ষ হয়েছে। মাত্র ২৭১ পৃষ্ঠায় প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন পাশ্চাত্য নাট্যকার আলোচিত হয়েছেন। শেষে দুইটি নিবন্ধ আছে; একটি দশ পৃষ্ঠার আধুনিক জাপানী নাটক নিয়ে ও অপরটি মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার— বিংশ শতকের চীনা নাটক নিয়ে। অনুমান করি, এই দুইটি নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে বিশ্বের নাট্যালোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের উপরে লিখিত প্রবন্ধটি এই পুস্তকে কেন স্থান পেল বুঝা গেল না। আর যদি স্থান পেলই তবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার নাট্যপ্রতিভা নিয়ে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধটি দীর্ঘ কুড়ি পৃষ্ঠার। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতের প্রতিভূ ধরে নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে সুদীর্ঘ

আলোচনা করলেই গোটা ভারতবর্ষের সমুদয় ভাষার নাট্যপ্রতিভা আলোচিত হল না। বরং কাজটা একদেশদুষ্ট হয়। এশিয়ার (মধ্যপ্রাচ্যসহ) অন্য দেশগুলির নাট্যপ্রতিভা নিয়েও অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আফ্রিকাকেও একেবারে বাদ দিলে চলবে না।

অবশ্য লেখক ভূমিকাতে বলে দিয়েছেন, যাঁরা নাট্যপ্রতিভাগুলোর বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ চাইবেন তাঁদের জন্য এই গ্রন্থ নয়। এতে নাট্যকারদের শিল্পীজীবনের পরিচয়ও স্কেল ছোট ব'লে স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত, শিল্পেতর জীবনের কথা ঠাঁই দেবার প্রশ্নই ওঠে না। জীবন-পরিচয় বাড়িয়ে দিলে বইখানা সাধারণ পাঠকের কাছে অধিকতর আকর্ষণযোগ্য হত। কেননা তাহলে কাহিনী-অংশ ভারী হত। তবে সে ক্ষেত্রে কলেবর অনাবশ্যক স্ফীত হত। অনাবশ্যক বলছি এই কারণে যে, বইটি তো সর্বসাধারণ পাঠকের জন্য নয়। যাঁরা নাট্যরসিক, যাঁদের জ্ঞানস্পৃহা আছে অথচ বিদেশী নাটক বেশি পড়তে পারেন নি তাঁদের শুধু প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া পুস্তকখানার ঘোষিত উদ্দেশ্য। সন্দেহ নেই লেখকের সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। বরং নাট্যকারদের বিস্তৃততর জীবনী দিতে গেলে অন্বিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যাহত হত। কেননা পাঠকের মনের কিছুটা অংশ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ত তাঁদের জীবনকাহিনীতে, আর তুলনায় সেইটুকুই তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের ভাগে কম পড়ত।

Ibsen is not a man but a pen— এই ধরণের কথাগুলোর একটা সুবিধা এই যে, এগুলো শিল্পীসাহিত্যিকদের রক্ষা করে তাঁদের জীবনীলেখকদের হাত থেকে। অলডাস হাক্সলি বলেছিলেন, ডি. এইচ. লরেন্স তো আরো কত কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন, কিন্তু তাঁর নাম কেউ কোনোদিন জানতও না যদি তিনি সাহিত্যশিল্পী না হতেন। বস্তুতঃ প্রতিভাধর শিল্পীর শিল্পীসত্তাই আসল সত্তা। তারও পরিচয় খুঁজতে হবে তাঁর সৃষ্ট শিল্পকৃতীতে। তাই বলেছিলাম, বিশ্বের নাট্যপ্রতিভাদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই শুধু আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সংগতই হয়েছে।

আর, এই পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে জীবনবাবু কৃতকৃত্য হয়েছেন। এই গ্রন্থপাঠে অনেক নাট্যপ্রতিভার সম্বন্ধেই গভীরতর জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হবে এবং যাঁদের অধিক অধ্যয়নের সুযোগ নেই তাঁদেরও হৃদয়ে বিশ্বের প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক নাট্যপ্রতিভার সঠিক রেখাচিত্র মুদ্রিত হয়ে যাবে।

ভূমিকাটি সুলিখিত, সংক্ষিপ্ত। ভূমিকায় বাঙলা নাটকের জন্য লেখক আশা করেছেন 'এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই একদিন সত্যকারে মহৎ নাটকের জন্ম হবে যা মৌলিকতায় হবে অনন্য। শিল্পনৈপুণ্যে রসোত্তীর্ণ এবং বাস্তবনিষ্ঠায় জীবনধর্মী।' তিনি বলেছেন, 'নাটকের ত্রিবিধ শক্তির কথা— অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনেই নাটক, নাটকে জীবনই মুকুরিত এবং মানুষের অধিচেতনা জাগ্রত করাই তার মূল কর্ম— আজ মেনে নেওয়া হয়েছে।'

আসলে বোধ হয় এ বিষয়ে আজ আর কাল নেই। সকল যুগের নাটকই জীবনের প্রয়োজনে রচিত হয়েছে, জীবনই তাতে অধিক্ষিপ্ত হয়েছে; শুধু প্রশ্ন এই: কোন্ জীবন, কার জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। যুগে যুগে প্রয়োজনের সংজ্ঞা বদলে গেছে, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনেই নাটক রচিত হয়েছে সকল সময়ে। এমনকি, লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যখন রাজা-রাজয়োড়া নিয়ে নাটক রচিত হয়েছে তখনও রাজকীয় জীবনের এমন কয়েকটি মোটা মোটা আবেগ বা আদর্শ ওতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যা সমাজের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর বহিরঙ্গ জীবনের নয়, আন্তর জীবনের প্রতিফলন। আন্তর

জীবনের প্রতিফলনকে কি জীবনের প্রতিফলন বলা হবে না? আজকাল জীবন বলতে জীবনের বহিরঙ্গ রূপের (না কুরূপের?) উপর ঝোঁক দেওয়া হয়; অসুন্দর আর বাস্তব এখন সমার্থক। আমাদের জীবনে কোকিল বাস্তব নয়, কাক বাস্তব। নাটকে সেই বহিরঙ্গ বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতিফলন। যেখানে মন নিয়ে কারবার সেখানে মঞ্চ হয়ে দাঁড়ায় মনঃসমীক্ষকের ক্লিনিক।

তা হোক, ক্ষতি নেই। জীবনে এ-ও আছে তো, তবে। জীবনে কেবল এ-ই নেই। আর স্বভাববাদীত্ব কিছু এমন ইবসেনের ঔরসজাত নয়। এ কথা স্বীকার্য যে স্বভাববাদীত্বর পথিকৃৎ হলেন ইবসেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে স্বভাববাদীত্বর শিকড় ইবসেনের অনেক আগে পর্যন্ত প্রসারিত। এলিজাবেথীয় নাটকেও conventionalismএর পাশাপাশি naturalism ছিল। তবে conventionalism ছিল বারো-আনা, naturalism চার-আনা। ইবসেন দিলেন এই অনুপাতটাকে উল্টে, চার-আনা বারো-আনা করে। কিন্তু তিনিও conventionalismকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হেনরিক ইবসেনের প্রথম নাটক— তিন অঙ্কের বিয়োগান্ত কাব্যনাট্য— 'ক্যাটিলিনা' প্রকাশিত হয়েছিল ক্রিস্টিয়ানিয়াতে। আর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বেরুল টি. এস. এলিয়টের মিলনান্ত কাব্যনাট্য 'দি ককটেল পার্টি'। মাঝখানের এই এক শ' বছর ছিল ইউরোপের নাট্য-ইতিহাসে অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এই শতবর্ষের শেষ ষাট বছরে ইবসেনই স্বভাববাদী নাট্যান্দোলনের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করলেন, লিখলেন গদ্যনাটক শহুরে ঘরোয়া ভাষায় মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা নিয়ে। সারা ইউরোপের রঙ্গমঞ্চ এই আন্দোলনে ভেসে গেল; ইংলণ্ড ভাসল না, সেই তরঙ্গবৃত্তের প্রান্তসীমায় থেকে দুলতে লাগল।

এই এক শ' বছরের মধ্যে গদ্যনাট্যের ধারা একই খাতে যে প্রবাহিত হতে থাকল তা নয়, নতুন নতুন খাতে বইতে লাগল— প্রতীকবাদ, প্রকাশবাদ, নববস্তুতন্ত্রবাদ। তার পর এল অ্যাবসার্ড, এপিক, আভাঁ-গার্দ আন্দোলনের ঢেউ। তারপর আভাঁ-গার্দও গেল পুরাতন হয়ে। দেখা যেতে লাগল আরও কত নব নব রীতিভঙ্গ।

তবে উল্লেখ্য এই যে, ১৯৫০এ এলিয়টের 'দি ককটেল পার্টি'র অভূতপূর্ব সাফল্য যেন এইসব বস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনকে শান্ত হবার জন্য প্রকারান্তরে আহ্বান। ১৯৫০এই লণ্ডনে আগতা একজন আমেরিকান অভিনেত্রী 'দি ককটেল পার্টি'র অভিনয় দেখে তাঁর দেশের নাট্যকারদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'যান, আপনারা ঘরে ফিরে গিয়ে যার যার টাইপরাইটার ভেঙে ফেলুন। এই বইর তুলনায় আপনারা কী লিখছেন!'

এই শতবর্ষ শুরু হয়েছিল কাব্যনাট্যে; শতবর্ষ শেষেও আবার কাব্যনাট্য ফিরে এল।

কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার পালা কি আর শেষ হয়েছে, না, শেষ হতে পারে? এ তো চলবেই। এখনও চলছে।

জীবনবাবু বলেছেন, '১৯৫৬তেই জন অসবোর্ন প্রমাণ করলেন, ইংরেজী নাটক এখনও পার্থিব জীবনের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে গজদন্তমিনারে আশ্রয় নেয় নি। অবশ্য জীবনের আরো বেশী কাছে আসা দরকার হয়ে পড়েছিল। অসবোর্নের আবির্ভাব সেই দাবী পূর্ণ করতে।'

এখন প্রশ্ন এই, জীবনের আরো কত কাছে গেলে আরো কাছে যাবার দাবী থাকবে না?

কোনো এক স্তরে এসে মানতেই হয় যে শেষপর্যন্ত নাটক জীবন নয়, অন্যসব কলার মত জীবনের

চুম্বক। চরিত্রগুলো কোনো জৈবিক অর্থেই স্বাধীন প্রাণী নয়, তাদের অস্তিত্ব সীমিত হয়ে আছে নাটকরূপী কলাসৃষ্টির চৌহদ্দির মধ্যে। তারা যতই জীবনের সন্নিকট হোক, বাইরের জীবন থেকে তারা কখনও সরাসরি মঞ্চে উঠে আসে না খোলা-জানলা দিয়ে আসা এক ঝলক খর রৌদ্রের মতো। তারা আসে নাট্যকারের অনুভবের প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পবোধের রঙে রাঙিয়ে। এখন রঙরস দেখলেই যদি বিব্রত বোধ করি গজদন্তমিনারে আশ্রয় নেওয়া বলে, তাহলে কিন্তু রসোত্তীর্ণ নাটক প্রত্যাশা করতে পারব না।

মহৎ নাটক প্রত্যাশার আরও একটা বাধা মনে হয় সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাষা। স্বভাববাদীরাই শুরু করেছিলেন নাটকে ঘরোয়া রোজানা বোলচালের ভাষা। কিন্তু নিত্যব্যবহারে দ্যোতনা ক্ষয়ে গেছে যে ভাষার সেই ভাষায় মহৎ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব কি না তাও ভাববার কথা। স্বভাববাদী নাট্যকাররা কী করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন surface emotionএর কারবারী তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় নি। মনের কেজো বৃত্তির প্রকাশ কেজো শব্দ দিয়ে দিব্যি করা গেছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা উপরে-উপরে সাঁতার না কেটে ডুব দিয়ে গভীরে তলিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁরা ভাষার এই অসুবিধা দূর করতে নানা বিকল্প প্রকরণের সাহায্য নিয়েছেন। ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবের্গ, চেকভ —এই তিন দিকপালই প্রতীকের শরণ নিয়েছেন। তবু দেখা গেছে যে, নাটকের সবটায় ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করে এলেও আবেগের গাঢ়তম গভীরতম মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলতে গিয়ে পোশাকী সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করলেন।

আগে প্রশ্ন তুলেছিলাম, নাটকে যে জীবন মুকুরিত হবার দাবী, সে কার জীবন? উত্তর বোধহয়, অবশ্যই গণজীবন। কিন্তু তারও অসুবিধা আছে। আজকাল তো রামায়ণের যুগ বা সামন্ততান্ত্রিক যুগ নেই যে জনচিত্ত সমপৃষ্ঠ হবে। সমতলভূমিতে যেমন এক ঘড়া জল ঢাললে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি সে যুগে একখানা মহৎ গ্রন্থ রচিত হলে তার রস জনচিত্তের সর্বত্র সঞ্চারিত হত। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিকযুগে আমাদের চিন্তাভাবনা সুখদুঃখের আদর্শ ও অনুভূতি সব যান্ত্রিক হয়ে গেছে, হয়েছে নানা মাপের নানা আকারের, হৃদয়ের বৃত্তিগুলিও যেন যন্ত্র দিয়ে কাটা, এক-এক কোম্পানীর শীলমোহর লাগানো। এযুগে সৎসাহিত্য সংখ্যালঘুর সাহিত্য হতে বাধ্য। একালে কোনো একজন লেখকের পক্ষে সমাজের সকল স্তরের লোকের পক্ষ হয়ে কথা বলা সম্ভব নয়।

হয়তো বলা হবে, তাহলে বারো-আনির পক্ষ হয়ে যে কথা বলবে সে'ই কথা বলুক, তারই কথা শুনব। তবে অসুবিধা এই যে, সাহিত্যে রসের কারবারটা গণিতের হিসাব মেনে চলে না।

আলোচ্য বইখানা পড়ে উপকৃত হয়েছি, এরকম তথ্যসমৃদ্ধ একখানা বই হাতের কাছে থাকা ভালো। বইটি পড়ে মনে হল, জীবনবাবুর প্রচুর অধ্যয়ন আছে, অতীত বিষয় পরিপাক করার শক্তি আছে, সর্বোপরি, সেই বিষয়ে রুচি আছে।

পরিশেষে গ্রন্থের ভূমিকাটিতে আবার ফিরে আসি। এতে একটি বিনয়-নম্র উচ্চশ্রেণীর চিত্তের প্রতিভাস দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

দিলীপকুমার সেনগুপ্ত

ভাগবতীতনু। প্রথম খণ্ড। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১২। মূল্য ১০·০০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী অথবা রবীন্দ্রজীবনকথা অনেকে রচনা করেছেন। ভালো মন্দ মাঝারি—এ রকম বিভিন্ন স্তরে সেগুলিকে বিচার করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আলোচ্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রজীবনকথাই, কিন্তু এটি একটু নূতন ভাবে বা নূতন ভঙ্গিতে লেখা।

বইটির নামকরণ হয়তো সার্থক হয়েছে, কিন্তু এই নাম দেখে সহসা বোঝা যায় না যে এ বইটি কবিজীবনী। অথচ, এই নাম রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই গৃহীত : "হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হয়ে থাক্! আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ ক'রে এই শরীরকে ভা গ ব তী ত নু ক'রে তুলুক।" রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনা একদিনের উচ্চারণে তাঁর জীবনে সহসা পূরণ হয় নি, স্তরে-স্তরে মননে-সাধনায় অধ্যবসায়ে-আরাধনায় কিভাবে তা ক্রমশ সার্থকতায় এসে পৌঁছেছে এই গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার তার বিবরণ দিয়েছেন। সন-তারিখের জীবনী এ'কে বলা যাবে না, অনুভূতি ও উপলব্ধির হিসাব-নিকাশ ক'রে রচনা করা এই বইটিকে হয়তো বলতে হয় এটি একটি মহৎ জীবনের ব্যাখ্যা। এ বই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' রচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী খণ্ডে সম্ভবত কবির জীবনের পরবর্তী অংশের কথা বলা হবে।

কবিকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তাঁর জীবনচর্যাতে। অচিন্ত্যকুমার সম্ভবত এই কারণেই কবিকে অন্বেষণ করেছেন কবির জীবন-পথ-পরিক্রমায় এবং কবির জীবনের পরিচর্যায়। যে পরিবেশ বা পরিমণ্ডলে অবস্থানের জন্যে কবির জীবনে বিশেষ-কোনো উপলব্ধি এসেছে, লেখক তার বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সেই উপলব্ধির প্রতিধ্বনি হয়ে যে কবিতা বা গান উৎসারিত হয়েছে, রবীন্দ্ররচনা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত। ঘটনার সঙ্গে রচনার সংযোগ ক'রে বইটি লিখিত।

একটি শিশুতরু ধীরে-ধীরে কিভাবে মাটির রস সংগ্রহ ক'রে ক'রে বড় হয়ে উঠল, মাটির গভীরে শিকড় চালনা ক'রে কিভাবে দেশের মৃত্তিকাকে নিবিড় আশ্লেষে নিজের মধ্যে বেঁধে নিল—এ বই তারই ইতিবৃত্ত। শিশুকালের উপনয়ন, পিতার সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণ, আন্না তড়খড়ের সঙ্গে পরিচয়—জীবনের সেই উন্মেষ থেকে জীবনের উন্মোচনের কথা অচিন্ত্যকুমার এই গ্রন্থে বেশ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। জীবনের কোন্ উপলব্ধি থেকে কোন্ কাব্য উৎসারিত হল, কোন্ কাব্যপংক্তির পিছনে কোন্ ভাবনা-বেদনা-স্মৃতি থাকা সম্ভব, তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন অচিন্ত্যকুমার।

কবির কলমে লেখা কবিজীবনীর স্বাদ আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। অচিন্ত্যকুমার কবি, তিনি সেই কবিপ্রাণ দিয়ে রচনা করেছেন এই কবিজীবনী। এই জন্যেই এ বই হয়েছে সরস ও মধুর।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব বৃত্তান্ত দেওয়ার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের কথা উল্লেখ করতে অচিন্ত্যকুমার ভুল করেন নি। রবীন্দ্রজীবন-নির্মাণে প্রথমদিকে পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা কতটা সে কথারও যেমন উল্লেখ আছে, পরবর্তী জীবনে যাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটেছে তাঁদের কথাও তেমনি আছে। যেমন, নবীনচন্দ্র সেন, দীনেশচন্দ্র সেন,

রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে শোকতাপ পেতে হয়েছে, তার বিবরণও আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব।

রজনীকান্ত যখন রোগশয্যায় তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন (পৃ ২৭৪)—"সেই দিনই রজনীকান্ত নতুন গান লিখলেন—'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর'। গানটি পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে।" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থেও এই গানটিরই উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রজনীকান্ত যে-গানটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন সেটি হল 'যজ্ঞভঙ্গ', যার প্রথম ছত্র 'এই, যুক্তপ্রাণের দৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিবে কে'। আমরা এর সন্ধান পেয়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রজনীকান্তের উল্লিখিত পত্রের ও তৎসহ কবিতাটিরও পাণ্ডুলিপিচিত্র প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকার (বর্ষ ২২ সংখ্যা ২) কার্তিক-পৌষ ১৩৭১ সংখ্যায়। আমাদের মনে হয়, বিষয়টি সামান্য হলেও সংশোধিত হয়ে থাকা ভালো।

সুশীল রায়

স্বরলিপি

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে।
দুয়ারে মম স্বপনের ধন-সম এ যে দেখি—
তব কণ্ঠের মালা এ কি গেছ ফেলে।
জাগালে না শিয়রে দীপ জ্বেলে—
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে,
চামেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে।
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণপবনের প্রাণে
রেখে গেলে বল নি যে কথা কানে কানে—
বিরহবারতা অরুণ-আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

চতুর্মাত্রিক ছন্দে গেয়

II পা -ন্ধা ন্ধধা পা I মা -গা গা -পা I পা -র্সা র্সনা -র্রা I র্রা র্সা র্সা র্সনা I
নি র্ জ ন রা ০ তে ০ নিঃ ০ শ০ ব দ চ র ণ০

I ধা -র্সনা ধপা -ন্ধা I -পা -া পর্সা র্সা I না -পন্ধা ধপা -া I -া -া -া -া I
পা ০০ তে০ ০ ০ ০ কে০ ন এ ০০ লে০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা মা মগা I গা -পা -া -া I সা -া রা রা I গা রা গা গরা I
দু য়া রে ম০ ম ০ ০ ০ স্ব প্ নে র ধ ন স ম০

I গা -মা পা পন্ধা I পা -া পন্ধা পন্ধা I ধা -না নর্সা র্সনা I ধা -র্সনা ধপা -া I
এ ০ যে দে০ খি ০ ত০ ব০ ক ণ্ ঠে০ র০ মা ০০ লা০ ০

I পা -ন্ধা পধা -ধপা I -মা -া মা মা I মা -গা গা -পা I -া -া -া -া I
এ ০ কি০ ০ ০ ০ গে ছ ফে ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I সা সা রা -া I রা -গা -া -া I রা রা গা মা I -পা পা পা -হ্মা I
জা গা লে ০ না ০ ০ ০ শি য় রে দী ০ প জ্ঞে ০

I পা -া পর্সা র্সা I না -পহ্মা ধপা -া I -া -া -া -া I পা পা না -ধা I
লে ০ কে০ ন এ ০০ লে০ ০ ০ ০ ০ ০ এ লে ধী ০

I না -র্সা র্সা -না I ঋর্সা -না -র্সা -া I র্সা -ধা র্সা -ধা I র্সা -ঋা র্সা না I
রে ০ ধী ০ রে০ ০ ০ ০ লি ০ দ্রা ০ র ০ তী রে

I ধা -র্সনা ধপা -া I পা পর্সা না ধা I পা -হ্মা ধা পা I পা পা পমা -া I
তী ০০ রে০ ০ চা মে০ লি র ই ঙ্ গি ত আ সে যে০ ০

I মা -া মা -গা I গা -পা -া -া I র্গা -া র্গা র্গঋা I ঋা -র্সা র্সা র্সনা I
বা ০ তা ০ সে ০ ০ ০ ল জ্ জি ত০ গ ন্ ধ মে০

I ধা -না র্সা না I ধা -র্সনা ধপা -া I পা -হ্মা ^হ্মধা পা I মা -গা গা -পা I
লে ০ কে ন এ ০০ লে০ ০ নি র্ জ ন রা ০ তে ০

I -া -া -া -া I মা -া মা -গা I গা -পা -া পা I না -ধা না -ধা I
০ ০ ০ ০ বি ০ দা ০ য়ে ০ ০ র যা ০ ত্রা ০

I না -ধা ধা -পা I পা -হ্মা পা পা I পর্সা র্সা -না না I না -ধা ধা -া I
কা ০ লে ০ পু ষ্ প ঝ রা০ ব ০ কু লে ০ র ০

I ধা -পা পা -া I পা -হ্মা ধা পা I পর্সা র্সা র্সা র্সা I র্সনা -ঋা র্সা র্সা I
ডা ০ লে ০ দ ক্ খি ন প০ ব নে র প্রা০ ০ ণে রে

I র্সা -া র্সনা -র্রা I র্সা -া -া -না I ধা না র্সা -র্রা I র্সা র্সনা না -ধা I
খে ॰ গে॰ ॰ লে ॰ ॰ ॰ ব ল নি ॰ যে ক॰ থা ॰

I ধপা পা পহ্মা -ধা I পা -া -া -া I পর্গা র্গা র্গা র্গা I -র্রা র্রা র্সা -না I
কা॰ নে কা॰ ॰ নে ॰ ॰ ॰ বি র হ বা ॰ র তা ॰

I র্সা র্সর্গা র্গা র্গা I র্রা র্সা র্সা র্সনা I ধনা -া -া না I নধা ধপা পহ্মা -ধা I
অ রু॰ ণ আ ভা র আ ভা॰ সে ॰ ॰ রা ঙা॰ য়ে॰ গে॰ ॰

I পা -া পর্সা র্সা I না -পহ্মা ধপা -া II II
লে ॰ কে॰ ন এ ॰॰ লে॰ ॰

—

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকার সপ্তবিংশ বর্ষ পূর্ণ হল। এইসঙ্গে বর্তমান সম্পাদকের কার্যকাল শেষ হল।

দীর্ঘ এগারো বছর এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকা গিয়েছিল। এই সূত্রে যাঁদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এবং যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া গিয়েছে তাঁদের সকলের সহযোগিতার ও সহৃদয়তার কথা স্মরণ করে সম্পাদক বিদায় নিচ্ছেন।

সুশীল রায়